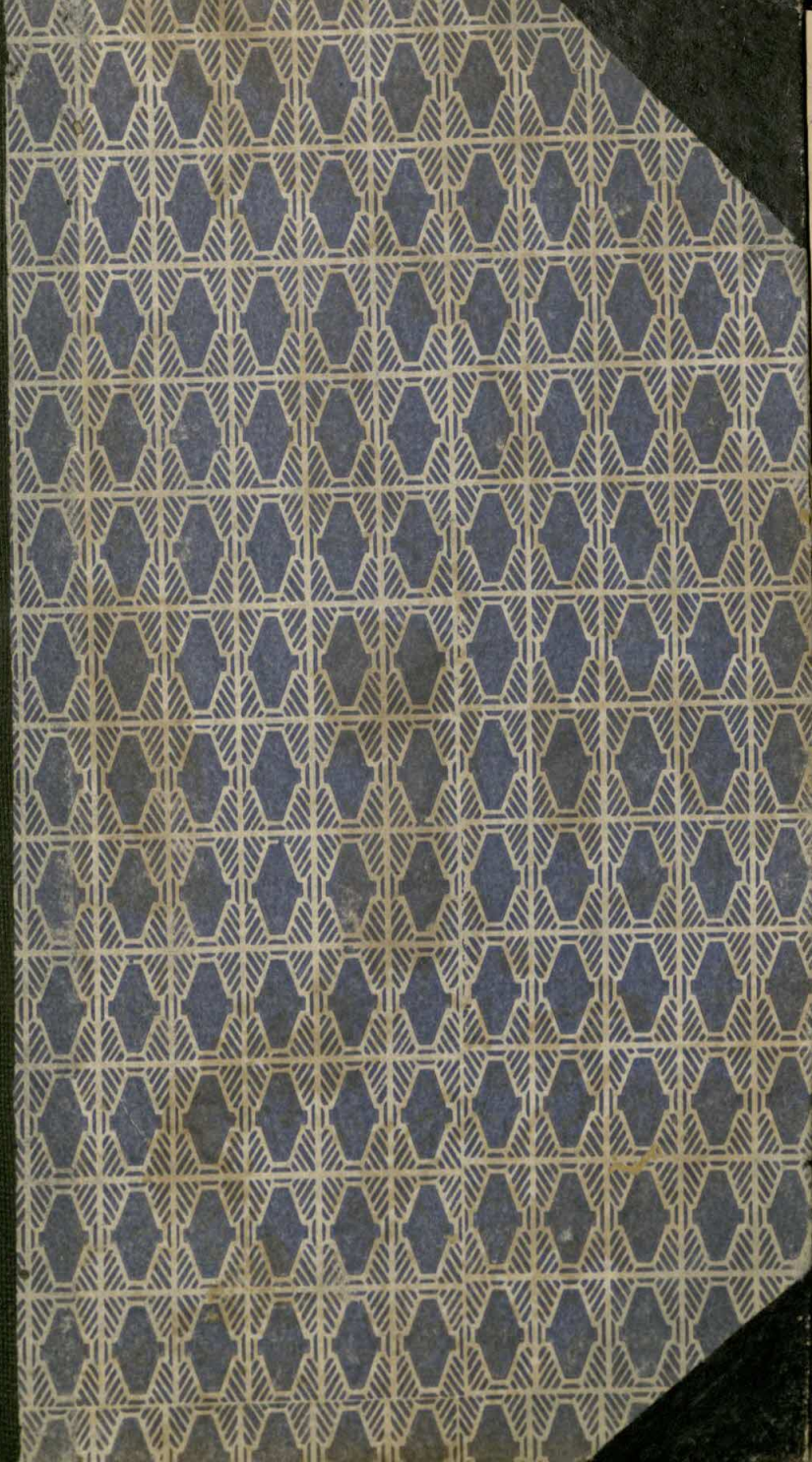
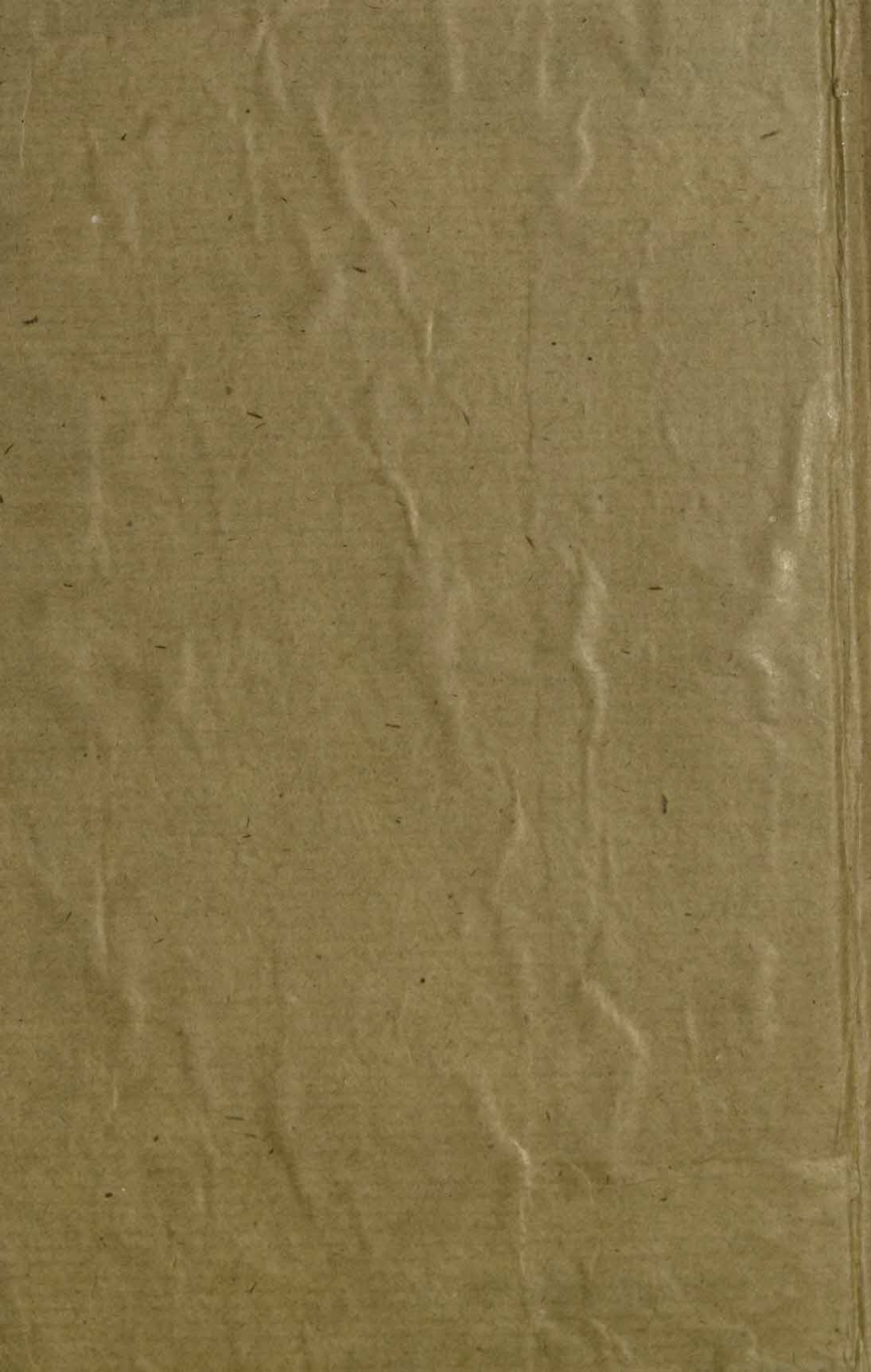






11E

~~7585~~

“বাঙ্গালার সামাজিক ইতিহাস”

সাধারণতঃ আমাদের দেশে সমালোচকগণ বা সংবাদপত্র পরিচালকগণ পারিশ্রমিক স্বরূপ কিঞ্চিৎ না পাইলে কোন স্তূথ্যিতি করেন না, কিন্তু এক্ষেত্রে তাঁহারা স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া বাহা বলিয়াছেন, তাহাতেই এই গ্রন্থ যে বঙ্গভাষায় এক অপূর্ব ও ভীতি প্রয়োজনীয় সামগ্রী তাহা সহজেই বুঝা যায়। ইংরেজী ভাষায় বাঙ্গালার ইতিহাস পড়িয়া অথবা তাহার বাঙ্গালা অনুবাদ পড়িয়া আমাদের দেশের প্রকৃত ইতিহাস কিছুই জানা যায় না। ঐ সকল ইতিহাসে দেশের আভ্যন্তরিক বৃত্তান্ত প্রায় নাই, বরং অল্পমাত্র বাহা কিছু লিখিত হয় তাহাও মিথ্যা মিশ্রিত। এই ইতিহাস দ্বারা স্বদেশের ইতিহাসের অভাব প্রচুর পরিমাণে পূরণ হইবে। ইহাতে বহুতর প্রয়োজনীয় নূতন তথ্য বিবৃত হইয়াছে। উপগ্রাস অপেক্ষাও সূখ পাঠ্য।

সুপ্রসিদ্ধ “সন্ন্যাস” সম্পাদক বলেন,—“দুর্গাচন্দ্র বাবুর সংগৃহীত বাঙ্গালার সামাজিক ইতিহাসখানি বহু অমূল্যমানের ফল। একপ বিদ্বান্ লোকের রাজদরবারে সম্মানিত হওরাই উচিত। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে তিনি গবর্ণমেন্ট কর্তৃক সম্মানিত না হইয়া বরং পাগল বলিয়া স্থির হইয়াছেন। দেশীয় মহৎ লোকেরা তাঁহাকে কিছু কিছু সাহায্য করিতেছেন বটে, কিন্তু তাঁহার গুণবস্তার তুলনায় সেই সাহায্য অতি সামান্য মাত্র।”

শ্রীযুক্ত সান্যাল মহাশয় বৃদ্ধ বয়সে নানারূপ কষ্ট পাইয়াছেন; তাঁহার সহিত সহানুভূতি প্রকাশ করিবার এই সর্বাপেক্ষা বৃহৎ সুযোগ। প্রত্যেক বাঙ্গালীর একখানি করিয়া পুস্তক ক্রয় করিয়া সাহায্য করা উচিত।

পুস্তক সম্বন্ধে কয়েকটি মতামত।

মাননীয় হরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বলিয়াছেন,—বাঙ্গালার প্রকৃত ইতিহাস লিখনে বোধ হয় এই প্রথম উদ্ভব।

শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রচন্দ্র ত্রিবেদী মহাশয় বলেন,—সাম্ভাল মহাশয়ের পূর্বে আমাদের সামাজিক ইতিহাস এইরূপে রচনার কেহ চেষ্টা করিয়াছেন কি না জানি না। গ্রন্থকার যে সকল কিম্বদন্তী সংগ্রহ করিয়া এই ধারাবাহিক ইতিহাস প্রণয়ন করিয়াছেন, তাহার অনেক কথা আমার অজ্ঞাত ছিল, বোধ করি অনেকের নিকট অজ্ঞাত আছে। এই সকল কিম্বদন্তী সংগ্রহ করিয়া গ্রন্থকার অস্বাভাবিক ইতিহাস লেখকের পথ সুগম করিয়া দিয়াছেন। প্রকৃত সামাজিক ইতিহাসের ভিত্তি স্থাপন করিয়া গ্রন্থকার সকলের কৃতজ্ঞতা ভাজন হইয়াছেন, সন্দেহ নাই। গ্রন্থকার কেবলমাত্র সংগ্রাহক নহেন, তিনি বহু স্থলে নূতন অনুসন্ধানের ও চিন্তার পথ মুক্ত করিয়া দিয়াছেন। বস্তুতই গ্রন্থখানি এই সকল কারণে বাঙ্গালী সাহিত্যে অতি উপাদেয় সামগ্রী হইয়াছে। এ পর্য্যন্ত বাঙ্গালার ইতিহাস বলিয়া যে সকল গ্রন্থ পরিচিত ছিল, তাহা কেবল রাষ্ট্রপতিদিগের বিবরণেই পূর্ণ থাকিত, বাঙ্গালী জাতির কথা কিছুই থাকিত না। বর্তমান গ্রন্থে প্রকৃত পক্ষে বাঙ্গালী জাতির ইতিহাস সফলনে চেষ্টা হইয়াছে। এজন্তও গ্রন্থকার ধন্যবাদার্থ।

প্রবাসী—সাম্ভাল মহাশয় বহুবন্ধে বহু নূতন তথ্য সংগ্রহ করিয়া যে বাগান রচনা করিয়াছেন তাহা ভবিষ্যৎ ঐতিহাসিকের পক্ষে অনেক উপকারে আসিবে।

বঙ্গবাসী—এই পুস্তকে প্রতাপাদিত্য, কালাপাহাড় প্রভৃতির সম্বন্ধে অনেক নূতন ও সুশ্রুত সংগৃহীত হইয়াছে। বাঙ্গালার প্রকৃত ইতিহাস নাই বলিয়া যাহাদের বিশ্বাস তাহার নিশ্চয়ই এই পুস্তকখানি পড়িবেন। ইহাতে বাঙ্গালীর বলিবার ও গর্ব করিবার অনেক কথা আছে।

হিতবাদী ও বহুমতী—এই পুস্তক সমস্ত বাঙ্গালীর ঘরে ঘরে আদৃত হইবার উপযুক্ত।

বাঙ্গালার



সামাজিক ইতিহাস ।

শ্রী দুর্গাচন্দ্র সান্যাল কর্তৃক সংগৃহীত

ও

শ্রী ফকিরচন্দ্র দত্ত সম্পাদিত

(সম্পূর্ণ পরিশোধিত ও পরিবর্দ্ধিত)

নূতন সংস্করণ ।



লোকনাথ এণ্ড কোম্পানী ।

কলিকাতা ।

সন ১৩১৭ সাল ।

এই

কলিকাতা,
১১/১, নবাবী ওস্তাগরের লেন ;
শ্রীমুরেশ্বনাথ বসু কর্তৃক প্রকাশিত ।

ALLEN & WOODS

Date

Ac. No. 5812

5912

সর্ব স্বত্ব সংরক্ষিত ।

কলিকাতা,
১১/১, নবাবী ওস্তাগরের লেন,
লোকনাথ যন্ত্রে
শ্রীনারায়ণচন্দ্র বিশ্বাস কর্তৃক মুদ্রিত ।

L. N.—163—2,000.

সম্পাদকের নিবেদন ।

সভ্যজগতে ভারতবর্ষ চিরকালই শীর্ষস্থানীয় ছিল। ভারতের বেদ, ভারতের বেদান্ত, দর্শন, জ্যোতিষ, কাব্য আজও জগতে অতুলনীয়। কিন্তু ভারতের প্রাচীন ধারাবাহিক কোন ইতিহাস নাই। যে আর্য্যজাতির গভীর জ্ঞানের, অলৌকিক পাণ্ডিত্যের এবং ভূয়সী গবেষণার শুভ্র জ্যোতির্শ্ময় অভ্রভেদী হিমাচল শির উদ্ভিত হইয়াছিল, সেই আর্য্যজাতি যে ইতিহাস লিখনে অজ্ঞাত ছিলেন, এ কথা সহসা বিশ্বাস হয় না। আমাদের বোধ হয়, বহু পূর্বে হইতেই আর্য্যদিগের ইতিহাস-লিখন প্রথা প্রচলিত ছিল, কিন্তু বৌদ্ধযুগের প্রাচুর্য্যাবে, বৌদ্ধদিগের অত্যাচারে যাবতীয় প্রাচীন গ্রন্থসমূহ বিনষ্ট হয়। কেবল বেদাদি ধর্ম্ম, দর্শন, জ্যোতিষ ও বৈদ্য শাস্ত্র প্রভৃতি যাহা সর্বসাধারণের নিত্য প্রয়োজনীয় ছিল, এবং যে সমস্ত গ্রন্থ তৎকালীন পণ্ডিতগণের কণ্ঠস্থ ছিল, সেই সকল গ্রন্থাদি কোনরূপে রক্ষা পাইয়াছিল। কারণ, এতদ্ সংক্রান্ত গ্রন্থাদি ব্যতীত বৌদ্ধযুগের পূর্বের প্রাচীন সাহিত্য গ্রন্থাদি বড় একটা দেখা যায় না। পূর্বকালের কথা কেবল প্রাচীন ধর্ম্ম গ্রন্থাদি হইতে কিয়ৎ পরিমাণে নির্দিষ্ট হইতে পারে, কিন্তু তাহাও সম্পূর্ণ বিশ্বাস যোগ্য হয় না। সুতরাং সে কালের কথা এক্ষণে আমাদের পক্ষে নিবিড় ঘনাচ্ছন্ন অমারজনীর তুল্য।

মুসলমান রাজত্বের অভ্যুত্থান হইতেই এদেশে একপ্রকার ধারাবাহিক ইতিহাস লিপিবদ্ধ হইতে আরম্ভ হয়। এই

সম্পাদকের নিবেদন ।

সকল ইতিহাস লেখকেরা প্রায় সকলেই মুসলমান ছিলেন । যদিও এই সকল ইতিহাস ধারাবাহিক, কিন্তু তাহা সম্পূর্ণ ও সৰ্ব্বাঙ্গসুন্দর নহে, কেবল রাজাদিগের নাম ও যুদ্ধাদির বিবরণেই পূর্ণ । কেবল যুদ্ধাদির বিবরণ, রাজাদিগের নাম, বংশাবলী ও শাসন-কাল থাকিলেই ইতিহাস হয় না । যথার্থ ইতিহাস হইতে গেলে তাহাতে জাতীয় জীবনের ও সামাজিক অবস্থার পরিবর্তনাদি বিবৃত থাকা আবশ্যিক । আবার যথার্থ ইতিহাস লিখিতে গেলে যথার্থ ঘটনার উল্লেখ করিতে হইবে । পূর্বে মুসলমান ঐতিহাসিকেরা রাজার বেতন ভোগী বা হিন্দু বিদ্বেষী ছিলেন, সুতরাং তাঁহাদের লিখিত ইতিহাস হয় অনর্থক রাজপ্রশংসায় নয় হিন্দুদিগের অযথা নিন্দাবাদে পূর্ণ । আবার, এক জাতির ইতিহাস অন্য জাতির লোকে লিখিলেই নানা ভ্রম প্রমাদ ঘটিবার সম্ভাবনা থাকে, কখনও বা পক্ষ-পাতিতা ও স্বজাতিবাৎসল্যে পরিপূর্ণ থাকায় প্রকৃত ঘটনা কি তাহা জানিবার কোন উপায় থাকে না ।

এই সমস্ত প্রতিবন্ধকতা সত্ত্বেও ফ্যুয়ার্ট্, মার্শম্যান্, হণ্টার্ প্রভৃতি পাশ্চাত্য ঐতিহাসিকগণের সত্যানুসন্ধিৎসুর বিশেষ প্রশংসা না করিয়া থাকা যায় না । কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয়, বিদেশী বলিয়া আমাদের রীতি নীতি সকল উত্তমরূপে না বুঝিতে পারিয়া, তাঁহারাও বিষম ভ্রমে পতিত হইয়াছেন, এবং তাঁহাদের ইতিহাসেও আমাদের সামাজিক অবস্থার আভাষ কিছুই পাওয়া যায় না । এই সমস্ত অভাব দূরীকরণার্থ শ্রীযুক্ত দুর্গাচন্দ্র সান্যাল মহাশয় যথাসাধ্য

যত্ন ও পরিশ্রমে অনেক নূতন তথ্য সংগ্রহ করিয়াছেন । আমাদের দেশের ইতিহাস সংগ্রহ করিতে হইলে প্রাচীন কিস্বদন্তী ভিন্ন অন্য উপায়ে সঙ্কলন করা এক প্রকার অসম্ভব । সান্যাল মহাশয়ও কিস্বদন্তী এবং প্রাচীন সনন্দ প্রভৃতি হইতেই তাঁহার সামাজিক ইতিহাসের ভিত্তি স্থাপন করিয়াছেন ।* কিস্বদন্তী সকলের মূলে সে অন্ততঃ কিয়ৎ-পরিমাণে সত্য নিহিত আছে তদ্বিষয়ে কাহারও সন্দেহ নাই । সুতরাং আশা করা যায় সান্যাল মহাশয়ের যত্ন ও পরিশ্রম ভবিষ্যৎ ঐতিহাসিকগণের উপকারে আসিবে ।

সান্যাল মহাশয় যখন এই গ্রন্থের কিয়দংশ প্রচার করেন, তখন তাঁহার দৈবদুর্ষিপাক বশতঃ দারজিলিং মেলের মারা-মারি মোকদ্দমা হইতেছিল, এবং তদ্ব্যতীত শারীরিক অসুস্থতা নিবন্ধন সম্পূর্ণ মনোযোগ করিতে পারেন নাই, এবং এই সকল কারণ জন্ত অনেক ভ্রমপূর্ণ হইয়াছিল । এক্ষণে এই নূতন সংস্করণে সেই সকল ভ্রান্তি নিরাকৃত করিবার জন্ত যথাসাধ্য প্রয়াস পাইয়াছি । উপক্রমণিকায় প্রজাপতিসূত্র প্রভৃতি গ্রন্থ হইতে প্রাচীন আৰ্য্য সমাজের ইতিহাস সঙ্কলিত হইয়াছে । ইহা একটা সম্পূর্ণ মৌলিক বিষয় । আনন্দ ভট্ট প্রণীত “বল্লাল চরিত” নামক সংস্কৃত গ্রন্থে ও “বিশ্ব-কোষ” সম্পাদক শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় সেন রাজ-গণকে “ব্রহ্ম ক্ষত্রিয়” বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন, কিন্তু এ বিষয়ে অনেকের মত ভিন্নরূপ থাকায় এবং উক্ত মত ততদূর প্রামাণিক বলিয়া বোধ না হওয়ায় আমরা সাধারণ মতানুযায়ী

সেন বংশীয় নৃপতিগণকে বৈষ্ণবংশজ বলিয়াই নির্দেশ করিয়াছি । কালাপাহাড় দুইজন ছিল এবং তাহাদের সম্বন্ধেও যত নূতন তথ্য সংগৃহীত হইয়াছে তৎসমুদায়ই সন্নিবেশীত করিয়াছি এবং পূর্বের যে ভ্রম ছিল তাহা সংশোধিত হইয়াছে । এবারে মোগল রাজত্ব সময়ের ইতিহাসও প্রদত্ত হইয়াছে । বর্তমান সংস্করণে অনেক স্থল পরিশোধিত, পরিমার্জিত ও পুনর্লিখিত হইয়াছে, এবং অনেক স্থলে আমরা উভয়ে যথাসাধ্য অসম্ভব অংশ সম্ভব করিতে ও নূতন তথ্য সংগ্রহে প্রয়াস পাইয়াছি । পাদটিকায় বিভিন্ন ঐতিহাসিকের মতও সন্নিবেশীত করিয়াছি । কয়েক স্থলে শ্রদ্ধাস্পদ সুবিখ্যাত ঐতিহাসিক শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের নিকট বিশেষ সাহায্য পাইয়াছি । তজ্জন্ম আমরা তাঁহার নিকট চিরকৃতজ্ঞ রহিলাম ।

উপসংহারে বল্লেখ্য এই যে, সামাজিক ইতিহাস লেখা অতীব দুর্লভ কার্য্য । যদিও সত্য নির্ণয়ে যথাসাধ্য যত্ন ও পরিশ্রম করা হইয়াছে, তথাপি এ প্রকার গ্রন্থ যে নিভুল হইবে তাহা কোন মতেই সম্ভব হইতে পারে না । সান্তাল মহাশয়ের যত্নে এই গ্রন্থের প্রায় সমুদায় উপাদান সংগৃহীত হইয়াছে । ইহার দোষ ও ত্রুটি সম্বন্ধে আমিই দায়ী । ইহার প্রসংসার ভাগ তাঁহার । ভরসা করি, সুধীসমাজ কৃপাকটাক্ষপাতে পত্রদ্বারা প্রমাদপ্রদর্শনপূর্ব্বক অজ্ঞানতা দূর করিলে কৃতার্থ হইব । ইতি—

১৫ই কার্তিক, ১৩১৭ ।
নবাবী ওস্তাগরের লেন,
কলিকাতা ।

শ্রীফকিরচন্দ্র দত্ত ।

দুর্গাচন্দ্রের সংক্ষিপ্ত জীবনী ।

মানবদেহ নশ্বর । জগতে কিছুই চিরস্থায়ী নহে । কিন্তু যতদিন জগত থাকিবে ততদিন গুণের আদর থাকিবে, কারণ গুণই চিরস্থায়ী,—প্রতিভাই চির-আদরণীয় ও পূজনীয় ।

এই জগতে অনেকেই নানা স্বেচ্ছাচারের সংঘটনে প্রতিষ্ঠা লাভ করেন । যাহারা সহজেই খ্যাতি লাভ করেন তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই কয়েকদিবসের নিমিত্ত নির্মল আকাশে অপরিচিত উল্কার হ্রাস দীপ্তি পাইয়া আবার বিস্মৃতির ঘোর অন্ধকারে নিমগ্ন হন । কিন্তু যাহাদের খ্যাতি চিরস্থায়ী, তাঁহারা ঐক্যবতারার মত নিশ্চল হইয়া চিরকাল দীপ্তি প্রাপ্ত হন । উল্কার হ্রাস তাঁহারা সর্বত্রই সাধারণের চিন্তাকর্ষণ না করিয়া ক্রমে ক্রমে, ধীরে ধীরে সকলের নয়নপথে পতিত হন, এবং ক্রমে ক্রমে লোকে তাঁহাদের ভিতরের গুণাবলী সমস্তই বুঝিতে পারে ।

শ্রীযুক্ত দুর্গাচন্দ্র সান্যালের নাম কিছুকাল পূর্বে বঙ্গবাসীর নিকট অজ্ঞাত ছিল । বিগত ১৩১৪ সালের আশ্বিন মাসে দারজিলিং টেঁনে মারামারির মামলায় দুর্গাচন্দ্রের নাম অনেকেই জানিল । দুর্গাচন্দ্রের অদৃষ্টচক্রও পরিবর্তিত হইয়া তাঁহাকে এক নূতন ক্ষেত্রে আনীত করিল । দুর্গাচন্দ্রের জেল তাঁহার দুর্ভাগ্য হইতে পারে কিন্তু সমগ্র বঙ্গদেশের সৌভাগ্যসূচক । অদৃষ্টের অলক্ষ্যগতি বোঝা সাধারণ মনুষ্যের সাধ্যাতীত । দুর্গাচন্দ্র ওকালতী করিতেন, জেল হওয়াতে ওকালতী ব্যবসা পরিত্যাগপূর্বক তাঁহাকে সাহিত্যসেবী হইতে হইয়াছে । তিনি নানাদেশ পরিভ্রমণ করিয়া বঙ্গদেশের সামাজিক অবস্থার যে ইতিহাস প্রকটিত করিয়াছেন তাহা বঙ্গবাসীর চিরগৌরবের বস্তু । যদি দুর্গাচন্দ্র এই হতভাগ্য বঙ্গদেশে জন্মগ্রহণ না করিয়া যুরোপে জন্মগ্রহণ করিতেন, তাহা হইলে এই

বৃদ্ধ বয়সে চারিটী উদরানের জন্ত তাঁহাকে লালায়িত হইতে হইত না—বরং তিনি অতুল ঐশ্বর্যের অধিপতি হইতেন। অবশ্য অনেকে তাঁহাকে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছেন, কিন্তু তাহা তাঁহার গুণের ও কার্যের তুলনায় অকিঞ্চিৎ। যাহা হউক, তবু যে বঙ্গবাসী গুণের আদর শিখিতেছে, ইহাই যথেষ্ট।

২৪৪ শকাব্দে বঙ্গাধিপতি আদিশূর কর্তৃক ভৃগুবংশীয় কাণ্ডকুজবাসী ধরাদর মুনি বাঙ্গালা দেশে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। তাঁহার প্রপৌত্র অনিরুদ্ধ বেদান্তাচার্য বল্লালসেনের গুরু ছিলেন। তাঁহার দুই পুত্র লক্ষ্মীধর ও ভীমদেব বারেন্দ্র কুলীন। লক্ষ্মীধর সঙ্গামিনী গ্রামে বাস করিয়াছিলেন। জনসাধারণে সঙ্গামিনী গ্রামকে সংক্ষেপে সানি বা সাণ্ডি বলিত। এজন্ত লক্ষ্মীধরের বংশধরেরা সাণ্ডাল বা সাণ্ডাল গোষ্ঠী নামে খ্যাত। আর ভীমদেব কালিয়া গ্রামে বাস করায় তদংশীয়েরা কালিয়াই গোষ্ঠী নামে পরিচিত। অনিরুদ্ধের ভ্রাতা দামোদর আচার্য রাঢ়দেশে ব্রহ্মত্র পাইয়া তথায় গিয়া বাস করিয়াছিলেন। দামোদরের পুত্রেরা রাঢ়ীয় কুলীন ব্রাহ্মণ। তাঁহাদের বংশধরেরা ঘোষাল ও কাজিলাল উপাধি বিশিষ্ট।

লক্ষ্মীধরের সপ্তম পর্ষায়ে শিখিবাহন (শিখাই) সাণ্ডাল নবাব সম্ভ্রুদ্দীনের স্বাধীনতা লাভের সাহায্য করিয়া চাকলে ভাড়াড়িয়া জাগীর প্রাপ্ত হইয়াছিলেন এবং খাঁ সাহেব উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। কিন্তু তিনি বা তদংশীয়েরা সেই যাবনিক উপাধি ধারণ করেন নাই। শিখাইর তিন পুত্র মধ্যে জ্যেষ্ঠ বলাই চাকলে ভাড়াড়িয়ার রাজা হইয়া সাঁতোড়ে বাস করিয়াছিলেন। বলাইএর সহোদর ভ্রাতা প্রিয়দেব (পিয়াই) গোড় বাদশাহের ফৌজদার ছিলেন। তৎপুত্র রাজা কংসরাম নাবালক সম্রাট ময়জুদ্দীনের (সেকেন্দর সাহ) অভিভাবকরূপে সমস্ত বাঙ্গালা ও বেহার শাসন করিয়াছিলেন। শিখাইর মধ্যম পুত্র কানাই যিনি বলাইএর বৈমাত্র ভ্রাতা ছিলেন, মুসলমান প্রদত্ত কোন সম্পত্তি গ্রহণ করেন নাই অথবা কোন চাকরী করেন নাই। কানাইএর সন্তানেরাই কুলপতি বা কুলমর্যাদার রাজা বলিয়া ব্রাহ্মণ সমাজে সম্মানিত হইতেন।

কানাই হইতে ষষ্ঠ পুরুষে গোপাল সাণ্ডাল। গোপালের তিন পুত্র; প্রথম, রামদেব; দ্বিতীয়, কৃষ্ণদেব; তৃতীয়, প্রাণকৃষ্ণ ছিলেন। ছুর্গাচন্দ্রেরা রামদেবের সন্তান। বলিহারের রাজারা কৃষ্ণদেবের সন্তান আর জেলা রঙ্গপুরে ভিতর বন্দের

রায়চৌধুরীরা প্রাণকৃষ্ণের সন্তান। রামদেবের পুত্র রঘুদেব হরিপুরের রামদেব চৌধুরীর কন্যা অননুপূর্ণা দেবীকে বিবাহ করিয়া কাপকুলীন হইয়াছিলেন এবং গুণাইগাছা গ্রামে এক তালুক পাইয়া তথায় বাস করিয়াছিলেন। তাঁহার পুত্র বলরাম সাত্হাল তাহিরপুরের রাজার দেওয়ান হইয়াছিলেন। তৎপুত্র জগজ্জীবন সাত্হালও তাহিরপুরের রাজার পেস্কারী কর্ম করিতেন। তৎপুত্র কালীচন্দ্র সাত্হাল প্রথমে তাহিরপুরের রাজ সরকারে জমানবিস ছিলেন পরে, পেস্কারী কর্ম পাইয়া অল্প বয়সেই অবরত হইয়াছিলেন। হুর্গাচন্দ্রের পিতা রামচন্দ্র সাত্হালই কালীচন্দ্রের একমাত্র সন্তান। অতি অল্প বয়সেই তাঁহার পিতৃবিয়োগ হয়। পিতৃবিয়োগ কালে রামচন্দ্রের বয়স ২৮ দিন মাত্র হইয়াছিল। জ্ঞাতিগণ দেখিলেন রামচন্দ্র অপোগণ্ড শিশু এবং তাঁহার মাতার বয়সও পনের বৎসর মাত্র, সুতরাং তাঁহারা সুরোগ পাইয়া রামচন্দ্রের সম্পত্তি সকল আত্মসাৎ করিতে লাগিলেন এবং নানাবিধ উপদ্রব আরম্ভ করিলেন। উপদ্রবের মাত্রা এত অধিক হইল যে, রামচন্দ্রের মাতামহ সেই সংবাদ জানিয়া নিজে কন্যা ও দৌহিত্রকে নিজবাটিতে লইয়া গেলেন।

জেলা ঢাকা, থানা মানিকগঞ্জের অধীন খল্লীগ্রাম নিবাসী পঞ্চানন ভট্টাচার্য্য রামচন্দ্রের মাতামহ ছিলেন। তিনি যাজন ও গুরুগিরি ব্যবসা করিতেন। তিনি একজন অতি মাত্হ গণ্য পণ্ডিত এবং পরম ধার্মিক বলিয়া সকলের পূজ্য ছিলেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠ ও ব্রহ্মচর্য প্রচুর ছিল। তিনি দৌহিত্রকে নিজ ব্যবসায়ের ভাবী উত্তরাধিকারী করিতে মনস্থ করিয়া সংস্কৃত পড়াইতে লাগিলেন। রামচন্দ্র টোলে সংস্কৃত পড়িতেন এবং গোপনে পারসী পড়িতে আরম্ভ করিলেন। তাঁহার পিতা, পিতামহ এবং প্রপিতামহ পারসী জানিতেন। কিন্তু তাঁহার মাতামহ গোঁড়া হিন্দু ছিলেন। তিনি দৌহিত্রের যাবনিক ভাষা পাঠ টের পাইয়া তাঁহাকে এরূপ প্রহার করিয়াছিলেন যে, রামচন্দ্র তিন দিন শয্যাগত ছিলেন। তাহার পর পঞ্চানন নাতীকে সঙ্গে লইয়া গঙ্গামান, মস্তক মুগুন ও স্বর্ণোৎসর্গ দ্বারা প্রায়শ্চিত্ত করাইয়াছিলেন।

রামচন্দ্র পিতার ও মাতামহের উত্তরাধিকারী হইয়াছিলেন। উপার্জন না করিলেও তাঁহার মধ্যবিত্তরূপে সংসার চলিতে পারিত। তিনি সন ১২৩১ সালে জেলা পাবনা, থানা মথুরার অধীন বাকসাটিয়া গ্রামে রামনিধি চৌধুরীর কন্যা

হরসুন্দরী দেবীকে বিবাহ করিয়াছিলেন। নদী ভঙ্গে তাঁহার মাতামহ সম্পত্তি নিঃশেষ হইল। নানাবিধ শত্রুর চক্রান্তে তিনি পৈত্রিক সম্পত্তি হইতেও বেদখল হইয়া দরিদ্র অবস্থায় পড়িয়াছিলেন। তিনি খল্লীর নিকটবর্তী ধানকোড়া গ্রামের জমিদারদের চাকরীতে প্রবৃত্ত হইয়া ধানকোড়া গ্রামে সপরিবারে বাস করিতেন। সেই স্থানে সন ১২৫৪ সালের ২৭শে জ্যৈষ্ঠ স্বর্ঘ্যোদয়ের সময় দুর্গাচন্দ্র ভূমিষ্ট হন।

দুর্গাচন্দ্রের দেড় বৎসর বয়সের সময় তাঁহার পিতামহীর অভাব হইয়াছিল। তখন তাঁহার জননী সংসারে একাকিনী হইলেন। তাঁহার চ্যোষ্ঠ ভ্রাতা জয়চন্দ্র সাংঘাল তাঁহার অপেক্ষা কেবল তের মাসের বড়। তাঁহাদের দুই জনকে প্রতিপালন করা জননীর অসাধ্য হইল। দুর্গাচন্দ্রের জননীর জ্যেষ্ঠা ভগিনী শিবসুন্দরী দেবী অবীরা বিধবা হইয়া পিত্রালয়ে বাস করিতেন। দুর্গাচন্দ্রের প্রতিপালনের ভার তিনি লইলেন। তজ্জন্য দুর্গাচন্দ্র স্বাভাবিক মাতুলালয়ে থাকিতেন। মাসী-মাকে 'বড় মা' বলিতেন। তিনিও দুর্গাচন্দ্রকে এত স্নেহ করিতেন যে কোন জননী নিজ সন্তানকে তদপেক্ষা অধিক স্নেহ করিতে পারে বলিয়া বোধ হয় না। তাঁহার জ্ঞান হইবার পূর্বেই বাকসাটিয়া গ্রাম নদী নিমগ্ন হওয়ায় তাঁহার মাতুল পাইকশা গ্রামে বাড়ী করিয়াছিলেন। সেই গ্রামের সংলগ্ন ভারাক্ষা গ্রামের বিদ্যালয় হইতে তিনি ১৮৬২ খৃঃ অব্দের শেষে বাঙ্গালা ছাত্রবৃত্তি পাইয়াছিলেন, এবং ১৮৬৫ খৃঃ অব্দে মাইনর ছাত্রবৃত্তি পাইয়াছিলেন। ১৮৬৮খৃঃ অব্দে রঙ্গপুর গবর্ণমেন্ট স্কুল হইতে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ১০ টাকা বৃত্তি পাইয়া কলিকাতা ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে ভর্তি হইয়া হিন্দু হোস্টেলে থাকিতেন। সেই সময়ে স্কুল কলেজের ছাত্রদের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে ইংরেজী পড়িলেই হিন্দুধর্ম বিরোধী হওয়া অবশ্য কর্তব্য। হিন্দু হোস্টেলে যে সকল ছাত্র থাকিত তাহারা একান্ত কদাচারী ছিল। ইংরেজের হোটেল হইতে মুসলমান হকারগণ নানাপ্রকার মাংস লইয়া আসিত। হিন্দু হোস্টেলের ছাত্রগণ তাহাই খাইত। সেখানে দুর্গাচন্দ্রের সন্ধ্যা বন্দনাদি করিবার স্বেচ্ছা ছিল না। তিনি ছাত্রদের উপর গিয়া অতি সংগোপনে কয়েকবার গায়ত্রী জপ করিতেন। একমাস মধ্যে অন্যান্য ছাত্রেরা তাহা জানিতে পারিয়া তাঁহার উপর ঘোর উৎপীড়ন আরম্ভ করিল। একদিন দশবারজন ছাত্র ঘোট করিয়া একটা ভাজা গোজিহ্বা তাঁহার মুখে দিতে চেষ্টা করিল। সেইদিন তিনি যছনাথ বসু এবং কালীমোহন

বন্দোপাধ্যায় নামক দুইটি ছাত্রকে প্রচণ্ড আঘাতে রক্তপাত করিয়াছিলেন এবং নিজেও বহু আঘাত পাইয়াছিলেন। কার্তিকচন্দ্র মিত্র যিনি পরে রায়চাঁদ প্রেমচাঁদ ছাত্রবৃত্তি পান তিনিও সেই সময়ে হিন্দু হোস্টেলে ছিলেন। তিনি মধ্যে পড়িয়া না ছাড়াইলে নিশ্চয়ই খুনাখুনি হইত। সেইদিন হইতে দুর্গাচন্দ্র হিন্দু হোস্টেল ছাড়িলেন। শীতকালে যখন গড়ের মাঠ জরিপ করিতে হইত তখনও সহাধ্যায়ীরা ঐরূপ দৌরাশ্রয় করায় তিনি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ ত্যাগ করিয়া জেনারেল আর্সেনারী কলেজ * হইতে ১৮৭০ সালে এফ্-এ পরীক্ষা দিয়াছিলেন কিন্তু ইংরেজী সাহিত্যে ফেল হইয়াছিলেন। তিনি পীড়িত অবস্থাতে এফ্-এ পরীক্ষা দিয়াছিলেন। তাহার পর স্বাস্থ্য বর্ধন জন্য পাটনা গিয়া কেবল কমিটিতে আইনের বক্তৃতা শুনিতেন। সুতরাং সেই অবধি ইংরেজী পড়া শেষ হইল। পাটনা হইতে কাশীতে গিয়া আইনের বক্তৃতা শুনিতেন। পারসী ও সংস্কৃত পূর্বে কিছু পড়িয়াছিলেন। কাশীতে থাকা কালে আরও কিছু শিখিলেন।

বাল্যকাল হইতেই দুর্গাচন্দ্র অতি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। যাহা একবার ধরিতেন, তাহা শেষ না করিয়া কোন ক্রমেই ছাড়িতেন না। এখনও তাঁহার এ স্বভাব পরিবর্তিত হয় নাই। হাজার ব্যাঘাত হউক, যাহা করিবার জন্ত সঙ্কল্প করেন তাহা সম্পূর্ণ করিতে কিছুতেই বিচলিত হন না।

দুর্গাচন্দ্র ১৮৭৪ খৃঃ অব্দে কমিটিতে ওকালতী পরীক্ষায় নিম্নশ্রেণীতে উত্তীর্ণ হইয়া জলপাইগুড়ীতে ওকালতী আরম্ভ করিয়াছিলেন। ইং ১৮৭৫ সালে পাইকশা গ্রাম নদীসীং হওয়ায় তাঁহার পিতা বক্তারপুর গ্রামে বাড়ী করিয়াছিলেন। সেই বৎসর নিয়ম হইল যে এফ্-এ পাস না হইলে কেহ জজ আদালতের ওকালতী পরীক্ষা দিতে পারিবে না। আবার জলপাইগুড়ীতে তাঁহার শরীর স্নায়ু থাকিত না। তজ্জন্য তিনি এলাহাবাদ হাইকোর্টের ওকালতী পরীক্ষা দিয়া জজ কোর্টে পাস হইয়া ইংরেজী ১৮৭৮ হইতে ১৮৮৪ সাল পর্যন্ত কানপুর জেলায় ওকালতী করিয়াছিলেন। এই স্থানে ১৮৮০ খৃঃ অব্দে তাঁহার পিতৃবিয়োগ হয় সেই সময়ে তাঁহার উর্দু ও পারসী বলা অভ্যস্ত হইয়াছিল। সেই সময়েই তিনি “মহামোগল কাব্য” লিখিয়াছিলেন। ইং ১৮৮৪ সালের শেষে কলিকাতায় আসিয়া প্রেসিডেন্সি

* এক্ষণে এই কলেজের নাম স্কটিস্ চার্চ কলেজ হইয়াছে।

মেজিষ্ট্রেটের কোর্টে ওকালতী করিতেন এবং মহামোগল কাব্যের প্রথম তিন পর্ব মুদ্রিত করিয়াছিলেন এবং ভাষাবিজ্ঞান নামক ব্যাকরণেরও কতকদূর মুদ্রিত করিয়াছিলেন। এক্ষণে “ভাষাবিজ্ঞান” সম্পূর্ণ প্রকাশিত হইয়াছে। এরূপ সর্বাঙ্গসুন্দর মৌলিক গবেষণাপূর্ণ ব্যাকরণ এপর্যন্ত কোন ভাষায় প্রকাশিত হয় নাই। ইং ১৮৮৫ সালে তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র গিরিশচন্দ্র সাত্তালের উপনয়ন দিবার জন্ত জলপাইগুড়ী গিয়া পুনরায় তথায় ওকালতী করিতে লাগিলেন। তদবধি পুস্তক মুদ্রিত করা স্থগিত থাকিল।

জলপাইগুড়ীতে ১৮৮৫ হইতে ১৮৯৩ সাল পর্য্যন্ত ছিলেন। কিন্তু এখানে তাঁহার শরীর সর্বদাই পীড়িত থাকিত। তজ্জন্ত পুনরায় ঐস্থান ত্যাগ করিতে মনস্থ করিলেন। মৈমনসিংহ জেলার মহকুমা টাঙ্গাইলে প্রায় দেড় বৎসর ছিলেন কিন্তু স্রবিধা বোধ না হওয়ায় রাজসাহী জেলার নওগাঁও মহকুমায় প্রায় সাড়ে তিন বৎসর ওকালতী করিয়াছিলেন। এখানে অনেক বিষয়ে স্রবিধাও হইয়াছিল। কিন্তু জলপাইগুড়ীস্থিত সম্পত্তি তাঁহার অনুপস্থিতে বিশৃঙ্খল হওয়ায় পুনরায় জলপাইগুড়ীতে বাইতে হইল। জলপাইগুড়ীর এই বাসায় তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র ও কন্যা এবং বহুসংখ্যক পুত্র কন্যা নষ্ট হওয়ায় তিনি রেলওয়ে স্টেশনের নিকট পৃথক বাসা করিলেন। এই বাসায় আসা অবধি স্বাস্থ্য ভাল হইল কিন্তু উপার্জন একবারে কমিয়া গেল।

ছুগাচন্দের জ্যেষ্ঠ পুত্রের ও জ্যেষ্ঠা কন্যার মৃত্যু অবধি সর্বদা মন উদাস থাকিত এবং জলপাইগুড়ী ত্যাগ করিতে সর্বদা ইচ্ছা করিতেন। ইং ১৯০৭ সালে সেই বিষয়ে দুইটি স্রবিধা হইল। পূর্বে জলপাইগুড়ী রঙ্গপুরের জজের অধীন ছিল, ইং ১৯০৬ সাল হইতে দিনাজপুরের জজের অধীন হইল। দিনাজপুর ও জলপাইগুড়ীতে একই সবজজ বহুদিন পূর্বাবধি ছিল। তজ্জন্ত অনেক কাজের জন্ত জলপাইগুড়ীর মোকদ্দমায় কোন তদ্বির প্রয়োজন হইলে জলপাইগুড়ীর উকীল মুক্তারদের অনেক সময়ে দিনাজপুর বাইতে হইত। তিনি সেই সকল কার্যের ভার লইয়া দিনাজপুর থাকিতে মনস্থ করিলেন। আর দিনাজপুরস্থ কুটুম্বেরাও তাঁহার সহায়তা করিতে স্বীকার করিলেন। এই সমুদায় কারণে দিনাজপুর গিয়া ইং ১৯০৭ সালে সেইখানে ওকালতি আরম্ভ করিলেন। আশা থাকিল যে দিনাজপুরে কিছু স্রবিধা হইলে জলপাইগুড়ীর বাসা

ভাড়া দিয়া কিসা বিক্রয় করিয়া দিনাজপুরে বাসা করিবেন। প্রতি বৎসরই বৈশাখ মাস হইতে ভাদ্রমাস পর্যন্ত মোকদ্দমা কম হইয়া থাকে সুতরাং তিনি দিনাজপুর গিয়া বড় সুবিধা পাইলেন না। কিন্তু ষে রূপ চলিল তাহাতে পূজার ছুটির পর সুবিধা হইবে বলিয়া আশা হইল।

তাঁহার মামাতো ভগিনীর স্বামী যাদবচন্দ্র ভট্টাচার্য্য বি এল, রঙ্গপুরে জজ আদালতে ওকালতী করিতেন এবং তথায় সপরিবারে বাস করিতেন। সন ১৩১৪ সালের ভাদ্র মাসে হঠাৎ তাঁহার মৃত্যু হইল। দুর্গাচন্দ্রের মামাতো ভ্রাতা পত্র দ্বারা তাঁহাকে অনুরোধ করিলেন যে তিনি শীঘ্র রঙ্গপুর গিয়া ভগিনীর দেনা পাওনা এবং সমস্ত কার্যের ও সম্পত্তির বন্দোবস্ত করিয়া তাহার দেশে যাইবার সুবিধা করিয়া দিবেন। সেই অনুরোধ বশতঃ তিনি ১৩১৪ সালের ৫ই আশ্বিন তারিখে রিটার্ন টিকিট করিয়া দিনাজপুর হইতে রঙ্গপুর চলিলেন। রেলগাড়ীতে দুই জন রেলের সাহেব তাঁহাকে অকারণ আক্রমণ করায় তিনি আত্মরক্ষার চেষ্টা করিয়াছিলেন, এই অপরাধে তাঁহার চারি বৎসর সপরিশ্রম কয়েদ থাকিবার হুকুম হইল। ১৯০৮, ৬ই আগষ্ট।

ভাললোক মন্দলোক সকল দেশের সকল জাতি মধ্যে চিরকালই আছে। যে ইংরেজ জাতি এখন পৃথিবী মধ্যে সর্বপ্রধান তাহার মধ্যে সংলোকের অভাব কদাচ সম্ভব নহে। দুর্গাচন্দ্রের প্রতি যে নিতান্ত অবিচার হইয়াছে তাহার জন্ত বড় বড় ইংরেজী পত্রিকায় অনেক অনুরোধ হইল। দেশীয় আপামর সমস্ত লোকেই অবিচারের জন্য দোষারোপ করিল। একজন সদাশয় ইংরেজ দুর্গাচন্দ্রের পরিবারগণের সাহায্যার্থ ৫০০ টাকা দিতে স্বীকৃত হইলেন। যদিও তাঁহার নিকট কোন টাকা লওয়া হয় নাই কিন্তু তাঁহার উদারতা জন্য দেশস্থ সমস্ত লোকেই তাঁহাকে ধন্যবাদ করিয়াছিল। দুর্গাচন্দ্রের মুক্তির জন্ত গবর্ণমেন্টে দরখাস্ত হইল তাহাতে যেমন দেশীয় বড় বড় লোকেরা দস্তখত করিয়াছিলেন তেমনি বহুসংখ্যক ইংরেজও দস্তখত করিয়াছিলেন। সেই দরখাস্ত মত গবর্ণমেন্ট দুর্গাচন্দ্রকে ইং ১৯০৯ সালের ৮ই মার্চ দুইটি সপ্তের অধীনে খালাস দিলেন। তিনি মুক্ত হইয়া দিনাজপুরের জজের নিকট ওকালতী পাট্টা প্রার্থনা করিয়াছিলেন কিন্তু জজ তাহা অগ্রাহ করিয়াছেন। দুর্গাচন্দ্রের পূর্বাবধি সাহিত্যসেবায় মনোযোগ ছিল। নানাবিধ প্রয়োজনীয়

বিষয়ে সংবাদ সংগ্রহ করিতেন, পুস্তক লিখিতেন এবং সংবাদপত্র সমূহে প্রবন্ধ পাঠাইতেন। এখন অল্প কৰ্ম্ম না থাকায় সাহিত্য সেবায় সম্পূর্ণ মনোনিবেশ করিয়াছেন। কিন্তু সাহিত্যসেবীগণ সৰ্ব্বত্রই দরিদ্র। ইংলণ্ড ফ্রান্স প্রভৃতি ধনশালী দেশেও জাতীয় গৌরবের উজ্জলরত্ন স্বরূপ বিদ্বান লোকেরা জীবমানে দারিদ্র্যহেতু বহুকষ্ট ভোগ করিয়াছেন। সুতরাং আমাদের এই দরিদ্রদেশে যে ছর্গাচন্দ্রের দারিদ্র্য জনিত দুর্দশা ভোগ করিতে হইবে তাহা বলা বাহুল্য।

বিজ্ঞাপন ।

যেমন ভূমিতে বীজ বপন করিলে অঙ্কুরিত হইয়া বৃক্ষ উৎপাদন করে, আবার সেই বৃক্ষ হইতে বহুসংখ্যক ফল ও বীজ উৎপন্ন হয় তদ্রূপ মনুষ্যের ঐহিক কর্ম সমস্ত কর্মবীজ, এবং পৃথিবী কর্মক্ষেত্র । দেশে কোন লোক যেরূপ কার্য্য করিয়া ধনী অথবা যশস্বী হয়, পরবর্ত্তী বংশধরেরা সেই দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিতে থাকে ; অতএব তাহাতেই জাতীয় চরিত্র গঠিত হয় । এই জন্তই ইতিহাসে জাতীয় অবস্থা ও জীবনচরিতের বারংবার পুনরাবৃত্তি দেখিতে পাওয়া যায় । আমাদের দেশে ইতিহাস ও জীবনচরিতের আদর ছিল না ; সুতরাং লিখিত হয় নাই । অতএব তাহার পুনরাবৃত্তি নিরূপণ করা শ্রুতিন ।

এখন ইতিহাসের আবশ্যকতা লোকে বুঝিয়াছে । রাজপুতনার এবং ভারতবর্ষের নানা স্থানের অসম্পূর্ণ ইতিহাসও বিলক্ষণ সমাদৃত হইতেছে ; তথাপি বাঙ্গালাদেশের ইতিহাস সংগ্রহে যথোচিত চেষ্টা হয় নাই । বাঙ্গালার ইতিহাস নামে যে সকল ইংরেজী গ্রন্থ বিদ্যালয়সমূহে পঠিত হয়, তাহা নিতান্ত অসম্পূর্ণ । তাহাতে হিন্দুরাজত্বের কোন বৃত্তান্তই নাই এবং মুসলমানরাজত্বের সময় বাঙ্গালী হিন্দুদের কিরূপ অবস্থা, আচার, ব্যবহার ও দেশের শাসনপ্রণালীই বা কিরূপ ছিল, তাহার কোনও বিবরণ নাই । অতএব তাদৃশ ইতিহাস পাঠে আভ্যন্তরিক অবস্থা কিছুই জানা যায় না । প্রাচীন ভারতবর্ষের প্রকৃত ইতিহাস না থাকিলেও প্রাচীন আচার ব্যবহার সম্বন্ধে যে সমস্ত গ্রন্থাদি আছে, তদ্বারা সামাজিক অবস্থা মোটামুটি জানা যায় । আধুনিক অবস্থা সম্বন্ধে অনেক গ্রন্থাদি হইতেছে । কিন্তু মুসলমানরাজত্বের মধ্যবর্ত্তী কালের রীতিমত ইতিহাস না থাকায়, প্রাচীন অবস্থা পরিবর্ত্তিত হইয়া কিরূপে বর্ত্তমান অবস্থায় পরিণত হইল, তাহা জানা যায় না । এই সকল অভাব দূরীকরণ জন্ত আমি অষ্টাদশ বৎসর পরিশ্রম করিয়া নানাবিষয়ক বিবরণী সংগ্রহ করত এই গ্রন্থ প্রকাশ করিলাম । প্রচলিত ইংরেজী ও পারসী ইতিহাস, পুরাতন জমিদারদিগের সনদ, বংশানুক্রমিক কিংবদন্তী, শেখ গুভোদয়া নামক গ্রন্থ, রাঢ়ী ও বারেন্দ্র ব্রাহ্মণদের কুলশাস্ত্র, বল্লালচরিত এবং ভট্টকবিতা, এই সমস্ত মিলাইয়া যথাসাধ্য সত্য নির্ণয়পূর্ব্বক এই গ্রন্থে সন্নিবেশিত করিয়াছি । যেখানে একই ঘটনা সম্বন্ধে মতান্তর আছে, তন্মধ্যে যেটি সত্য বোধ হইল, আমি কেবল তাহাই গ্রহণ করিয়াছি । যেখানে সত্যাসত্য ঠিক করিতে পারিলাম না, সেখানে কোন তর্ক না করিয়া বিভিন্ন মতগুলি সমস্তই গ্রহণ করিয়াছি । যে সকল স্থানে প্রকৃত বৃত্তান্ত সহ কাল্পনিক বৃত্তান্ত মিশ্রিত দেখিয়াছি, সেখানে কেবল প্রকৃত ঘটনাই

গ্রহণ করিয়াছি। কিন্তু যেখানে প্রকৃত ও কাল্পনিক অংশ পৃথক্ করিতে পারি নাই, সেখানে কোন পরিবর্তন না করিয়া, যেমন পাইয়াছি ঠিক তাহাই গ্রহণ করিয়াছি। ইতিহাস সংগ্রহ প্রথম উদ্গমেই নির্দোষ হওয়া অসম্ভব। অতএব স্থানে স্থানে অসম্পূর্ণ এবং কাল্পনিক বৃত্তান্ত মিশ্রিত থাকিল। আশা করি ভবিষ্যতে ক্রমে ক্রমে ঐ সকল সংশোধন করিবার চেষ্টা পাইব।

সার ওয়ান্টার রেলী নামক একজন শিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত ইংরেজ বহুসংখ্যক গ্রন্থ সংগ্রহ করিয়া সমস্ত পৃথিবীর ইতিহাস লিখিতেছিলেন। ইতিমধ্যে তিনি নিজ বাড়ীর নিকট একটা গোলযোগ শুনিলেন। রেলী স্নেহেব নিজে তথায় গেলেন না ; কিছুকাল পরে গোলযোগ থামিলে ঘটনাস্থান হইতে লোক ফিরিতে লাগিল। তিনি তখন একে একে তিন জন লোকের নিকট সেই ঘটনার বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করিলেন ; কিন্তু প্রত্যেকের কথিত বৃত্তান্তই কিছু কিছু বিভিন্ন হইল। তখন তিনি সিদ্ধান্ত করিলেন যে, ‘সত্য কথার কদাচ অনৈক্য হইতে পারে না। এই তিন ব্যক্তির কথায় যখন সামঞ্জস্য নাই, তখন অবশ্যই ইহাতে মিথ্যা মিশ্রিত আছে। যখন এত নিকটবর্তী স্থানের ঘটনাসম্বন্ধীয় বৃত্তান্ত মিথ্যা-মিশ্রিত, তখন আমার সংগৃহীত গ্রন্থাদিতে যে অধিকতর মিথ্যা মিশ্রিত থাকিবে, তাহা নিশ্চিত। এবংবিধ মিথ্যা কথা সত্য বলিয়া জনসমাজে উপস্থিত করা অমুচিত।’ এজন্ত তিনি ইতিহাস লিখিতে ক্ষান্ত হইলেন। প্রকৃত পক্ষে পৃথিবীতে সম্পূর্ণ সত্য ইতিহাস একখানিও নাই। সর্বত্রই বিজয়ীরা পরাজিতের উপর নানারূপ মিথ্যা দোষারোপ করিয়া নিজ দোষ গোপন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। গ্রন্থকারগণ ভয়, লোভ বা পক্ষপাতের বশীভূত হইয়া ঠিক সত্য কথা লিখিতে পারেন নাই। ভ্রম বশতও প্রচুর মিথ্যা কথা, কিংবদন্তীতে, সনদে এবং গ্রন্থসমূহে প্রবেশ করিয়াছে। এজন্ত চেষ্টা করিয়া ঠিক সত্য ইতিবৃত্ত সংগ্রহ করা যাইতে পারে না। এই জন্ত পৃথিবীর সকল দেশের সকল ইতিহাসই অলীকতা দোষে কলঙ্কিত। মংকৃত এই ইতিহাস সম্বন্ধে আমি এইমাত্র বলিতে পারি যে, ইহাতে সম্পূর্ণ অমূলক বৃত্তান্ত নাই ; অধিকন্তু ইহাতে সাময়িক আচার ব্যবহার রীতিপদ্ধতি সম্বন্ধে যাহা লিখিত হইল, তাহা সম্পূর্ণ সত্য। সেই জন্য এই গ্রন্থের নাম “বাস্তবিক সামাজিক ইতিহাস” রাখিলাম। ইতি—

১লা চৈত্র,

১৩১৩ সাল।

}

শ্রীদুর্গাচন্দ্র সান্যাল।

উপক্রমণিকা ।

আর্য্যসমাজের প্রাচীন ইতিহাস । — আদিম আর্য্যসমাজ এবং সামাজিক আচার ব্যবহার ।

আর্য্য সমাজ বাঙ্গালা দেশে সৃষ্ট হয় নাই । ব্রহ্মাবর্ত আর্য্য সমাজের আদিম উৎপত্তিস্থান । সেই থানে আর্য্যজাতি আদিম অসভ্য মুখাবস্থা হইতে সভ্যাবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছিল । ভগবান্ মনু কহিয়াছেন যে ব্রহ্মাবর্তের প্রচলিত আচার ব্যবহারই সদাচার । তাহাই অনুসরণ করা সকল লোকের কর্তব্য । পরবর্তী কাল অর্থাৎ ত্রেতাযুগে কোশল দেশ ব্রহ্মাবর্ত অপেক্ষা গমুন্নত হইয়াছিল । অযোধ্যা প্রদেশের নাম কোশল । তাহাতে সূর্য্যবংশীয় ক্ষত্রিয়দের রাজত্ব ছিল । আর প্রয়াগ প্রদেশের নাম দক্ষিণ কোশল । তাহাতে চন্দ্রবংশীয় ক্ষত্রিয়েরা রাজত্ব করিতেন । ত্রেতাযুগে এই কোশল দেশ ঐশ্বৰ্য্যে, পরাক্রমে, বিজ্ঞাতে এবং বুদ্ধিতে ব্রহ্মাবর্ত হইতে শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করায় এই স্থানের আচারই সদাচারের আদর্শ হইয়াছিল । বৌদ্ধ প্রাবল্য বিলোপের পর কান্যকুব্জ আর্য্যবিজ্ঞায় ও সদাচারের প্রধান স্থান হয় । সেই বিজ্ঞা ও সদাচার শ্রোত্রিয়গণ কর্তৃক বাঙ্গালা দেশে আনীত হইয়া, দেশ ও কালের প্রয়োজন অনুসারে নানা প্রকার পরিবর্তন সম্ভব হইয়া বর্তমান বাঙ্গালা দেশে বিद्यমান আছে ।

আদিম মনুষ্যাগণ পশুবৎ অসভ্যাবস্থা হইতে কিরূপে উন্নত হইয়াছিল তাহা জানিতে সকলেরই কোতূহল হয় এবং তদ্বারা অনেক বিষয়ে জ্ঞান লাভ হইতে পারে । সেই সভ্যতা লাভের ইতিহাস কেবল মাত্র ভারতবর্ষে এবং চীনদেশে পাওয়া যাইতে পারে । চীনে দুই লক্ষ আঠার হাজার বৎসরের ধারাবাহিক ইতিহাস আছে । ভারতবর্ষে তদ্রূপ ধারাবাহিক ইতিহাস নাই । কিন্তু বেদ, স্মৃতি, পুরাণ এবং প্রজাপতি সূত্র হইতে সভ্যতার ইতিহাস কতক সংগ্রহ করা যাইতে পারে । হিন্দুশাস্ত্রোক্ত ঘটনাসমূহের সময় নিরূপণের কোন স্মবিধা নাই, এমন কি কোন ঘটনা বা আচার নিয়ম আগে হইয়াছিল কোন্টি তাহার পরে হইয়াছিল তাহাও অনেক স্থানে ঠিক করা যায় না । তথাপি আর্য্য সভ্যতার ইতিহাস অতীব প্রয়োজনীয় । কেননা আর্য্য জাতিই মানব জাতির

বিজ্ঞা ও সভ্যতার সৃষ্টিকর্তা। সেই আৰ্য্য সন্তানগণ কতকগুলি গিয়া চীন ও পারস্য দেশ অধিকার করিয়া তথায় স্বজাতীয় সভ্যতা ও বিজ্ঞা প্রচার করিয়াছিল। ভারতবর্ষ, চীন এবং পারস্য দেশ হইতে আৰ্য্য সভ্যতা নানা কারণে দিগ্দেশে প্রচারিত হইয়া মানব জাতির উন্নতির প্রথম সোপান হইয়াছে। তাহার পর কোন দেশের লোক কোন কোন বিষয়ে আৰ্য্য জাতি অপেক্ষাও সমধিক উন্নতি লাভ করিয়াছে বটে কিন্তু মূলতঃ কোন জাতি আৰ্য্য সভ্যতার প্রভা ব্যতীত সভ্যতা লাভে সমর্থ হয় নাই। আৰ্য্যদিগের সৌর বৎসর গণনা, সূর্য্যের গতিপথ নির্ণয়, দ্বাদশ রাশিচক্র, সপ্ত বার এবং দশমিক অঙ্ক স্থাপন প্রণালী, আগ্নেয়াস্ত্র প্রয়োগ প্রণালী, প্রস্তর বা কাষ্ঠফলকে অক্ষর খুদিয়া কাগজ ছাপা করিবার রীতি যে বৌদ্ধ ধর্ম্ম প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে প্রাদেশ (পূর্বোপদ্বীপে), চীনে, কিম্বদ্বীপবর্ষে (তিব্বতে) এবং লঙ্কায় প্রচারিত হইয়াছিল তাহা ঐ সকল দেশের ইতিহাসে প্রকাশ আছে। হিন্দুদিগের সৌরবৎসর, দ্বাদশ মাস, সপ্তবার, এবং দ্বাদশ রাশিচক্র গ্রীকজাতি দ্বারা * পারস্য ও মিসরে প্রচার হয়। রোমের সম্রাট জুলিয়াস সিজার মিসর দেশ হইতে তাহা শিখিয়া সমস্ত রোম সাম্রাজ্যে প্রচলিত করিয়াছিলেন। কিন্তু তখনও গ্রীক বা রোমানেরা জ্যোতিষ শাস্ত্র জানিত না। সুতরাং রাশিচক্র দ্বারা মাস গণনা করিতে পারিত না। এই জন্ত সিজার প্রত্যেক মাসের পরিমাপার্থ দিন নির্দিষ্ট করিয়া দিয়াছিলেন। তাহাতে কিছু কিছু ভুল হইত। আধুনিক যুরোপীয়েরা জ্যোতিষ গণনা শিখিলে তাহারা বুঝিতে পারিল যে সিজারের নিয়মানুসারে গণনা করায় বিগত চৌদ্দশত তিরাশী বৎসরে প্রায় ১১ দিন অধিক হইয়া গিয়াছে। তজ্জন্ত পোপ গ্রেগারি খৃঃ ১৫৮২ সালের ১০ দিন ত্যাগ করিয়া বৎসর গণনা সংশোধন

* ইহা জানা আবশ্যক যে চারিশত বৎসর পূর্বে আফ্গানিস্তান ও তুরস্ক কোন পৃথক দেশ ছিল না। আফ্গানিস্তানের কতক অংশ ভারতবর্ষের এবং অপর অংশ পারস্য দেশের অংশ ছিল। খৃঃ ১৫৩২ সালে দিল্লীর সম্রাট হুমায়ুন তাহার ভ্রাতা মির্জা কামরানকে সিদ্ধ নদের পশ্চিম তীরবর্তী নিজ সাম্রাজ্যাংশ ছাড়িয়া দিয়াছিলেন। তদবধি ঐ স্থানের নাম আফ্গানিস্তান হইয়াছে। আর খৃঃ ১৪১৯ সালে তুর্ক জাতি পারস্য দেশের পশ্চিমাংশ অধিকার করায় সেই অংশের নাম তুর্কী বা তুরস্ক হইয়াছে। তৎপূর্বে ভারতের পশ্চিম ভূমধ্য সাগর পর্য্যন্ত সমস্ত পারস্য রাজ্য ও পারস্য দেশভুক্ত ছিল।

করিয়াছিলেন। সিজারের পূর্বে যুরোপে এক পূর্ণিমা হইতে অল্প পূর্ণিমা প্যাস্চ চান্দ্র মাস গণনা হইত। সিজার সেই বৎসরের মধ্যস্থল জুলাই এবং আগষ্ট নামে দুইমাস বৃদ্ধি করিয়াছিলেন। তজ্জন্ত যুরোপের শেষ মাসগুলির নামের অর্থ ব্যত্যয় হইয়াছে। যথা, সেপ্টেম্বর অর্থ সপ্তম মাস এখন তাহা নবম মাস হয়। ঐরূপ অক্টোবর, নবেম্বর ও ডিসেম্বর অর্থ অষ্টম, নবম ও দশম, দশম, একাদশতম ও দ্বাদশতম মাস হয়। মুসলমানেরাও রোমানদের দেখা দেখি ২ মাস বৃদ্ধি করিয়াছিল। পূর্বে যখন দশ মাসে বৎসর হইত তখন মুসলমানদের দুইটি মাসের নাম রবি ও জমাদি ছিল। পরে দুই মাস বৃদ্ধি করার জন্ত তাহারা উক্ত নামে দুই দুই মাস গণনার নিয়ম করিল। যেমন জমাদিয়ল আউয়ল (অর্থাৎ প্রথম জমাদি), জমাদি অস্‌সানি (দ্বিতীয় জমাদি মাস), রবিয়ল্ আউয়ল (প্রথম রবি মাস) এবং রবি অস্‌সানি (দ্বিতীয় রবি মাস)। এইরূপে দ্বাদশ মাস পূরণ হইল বটে, কিন্তু মুসলমানেরা এখনও চান্দ্র মাস গণনা করে। তজ্জন্ত প্রতি বৎসর প্রায় সাড়ে নয় দিন সৌর বৎসর অপেক্ষা কম হয়। প্রতি তিন বৎসরে এক মাস কম হয়। চান্দ্র বৎসর গণনা সহজ এজন্ত হিন্দুদের মধ্যেও প্রথমে চান্দ্র বৎসর গণনা করিবার রীতি ছিল। এখনও সংবৎ গণনা চান্দ্রবৎসর অনুসারে হয়। কিন্তু প্রত্যেক তিন বৎসরান্তে ১৩ মাসে বৎসর গণনা করিয়া সৌরবৎসর সহ মিল রাখিতে হয়। সেই অতিরিক্ত মাসকে মলমাস বলে এবং তদ্বারা সৌর বৎসর সহ মিল করাকে সাবন মিতি বলে।

মুসলমান ধর্মের প্রথম উন্নতি সময়ে আল কেরাটী নামক মুসলমান পণ্ডিত হিন্দুদের নিকট হইতে দশ গুণোত্তর অঙ্ক স্থাপন প্রণালী, আদি গণিত, বীজ-গণিত, বীণা বাজান শিক্ষা করিয়া তাহাই মুসলমান রাজ্যসমূহে প্রচার করিয়া-ছিলেন। তিনি আদি গণিতের নাম হিন্দু সা ময়যানা, বীজ গণিতের নাম হিন্দু সা আল ঘাব্বা, এবং বীণার নাম সেতার রাখিয়াছিলেন। তাহাই যুরোপে প্রচারিত হইয়াছে।

ভারতবর্ষ হইতে রাক্ষস জাতি অতি প্রাচীন কালেই বিতাড়িত হইয়া পাতালে উপনিবিষ্ট হইয়াছিল। তাহারা আর্ঘ্য সভ্যতার যৎকিঞ্চিৎ যাহা শিখিয়াছিল তাহাই পাতালে (আমেরিকায়) প্রচারিত হইয়াছিল।

এই সমুদায় বিষয়ে প্রমাণাদি পাওয়া যায় অত্যন্ত বিষয়ে কোন স্পষ্ট প্রমাণ

সুপ্রাপ্য নহে। কিন্তু ইহা নিশ্চিত যে আৰ্য্য সভ্যতার সাহায্য ব্যতীত কোন জাতি সভ্য হয় নাই। ধর্ম-জ্ঞানও সভ্যতার এক অংশ মাত্র। জগতের এক-জন মাত্র কর্তা আছেন তাঁহার অনেক অনুচর আছে এইরূপ বিশ্বাস, বোধ হয় মনুষ্যদের সৃষ্টি কাল হইতেই ছিল। কিন্তু সেই ঈশ্বর কিরূপ, তাঁহার অনুচর-দেরই বা কার্য্য এবং চরিত্র কিরূপ তৎ সম্বন্ধে মনুষ্যেরা নিজ নিজ অবস্থা ও চরিত্র দৃষ্টে ঈশ্বরকে সেই চরিত্রের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তি মনে করিত। আর প্রত্যেক ভৌতিক কার্য্য ও পদার্থে অধিষ্ঠাতা দেবতাকে ঈশ্বরের অনুচর বা পারিষদ অনুমান করিয়া আপনাদের সদৃশ চরিত্রের প্রবলতর ব্যক্তি বলিয়া জ্ঞান করিত। প্রথমাবস্থায় কোন জাতীয় লোকের নিরাকার ব্রহ্মজ্ঞান ছিল না। যেমন মৃত্যুর কর্তাকে আর্য্যেরা যম, গ্রীকেরা প্লুটো, ইহুদিরা গাব্রিএল (যবরেল) বলিত; অগ্নির অধিষ্ঠাতা দেবতাকে আর্য্যেরা অগ্নি, গ্রীকেরা ইগ্নিস্, রোমানেরা বল্কান এবং ইহুদিরা এরিএল বলিত। তাহার পর সভ্যতা বৃদ্ধি হইলে যে জাতীয় লোকেরা যে প্রকার কার্য্য ও চরিত্র সর্ব্বোৎকৃষ্ট জ্ঞান করিত তাহারা তাহাদের ঈশ্বরে সেইরূপ কার্য্য ও চরিত্র অধ্যাস করিয়াছে। আর প্রত্যেক জাতি স্ব স্ব বিবেচনামত উপাসনা প্রণালী নির্ব্বাচন করিয়াছে। তাহাতেই ধর্ম্ম বিষয়ে পার্থক্য জন্মিয়াছে। কিন্তু অনুধাবন করিয়া দেখিলে যাবতীয় প্রাচীন সভ্য জাতির ধর্ম্মজ্ঞান যে আৰ্য্য জাতি হইতে গৃহীত বা অনুকৃত তাহা বুঝিতে পারা যায়। সুতরাং আৰ্য্য-জাতির সভ্যতার ইতিহাসকে সমস্ত পুরাতন সভ্যজাতির সমুন্নতির ইতিহাস বলা যাইতে পারে। সেই ইতিহাস সম্পূর্ণ পাইবার কোন উপায় নাই। কিন্তু যতটুকু পুরাণাদি হইতে সংগ্রহ করা যায় তাহা অসম্পূর্ণ হইলেও অতিমাত্র প্রয়োজনীয় এবং উপদেশ পূর্ণ।

সর্ব্বপ্রথমে ব্রহ্মাবর্ত্তে চারিজাতীয় লোক বনমধ্যে বিচরণ করিত। এক জাতি শ্বেতবর্ণ, আর এক জাতি রক্তিমবর্ণ, তৃতীয় জাতি শ্চামবর্ণ এবং চতুর্থ জাতি কৃষ্ণবর্ণ। তাহারা সকলেই অসভ্য, মুর্থ ছিল। তাহারা কাঁচা ফল মূল বৃক্ষ পত্রাদি আহার করিত, উলঙ্গ থাকিত; নদী হ্রদ বা নির্ব্বারে গিয়া জলপান করিত, ভূমিতে শয়ন করিত এবং রোদ্র বৃষ্টি এবং শীত শরীরে সহ্য করিত। তাহাদের সকলের অবস্থা এবং কর্ম্ম বহু পশুর স্থায় ছিল। অবস্থা ও কর্ম্মের তুল্যতা হেতু তাহাদের মর্য্যাদার কোন ইतर বিশেষ ছিল না। প্রমাণ—

“ন বিশেষোহস্তি বর্ণানাং সৰ্ব্ব ব্রহ্মময়ং জগৎ

ব্রহ্মণা পূৰ্ব্ব সৃষ্টং হি কৰ্ম্মণা বৰ্ণতাং গতঃ।”

অন্তার্থ।—পূৰ্বে ব্রহ্মা যখন সৃষ্টি করিয়াছিলেন, তখন সকলুই ঈশ্বরের সম্পত্তি ছিল। কোন ভূমি বা কোন দ্রব্য ব্যক্তি বিশেষের সম্পত্তি ছিল না। লোকের কৰ্ম্মগত ভিন্নতা না থাকায় সম্রাণের কম বেশ ছিল না অর্থাৎ মান সম্রম কাহাকে বলে তাহা তাহারা জানিত না। পরে তাহাদের বুদ্ধি ও সভ্যতার উন্নতি হইল, প্রত্যেক বর্ণের কৰ্ম্মগত শ্রেষ্ঠতা দ্বারা মৰ্যাদার পার্থক্য হইয়াছিল। তদবধি শ্বেতবর্ণ লোক ব্রাহ্মণ, রক্তবর্ণ লোক ক্ষত্রিয়, শ্যামবর্ণ বৈশ্য এবং কৃষ্ণ-বর্ণ লোক শূদ্র হইয়াছিল।

অনেকে এই শ্লোকের এইরূপ অর্থ করেন যে, “প্রথমে সকলেই ব্রাহ্মণ ছিল পবে কৰ্ম্মের উচ্চনীচতা দ্বারা জাতিভেদ হইয়াছে।” এই অর্থ নিতান্ত অশুদ্ধ। বর্ণ শব্দের অর্থ শরীরের রঙ। কৰ্ম্ম দ্বারা সেই রঙ পরিবর্তন হইতে পারে না। “বর্ণানাং” শব্দ হইতে শারীরিক বর্ণের ভিন্নতা প্রথমাবধি ছিল তাহা স্পষ্ট জানা যায়। আর “কৰ্ম্মণা বর্ণতাং গতঃ” এই বাক্য দ্বারা বুঝিতে হইবে যে কৰ্ম্মের শ্রেষ্ঠত্বানুসারে মৰ্যাদার তারতম্য হইয়াছে। কৰ্ম্মদ্বারা গায়ের রঙ বদলাইয়া গিয়াছে এমন অর্থ হইতে পারে না, এবং সকলে এক জাতি ছিল ইহাও বুঝায় না। আর “সৰ্ব্ব ব্রহ্মময়ং জগৎ” এই বাক্যে সকলেই ব্রাহ্মণ ছিল এরূপ অর্থ কোন মতেই হইতে পারে না।

সেই বিভিন্ন বর্ণের লোকদের একবর্ণ অথ বর্ণকে সম্পূর্ণ বিভিন্ন প্রাণী জ্ঞান করিত। তজ্জন্ত বিভিন্ন বর্ণের স্ত্রী পুরুষের সংযোগ হইত না সুতরাং বর্ণসঙ্কর সন্তান জন্মিত না। বহুকাল পরে বেণ রাজা অশ্ব ও গর্দভী যোগে খচ্চর উৎপন্ন হইতে দেখিয়া বিভিন্ন বর্ণের স্ত্রী পুরুষ সংযোগে সন্তান হয় কিনা পরীক্ষা করিয়াছিলেন। তদ্রূপ বিষম যোগ সন্তান হইতে দেখিয়া বিষম যোগের আদেশ করিয়াছিলেন। তদনুসারে নানা প্রকার সঙ্কর জাতি উৎপন্ন হইয়াছে। বেণ রাজার পূর্বে বিষম যোগ ও বর্ণসঙ্কর ছিল না। সন্তানেরা কেহ জনকের বর্ণ প্রাপ্ত হয়, কেহ বা জননীর বর্ণ প্রাপ্ত হয়, অপর কোন সন্তান উভয়ের মিশ্রিত বর্ণ প্রাপ্ত হয়। সুতরাং যত দিন বিষম যোগ ছিল না ততকাল জনক জননীর সমবর্ণত্ব সমস্ত সন্তানই সেই বর্ণ প্রাপ্ত হইত। এজন্ত তখন

কেবল শরীরের বর্ণ দৃষ্টে জাতি নির্ণীত হইতে পারিত।

পৃথুচরিতে ইহার স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। 'অধিকন্তু মনুসংহিতা এবং মহাভারতেও এ বিষয়ে কিছু কিছু উল্লেখ আছে।

প্রথমে বিবাহ ছিল না। নরনারী সকলেই বন মধ্যে স্বাধীন ভাবে বিচরণ করিত। সবর্ণ স্ত্রীপুরুষে সাক্ষাৎ হইলে সংযোগ হইত এবং তাহাতেই সন্তান জন্মিত। এক জননারী সন্তানেরা প্রায়শঃ এক স্থানে থাকিত। তখন জননী দ্বারাই সন্তানের পরিচয় হইত। তাহাদের জনক কোন্ ব্যক্তি তাহা প্রায়শঃ সন্তানেরা জানিত না। সুতরাং জনকের সহ কোন সম্পর্ক বা পরিচয় ছিল না।

শ্বেতবর্ণ লোকেরাই সর্বাপেক্ষা ক্ষমতাশালী ছিলেন। তাঁহারাি অত্যাগ্ৰ লোকদিগের উপর আধিপত্য স্থাপন করিয়াছিলেন। মনুষ্যেরা অগ্ৰ-প্রাণী বশীভূত ও অধীন করিবার পূর্বে মনুষ্য বশ করিতে সমর্থ হইয়াছিল।

এগার জন শ্বেতবর্ণ পুরুষ সমস্ত ব্রহ্মাবর্ত অধিকার করিয়া প্রত্যেকের অধিকৃত ভূভাগ চিহ্নিত সীমা বিশিষ্ট করিয়াছিলেন। সেই এগার জন প্রজাপতি নামে খ্যাত হইয়াছিলেন। প্রত্যেক প্রজাপতির অধিকৃত স্থানবাদী সমস্ত লোক সেই প্রজাপতির অধীন ও আজ্ঞাবহ হইয়া তাঁহার প্রজা নামে খ্যাত হইয়াছিল।

মনুষ্যেরা অগ্ৰ পশু পক্ষী অপেক্ষা গো জাতিকে সর্বাপেক্ষে বশীভূত করিয়া পালনারম্ভ করিয়াছিল। প্রজাপতি এবং প্রজাগণ গো পালন করিতেন। এজগ্ৰ প্রত্যেক প্রজাপতির অধিকৃত স্থানকে তাঁহার গোত্র ও গোষ্ঠ বলা হইত। প্রত্যেক গোত্রবাদী লোকেরা সেই গোত্রীয় বা সেই গোষ্ঠী নামে পরিচিত হইত।

যত দিন মনুষ্যেরা প্রত্যেকে স্বাধীন ও স্বতন্ত্র ছিল তত দিন তাহারা পশুবৎ নিকৃষ্ট ছিল। অধীনতা দ্বারাই তাহাদের উন্নতি হইতে আরম্ভ হইল। এখানে ইহা জ্ঞাতব্য যে হিন্দুরা দশ জন স্বাধীন লোক একত্র হইয়া কখন কোন মহৎ কার্য্য করিতে পারে নাই। যখন বহু সংখ্যক হিন্দু কোন এক ব্যক্তির আজ্ঞাধীন হইয়াছে তখন তাহারা মহৎ কার্য্য করিতে সমর্থ হইয়াছে।

প্রত্যেক প্রজাপতি নিজ অধিকৃত ভূভাগ নিজ প্রজাদের মধ্যে চিহ্নিত।

বিভাগ করিয়া দিয়াছিলেন এবং তাহাদিগকে জানাইয়াছিলেন যে, “যাহাকে যে ভূমি দেওয়া গেল সেই ভূমি স্থিত বৃক্ষ, লতা, ফল, ফুল, খাদ্য, পশুাদি যাবতীয় প্রয়োজনীয় পদার্থ সেই ভোগ করিতে পারিবে। তাহার অহুমতি বিনা অণু কেহ তাহা গ্রহণ করিলে সেই গ্রহীতা দণ্ডিত হইবে। তদবধি সম্পত্তি ব্যক্তিগত হইল। তৎপূর্বে কোন বস্তুতে কাহার স্বামিত্ব ছিল না। অমুক বস্তু আমার, অমুক বস্তু অণু ব্যক্তির ক্ষেত্র জ্ঞান পূর্বে না থাকায় যে যাহা পাইত সে তাহা ভোগ করিত। যখন সম্পত্তি ব্যক্তি বিশেষের বলিয়া নির্দিষ্ট হইল, তখন অবধি পরদ্রব্য গ্রহণ হেতু চৌর্য্যাপাপ সৃষ্ট হইল।

প্রজারা যে কিছু খাণ্ড সংগ্রহ করিত তন্মধ্যে কতক অংশ প্রজাপতিকে দিত। তদ্বারাই “রাজস্ব” সৃষ্টি হইল। রাজস্ব দ্বারা প্রজাপতিদের আহাৰ্য্য সংস্থা হইল।

পূর্বে আহাৰ চেষ্টাতেই লোকের সময় কাটিত সুতরাং বৈবয়িক উন্নতি জন্ম চিন্তা বা চেষ্টা করিতে লোকের অবসর হইত না। যখন রাজস্ব দ্বারা প্রজাপতিদের অন্নভাব দূর হইল তখন তাঁহারা জন সমাজের হিতকর, সুখকর ও উন্নতি সাধক বিষয়কার্য্যে মনোযোগী হইলেন। মনুষ্যের বুদ্ধি যতদূর পরিচালন করা যায় ততই উন্নতির উপায় উদ্ভাবিত হয়। প্রজাপতিরা দিন দিন লোকের হিত সাধনের উপায় সকল উদ্ভাবন করিতে লাগিলেন।

প্রজাপতিদের আধিপত্য স্থাপনের পূর্বে মনুষ্যদের ভাষা সৃষ্টি আরম্ভ হইয়াছিল। পূর্বেই উক্ত হইয়াছে যে, এক জাতীয় সন্তানেরা একত্র বাস করিত। তাহারা পরস্পরের মনোগত ভাব বুঝিবার জন্ম সাক্ষেতিক শব্দ সৃষ্টি করিতে আরম্ভ করিয়াছিল। প্রজাপতিরা ক্রমেই নূতন নূতন শব্দ সৃষ্টি করিয়াছিলেন এবং সেই সমুদায় শব্দ সমস্ত প্রজাগণ বুঝিয়া যাহারারা পরস্পর কথোপকথন করিতে পারে, তৎপার করিয়াছিলেন। তাহার পর সমস্ত প্রজাপতিদের প্রজারা যাহাতে পরস্পরের কথা বুঝিতে পারে তাহারও উপায় করিয়াছিলেন। সেই সময়েই একই অর্থবোধক বহু শব্দ একই ভাষাতে স্থান প্রাপ্ত হইয়াছিল। যেমন, যে বস্তুকে দক্ষ প্রজাপতির গোত্রে “জল” বলিত ঠিক সেই বস্তুকে কণ্ডপ প্রজাপতির গোত্রে “নীর” বলিত, অত্রির গোত্রে “বারি” বলিত, অঙ্গিরার গোত্রে সলিল বলিত। তখন এক গোষ্ঠী অণু গোষ্ঠীর কথা বুঝিতে পারিত না। পরে সকল

প্রজাপতির পরামর্শ করিয়া সকল প্রজাকে জানাইলেন যে, জল, নীর, বারি, সলিল এই চারিটা শব্দই এক বস্তু বোধক। তখন বিভিন্ন গোষ্ঠীয় লোকেরা পরস্পরের কথা বুঝিতে পারিল।

প্রজাপতির দেখিলেন স্ত্রী লোক দুর্বল। তাহারা যখন পূর্ণগর্ভা হয় এবং সন্তান প্রসব করে তখন তাহারা নিজ খাত সংগ্রহে অশক্তি হয়। আবার তাহারা খাত অন্বেষণে গেলে সদ্য জাত বহু সন্তান অনাহারে কিংবা বহু জন্তু দ্বারা বিনষ্ট হয়। পক্ষান্তরে পুরুষেরা যখন অতিশয় বৃদ্ধ হয় তখন তাহারা নিজ খাদ্য ঘোড়াইতে পারে না; তাহাদের ব্যারাম হইলে তাহাদের গুশ্রবা কেহ করে না; সুতরাং তাহারা বহু কষ্টে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। এই জন্ত প্রজাপতির বিবাহ প্রথা সৃষ্টি করিলেন। কোন স্ত্রী পুরুষ একত্র হইয়া সংসার করিতে সম্মত হইলে তাহারা প্রজাপতির নিকট গিয়া সেই অভিপ্রায় জানাইত। প্রজাপতি কোন লতা বা ঘাস দ্বারা উভয়ের হাত বাঁধিয়া দিতেন। তাহারা একত্রে প্রজাপতিকে প্রণাম করিলে প্রজাপতি তাহাদের হাতের বন্ধন লতা খুলিয়া তাহার ষংক্షিৎ সেই দম্পতিকে খাওয়াইতেন। ইহাতেই তখন বিবাহ কার্য সম্পূর্ণ হইত। সেই বিবাহ দ্বারা পুরুষ স্ত্রীকে ও তাহার সন্তানদিগকে প্রতিপালন করিতে বাধ্য হইত। পক্ষান্তরে সেই স্ত্রী ও তাহার সন্তানগণ সেই পুরুষের অধীন হইত এবং তাহার সেবা গুশ্রবা করিতে বাধ্য হইত।

তখনও সতীত্ব ধর্ম্য সৃষ্টি হয় নাই। এক জনের স্ত্রীতে স্বজাতীয় অগ্র পুরুষের সঙ্গমে কোন দোষ ছিল না। বরং তাহাতে অস্বীকার করিলে কিংবা বাধা দিলে নিন্দা হইত।

ভূমির উপর এবং স্ত্রীর উপর স্বামিত্ব স্বত্ব ঠিক তুল্য ছিল। এক জনের ভূমিতে অগ্র ব্যক্তি কোন বৃক্ষ বা শস্য রোপণ করিলে সেই বৃক্ষ ও শস্য ক্ষেত্রস্বামীর হইত। সেইরূপ একজনের স্ত্রীতে অগ্র কেহ সন্তান উৎপাদন করিলে সেই সন্তান ঐ স্ত্রীর স্বামীর সন্তান গণ্য হইত।

পুরুষেরা উপযুক্ত কারণে পত্নীকে ত্যাগ করিতে পারিত। কিন্তু তদ্বিষয়ে প্রজাপতির সম্মতি লইতে হইত। স্বামী মৃত হইলে, অনুদ্ভিষ্ট হইলে, ক্লীব হইলে, স্ত্রী ত্যাগ করিলে, সেই স্ত্রী অগ্র পুরুষের সহ বিবাহ বন্ধন করিতে পারিত।

প্রধানতঃ ভ্রাতা ভগিনীতেই বিবাহ হইত। স্বজাতির অগ্র স্ত্রী পুরুষে বিবাহ হইত। কেবল “নগচ্ছেৎ জারিকা জাতা গমণেঃ চাতি পাতকঃ” এই সূত্র মাত্র মাত্র হইত, অর্থাৎ যাহার রক্ত হইতে নিজ শরীর উৎপন্ন হইয়াছে এবং নিজের রক্ত দ্বারা যাহার শরীর উৎপন্ন হইয়াছে তৎ সঙ্গম নিষিদ্ধ ছিল। তজ্জন্তু কেহ নিজ জননী বা নিজকন্যা সহ সঙ্গম করিত না। তদ্ ভিন্ন স্বজাতীয় স্ত্রী পুরুষ সঙ্গমে কোন নিষেধ ছিল না।

দক্ষ প্রজাপতি শুদ্ধ কাষ্ঠ ঘর্ষণ দ্বারা অগ্নি উৎপাদন করিলেন। অমনি প্রত্যেক প্রজাপতি স্ব স্ব প্রজাদিগকে নিজ নিজ গৃহে অগ্নি রাখিতে আদেশ দিলেন। তদবধি মনুষ্যেরা অপর জন্তু হইতে শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিল। মনুষ্যেরা অগ্নি সংযুক্ত কাষ্ঠের সাহায্যে সিংহ ব্যাঘ্রাদি জন্তুদিগকে তাড়াইয়া শান্তি লাভ করিল। সেই অবধি দক্ষ প্রজাপতি সকল প্রজাপতির শ্রেষ্ঠ গণ্য হইলেন। এই অবধি যাবতীয় ধর্ম্মকর্ম্মে অগ্নি সংস্থান করিতে বিধান হইল। অগ্নি প্রতিষ্ঠা ব্যতীত কোন পুণ্য কার্য্য হইত না।

প্রজাপতিদের নাম শুনিয়া অনেকের বিশ্বাস হয় যে, “একাদশ প্রজাপতি” ঠিক সেই এগারটা ব্যক্তি মাত্র। তাহা সম্পূর্ণ ভুল। দক্ষ, কশ্যপাদি এগার জন প্রথমে প্রজাপতি হইয়াছিলেন। পরে সেই নাম তাঁহাদের পদবীর নাম হইয়াছিল। যে কেহ দক্ষ প্রজাপতির পদে অভিষিক্ত হইতেন তাহা-কেই দক্ষ প্রজাপতি বলা যাইত। সেইরূপ যিনি যখন কশ্যপ প্রজাপতির স্থলাভিষিক্ত হইতেন তিনিই কশ্যপ প্রজাপতি বলিয়া আখ্যাত হইতেন। একই দক্ষ, একই কশ্যপ, একই অত্রি প্রভৃতি যে চিরকাল থাকিতে পারে না ইহা সহজেই বুঝা যায়। পরন্তু কানীতে বাপুদেব শাস্ত্রী, দক্ষিণের দয়ানন্দ সরস্বতী, ভাস্করানন্দ স্বামী, নেপালের পণ্ডিত কানীনাথ বলিয়াছেন যে, “প্রজাপতিদের যে নাম পাওয়া যায় তাহা প্রথমে এক এক ব্যক্তির নাম ছিল পরে পদবী-গত নাম হইয়াছিল।” কিন্তু বাঙ্গালী পণ্ডিতবর্গের মধ্যে অনেকের বিশ্বাস যে “সেই একমাত্র দক্ষ কশ্যপাদি যুগযুগান্তর ব্যাপিয়া জীবিত ছিলেন। তাঁহারা কলিকালে অদৃশ্য হইয়াছেন। মহাদেবের কোপে দক্ষ নির্বংশ হইয়াছেন। অত্যাচার প্রজাপতিরা অদৃশ্য ভাবে এখনও বিদ্যমান আছেন।” বাঙ্গালী পণ্ডিতদের এই বিশ্বাস সঙ্গত বোধ হয় না।



প্রজাপতিরা দেখিলেন যে, ভাই ভগ্নীতে বিবাহ হইলে ভিন্ন গোত্রীয় লোক সহ, পরিচয় এবং আত্মীয়তা থাকে না। অধিকন্তু সম্বন্ধ সুলভ হওয়াতে অতি অল্প বয়সেই স্ত্রী পুরুষ সংযোগ আরম্ভ হইয়া তাহাদের তেজঃ ক্ষয় হয়। এজন্য তাঁহারা নিয়ম করিলেন যে, “একই গোত্রীয় স্ত্রী পুরুষের বিবাহ হইবে না। বিবাহ গোত্রান্তরে দিতে হইবে। পত্নী স্বামীর গৃহ-বাসিনী হইয়া তদ্-গোত্রীয় হইবে। পরন্তু মাতৃগোত্রে, পিতার মাতৃগোত্রে মাতার মাতৃগোত্রে বিবাহ হইতে পারিবে বটে, কিন্তু নৈকট্য, কতিপয় পুরুষ ত্যাগ করিতে হইবে। ইহা মনে রাখা উচিত যে, তখন সগোত্র বলিলে এক স্থানবাসী বুঝাইত। এখন যেমন একই গ্রামে বিভিন্ন গোত্রীয় লোক বাস করে তখন তাহা ছিল না।

প্রজার সংখ্যা বৃদ্ধি হইলে, প্রজাপতিগণ তাহাদের নিকট যে পরিমাণ খাদ্য দ্রব্য পাইতেন তাহা তাঁহাদের প্রয়োজনের অতিরিক্ত হইত। তাঁহারা সেই উদ্বৃত্ত দ্রব্য আর্ন্ত প্রজাদিগকে দিতেন। ইহা হইতে দয়া এবং দানধর্ম সৃষ্ট হইল।

প্রজাপতিরা দূরবর্তী প্রজাকে ডাকিতে কিংবা অগ্র কোন কার্য্য করিতে কোন প্রজাকে নিযুক্ত করিলে তাহাকেও নিজের উদ্বৃত্ত খাদ্য দিতেন। তাহা হইতেই বেতন ও ভৃত্যভাব সৃষ্ট হইল।

প্রজাপতিরা সকল বিষয়েই প্রজাদের উপর কর্তা ছিলেন। তাঁহারাই রাজা, ধর্মগুরু, শিক্ষক, রক্ষক, বিচারক, প্রতিপালক এবং রোগের চিকিৎসক ছিলেন। তাঁহারা প্রজাদের হিতার্থ তপশ্চা করিতেন অর্থাৎ উন্নতিকর বিষয়ে চিন্তা করিতেন এবং যে কিছু উপায় উদ্ভাবন করিতেন তাহা প্রজাদিগকে শিক্ষা দিতেন। তাঁহারাই গৃহনির্মাণ, মৃত্তিকার বাসন গঠন, অস্ত্র চালনা, উটজ এবং পশম ও চর্ম্ম দ্বারা বস্ত্র ও শয্যা নির্মাণ প্রণালী উদ্ভাবন করিয়া প্রজাদিগকে শিক্ষা দিয়াছিলেন। তাঁহারা গ্রাম ও সমাজ স্থাপন করিয়াছিলেন এবং সেই সমাজ রক্ষার জন্য নিয়মাবলী প্রচার করিয়াছিলেন। তাঁহারা প্রজাদের মনে ধর্ম্ম জ্ঞান সঞ্চার করিয়া উপাসনার রীতি প্রচলিত করিয়াছিলেন। তাঁহারা সোমলতা হইতে রস চোয়াইয়া সুরা তৈয়ারী করিয়াছিলেন।

তখন গরুই মনুষ্যের প্রধান সম্পত্তি ছিল। গো হত্যা নিষিদ্ধ ছিল না। অতীথি সেবা পরম ধর্ম গণ্য ছিল। সম্ভ্রান্ত অতীথি কিংবা কুটুম্ব আসিলে দধি, দুগ্ধ এবং গোমাংস দ্বারা ভোজন করাইতে হইত। তজ্জন্ত অতীথি সেবার নাম 'গোলা' হইয়াছিল। সেই অতীথি বা কুটুম্বের কামতৃপ্তি জন্য কোন যুবতীকে তাঁহার নিকট নিয়োগ করিতে হইত। নিজ বাড়ীতে যুবতী না থাকিলে প্রতি-বাসীর বাড়ী হইতে ধার করিয়া যুবতী আনিয়া তাহা দ্বারা অতীথি ও কুটুম্বের তৃপ্তি সাধন করা পরম ধর্ম বলিয়া গণ্য ছিল।

সতীত্ব ধর্ম ছিল না বরং যে রমণী গুরুতর কারণ ব্যতীত পরপুরুষ সংযোগে আপত্তি করিত তাহাকে জন সমাজ কর্কশা বলিয়া নিন্দা করিত।

সকলেই সুরাপান করিত। সুরা না হইলে দেবार्চনা হইত না। যে কেহ সুরাপান করিত না লোকে তাহাকে অসুর বা পশু বলিয়া ঘৃণা করিত।

দীর্ঘতমস্ মুনি দ্বারা প্রার্থিত হইয়া সমস্ত প্রজাপতিগণ একবাক্যে সতীত্ব ধর্ম স্থাপন করিলেন। প্রজাপতিগণ দেখিলেন যে বহু পুরুষ সুন্দরী রমণীগণ প্রতি আকৃষ্ট হয়। অতি কর্ষণ দোষে সুন্দরীদের সন্তান হয় না এবং অল্প বয়সেই যৌবনান্ত হয়। পক্ষান্তরে কুৎসিত রমণীগণ নিতান্ত অনাদৃত হয়। এজন্ত তাঁহারা নিয়ম করিলেন যে, যেস্ত্রী স্বামী বর্তমানে পর পুরুষ সংযোগ করিবে সে সর্ব ধর্ম ভ্রষ্টা হইবে এবং পরস্ত্রীগামী পুরুষ পরধনহারী চোরের ছায় দণ্ডিত হইবে। কিন্তু যদি কোন পুরুষ মরে কিম্বা পত্নীকে ত্যাগ করে তাহার পুনরায় বিবাহ করিতে পারিবে। আর যদি কোন পুরুষ ক্রীবদ্ধ বা অগ্ন্য কারণে সন্তান উৎপাদনে অশক্ত হয় তবে সে ক্ষেত্রজ সন্তান উৎপাদন জন্ত স্বজাতীয় বা উচ্চতর জাতীয় পুরুষকে নিয়োগ করিতে পারিবে। তাহাতে দোষ হইবে না। কিন্তু এই নিয়ম কেবল ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, এবং বৈশ্য জাতীর জন্ত হইয়াছিল। শূদ্রাণীদের জন্ত সতীত্ব ধর্ম স্থাপিত হয় নাই।

এই নিয়ম স্থাপনের পর প্রজাপতিরা, রাজারা এবং বড় লোকেরা, সম্ভ্রান্ত অতীথির কামার্থ সুন্দরী যুবতী বেষ্ঠা নিয়োগ করিতেন। তাদৃশ নিয়োগ শয়নের প্রয়োজনীয় অঙ্গ স্বরূপ গণ্য ছিল।

বশিষ্ঠ ও গুক্র মুনির শাপ দ্বারা সুরাপান নিষিদ্ধ হইয়াছিল। কিন্তু স্ত্রী লোকের এবং শূদ্রের জন্ত সুরাপান নিষিদ্ধ হয় নাই। পরন্তু যুদ্ধকালে ক্ষত্রিয়দিগের

সুরাপান দূষ্য নহে। তপস্তায় দৃঢ় মনোনিবেশ জন্ত শোধিত সুরাপান অদূষ্য।
বশিষ্ঠের প্রার্থনা মতে সমস্ত প্রজাপতিগণ গোহত্যা নিষিদ্ধ করিয়া-
ছিলেন। গোজাতি মনুষ্যের পরম উপকারী জন্ত এজন্ত গোহত্যা মাতৃহত্যা
তুল্য মহাপাপ রূপে ধার্য্য হইয়াছিল।

শূদ্র কর্তৃক পক্ষ অন্ন ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্যের অথবা বলিয়া ধার্য্য হইয়াছিল।
কেননা প্রজাপতিরা দেখিলেন, শূদ্রেরা অতি কদাচারী এবং আবিষ্কারী, অতএব
ধার্য্য করিলেন যে, শূদ্র কৃত পক্ষ অথবা আনীত অন্ন উচ্চ বর্ণের লোকেরা আহা-
র করিবে না, কিংবা দেবকার্য্যে নিয়োগ করিবে না।

ধর্ম্ম শাস্ত্র পাঠ এবং যজন যাজন ক্রিয়া শিক্ষার পূর্বে উপনয়ন গ্রহণপূর্ব্বক
ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিবার রীতি স্থাপিত হইয়াছিল। কিন্তু স্ত্রীলোক এবং শূদ্র-
দের বুদ্ধির ও ক্ষমতার অল্পতা হেতু তাহাদের উপনয়ন নিষিদ্ধ এবং তাহারা ধর্ম্ম
শাস্ত্রপাঠে অনধিকারী ছিল। কিন্তু দ্বিজ কন্যাগণ বিবাহ কালে স্বামীর উপবীত
দ্বারা অর্দ্ধাঙ্গ রূপে আবদ্ধ হওয়ায় বিবাহিতা দ্বিজ কন্যাগণ উপনীতার ছায়া প্রাপ্ত
হইবে কিন্তু বেদ পাঠ এবং ধর্ম্ম শাস্ত্র অধ্যাপনে অধিকার পাইবে না।

উপবীত মৌঞ্জী পত্র দ্বারা, কুঙ্কমার মৃগের চর্ম্ম দ্বারা, কার্পাস সূত্র দ্বারা
কিংবা সূবর্ণ সূত্র দ্বারা নির্ম্মিত হইলে এবং মন্ত্র দ্বারা শোধিত হইলে, প্রাপ্ত
হইবে। অবিপ্রদিগের অর্থাৎ ক্ষত্রিয়, বৈশ্যদের পক্ষে বিপ্রকেশ নির্ম্মিত কিংবা
রৌপ্য নির্ম্মিত উপবীত ও মন্ত্র শোধিত হইলে প্রাপ্ত।

স্ত্রীলোক এবং সৎ শূদ্রেরা স্বর্ণ রৌপ্য দ্বারা উপবীত করিতে পারে কিন্তু
তাহা বৈদিক মন্ত্র দ্বারা শোধিত হইবে না। যে যে শূদ্র সদ্যবসায়ী, দেব
দ্বিজ গুরু ভক্ত, সদাচারী এবং অহিংসক তাহারা ই সৎশূদ্র।

প্রজার সংখ্যা বৃদ্ধি হওয়ায় প্রজাপতিদিগের অধিকার ব্রহ্মাবর্তের বহির্ভাগে
বহু দূর পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছিল। উত্তরে হিমালয়, পূর্বে অযোধ্যা, দক্ষিণে
রাজপুতনার অন্তর্গত সম্বর হ্রদ ও সিন্ধুদেশ এবং পশ্চিমে গান্ধার পর্য্যন্ত আ-
জাতির বসতি হইয়াছিল। তাহার প্রমাণ এই যে, বেদে হিমাচ্ছন্ন হিমালয়
পর্ব্বতের উল্লেখ আছে, উপনিষতে রমণীয় গান্ধার দেশের উল্লেখ আছে, খাণ্ড
দ্রব্যো লবণ সংযোগ করিয়া আহা-
র করিবার উপদেশ আছে এবং সমুদ্রের
উল্লেখ আছে।

প্রজাপতিদের শাসন থাকিতেই লেখা পড়ার চর্চা আরম্ভ হইয়াছিল। কিন্তু যথোচিত উন্নতি প্রাপ্ত হয় নাই। একাক্ষরী অভিধান দৃষ্টে অনুমান হয় যে, চীন ভাষার গ্রায় সংস্কৃতও প্রথমে শব্দমূল ভাষা ছিল অর্থাৎ এক একটা শব্দের পরিবর্তে এক একটি চিহ্ন ব্যবহৃত হইত। অক্ষর ও বর্ণ পরে উদ্ভাবিত হইয়াছিল। পরবর্তী কালে স্বায়ম্ভুব মনু কৃত ব্যবস্থাগুলিকে মনুর বচন এবং স্মৃতি বলে। তাহা হইতে অনুমান হয় যে, সেই মনুর সময়েও লেখা পড়ার অবস্থা এতদূর উন্নত হয় নাই যে মনুর ব্যবস্থাগুলি যথারীতি লিপিবদ্ধ হইতে পারে।

প্রজাপতিদিগের কৃত নিয়মাবলীকে প্রজাপতি-সূত্র বলে। সেইগুলিই মানবজাতির প্রাচীনতম আইন। প্রজাপতি-সূত্র নেপালে পাওয়া যাইতে পারে। আমরা যতদূর অনুসন্ধান করিয়াছি তাহাতে আমাদের বিশ্বাস এই যে অথ কুত্রাপি প্রজাপতি-সূত্র বিद्यমান নাই।

পূর্বে বলা হইয়াছে যে প্রজাপতিদিগের মধ্যে দক্ষ সর্কপ্রধান ছিলেন। মহাদেবকে অবজ্ঞা করায় দক্ষ প্রজাপতির বংশ ধ্বংস হইয়াছে। অবশিষ্ট দশ প্রজাপতির সন্তান হইতে দশটি গোত্র ব্রাহ্মণ হইয়াছিল। সেই মূল দশ গোত্র আবার শাখা প্রশাখায় বিভক্ত হইয়াছে।

বংশরক্ষার্থ মর্ত্য-প্রাণীদের সন্তান হয়। অমর দেবদেবীর সংযোগ আছে, কিন্তু তাহাতে কোন সন্তান হয় না। মর্ত্যালোকসহ দেবদেবীর সংযোগে সন্তান হইলে সেই সন্তান মৃত্যুর অধীন হয় এবং সে মর্ত্য উৎপাদকের জাতি প্রাপ্ত হয়। যেমন দেবতার ঔরসে ব্রাহ্মণীগর্ভজাত সন্তান ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়গর্ভজাত ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্যগর্ভজাত সন্তান বৈশ্য হয়। দেবী গর্ভে ব্রাহ্মণের ঔরস-জাত সন্তান ব্রাহ্মণ এবং ক্ষত্রিয় জাত সন্তান ক্ষত্রিয় হইয়াছে। দেবীসহ বৈশ্য-শূদ্র সংযোগ নাই এবং শূদ্রানীসহ দেবসংযোগ নাই সুতরাং তাদৃশ অপকর্ষণ জাত সন্তানও নাই। সর্বগ অর্থাৎ সূর্য্যদেবের ঔরসে ব্রাহ্মণী গর্ভে সাবর্ণি মুনির জন্ম হয়। তিনি অষ্টম মনু নামে বিখ্যাত। তাঁহার সন্তানেরা সাবর্ণি গোত্রীয় ব্রাহ্মণ।

ক্ষত্রিয় রাজা কুশিকের পুত্র বিশ্বামিত্র তপশ্যা দ্বারা ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিয়াছিলেন, কিন্তু ব্রাহ্মণের যাজকতা করিতে তৎসংশ্লিষদের অধিকার নাই। বিশ্বামিত্রের সন্তানেরা কৌশিক গোত্র।

এইরূপে পূর্বোল্লিখিত দ্বাদশগোত্রীয় ব্রাহ্মণ আবার অনেক শাখায় বিভক্ত হইয়াছে বটে, কিন্তু উক্ত দ্বাদশগোত্রীয় ব্রাহ্মণেরাই বিশুদ্ধ দ্বিজ। স্বায়ম্ভুব মনুর পুত্র ভৃগু পূর্বোক্ত ভৃগুপ্রজাপতির পদবী লাভ করায় তদংশীয়েরাও ভার্গব বলিয়া গণ্য।

এতদ্ভিন্ন তীর্থ ব্রাহ্মণ অনেক আছে। তাহারা নিজ নিজ অধিষ্ঠিত তীর্থে সর্বলোক 'গুরু'। সুব্রাহ্মণেরাও সেই তীর্থে তাহাদিগকে “তীর্থগুরু-ব্রাহ্মণায় নমঃ” বলিয়া নমস্কার করিয়া থাকেন বটে, কিন্তু সেই সেই তীর্থের বাহিরে তাহারা ব্রাহ্মণ মন্যে গণ্য নহে। ইহাদের মধ্যে মথুরার সনাতন ব্রাহ্মণ এবং গয়ায় গয়ানী ব্রাহ্মণগণই বিশেষ প্রসিদ্ধ।

পূর্বে বলা হইয়াছে যে প্রজাপতিদিগের কর্তব্যকার্য্য অত্যন্ত অধিক ছিল। যখন তাঁহাদের প্রজাসংখ্যা অত্যন্ত অধিক হইল, তখন তাঁহারা দেখিলেন যে তাদৃশ সমস্ত কর্তব্য পালন করা অসাধ্য। তজ্জন্ত তাঁহারা রাজ্যশাসন এবং ধর্ম্মশাসন পৃথক্ করিয়া রাজ্যশাসনভার ক্ষত্রিয়দিগকে দিয়া কেবল ধর্ম্মশাসনাদি কার্য্য আপনাদের হাতে রাখা ধার্য্য করিলেন। কিন্তু প্রজাপতি কণ্ডপ তাহাতে সম্মত হইলেন না। তিনি কহিলেন, ক্ষত্রিয়েরা শাসন ভার লাভ করিলে পরে তাহারা নিতান্ত গর্বিত এবং অত্যাচারী হইবে। তখন ব্রাহ্মণসহ তাহাদের সর্বদা বিবাদ বিসংবাদ হইবে। অতএব সর্ব-বিষয়ে ব্রাহ্মণ-প্রাধান্য রক্ষা করাই কর্তব্য। অত্যাগত প্রজাপতিদের অবধারণ ক্রমে ক্ষত্রিয়শ্রেষ্ঠ বেণ প্রজাশাসন ভার প্রাপ্ত হইলেন। বেণ প্রথমতঃ সর্বলোকের মনোরঞ্জন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। তজ্জন্ত তাঁহার “রাজন্” উপাধি হইয়াছিল।

প্রজাপতি কণ্ডপ ক্ষত্রিয়ের অধীন হইতে অনিচ্ছুক হইয়া নিজ অল্পগামী-গণসহ হিমাচলগর্ভে সতীহৃদ মধ্যস্থিত দ্বীপে গিয়া বাস করিয়াছিলেন। সেই স্থান পরে কাশ্মীর নামে খ্যাত হইয়াছে। কাশ্মীরে ব্রাহ্মণ ভিন্ন অন্য জাতীয় লোকের বসতী ছিল না। সেই জন্ত কাশ্মীরে সমস্ত ব্যবসায় ব্রাহ্মণেরা করিত। কাশ্মীরের ধোবা, নাপিত, কানার, কুন্তকার সকলেই ব্রাহ্মণ ছিল।

বেণ রাজা অশ্ব ও গর্দভীযোগে খচ্চর জন্মিতে দেখিয়া অল্পমান করিলেন যে বিভিন্ন বর্ণের নরনারী সংযোগে সন্তান হইতে পারে। তিনি বৈশ্বানরী

সহ শূদ্রের এবং শূদ্রানীসহ বৈশ্যের সংযোগ করাইয়া জানিতে পারিলেন যে তাদৃশ বিষমযোগে সম্ভান হইতে পারে এবং সেই বিষমযোগে সুখ ভিন্ন অসুখ হয় না। তদবধি তিনি বিষমযোগ বিধিসিদ্ধ করিলেন। প্রজাপতিগণ তাঁহাকে তাদৃশ বিধান প্রত্যাহার করিতে বলিলেন। বেণ তাহা গ্রাহ্য করিলেন না। পালে পালে বর্ণসঙ্কর উৎপন্ন হইল। তাহারা কেহ জনকের বর্ণ পাইল, কেহ জননীর বর্ণ পাইল, আর কেহ বা উভয়ের মিশ্রিত বর্ণ পাইল। তদবধি ভারতবর্ষে নানাবর্ণের লোক হইল। পূর্বে যেমন শরীরের বর্ণ দেখিয়া জাতি পরিচয় হইত এখন তাহা অসাধ্য হইল। আর্য্য অর্থাৎ ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়গণ প্রজাপতিগণের আদেশে বেণ রাজাকে হত্যা করিয়া তৎপুত্র পৃথুকে রাজা করিলেন। মূল চারি জাতি এবং আটটি সঙ্কর জাতি লইয়া হিন্দুদের বার জাতি হইল। তাহাদের জীবিকা নির্বাহ জন্ত প্রজাপতিগণ প্রত্যেক জাতির ব্যবসায় নির্দিষ্ট করিয়া দিলেন। রাজা পৃথু সর্বগুণায়িত ছিলেন। তাঁহার রাজত্ব মগধের পশ্চিম হইতে গান্ধার দেশ পর্য্যন্ত এবং উত্তর দক্ষিণে হিমালয় হইতে নর্মদা নদী পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছিল। তাঁহার সাম্রাজ্য আর্য্যাবর্ত নামে খ্যাত হইয়াছিল। তিনি নিজ রাজ্যের মধ্যে অবস্থিত অধিকাংশ পাহাড় চূর্ণ করিয়া সমভূমি করত সমস্ত স্থান কৃষিক্ষেত্রে পরিণত করিয়াছিলেন। দৈত্য, দানব ও রাক্ষসেরা তাঁহার ভয়ে দূরে পলায়ন করিয়াছিল। তিনি পাহাড় চূর্ণ করিতে নানা প্রকার মণি মাগিক্য এবং স্বর্ণ রৌপ্যাদি ধাতু পাইয়া অতিশয় ধনী হইয়াছিলেন। তিনি বিষম যোগ মধ্যে অনুলোম সংযোগ প্রাপ্ত রাখিয়া প্রতিলোম সংযোগ রহিত করিয়াছিলেন। তিনি নগর গ্রাম প্রভৃতি স্থাপন করিয়াছিলেন এবং তিনি সুপন্থা নির্মাণ করিয়া তৎসমুদায়ে যাতায়াতের সুবিধা করিয়া দিয়াছিলেন। তিনি প্রত্যেক গ্রামে ও নগরে লোকদের ব্যবসায় নির্দিষ্ট করিয়া দিয়াছিলেন। কেহ সেই ব্যবসায়ের ব্যভিচার করিলে দণ্ডিত হইত। তাঁহার কোন প্রজা নিরন্ন পরপ্রত্যাশী ছিল না। তিনি ধার্মিক এবং যাগযজ্ঞপরায়ণ ছিলেন। তাঁহার রাজ্যে যথাকালে বৃষ্টি হইত। তাঁহার রাজ্যে দুর্ভিক্ষ, মহামারী বা অকাল মৃত্যু ছিল না। তিনি চৌদ্দবৃগ (১৬৮ বৎসর) রাজত্ব করিয়াছিলেন। তাঁহার নাম

হইতেই অবনিমগুলের নাম পৃথিবী হইয়াছে, রাজাগণের উপাধি পার্থিব হইয়াছে। এখন পর্য্যন্ত রাজাদের অভিষেকের পূর্বে পৃথুচরিত গুনান হইয়া থাকে। পৃথু হিন্দু রাজগণের আদর্শ চরিত্র।

পুরুষেরা নানা কারণে প্রবাস গমনে বাধ্য হয়। তথায় তাহারা পত্নী সঙ্গে লইয়া যাইতে পারে না কিন্তু কাম প্রবৃত্তি তাহাদের সঙ্গেই থাকে। যতদিন সতীত্ব ধর্ম ছিল না ততদিন বেশাবৃত্তির প্রয়োজন ছিল না। সতীত্ব ধর্ম স্থাপিত হইলে বেশা প্রয়োজনীয় হইল। পৃথু রাজার রাজত্ব কালেই সর্ব প্রথমে বারবনিতা বারজাতির স্ত্রী অর্থাৎ বেশা শব্দ দেখা যায়। তাহা হইতে অনুমান হয় যে পৃথু রাজার রাজত্ব কালেই বেশাবৃত্তি স্থপ্তি হইয়াছিল।

প্রজাপতিদের সময়ে দ্রব্য বিনিময়ে দ্রব্য লইতে হইত। অবশেষে কপর্দক অর্থাৎ কোড়ী দ্বারা ক্রয় বিক্রয়ও চলিত হইয়াছিল। পৃথু রাজা প্রচুর ধাতু রত্নাদি পাহাড় চূর্ণ করিতে পাইয়াছিলেন। তিনি ধাতু গলাইয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খণ্ড প্রস্তুত করিয়াছিলেন, তাহাই ভূত্যদের বেতন স্বরূপে দিতেন, যজ্ঞে তাহাই ঋত্বিকগণকে দিতেন এবং সেই ধাতু খণ্ডকেই বিনিময়ের মূল্যরূপে ধার্য্য করিয়াছিলেন। সেই সময়ে রৌপ্য খণ্ডকে দ্রবিন এবং স্বর্ণ খণ্ডকে নিক্ক বলিত। তাহাতে “পৃথু” এই শব্দটি অঙ্কিত থাকিত। ইহাই হিন্দুদের আদিম মুদ্রা।

অতঃপর পৃথুর উত্তরাধিকারীরা রাজা হইয়া রাজ্য শাসন করিতে লাগিলেন। শাস্ত্রকার মনু মানব ধর্ম সম্বন্ধে সম্পূর্ণ ব্যবস্থা করিলেন। রাজা প্রজা সকলেই সেই ব্যবস্থা মত কার্য্য করিতে লাগিল। কোন বিষয়ে সংশয় হইলে কোন বিজ্ঞ ধার্ম্মিক ব্যক্তিকে “মনু” রূপে বরণ করা হইত। প্রজাপতির সকলেই ব্রাহ্মণ ছিলেন। তাহাদের মোট সংখ্যা কত এক্ষণে তাহা নির্ণয় করা যায় না। মনুদিগের মোট সংখ্যা চৌদ্দটি। তন্মধ্যে প্রথম স্বায়ম্ভুব মনু এবং সপ্তম বৈবস্বত মনু দেবতা ছিলেন। অবশিষ্ট বার জন মনু ব্রাহ্মণ ছিলেন। স্বায়ম্ভুব মনু ব্রাহ্মণ কন্যা বিবাহ করায় তৎসন্তানেরা ব্রাহ্মণ, এবং বৈবস্বত মনু ক্ষত্রিয় কন্যা বিবাহ করায় তৎসন্তানেরা ক্ষত্রিয় হইয়াছিল। বৈবস্বত মনুর পুত্র ইক্ষ্বাকু হইতে সূর্য্যবংশীয় ক্ষত্রকুল

উৎপন্ন হইয়াছে। বৈবস্বতের কন্যা ইলার সন্তানেরা চন্দ্রবংশীয় ক্ষত্রিয়।

বৈবস্বত মনুর রাজ্যের নাম কোশল দেশ। তাহা গঙ্গা যমুনার উভয় পার্শ্বে বিস্তৃত ছিল। বৈবস্বতের মৃত্যুকালে ইক্ষ্বাকু অজ্ঞাত স্থানে তপস্তা করিতে ছিলেন। তাঁহাকে মৃত জ্ঞান করিয়া ইলা রাজ্য প্রাপ্ত হইয়া চন্দ্রতনয় বুধের সহ বিবাহিতা হইয়াছিলেন। তাহার পর ইক্ষ্বাকু উপস্থিত হইলে তাঁহার সহ বুধের বিবাদের উপক্রম হইল। পুরোহিত বশিষ্ঠদেব মধ্যস্থ হইয়া উত্তর কোশল অর্থাৎ গঙ্গার উত্তরবর্তী অংশ ইক্ষ্বাকুকে দিলেন। অযোধ্যা তাঁহার রাজধানী হইল। দক্ষিণ কোশল ইলাকে দিলেন। প্রয়াগে তাঁহার রাজধানী হইয়াছিল।

সূর্য্যবংশ ও চন্দ্রবংশ স্থাপিত হইলে রাজশাসন সর্বত্র প্রচলিত হইল। প্রজাপতি ও মনুর পদবী রহিত হইল।

যদিও পৃথুরাজা অনুলোম বিবাহ বিগুদ্ধ বলিয়া ধার্য্য করিয়া ছিলেন, তথাপি তাদৃশ বিবাহের সন্তানেরা জনক ও জননীর মধ্যবর্তী জাতি প্রাপ্ত হইত। কিন্তু ত্রেতাযুগে ক্ষত্রিয়েরা অতিশয় প্রবল হইয়া সেই বিধি লঙ্ঘন করিতে লাগিল। ক্ষত্রিয়গণ বৈশ্য, শূদ্র, অশ্বর, রাক্ষস, গন্ধর্ব্ব প্রভৃতি যে কোন জাতীয়া কন্যা বিবাহ করিত, তাহাদের সকল সন্তানই বিগুদ্ধ ক্ষত্রিয় হইত। তজ্জন্য ক্ষত্রিয় জাতি মধ্যেও নানা বর্ণের লোক হইল।

বহুকাল পর্য্যন্ত ব্রাহ্মণদের বর্ণ ব্যত্যয় ঘটে নাই। অবশেষে অযোধ্যার সূর্য্যবংশীয় রাজারা বহুকাল যাবৎ সমস্ত ক্ষত্রিয়ের শ্রেষ্ঠ ছিল। তাহারা নানা জাতীয়া কন্যা বিবাহ করিয়া নানা বর্ণের সন্তান জন্মাইত। কিন্তু তাহারা কোন কন্যা ক্ষত্রিয় সহ বিবাহ দিত না। তাহাদের সমস্ত কন্যাই ব্রাহ্মণ সহ বিবাহিতা হইত। আবার অযোধ্যাধিপতির সম্মান রক্ষার্থ সেই কন্যাদের সন্তানেরা বিগুদ্ধ ব্রাহ্মণ হইত। মহারাজ মান্নাতার কন্যা অজ্ঞা কৃষ্ণবর্ণা ছিলেন। ভৃগুবংশীয় সানন্দ মুনির সহ তাঁহার বিবাহ হইয়াছিল। তাঁহার পুত্র ঋচীক কৃষ্ণবর্ণ ছিলেন। ভৃগু তাঁহার উপনয়ন দিতে অন্যান্য বিপ্রেরা আপত্তি করিলেন যে “কৃষ্ণবর্ণ কথং দ্বিজঃ” অর্থাৎ এই কালবর্ণ বালক কিরূপে ব্রাহ্মণ বলিয়া গণ্য হইবে। রাজ পুরোহিত বশিষ্ঠদেব বলিলেন যে, “যখন ক্ষত্রবীর্য্যে জাত সন্তান যে কোন বর্ণ হউক গুণবান হইলে সকলেই ক্ষত্রিয় বলিয়া গণ্য হয়

তখন ব্রহ্মবীৰ্য্যে সমুৎপন্ন সন্তান গুণবান হইলে অবশ্যই ব্রাহ্মণ হইতে পারে।” তখন নাক্ষাত্ৰা, বশিষ্ঠ ও ভৃগুর অনুরোধে এই বিধান হইল যে “ব্রহ্মবীৰ্য্যে উৎপন্ন সন্তান, যে কোন বর্ণ হউক এবং যে কোন জাতীয়া জননীর গৰ্ভজাত হউক, গুণবান্ হইলেই ব্রাহ্মণ হইতে পারিবে। অথচ ব্রাহ্মণের ঔরসে না হইলে কেহ যত কেন গুণবান্ হউক না সে ব্রাহ্মণ হইবে না। কিন্তু দেবতার শ্রেষ্ঠত্ব হেতু দেবতার ঔরসে ব্রাহ্মণী গৰ্ভজাত সন্তান সূত্রাহ্মণ হইবে।” সেই বিধান মতে ক্ষত্রিয়া গৰ্ভজাত ঋচীক ব্রাহ্মণ হইলেন। শূদ্রানী গৰ্ভজাত ব্যাসদেবও বিশুদ্ধ ব্রাহ্মণ হইয়াছিলেন। এইরূপে ব্রাহ্মণ মধ্যেও নানা বর্ণ লোক হইল। তদবধি বর্ণদৃষ্টে জাতি নির্ণয় হইত না। কিন্তু কাশ্মীরে অনুলোম বিবাহ প্রচলিত হয় নাই। কাশ্মীরে ব্রাহ্মণ ভিন্ন অন্য জাতি না থাকায় সেখানে বর্ণ ব্যত্যয় হয় নাই। কাশ্মীরী ব্রাহ্মণদের যে বর্ণ এখন আছে তাহাই সমস্ত ব্রাহ্মণদের আদিম বর্ণ।

বাঙ্গালার

সামাজিক ইতিহাস ।

প্রথম অধ্যায় ।

বাঙ্গালা দেশ ।—বাঙ্গালা দেশের লোক বাঙ্গালী ।—বাঙ্গালা ভাষা ।—বাঙ্গালা
দেশে ক্ষত্রিয় না থাকার হেতু ।—পাষাণদলন ।—করদরাজ্য ।—
গোড়ীয় পঞ্চরাজ্য ।

হিন্দুরাজত্বকালে সমস্ত বাঙ্গালাদেশ একটি মাত্র দেশ বলিয়া গণ্য ছিল না
বাঙ্গালা দেশ । এবং তাহার একত্রীকৃত কোন নামও ছিল না ।

গোড়নগরের বৈষ্ণ্বরাজগণ ক্রমশঃ বরেন্দ্রভূমি, বঙ্গ,
মিথিলা, রাঢ় এবং বকদ্বীপ (বগ্দি) এই পাঁচটি রাজ্য অধিকার করিয়া সম্পূর্ণ
আয়ত্ত করিয়াছিলেন । তদবধি ঐ পাঁচটি রাজ্য গোড়ীয় পঞ্চরাজ্য নামে উক্ত
হইত । মুসলমানেরা সেই পঞ্চরাজ্য অধিকার করিয়া, মগধ ও মিথিলা দেশ
একত্র করিয়া সূবে বেহার, এবং অবশিষ্ট চারিটি দ্বারা সূবে বাঙ্গালা গঠিত
করিয়াছিলেন । সেই “বাঙ্গালা” শব্দ হইতেই বাঙ্গালা দেশ নামকরণ হইয়াছে ।
তাহার পর সেই বাঙ্গালা দেশের উত্তর ও পূর্বদিকে, যে সকল স্থান বাঙ্গালা
দেশের শাসনকর্তার অধীন হইয়াছে, তাহাও বাঙ্গালা দেশের অন্তর্ভুক্ত
হইয়াছে । এইরূপে বাঙ্গালা দেশ একটি বিস্তীর্ণ দেশ হইয়াছে ।

বর্তমান বাঙ্গালা দেশের উত্তরে শিকিম ও ভোটান; পূর্বে আসাম, মনিপুর
পাহাড় ও ব্রহ্মদেশ; দক্ষিণে আরাকান, বঙ্গোপসাগর এবং উড়িষ্যা; পশ্চিমে
ছোট নাগপুর ও বেহার প্রদেশ । ইহার পূর্ব পশ্চিমে দৈর্ঘ্য গড়ে ২০৪ ক্রোশ

এবং প্রস্থ উত্তর দক্ষিণে গড়ে ১৮২ ক্রোশ; অধিবাসীর সংখ্যা প্রায় ছয় কোটি। ইহার পূর্ব প্রান্ত পাহাড় ও জঙ্গলময়; পশ্চিম দক্ষিণ প্রান্তেও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পাহাড় দেখা যায় কিন্তু তাহাতে কোন নিবিড় জঙ্গল নাই। আবার ইহার পূর্ব দক্ষিণ প্রান্তে সুন্দরবন নামে ভয়ানক ব্যাঘ্রসর্পসঙ্কুল নিবিড় জঙ্গল। কিন্তু তাহাতে কোন পাহাড় পর্বত নাই। সমস্ত মধ্যভাগ প্রকাণ্ড উর্বর সমতল ক্ষেত্র। তাহাই প্রকৃত বাঙ্গালা দেশ।

দেশভেদে প্রাণিভেদ দেখা যায়। এক এক দেশে একরূপ কতপ্রকার প্রাণী

আছে, বাহা অত্র কোন দেশেই নাই। তদ্বারা

বাঙ্গালা দেশের লোক
বাঙ্গালী।

জানা যায় যে, ভিন্ন ভিন্ন দেশে ভিন্ন ভিন্ন প্রাণী

উৎপন্ন হইয়াছে, সর্বপ্রকার প্রাণী একদেশে উৎপন্ন

হয় নাই। আবার ইহাও দেখা যায় যে, একপ্রকার প্রাণী অত্রপ্রকার প্রাণিদিগকে ভক্ষণ করিয়া জীবন ধারণ করে। ইহা হইতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, ভক্ষ্যপ্রাণিদের সংখ্যা প্রচুর বৃদ্ধি হইলে পর, ভক্ষকপ্রাণিগণের সৃষ্টি হইয়াছে; কেননা, ভক্ষ্য এবং ভক্ষক যদি একই কালে উৎপন্ন হইত, তবে ভক্ষকগণ ভক্ষ্য-প্রাণিদিগকে খাইয়া নিঃশেষ করিত, নতুবা নিজেরাই অনাহারে মরিত। অতএব ইহা সহজেই প্রতীয়মান হয় যে, সমস্ত প্রাণী এক সময়ে বা একদেশে উৎপন্ন হয় নাই। মনুষ্য সম্বন্ধেও ঠিক তদ্রূপ অনুমান যুক্তি ও শাস্ত্রসঙ্গত। যেমন সিংহ, ব্যাঘ্র, গো, মহিষ, শূকর ও কুকুরাদি কতকগুলি প্রাণীর সাধারণ নাম পশু; আর পক্ষ-বিশিষ্ট কাক, বক, হাড়গিলা, চড়ুই প্রভৃতি কতকগুলি প্রাণীর সাধারণ নাম পক্ষী; তদ্রূপ হস্তপদবিশিষ্ট কতকগুলি প্রাণীর সাধারণ নাম মনুষ্য। তাহারা এক আদিপুরুষের সন্তান নহে এবং তাহারা এক দেশে বা এক সময়ে সৃষ্ট হয় নাই। বিভিন্নপ্রকার পশুপক্ষীদের আকৃতি, প্রকৃতি ও বর্ণের যতদূর বিভিন্নতা, বিভিন্নজাতীয় মনুষ্যের বিভিন্নতা তদ্রূপ বা ততধিক। একজাতীয় মনুষ্য অত্র-জাতীয় মনুষ্যের মাংস ভক্ষণ করিত। সভ্যতা-বিস্তৃতির সঙ্গে সঙ্গে তাদৃশ ব্যবহার হ্রাস হইয়াছে বটে, কিন্তু এখনও সম্পূর্ণ তিরোহিত হয় নাই। অতএব সমস্ত মনুষ্যজাতিকে এক আদিম মানব-দম্পতির সন্তান বলিয়া অনুমান করা যুক্তি, প্রমাণ এবং হিন্দুশাস্ত্র-বিরুদ্ধ। বাগ্দি, পোদ, গারো, কুকি প্রভৃতি জাতি বোধ হয় বাঙ্গালা দেশেই সৃষ্ট হইয়াছিল। তাহারা অন্য স্থান হইতে আসিয়া এদেশে

বাস করিতেছে, এরূপ কোন প্রবাদ বা প্রমাণ নাই। পক্ষান্তরে, অন্যান্য অনেক জাতীয় লোক যে, বিভিন্ন সময়ে স্থানান্তর হইতে এদেশে আসিয়া বাস করিয়াছে, তাহার প্রমাণ বা কিংবদন্তী পাওয়া যায়। যাহারা দীর্ঘকাল যাবৎ বাঙ্গালাদেশে বাস করিয়া বাঙ্গালা ভাষা ব্যবহার করিতেছে, তাহাদের জাতি ও ধর্মগত পার্থক্য সত্ত্বেও একটি সাধারণ নাম “বাঙ্গালী” হইয়াছে।

যুরোপীয়েরা অনুমান করেন যে, গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্রনদ-প্রবাহিত মৃত্তিকা দ্বারা বাঙ্গালা দেশের দক্ষিণ ভাগ নূতন উৎপন্ন হইয়াছে। সেই অনুমান প্রকৃত বলিয়া বোধ হয় না। কেননা কালীঘাট পাঠস্থানের নাম অতি প্রাচীন শৈবপুরাণে দেখিতে পাওয়া যায়। বরং অনুমান হয় যে, গঙ্গা, ব্রহ্মপুত্র, মহানদী, গোদাবরী, কাবেরী, ঐরাবতী প্রভৃতি নদীর স্রোতে মহাদেশের কতক ভূমি ভগ্ন হইয়া বঙ্গোপসাগর উৎপন্ন হইয়াছে। সেই সকল মৃত্তিকা সমুদ্রে চালিত হইয়া স্থানান্তরে দ্বীপ উৎপন্ন হইয়াছে। এই অনুমান যে যুক্তিসঙ্গত, তাহা অগ্নাত বৃহৎ নদীর মোহনার প্রতি দৃষ্টি করিলেই বোধগম্য হয়। নর্মদা নদীর মুখে খাম্বাজ উপসাগর হইয়াছে, ইউফ্রেটিস নদীর মুখে পারস্ত উপসাগর হইয়াছে এবং মীনাম ও মেকিয়াং নদী দ্বারা শ্রাম উপসাগর হইয়াছে। এইরূপ প্রত্যেক বেগবতী নদীর মুখে এক একটি ছোট বড় উপসাগর হইয়াছে। নদীর এক স্থান ভাঙ্গে, এবং সেই মাটির দ্বারা অগ্ন স্থানে চড়া পড়ে। সুররাং নদী দ্বারা অতি অল্পই মৃত্তিকা সাগরসঙ্গমে নীত হয়। তদ্বারা কোন প্রকাণ্ড ভূখণ্ড উৎপন্ন হয় না। যদি নদীর বালুকা দ্বারা দেশের সীমা বৃদ্ধি হইত। তবে হোয়াংহো, ইয়াংসিকিয়াং নদ দ্বারা চীনের সীমা বৃদ্ধি হইত। নীল নদ, আমেজন, মিসিসিপী প্রভৃতি নদ নদী দ্বারাও অনেক দেশ উৎপন্ন হইত। কিন্তু সর্বত্রই যখন নদীর মোহনায় ভূভাগ বৃদ্ধি না হইয়া বরং সাগরের সীমাই বৃদ্ধি হয়, তখন নদীসমূহের বেগে বঙ্গোপসাগর উৎপন্ন হইয়াছে বলিয়া অনুমান করাই সমধিক সম্ভব। ভারতবর্ষ অতি প্রাচীন দেশ, ইহার প্রত্যেক স্থানের অবস্থা বারংবার পরিবর্তিত হইয়াছে। এখন যেখানে নিবিড় অরণ্য, পূর্বে কোন সময়ে তথায় মহাসমৃদ্ধ নগর ছিল, তাহার প্রমাণও পাওয়া যায়। সুন্দরবনের স্থানে স্থানেও তদ্রূপ প্রাচীন পুরীর ভগ্নাবশেষ পরিলক্ষিত হয়। তজ্জন্ত অনুমান হয় যে, ঐ সকল স্থানেও পূর্বে জনপদ ছিল; পরে মগ ও পর্তুগিজদের দৌরাত্ম্যে

স্থানের অধিবাসিবর্গ স্থানান্তর যাওয়াতে, তদবধি ঐ স্থান জঙ্গলে পরিণত হইয়াছে। ভাগীরথীর সাগরসঙ্গমস্থলে কোন জঙ্গল থাকার বিষয় রামায়ণে উল্লেখ নাই। সূত্রাং সুন্দর জনপদ যে দস্যুপীড়নে অধুনা অরণ্যে পরিণত হইয়াছে, ইহাই বিশ্বাসযোগ্য।

আর্য্যজাতির সংস্কৃত ভাষা কোন কালেই কোন দেশের সাধারণ কথা ভাষা

বাঙ্গালা ভাষা।

ছিল না। সাধারণ কথোপকথন প্রাকৃত ভাষায় হইত।

প্রাকৃত ভাষা সংস্কৃতের অপভ্রংশ মাত্র। লিখন পঠনাদি

কার্য্যে সংস্কৃত ভাষা ব্যবহৃত হইত। তাহা সমস্ত আর্য্যজাতির মধ্যে একবিধ ছিল।

কিন্তু প্রাকৃত ভাষা সর্বত্র একবিধ ছিল না। প্রত্যেক প্রদেশের প্রাকৃত ভাষা অল্প-

ত্রের প্রাকৃত ভাষা হইতে কিছু কিছু বিভিন্ন ছিল। প্রত্যেক প্রদেশের নাম অনুসারে

সেই সকল প্রাকৃত ভাষার নামকরণ হইত। বাঙ্গালা দেশ মধ্যে বারেন্দ্রী বা গোড়ীয়

ভাষা বারেন্দ্র ভূমি ও রাঢ় প্রদেশে প্রচলিত ছিল।

বৌদ্ধধর্মের অভ্যুদয়ের সময়ে মগধ দেশে শূদ্র-সাম্রাজ্য ছিল। সেই শূদ্র সম্রাট্ গণ

দেখিলেন যে, বৌদ্ধধর্ম জাতিভেদ নাই। বৌদ্ধধর্ম প্রচলিত হইলে জাতিভেদ উঠিয়া

যাইবে। জাতিভেদ উঠিয়া গেলে শূদ্র সম্রাট্ বৈবয়িক শ্রেষ্ঠতাহেতু জনসমাজে সর্ব-

শ্রেষ্ঠ হইতে পারিবেন, এই আশায় মগধরাজগণ যথাসাধ্য বৌদ্ধধর্মের পোষকতা

করিতে লাগিলেন। নিম্ন শ্রেণীর লোক দলে দলে বৌদ্ধধর্ম অবলম্বন করিতে

লাগিল। রাজানুগ্রহ লাভের প্রত্যাশায় অল্পসংখ্যক উচ্চজাতীর লোকও

বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করিল। অতঃপর সম্রাট্ অশোক স্বয়ং প্রকাণ্ড রূপে নবধর্মের

দীক্ষিত হইয়া দিগদেশে সেই ধর্ম প্রচার জন্ত প্রচারক প্রেরণ করিলেন। এতকাল

রাজকার্য্য ও ধর্মকার্য্য প্রভৃতি যাবতীয় উচ্চ কার্য্য সংস্কৃত ভাষায় পরিচালিত

হইত। প্রাকৃত ভাষা কেবল সামান্য কার্য্যে ও কথাবার্তায় প্রযুক্ত হইত মাত্র।

মগধের বৌদ্ধগণ অধিকাংশই নীচজাতীয় লোক। তাহারা সংস্কৃত ভাষা জানিত

না। এ জন্ত সম্রাট্ অশোক নিজ রাজকার্য্যে ও ধর্মকার্য্যে মগধদেশীয় প্রাকৃত

ভাষা ব্যবহারের আদেশ দিলেন। মগধী ভাষা পাটলিপুত্র নগরের ভাষা,

এজন্ত “পাটলি” শব্দের অপভ্রংশে সেই ভাষার নাম পালিভাষা হইল। পালি-

ভাষা রাজ-ভাষা এবং ধর্মভাষা রূপে প্রবর্তিত হওয়ায় ক্রমশঃ ইহার উন্নতি হইতে

লাগিল। কালের আবর্তনে ভারতে বৌদ্ধধর্ম ও বৌদ্ধরাজত্ব লোপ হইয়াছে

বটে, কিন্তু সংস্কৃত ভাষা আর পূর্ববৎ প্রচলিত হয় নাই। পরবর্তী হিন্দু রাজ-গণের অধিকাংশ রাজকার্য্য স্থানীয় প্রাকৃতভাষাতেই নিখিত ও পঠিত হইয়া আসিতেছে। কাণ্ডকুজ ও তৎপার্শ্ববর্তী স্থানে যে প্রাকৃতভাষা প্রচলিত হইয়াছিল, তাহার নাম ব্রজ-ভাষা। সেই ব্রজভাষা হইতেই বর্তমান হিন্দী ও বাঙ্গালা ভাষা উৎপন্ন হইয়াছে।

বঙ্গভাষা বঙ্গ প্রদেশে এবং বগ্দির পূর্বাংশে ব্যবহৃত হইত। বগ্দির পশ্চিম ভাগে নবদ্বীপ অঞ্চলে নানা স্থান হইতে লোক আসিয়া গঙ্গাতীরে বসত করিয়াছিল। তজ্জন্ত এই স্থানে বঙ্গভাষা ও গোড়ীয়ভাষা মিশ্রিত হইয়াছিল। এই স্থানে সংস্কৃত ভাষার চর্চা অধিক হওয়ায় এখানকার প্রাকৃত ভাষা সমধিক মার্জিত হইয়াছিল। সেই হেতু নদীয়া শান্তিপুরের প্রাকৃত ভাষাই সমস্ত বাঙ্গালা দেশের আদর্শ ভাষা হইয়াছিল। তাহাই এক্ষণে বাঙ্গালা ভাষা নামে পরিগৃহীত হইয়াছে। এখন বাঙ্গালা গণ্ডে যেরূপ ভাষা সর্বত্র ব্যবহৃত হয় তাহা নদীয়া শান্তিপুরের সাধু ভাষা। কিন্তু সাধারণ কথোপকথনে এই সাধু ভাষা কুত্রাপি ব্যবহৃত হয় না। রাঢ় ও বারেন্দ্র ভূমিতে গোড়ীয়-ভাষা, পূর্ব-বাঙ্গালায় বঙ্গভাষা এবং কলিকাতার নিকটবর্তী স্থানে কলিকাতাই-ভাষা সাধারণ কথোপকথনে প্রচলিত আছে। বাঙ্গালা ভাষায় অধিকাংশ শব্দই সংস্কৃত মূলক। মুসলমান রাজত্বকালে আরবী ও পারসী শব্দ প্রচুর পরিমাণে বাঙ্গালা ভাষায় প্রবেশ করিয়াছে। পারসী লিখিবার ধরণ করণও কিছু কিছু বাঙ্গালা ভাষায় গৃহীত হইয়াছে। তাহারপর ইংরেজাধিকারে অল্প সংখ্যক ইংরেজী শব্দও বাঙ্গালা ভাষায় মিলিত হইয়াছে। পরন্তু ইংরেজী রচনা প্রণালী প্রচুর পরিমাণে বাঙ্গালা ভাষায় অনুরূপ হইয়াছে। এইরূপে সংস্কৃত ভাষা, প্রাকৃত ভাষা, পারসী, আরবী এবং ইংরেজী ভাষার সংস্রবে বর্তমান বাঙ্গালা ভাষা সংগঠিত হইয়াছে।

মগধ দেশে চন্দ্র নামে শূদ্রজাতীয় এক মহাবল পরাক্রান্ত সম্রাট ছিলেন। বাঙ্গালা দেশে ক্ষত্রিয় কাশীধাম হইতে ব্রহ্মপুত্র পর্য্যন্ত তাঁহার রাজ্য বিস্তৃত না থাকার হেতু ছিল। তিনি ক্ষত্রিয়দিগের সহিত বৈবাহিক আদান প্রদান করিয়া ক্ষত্রিয়দলে মিলিতে উৎসুক ছিলেন। ক্ষত্রিয়েরা তাঁহার সহ একরূপ আদান প্রদানে স্বর্ণা প্রকাশ করায় তিনি দ্বিতীয় পরশুরামের হায়া

ক্ষত্রবিনাশে ব্রতী হইয়াছিলেন। বহুসংখ্যক ক্ষত্রিয় তাঁহা কর্তৃক বিনষ্ট হইয়াছিল, কতক দেশান্তরে পলায়ন করিয়াছিল। অবশিষ্ট যাহারা তাঁহার বাধ্য হইয়াছিল, তাহারা ক্ষত্রসমাজ হইতে বিচ্যুত হইয়া শূদ্রমধ্যে পরিগণিত হইয়াছিল। এজন্ত মগধ-সাম্রাজ্যে কোন বিশুদ্ধ ক্ষত্রিয় ছিল না। বৌদ্ধ বিনাশ ও মগধ-সাম্রাজ্য ধ্বংসের পর ক্ষত্রিয়েরা কাশী, মগধ এবং মিথিলার অধিকাংশ স্থান পুনরায় দখল করিয়াছিল। সেই জন্ত ঐ সকল স্থানে পুনরায় ক্ষত্রিয়ের আবাস হইয়াছে। কিন্তু বাঙ্গালা দেশে ক্ষত্রিয়-আধিপত্য না হওয়ায় তথায় পুনরায় ক্ষত্রিয়দের বসতি হয় নাই।

আধুনিক সম্রাটগণ তাঁহাদের বিশাল সাম্রাজ্যের দূরবর্তী প্রদেশ শাসনার্থ

বেতনভোগী অস্থায়ী শাসনকর্তা নিযুক্ত করিয়া থাকেন।

করদ রাজ্য।

প্রাচীন হিন্দু ও বৌদ্ধ সম্রাটদের সময়ে এরূপ রীতি

ছিল না। তাঁহারা দূরবর্তী প্রদেশ শাসন জন্ত, করদ রাজা নিযুক্ত করিতেন। তৎকালে প্রজার বার্ষিক লভ্যের $\frac{১}{৩}$ ষষ্ঠাংশ রাজস্ব রূপে নির্দিষ্ট ছিল। করদ-রাজ্যের মধ্যে সেই হারে যে রাজস্ব আদায় হইত, করদ রাজগণ তাহার চতুর্থাংশ নিজ বেতন এবং দশমাংশ আদায়ের ব্যয়স্বরূপ প্রাপ্ত হইতেন। হিন্দীভাষায় ইহাকেই চৌথ ও সরদশমুখী বলে। অবশিষ্ট $\frac{২}{৩}$ ভাগ করদ রাজারা নিজ প্রভুর নিকট প্রেরণ করিতেন। করদ রাজারা পুরুষানুক্রমিক ভূম্যধিকারী ছিলেন। তাঁহাদের উত্তরাধিকারিগণের মধ্যে কেহ কার্য্যনির্বাহের অযোগ্য হইলে, সম্রাট তাঁহার কার্য্য চালাইবার জন্ত কোন ব্যক্তিকে অস্থায়ী রূপে বেতনভোগী কার্য্যনির্বাহক নিযুক্ত করিতেন। সেই কর্মচারীকে সর্বাধিকারী, সরবরাহকার বা ডিঠা বলিত। ডিঠা ব্যতীত প্রাচীন রাজগণের স্বতন্ত্র বেতনভোগী শাসনকর্তা ছিল না। এতদ্ব্যতীত আর একপ্রকার করদ রাজা ছিলেন, তাঁহাদিগকে সম্রাটগণ নূতন নিযুক্ত করিতেন না। কোন দুর্বল রাজা প্রবল পরাক্রান্ত রাজার সহিত যুদ্ধ করিতে অসমর্থ হইয়া তাঁহার বশ্যতা স্বীকার-পূর্ব্বক বার্ষিক কর দিতেন। কিংবা তদনুরূপ অল্পশক্তিশালী রাজা কোন প্রবল শত্রুর বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইবার উদ্দেশ্যে সাহায্য পাইবার আশায় অথবা কোন প্রবল পরাক্রান্ত রাজার আশ্রয় লইয়া তাঁহাকে কর প্রদান করিতেন। এইরূপ করদ রাজগণ বশী রাজা বলিয়া অভিহিত হইতেন। বশী রাজগণ নিজ প্রভুকে

যত টাকা কর দিতেন এবং যে যে সর্বের অধীন হইতেন, তাহা সন্ধিপত্র দ্বারা নির্দিষ্ট হইত। বশীদিগের প্রদত্ত করকে অনুকর বা নালবন্দী বলে। অনুকরের পরিমাণ প্রায়শঃ সমগ্র রাজস্বের $\frac{২}{৩}$ ভাগ অপেক্ষা কম হইত।

জনসমাজের হিত সাধন করাই সকল ধর্মের উদ্দেশ্য এবং মূলমন্ত্র। কিন্তু

চিরকালই প্রবল পক্ষ স্বধর্মবিরুদ্ধবাদীদের উপর
পাষাণদলন।

ঘোর অত্যাচার করিয়া থাকে। বরং ধর্মবিদ্বেষ বশতঃ

লোকে যত অত্যাচার ও অধর্মাচরণ করিয়া থাকে, অত্ন কোন কারণে ততদূর করে না। বৌদ্ধধর্মের প্রথম অবস্থায় হিন্দুরা বৌদ্ধদের উপর অত্যাচার করিত কিন্তু যখন বৌদ্ধধর্ম সর্বত্র বিস্তৃত হইয়া প্রবল হইয়া উঠিল, তখন বৌদ্ধেরা হিন্দুদের উপর উৎপীড়ন করিতে আরম্ভ করিল। কাথকুজবাসী ব্রাহ্মণেরা সেই অত্যাচার নিবারণ জন্ত যজ্ঞাগ্নি হইতে কতকগুলি যোদ্ধা উৎপাদন করিয়া-ছিলেন। সেই যোদ্ধাদিগকে অগ্নিকুল বা অগ্নিসন্তৃত ক্ষত্রিয় বলে। প্রমার, পরিহর, চালুক্য ও চালুমান, এই চারি জন সেই অগ্নিকুলের নেতা ছিলেন। সেই অগ্নিকুলের সাহায্যে ব্রাহ্মণেরা সমগ্র ভারতবর্ষে বৌদ্ধদিগের বিনাশ সাধনে প্রবৃত্ত হইলেন। ইহার ফলে, কতক বিনষ্ট হইল, কতক দেশ হইতে বিতাড়িত হইল, অবশিষ্ট বশত স্বীকার করিল। ইহারই নাম পাষাণদলন। এই পাষাণ-দলন দ্বারা কনোজ ব্রাহ্মণের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠিত হইল এবং কাথকুজ নগর আর্ধ্যবিহার আদর্শ স্থান হইল। কাথকুজ-ব্রাহ্মণদিগকে শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণ বলিত। তাঁহারাই সকল ব্রাহ্মণের আদর্শরূপে পূজিত হইতেন। এজন্য গৌড়াধিপতি কাথকুজ হইতে শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণ আনিয়া নিজ রাজ্যে স্থাপন করিয়াছিলেন। অগ্নিকুল দ্বারা মগধসাম্রাজ্য ধ্বংস হইলে তথাকার এক রাজকুমার ব্রহ্মদেশে গিয়া রাজ্য স্থাপন করেন। সেই রাজবংশ আড়াই হাজার বৎসর ব্রহ্মদেশে রাজত্ব করিয়াছিলেন। ব্রহ্মদেশীয় লোকদিগকে যে “মগ” বলে, তাহা মগধ শব্দের অপভ্রংশ। *

* মগধ হইতে মগহ, তাহা হইতে মঘ বা মগ। ব্রহ্মদেশের শেষ রাজা দেবাকে ইংরেজেরা ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দে বন্দী করিয়া তাঁহার রাজ্য গ্রহণ করিয়াছেন।

গৌড়ীয় পঞ্চরাজ্যের ইতিহাস বৈষ্ণব-রাজ্যারম্ভ হইতেই ধারাবাহিক রূপে
গৌড়ীয় পঞ্চ রাজ্য।
যাহা পাওয়া যায়, তাহা ধারাবাহিক না হইলেও
অতীব প্রয়োজনীয় কথা। এজন্য তাহা বিবৃত করা গেল।

মিথিলাদেশ—ইহার পূর্বে বরেন্দ্রভূমি, দক্ষিণে গঙ্গা, পশ্চিমে নারায়ণী
নদী, উত্তরে নেপাল। বেণু রাজার সময়ে ব্রহ্মাবর্তে চতুর্ভুজ-মিশ্রণে নানা প্রকার
সঙ্কর জাতি উৎপন্ন হইয়াছিল। তন্মধ্যে বিদেহ-নামক সঙ্কর জাতি আসিয়া
এই দেশে প্রথমে বাস করে। এই জাতির নাম হইতেই এই দেশের আদিম
নাম “বিদেহ” হয়। তাহার পর চন্দ্রবংশীয় মিথি-নামক রাজা এই দেশ জয়
করিয়া নিজ রাজ্য স্থাপন করিয়াছিলেন। তাঁহার নাম হইতেই এই দেশের
নাম মিথিলা দেশ এবং রাজধানীর নাম মিথিলা নগর হইয়াছে। মিথি-বংশ
বহুকাল এই দেশে রাজত্ব করিয়াছিল। প্রসিদ্ধ রাজর্ষি জনক এই মিথিবংশীয়
ছিলেন। কুরু-পাণ্ডবদের সময়ে এই দেশ মগধরাজ জরাসন্ধের অধীন ছিল
এবং তাঁহার করদরাজগণ দ্বারা উক্ত প্রদেশ শাসিত হইত। মগধের নন্দবংশীয়
শূদ্র রাজা এবং বৌদ্ধ সম্রাটের সময়েও এই দেশ মগধসাম্রাজ্যের অধীন ছিল;
তখন এই দেশ পাল-উপাধিবাহী করদরাজগণ কর্তৃক শাসিত হইত। পাণ্ডু-
দলনের পর এই দেশের অধিকাংশ স্থান ক্ষত্রিয়গণ অধিকার করিয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র
স্বাধীন রাজ্য স্থাপন করিয়াছিলেন। কিন্তু মিথিলার পূর্বাংশে পালবংশেরই
রাজত্ব ছিল। অবশেষে গোড়াধিপতি বল্লালসেন, গোবিন্দপাল এবং অন্যান্য
ক্ষত্রিয় রাজগণকে পরাজিত করিয়া সমগ্র মিথিলা দেশ নিজের অধীন
করিয়াছিলেন। তদবধি এই দেশ বৈষ্ণবরাজ্যভুক্ত হইয়াছিল।

বরেন্দ্রভূমি—ইহার পূর্বে করতোয়া নদী ও চলনবিল, দক্ষিণে পদ্মানদী,
পশ্চিমে মিথিলা, উত্তরে কোচবিহার। দৈত্যরাজ বলির পত্নী সূদেষ্কার গর্ভে
দীর্ঘতমা মুনির ঔরসে অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, ওড়্র এবং পুণ্ড্র নামে পাঁচটি ক্ষেত্রজ
পুত্র হইয়াছিল। তাঁহারা প্রত্যেকে স্বনামখ্যাত এক একটা রাজ্য স্থাপন
করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে বঙ্গ এবং পুণ্ড্রের রাজ্য বর্তমান বাঙ্গালা দেশের
অন্তর্গত। মালদহ জেলার অন্তর্গত পাণ্ডুয়া নগরের চতুর্পার্শ্ববর্তী স্থান পুণ্ড্রের

অধিকারভুক্ত ছিল। তাঁহার নাম হইতেই ইহাকে পৌণ্ড্রদেশ এবং ইহার রাজধানীকে পৌণ্ড্রপট্টন বলিত। * কালক্রমে বরেন্দ্র-নামক একজন ক্ষত্রিয় পৌণ্ড্র রাজ্য জয় করিয়া সমস্ত বরেন্দ্রভূমিতে নিজ প্রভুত্ব স্থাপন করত এই রাজ্যের নাম বরেন্দ্রভূমি রাখিয়াছিলেন, এবং তিনি পৌণ্ড্রপট্টন হইতে সরাইয়া গৌরবনগরে রাজধানী সংস্থাপিত করেন। কালক্রমে এই দেশ মগধসাম্রাজ্যের অধীন হইয়া ক্ষত্রিয়শূন্য হইয়াছিল। বৌদ্ধদিগের প্রাধান্যের সময় পালবংশীয় রাজগণ মগধসাম্রাজ্যের অধীনে এই দেশে রাজত্ব করিতেন। তাঁহারা বৌদ্ধ-মতাবলম্বী ছিলেন। সেই সময়ে পৌণ্ড্রপট্টনের নাম পাণ্ডুরা, গৌরবনগরের নাম গোড়, এবং বরেন্দ্রভূমির নাম বরিন্দা হইয়াছিল। পাষণ্ডদলনের পর এই দেশের পাল-রাজগণ স্বাধীন হইয়া ক্রমে ক্রমে সনাতন ধর্ম গ্রহণ করত শৈব হইয়াছিলেন। পালবংশীয়েরা হিন্দু হইলেও শূদ্র বলিয়া গণ্য হইতেন। মদনপাল এই বংশের শেষ রাজা। তাঁহার পত্নী মন্ত্রী সহযোগে বিষপ্রয়োগে স্বামি-হত্যা করিয়াছিলেন। কিন্তু সেনাপতি শূরসেন-নামক বৈজ্ঞ সেই দুষ্টা রাণী সহ মন্ত্রীকে বন্দী করিয়া অগ্নিতে দগ্ধ করেন এবং মৃত রাজার কোন সন্তান না থাকায় স্বয়ং রাজা হন। তদবধি গোড়ে বৈজ্ঞরাজ্য স্থাপিত হইল; কিন্তু বরিন্দার উত্তর ও পূর্ব প্রান্তে তখনও পালবংশীয় কোন কোন রাজার আধিপত্য ছিল। বৈজ্ঞরাজগণ ক্রমে ক্রমে পালরাজ্য ধ্বংস করিয়া সমস্ত বরিন্দা অধিকার করিয়াছিলেন।

বঙ্গদেশ।—ইহার পূর্বে ব্রহ্মপুত্র, দক্ষিণে পদ্মা, পশ্চিমে বরেন্দ্রভূমি এবং উত্তরে জঙ্গল। ইহার কতকাংশে বঙ্গের রাজ্য ছিল বলিয়া ইহা বঙ্গদেশ বলিয়া অভিহিত হয়। ভগবান্ পরশুরাম ব্রহ্মার মানস-সরোবর হইতে খাল কাটিয়া এই দেশে ব্রহ্মপুত্র নদ আনয়নপূর্বক জলদানের পুণ্যে মাতৃহতাজনিত পাপ হইতে মুক্ত হইয়াছিলেন। যে স্থানে স্নান করিয়া তাঁহার পাপান্ত হইয়াছিল, সেই স্থান পরশুরামক্ষেত্র ও পৌষনারায়ণী নামে খ্যাত। এই দেশের কতকগুলি ক্ষত্রিয় প্রাণভয়ে পরশুরামের নিকট আপনাদিগকে ধীবর বলিয়া পরিচয় দিয়াছিল। তাহাদের সন্তানেরাই রাজবংশী। এই দেশও মগধরাজ্যের

* পৌণ্ড্রপট্টন স্থলে আধুনিক কেহ কেহ পৌণ্ড্রবর্ধন বলেন, তাহা অশুদ্ধ। চীন ভাষা হইতে অনুবাদ করিতে ঐ ভুল উৎপন্ন হইয়াছে।

অধীন এবং ক্ষত্রিয়শূত্র হইয়াছিল। তখন এই দেশ মগধের বৌদ্ধ সম্রাটদিগের অধীন পালউপাধিদারী করদরাজগণ দ্বারা শাসিত হইত। পাষণ্ডদলনের পর সেই পালগণ স্বাধীন হইয়া ক্রমে ক্রমে শৈব হিন্দু হইয়াছিলেন। পালবংশের ধর্ম্যপাল প্রথম সনাতন ধর্ম্য গ্রহণ করেন। তৎপুত্র দেবপাল বা দেপাল গোড় নগর হইতে কয়েকজন কায়স্থ আনিয়া বঙ্গদেশে স্থাপিত করেন এবং তাঁহাদের সহিত বৈবাহিক আদান প্রদান করিয়া সেই সমাজে মিলিত হইয়াছিলেন। তৎপুত্র রামপাল এই বংশের শেষ রাজা। রামপালের পত্নী ও পুত্রবধু কায়স্থ কণ্ঠা। তদীয় রাজ্যের প্রধান কার্য্যকারক সমস্তই কায়স্থ ছিল। রামপালের একমাত্র পুত্র যক্ষপাল এক প্রজার পত্নীকে বলাৎকার করায় অপক্ষপাতী রাজা তাহার প্রাণদণ্ড করিয়াছিলেন। তাঁহার পত্নী ও পুত্রবধু শোকে বিমুগ্ধ হইয়া ব্রহ্মপুত্র নদে আত্মবিসর্জন করিলেন। রামপাল নিজে গঙ্গাতীরে গিয়া শিবভক্ত বিজয় সেনকে নিজ রাজ্য প্রদান করত অনশনে প্রাণত্যাগ করিলেন। এই সময় হইতেই বঙ্গদেশে বৈষ্ণবরাজত্বের সূত্রপাত হয়।

রাঢ়দেশ।—ইহার পূর্বে ভাগীরথী, দক্ষিণে উড়িষ্যা, পশ্চিমে মগধ, এবং উত্তরে গঙ্গা। ইহার প্রাচীন নাম প্রাচদেশ। বৌদ্ধ-সাম্রাজ্যের সময় সেই শব্দ অপভ্রষ্ট হইয়া রাঠ বা রাঢ় নামে পরিণত হয়। এই দেশ বহুকাল মগধদেশের অধীন ছিল। জরাসন্ধের প্রসিদ্ধ রাজধানী পঞ্চকূট এই দেশের অন্তর্গত। মগধের শূদ্র রাজাদের অধীনে এই দেশও ক্ষত্রিয়শূত্র হইয়াছিল। বৌদ্ধ-রাজত্বের সময় এই দেশ পালউপাধিদারী করদরাজগণ মগধসম্রাটের অধীন থাকিয়া ভোগ করিতেন। পাষণ্ড-দলনের পর এ দেশের উত্তরভাগ গোড়াধিপতির অধীনে উত্তর রাঢ় নামে খ্যাত হয়। দক্ষিণ রাঢ় স্বাধীন হইয়াছিল। আদিশুর ও তৎপরবর্ত্তী বৈষ্ণব রাজারা ক্রমশঃ সমস্ত রাঢ়দেশ অধিকার করিয়া এই দেশ বৈষ্ণবরাজ্যভুক্ত করিয়াছিলেন।

বকদ্বীপ।—ইহার পূর্বে পদ্মা, দক্ষিণে সমুদ্র, উত্তরে গঙ্গা এবং পশ্চিমে ভাগীরথী। বৌদ্ধদিগের সময় ভাষা অপভ্রষ্ট ও সংকীর্ণ হইয়া ইহার নাম 'বগদি' হইয়াছে। ইহার আদিম অধিবাসীদিগকে বাগদি বলে। ইহা স্বতন্ত্র কোন রাজ্য ছিল না। ইহার উত্তরভাগ বরেন্দ্রভূমির, পূর্বভাগ বঙ্গের এবং পশ্চিম ভাগ রাঢ়ের অধীন ছিল। মধ্য ও দক্ষিণ ভাগ জঙ্গলাকীর্ণ ছিল, তাহাতে

বাগদিগণ ও বহু পশুরা বাস করিত । বৈষ্ণবরাজগণ ক্রমশঃ এই দেশ সম্পূর্ণ অধিকারপূর্ব্বক স্বরাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করিয়া শান্তি ও সভ্যতা স্থাপন করিয়া-
ছিলেন । যুরোপীয়েরা এই দেশকে আধুনিক উৎপন্ন বলিয়া অনুমান করেন ;
কিন্তু হিন্দুশাস্ত্রাদি দৃষ্টে সেই অনুমান ভ্রান্তিমূলক বোধ হয় ।

দ্বিতীয় অধ্যায় ।

আর্য্যগণের আদিম নিবাস ।—অশ্বিষ্ঠ জাতি ।—বৈষ্ণবরাজ ।—বঙ্গে ব্রাহ্মণগমন ।—বিজয়সেন ।
—বল্লালসেন ।—কৌলীন্দ্ৰ মর্যাদা ।—স্বর্ণবর্ণিকদিগের পতন ।—লক্ষণসেন ।—বংশানু-
ক্রমিক কৌলীন্দ্ৰ প্রথা ।—রোমথা ।—শেখ শুভোদয় ।—পাঠান কর্তৃক বঙ্গ
বিজয় ।—বান্দালোর বীরত্ব ।—হিন্দুদিগের দ্বিগুণ প্রণালী ।—
প্রাচীন ঢাকা ।—পাঠান শাসন প্রণালী ।

সংস্কৃত ভাষায় বাহাকে হুণ দেশ বলে, যুরোপীয়েরা তাহাকেই সাইথিয়া বলিতেন । এখন মুসলমানেরা সেই দেশকে তুরাণ বলেন এবং ইংরেজেরা সেই দেশকে তুর্কিস্থান বলেন । সেই দেশ হইতে ভারতীয় জাতি দলে দলে গিয়া যুরোপ জয় করত তদ্দেশবাসী হইয়াছে । সেই দৃষ্টান্তে যুরোপীয়েরা অনুমান করেন যে, আর্য্যজাতিও সেইরূপ একদল ভারতীয় জাতির শাখা । তাহারা সাইথিয়া হইতে আসিয়া ভারতবর্ষ জয় করিয়া এই দেশবাসী হইয়াছে । ভারতের আদিম নিবাসীদের সন্তানেরাই শূদ্র । এই অনুমানের পোষক কোন প্রমাণ নাই, সুতরাং তাহা বিশ্বাসের অযোগ্য ।

মোক্ষমূলর-প্রমুখ সংস্কৃতজ্ঞ যুরোপীয়গণ অনুমান করেন যে, আর্য্যজাতি পারস্ত দেশ হইতে আসিয়া ভারতবর্ষ জয় করিয়া এই দেশে বাস করিয়াছে । এই অনুমান সমর্থন জ্ঞাত হইয়া দেখান যে, সংস্কৃত ভাষার সহিত প্রাচীন পার্সী অর্থাৎ জৈন ভাষার প্রচুর ঐক্য আছে এবং আচার ব্যবহারেও কতক ঐক্য আছে । অথচ এই দুই জাতির মধ্যে যে প্রাচীন কালে ঘোরতর বিবাদ ও

বিদেহ ছিল, তাহাও স্পষ্ট প্রতিপন্ন হয়। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ তদৃষ্টে সিদ্ধান্ত করেন যে, আৰ্য্য জাতি আদৌ পারশ্ব দেশে বাস করিয়া দেবতা ও অসুর উভয়কে শূজা করিত। পরে তাহাদের মধ্যে একদল সুর অর্থাৎ দেবগণের ভক্ত হয় এবং অপর দল অসুর ভক্ত হয়। সেই ধর্মবিদ্বেষে উভয় দলে বিবাদ হইলে, দেবভক্তগণ পরাস্ত এবং স্বদেশ হইতে তাড়িত হইয়া, ভারতে আসিয়া-ছিলেন এবং এই দেশ জয় করিয়া ইহাতে বাস করিয়াছেন। পাশ্চাত্য পণ্ডিত-গণের উপরোক্ত সিদ্ধান্ত সম্ভবতঃ ভ্রমপূর্ণ। আৰ্য্য জাতির অগ্র দেশ হইতে ভারতে আসিবার কোন প্রমাণ কোন দেশের কোন পুস্তকে নাই এবং তাদৃশ কোন কিংবদন্তীও কুত্রাপি নাই।* বরং মনুসংহিতাতে স্পষ্ট লিখিত আছে যে, ব্রহ্মাবর্তই আৰ্য্যজাতির আদিম স্থান, তথা হইতে তাহারা নানা দেশে বিস্তৃত হইয়াছে। ঋগ্বেদ ও জৈন অবস্তার শ্লোক সমস্ত তুলনা করিলে জানা যায় যে, আদিম আৰ্য্যজাতিরা সুরাসুর উভয়-পূজক ছিল। পরে একদল কেবল-মাত্র সুরভক্ত এবং অগ্রদল কেবলমাত্র অসুরভক্ত হইয়াছিল। তজ্জন্ত তাহাদের মধ্যে বিবাদ হইয়াছিল। দেবগণ সুরভক্তদের সহায় হইয়াছিলেন, পক্ষান্তরে অসুর ও রাক্ষসগণ অসুরভক্তদের পক্ষ হইয়াছিল। ইহাই দেবাসুরযুদ্ধ। কিছু দিন পরে উভয়ের সন্ধি হইয়াছিল এবং উভয়ে মিলিয়া সমুদ্র-মস্থান করিয়াছিল। সমুদ্রমস্থান শব্দের অর্থ বোধ হয় “সামুদ্রিক বাণিজ্য” অথবা “সমুদ্র পথে দিগ্বিজয়”।† সেই যৌত বাণিজ্যে বা দিগ্বিজয়ে যাহা কিছু লাভ

* এ বিষয়ে নানা লোকের নানা মত। শ্রীযুক্ত বালগঙ্গাধর তিলক বেদ ও জ্যোতিষ হইতে যে প্রমাণ সংগ্রহ করিয়াছেন তাহাতে আৰ্য্যদিগের আদিম বাসস্থান মেরু প্রদেশ নির্ণয় করিয়াছেন। তিলক মহাশয় বৈজ্ঞানিক যুক্তির বলেও প্রমাণ করিতে চাহেন যে পুরাকালে আৰ্য্যগণের বাস মেরু সম্মিহিত প্রদেশে ছিল। সে দেশ তখন সুখের ছিল, কিন্তু কালক্রমে তাহা হিমাচ্ছন্ন হইলে আৰ্য্যগণ দক্ষিণে আগমন করেন। ১০।৮৯।২ ঋকে ইন্দ্র (সূর্য্য) রথের চক্রের দ্বারা চতুর্দিকে ঘূর্ণিত করিতে থাকেন; ১।২৪।১০ ঋকে ঋক্ষগণ অর্থাৎ সপ্তর্ষিগণ ‘উচ্চে’ অবস্থিত। তিলক বলেন, সূর্য্যের চক্রবৎ পরিভ্রমণ দ্বারা ও সপ্তর্ষিগণ মাথার উপর থাকায় মেরুদেশের অবস্থা বর্ণিত হইয়াছে। বিশেষতঃ সপ্তর্ষিগণ মাথার উপর থাকা ভারতবর্ষে হইতে পারে না। যে দেশের অক্ষাংশ ৫০ কি ৫৫, সে দেশের লোকদিগের মাথার উপর সপ্তর্ষি থাকেন। অন্ততঃ ইহা বেশ বলা যায় যে, বৈদিক ঋষিগণের কতকগুলির বাস ভারতবর্ষের বহু উত্তরে ছিল। তাহারা ভারতবর্ষ হইতে গিয়া তথায় বাস করিতে পারেন। বাস্তবিক তিলকের উক্ত কোন লোক দ্বারা প্রমাণ হয় না যে, আৰ্য্যজাতি উত্তর দেশ হইতে আসিয়া ভারতে বসতি করিয়াছিলেন।

† “সামুদ্রিক বাণিজ্যই” অধিক সম্ভবতঃ।

হইয়াছিল, দেবগণ ও দেবভক্তগণ তাহা সমস্তই আত্মসাৎ করাতে পুনরায় উভয় দলে বিবাদ হইয়াছিল । সেই বিবাদে দেবভক্তগণ জয়ী হইয়া বিপক্ষগণকে দেশ হইতে তাড়াইয়া দিয়াছিল । অম্বর ও অম্বরভক্তগণ সিদ্ধনদের পরপারে পলায়ন করিয়াছিল এবং রাক্ষসগণ পাতালে গিয়া বাস করিয়াছিল ; সুতরাং সমস্ত ভারতবর্ষ দেবভক্ত আর্য্যগণের অধিকৃত হইয়াছিল । পাতাল শব্দে পদতলবর্তী দেশ অর্থাৎ পৃথিবীর বিপরীত পৃষ্ঠ । যুরোপীয়েরা যাহাকে 'আমেরিকা' বলেন, তাহারই নাম পাতাল । আর্য্যগণ যে অতি প্রাচীন কাল হইতে আমেরিকার অস্তিত্ব অবগত ছিলেন, তাহা ঋগ্বেদের ঐতরেয় ব্রাহ্মণ দশম মণ্ডল ৯০।৯১।৯২ শ্লোক পাঠ করিলেই স্পষ্ট জানা যায় । আর আদিম আমেরিক লোকদের চরিত্রে এবং রাক্ষসচরিত্রে সম্পূর্ণ ঐক্যও দেখা যায় । তদ্বারা পৌরাণিক উক্তির সত্যতা প্রমাণ হয় । অধিকন্তু অনুমান হয় যে, রাক্ষসেরা পাতালে যাতায়াতের পথে কতকগুলি অষ্ট্রেলিয়া, পলিনেসিয়া, ফিলিপাইন প্রভৃতি দ্বীপে বাস করিয়াছিল ।

পারশ্বদেশ শব্দের অর্থ "সিন্ধোঃ পারশ্ব দেশঃ" অর্থাৎ সিদ্ধনদের পরপার-বর্তী দেশ । গ্রীক জাতির কথিত পার্সিয়া শব্দ এই পারশ্ব শব্দের রূপান্তর মাত্র । এই নামটি দ্বারাই স্পষ্ট বুঝা যায় যে, পার্সী জাতি আগে ভারতবর্ষে ছিল, পরে সিদ্ধুর পশ্চিম পারে গিয়া বসতি করিয়াছিল । মনু ব্রহ্মাবর্ত সঙ্ঘর্ষে যেমন বলিয়াছেন "স দেশো দেবনির্গিতঃ," জৈন অবস্তাতেও ঠিক সেইরূপ লিখিত হইয়াছে যে, "অহুরা মজ্জদা যত দেশ সৃষ্টি করিয়াছেন, তন্মধ্যে হপ্ত হিন্দব এবং হরহৈতি দেশ সর্বোৎকৃষ্ট ।" 'অহুরা মজ্জদা' শব্দ সংস্কৃত "মস্ত অম্বর" শব্দের রূপান্তর । আর 'হপ্ত হিন্দব' শব্দ সপ্তসিদ্ধ বা বর্তমান পঞ্জাব বোধক । 'হরহৈতি' শব্দ সংস্কৃত সরস্বতী শব্দের অপভ্রংশ । অহুরা মজ্জদা বা মস্ত অম্বর পার্সীদিগের পরমেশ্বর বোধক শব্দ । ব্রহ্মাবর্ত সরস্বতী নদীর তীরে অবস্থিত, সুতরাং হরহৈতি শব্দ যে ব্রহ্মাবর্ত-বোধক, তাহাতে সন্দেহ নাই । জৈনগণ ব্রহ্মাবর্ত ও পঞ্জাবকে সর্বশ্রেষ্ঠ দেশ বলায় উহা যে তাহাদের সুখকর আদিম বাসস্থান, তাহা প্রতিপন্ন হয় । অবস্তায় আরও উক্ত হইয়াছে যে "চোরদিগের দলপতি ছুরাত্মা ইন্দ্র আমাদের শত্রু এবং ধন সর্বদা হরণ বা নষ্ট করে, তজ্জন্ত আমরা সতত শঙ্কিত থাকি ।" এই বচন দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, দেবভক্তদের উৎপাতে

তিষ্ঠিতে না পারিয়া পার্শ্বীরা ব্রহ্মাবর্ত ও পঞ্জাব ত্যাগ করিয়া সিন্ধুনদের পশ্চিম পারে বাস করিতে বাধ্য হইয়াছিল। আবার পুরাণে দেখা যায় যে মহর্ষি অঙ্গিরাজেবগণের এবং অশুরগণের পুরোহিত ছিলেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র দেবগুরু বৃহস্পতি এবং কনিষ্ঠ পুত্র অশুরগুরু সম্বর্ত, উভয়েই দেবাসুর উভয় কুলের পূজা ছিলেন। ঐরূপ অশুরগুরু শুক্রাচার্য্য ও উভয় কুলের মান্য ছিলেন। ইহা দ্বারা অনুমান হয় যে, দেবভক্ত ও অশুরভক্তদের ধর্ম্ম বিষয়ে বিবাদ তত গুরুতর ছিল না, বরং বিষয় সম্পত্তি লইয়া বিবাদই তাহাদের শক্তির প্রধান কারণ। অতএব ইহা নিশ্চিত হইতেছে যে, আর্য্যজাতির আদিম নিবাস ব্রহ্মাবর্ত ছিল, তথা হইতে তাহারা নানা কারণে চতুর্দিকে বিস্তৃত হইয়াছিল। আবার মনুসংহিতা, রামায়ণ এবং মহাভারত দৃষ্টে স্পষ্ট জানা যায় যে, সেই বিদেশ-প্রস্থিত আর্য্যগণ মধ্যে প্রায় সকলেই ক্ষত্রিয় ছিল। তাহারা দেশান্তরে গিয়া ব্রাহ্মণের উপদেশ না পাওয়াতে ভ্রষ্টাচারী ও দম্ভাবৃত্তিপরায়ণ হইয়াছিল। ভ্রষ্টাচারী অর্থে অন্ন, যোনি এবং ব্যবসায়ের বিচারবিহীন অর্থাৎ যাহাদের আহার বিষয়ে, বিবাহ বিষয়ে এবং ব্যবসায় বিষয়ে কোন বাধা-বিচার নাই।

ব্রহ্মাবর্ত আর্য্য-সদাচারের আদর্শ স্থান ছিল। আর্য্যরাজ্যে শ্বেতবর্ণ ব্রাহ্মণ, রক্তবর্ণ ক্ষত্রিয়, শ্রামবর্ণ বৈশ্য এবং কৃষ্ণবর্ণ শূদ্রদিগের জন্য খাদ্য দ্রব্য, বিবাহ এবং ব্যবসায় বিষয়ে নির্দিষ্ট নিয়মাবলী ছিল। বেণু রাজার রাজত্বকালে এবং তৎপরে সেই চতুর্কর্ণ-সংমিশ্রণে কতকগুলি সঙ্কর জাতি উৎপন্ন হইয়াছিল। তাহাদের জন্যও অধিকাংশ স্থলে ব্যবসায় নির্দিষ্ট করা হইয়াছিল। পরজী-গমনে এবং পরধন-হরণে যেক্রপ দণ্ড হইত, তেমনি একজাতীয় লোক অন্য জাতির ব্যবসায় করিলে, আর্য্যরাজ্যে তাহার কঠিন দণ্ড হইত; সেই জন্য যে জাতির নিমিত্ত কোন ব্যবসায় ধার্য্য হয় নাই, তাহারা আর্য্যরাজ্যে জীবিকানির্ভার উপায় না পাইয়া স্থানান্তরে যাইতে বাধ্য হইত। আবার যে জাতির নির্দিষ্ট ব্যবসায় ছিল, সেই জাতির কোন ব্যক্তি, জাতিব্যবসায় দ্বারা জীবিকা চালাইতে না পারিলে অগত্যা স্থানান্তরে যাইত। এই কারণে বিদেহজাতি মিথিলায়, মগধজাতি মগধদেশে, উগ্রক্ষত্র জাতি রাঢ়দেশে এবং অশ্বিষ্ঠ জাতি বরেন্দ্রভূমিতে গিয়া বাস করিতে বাধ্য হইয়াছিল। * বাঙ্গালা দেশে অশ্বিষ্ঠেরা অধিকাংশই

* আধুনিক বাঙ্গালা পুস্তকে অশ্বিষ্ঠ শব্দ স্থলে অঘষ্ঠ লেখা হয়, তাহা অশুদ্ধ। (অধিকাংশই)

চিকিৎসা ব্যবসায় করিত। যাহারা অন্য ব্যবসায় করিত, তাহারাও চিকিৎসাকাৰ্য্য কতক জানিত। এজন্য বাঙ্গালা দেশে তাহারা বৈষ্ণ নামে খ্যাত হইয়াছিল। বাঙ্গালা দেশের বাহিরে বৈষ্ণ নামে কোন জাতি নাই। মগধদেশে অধিষ্ঠ জাতিকে ‘অধিষ্ঠ কায়ত’ বলে। হিন্দুস্থানে ইহাদিগকে ‘বৈষ্ ঠাকুর’ বলে। মহারাষ্ট্র দেশে এই জাতিকে ‘পরভূ জাতি’, এবং দ্রাবিড় দেশে ‘করণ জাতি’ বলে।

প্রাচীন কালে অনুলোম-বিবাহ প্রচলিত ছিল। ব্রাহ্মণের বিবাহিত-বৈষ্ণার গর্ভজাত সন্তানেরাই অধিষ্ঠ। ব্রাহ্মণ ও শূদ্রাজাত করণ জাতিও বোধ হয় অধিষ্ঠ সহ মিলিত হইয়াছে। করণ জাতি জারজ সন্তান নহে। কেন না ব্রাহ্মণের বৈষ্ণা বা শূদ্রা উপপত্নীর সন্তান কুত্রাপি অধিষ্ঠ বা করণ জাতি বলিয়া গণ্য হয় না। এই সঙ্কর জাতি বাঙ্গালা দেশে এবং দাক্ষিণাত্যে বৈষ্ণশ্রেণীভুক্ত, মগধদেশে কায়স্থশ্রেণীভুক্ত এবং হিন্দুস্থানে ক্ষত্রিয়শ্রেণীভুক্ত।

বৈষ্ণ ও কবিরাজ শব্দ পণ্ডিত এবং চিকিৎসক এই উভয় অর্থ-প্রতিপাদক। ইংরেজী ডক্টর ও আরবী হেকিম শব্দ ঠিক এই দুই অর্থ-বোধক। তজ্জন্তু অনুমান হয় যে, প্রাচীন কালে প্রধান প্রধান পণ্ডিতেরাই চিকিৎসাকাৰ্য্য করিতেন। প্রাচীনকালে চিকিৎসা-ব্যবসায় ব্রাহ্মণদের একচাটিয়া ছিল। অথচ কলিযুগে ইহা ব্রাহ্মণের পক্ষে নিষিদ্ধ হইয়াছে। তাহাতে অনুমান হয়, ব্রাহ্মণেরা এই ব্যবসায় অধিষ্ঠদিগকে ছাড়িয়া দিয়াছিলেন। কলিকালে কোন ব্রাহ্মণ লোভবশে পুনরায় সেই ব্যবসায় করিয়া অধিষ্ঠদিগের জীবিকানির্কাহে ব্যাঘাত না করে, এই উদ্দেশ্যে ব্রাহ্মণের পক্ষে তাহা নিষিদ্ধ হইয়াছে।

“শব্দকল্পদ্রুম” নামক অভিধানে “অম্বষ্ঠঃ জারজঃ বৈষ্ণঃ” বলিয়া যে লিখিত হইয়াছে, তাহা ভুল বলিয়া বোধ হয়। কেননা অম্বা+স্থা+ড=অম্বস্থ হয়। অম্বষ্ঠ শব্দটি ব্যাকরণশুদ্ধ নহে। আর জারজ শব্দ, বৈষ্ণ শব্দ এবং অম্বষ্ঠ শব্দ কদাচ তুল্যার্থক হইতে পারে না। “বিশ্বকোষ” অভিধানে পরভূ জাতি স্থলে “প্রভূ” শব্দ লিখিত হইয়াছে এবং তাহাদিগকে কায়স্থ বলিয়া লেখা হইয়াছে। তাহাও অশুদ্ধ। পরভূ শব্দের অর্থ পরবর্তী কালে উৎপন্ন জাতি অর্থাৎ আদিম

অধি+স্থা+ড=অধিষ্ঠ। হিন্দুস্থানী পণ্ডিতেরা অধিষ্ঠ লিখিয়া থাকেন, তাহাই ব্যাকরণসিদ্ধ। পাণিনি ব্যাকরণে বিশেষ সূত্র দ্বারা অম্বষ্ঠ শব্দ সাধিয়াছেন বটে কিন্তু পরবর্তী ব্যাকরণে তাহা গৃহীত হয় নাই।

চতুর্ভূজের পরে উৎপন্ন জাতি । ইহা “প্রভু” শব্দের অপভ্রংশ নহে । আর ব্রাহ্মণের ঔরসে মারাতী শূদ্রার গর্ভে এই জাতির উৎপত্তি । ইহাদিগকে কায়ের বলা যায় না । আমি যতদূর অনুসন্ধান করিয়াছি, তাহাতে জানিয়াছি যে, দাক্ষিণাত্যে কায়স্থ জাতি নাই । পরভু ও করণ জাতিগণকে অশিষ্ঠ জাতি-মধ্যে গণ্য করা যায় ।

বৈদ্যরাজত্ব ।

পাণ্ডুলনের পর সমস্ত বরেন্দ্রভূমি একটি রাজ্য ছিল না । গৌড়নগরের পালরাজ্যই সর্বাপেক্ষা বিস্তীর্ণ ছিল । উত্তর রাঢ়দেশও তাহারই অধীন ছিল । উত্তর দিকের দিনাজপুর অঞ্চলে আর একটি পালরাজ্য ছিল । পূর্বদিকে বগুড়া অঞ্চলে তৃতীয় পালরাজ্য ছিল । ফলতঃ বরেন্দ্রভূমিতে তিন চারিটি রাজ্য ছিল । মদনপাল গৌড়রাজ্যে পালবংশে শেষ রাজা । শূরসেন-নামক একজন বৈদ্য তাঁহার সেনাপতি ছিলেন । মদনপাল ভ্রষ্টা পত্নী কর্তৃক বিষপ্রয়োগে নিঃসন্তান অপহৃত হইলে, শূরসেন সেই রাণীকে ও তাহার উপপতিকে অগ্নিতে দগ্ধ করিয়া স্বয়ং রাজা হইয়াছিলেন । বৈদ্যজাতির মধ্যে তিনিই প্রথম রাজা ; এইজন্ত তিনি আদিশূর নামে বিখ্যাত হইয়াছিলেন । আদিশূর চতুর্দিকে নিজরাজ্য বিস্তার করিয়া অতিশয় পরাক্রান্ত হইয়াছিলেন । এইরূপে বৈদ্যরাজত্ব-কালেই শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণ ও কায়স্থদিগের বাঙ্গালাদেশে বাস আরম্ভ হয় । তাঁহাদের দ্বারাই বাঙ্গালা দেশের সর্বপ্রকার উন্নতি আরম্ভ হয় । ৯৪৪ শকাব্দের কয়েক বৎসর পূর্বে গৌড়ে বৈদ্যরাজত্ব স্থাপিত হইয়াছিল ।

আধুনিক কোন কোন ব্যক্তি অনুমান করেন যে, আদিশূর ও তৎপরবর্তী রাজগণ ক্ষত্রিয় ছিলেন । এই অনুমানের পোষক কোনই যুক্তি বা প্রমাণ নাই ; বরং যুক্তি প্রমাণাদি বাহ্য পাওয়া যায়, তাহা সমস্তই উক্ত প্রকার অনুমানের বিরুদ্ধ । শূরসেন (আদিশূর) হইতে নাথবসেন পর্য্যন্ত এগার জন রাজা প্রায় তিন শত বৎসর বাঙ্গালা দেশে রাজত্ব করিয়াছিলেন । যদি তাঁহারা ক্ষত্রিয় হইতেন, তবে তাঁহাদের জাতি কুটুম্ব অবশ্যই বাঙ্গালা দেশে থাকিত । কিন্তু তাদৃশ কোন ক্ষত্রিয় বাঙ্গালা দেশে বা কোন নিকটবর্তী স্থানে নাই এবং কখন ছিল বলিয়াও জানা যায় না । কোন শ্রেণীর হিন্দু রাজা স্বশ্রেণীর লোক ব্যতীত থাকিতে পারেন না । সুতরাং সেন রাজারা যে ক্ষত্রিয় ছিলেন না, ইহাই তাহার

অকাটা প্রমাণ । দ্বিতীয়তঃ—ক্ষত্রিয়দিগের কোথাও কোলিক “সেন” উপাধি নাই । তৃতীয়তঃ—রাষ্ট্রীয় ও বারেন্দ্র ব্রাহ্মণদিগের কুলশাস্ত্রে ইহাদিগকে বৈষ্ণ-জাতীয় বলিয়া উল্লেখ আছে । চতুর্থতঃ—বৈষ্ণদিগের মধ্যে লক্ষ্মণসেনের মতের বৈষ্ণ এবং বল্লালসেনের মতাবলম্বী বৈষ্ণ এখনও আছে । অতএব ইহারা যে বৈষ্ণজাতীয় ছিলেন, তদ্বিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই ।

বৈষ্ণ রাজাদের পুত্র-কন্যাসহ ক্ষত্রিয় রাজাদের পুত্র-কন্যার বিবাহে আদান প্রদান প্রচলিত ছিল । আদিশূর কান্যকুব্জের ক্ষত্রিয় রাজা চন্দ্রকেতুর কন্যা চন্দ্র-মুখীকে বিবাহ করিয়াছিলেন । এক সময়ে আদিশূরের রাজ্যমধ্যে অনাবৃষ্টি দুর্ভিক্ষ প্রভৃতি দ্ধিতি উপস্থিত হইল । রাণী কহিলেন—রাজার পাপে রাজ্য মধ্যে দ্ধিতি হয় । অতএব রাজার চান্দ্রায়ণ প্রায়শ্চিত্ত করা কর্তব্য । রাজমন্ত্রিগণ এবং রাজা নিজেও তাহাই কর্তব্য স্থর করিলেন । বাঙ্গালাদেশ বহুকাল বৌদ্ধ রাজার অধীন ছিল । বৌদ্ধদিগের প্রাধাত্তে হিন্দু ধর্ম্মের কিছু গ্লানি হইয়াছিল । সেই জন্য এদেশীয় ব্রাহ্ম-ণেরা কতক ভ্রষ্টাচারী হইয়াছিল । ধর্ম্মশাস্ত্রে ও সংস্কৃত ভাষায় তাহাদের বিজ্ঞতা কম ছিল । অথচ সেই সময়ে কান্যকুব্জ আধ্যধর্ম্মের এবং বিদ্যার আদর্শ স্থল ছিল । এদেশীয় ব্রাহ্মণেরা চান্দ্রায়ণ যজ্ঞ করাইতে অপারক হওয়ায় রাজা আদিশূর কান্যকুব্জ হইতে পঞ্চগোত্রীয় পাঁচজন সুগণ্ডিত আনিয়া তাঁহাদের দ্বারা যজ্ঞ সম্পাদন করিলেন । তাহাতেই তাঁহার রাজ্যের সমস্ত দুর্নিমিত্ত শাস্তি হইল । রাজা তদৃষ্টে ভক্তি-পূর্ব্বক শ্রোত্রিয়গণকে প্রচুর দক্ষিণা দিলেন এবং গো অশ্ব শকটাদি দান করিলেন । শ্রোত্রিয়েরা শাস্ত্রবিদ্যায় যেমন পারদর্শী ছিলেন, শস্ত্রবিদ্যায়ও সেইরূপ ছিলেন । তাঁহারা যেমন ধার্ম্মিক এবং পণ্ডিত ছিলেন, তেমনই বলবান্ বীর-পুরুষও ছিলেন । তাঁহারা দূরদেশে যাইতে শাস্ত্র এবং শস্ত্র উভয়ই সঙ্গে লইয়া যাইতেন । তাঁহারা শাপ দ্বারা এবং শর দ্বারা ছষ্ট দমন করিতে পারিতেন ।

শ্রোত্রিয়েরা প্রত্যেকে একজন ভূত্যসহ শাস্ত্র ও শস্ত্র লইয়া পদব্রজে গৌড়ে আসিয়াছিলেন । তথায় দক্ষিণা ও প্রতিগ্রহ প্রচুর পরিমাণে পাইয়া তাঁহারা অশ্ব আরোহণে স্বদেশে চলিলেন । তাঁহাদের ভূত্যগণ তাঁহাদের প্রাপ্তধন শকটে চাপাইয়া তত্পরি আরোহণে প্রভুর পশ্চাতে চলিল । তাঁহারা স্বদেশে পৌঁছিলে, তাঁহাদের প্রতিবেশিগণ তাঁহাদের ঐশ্বর্য্য দৃষ্টে ঈর্ষাপরবশ হইয়া কহিল, “কলৌ

বৈষ্ণব শূদ্রবৎ ; সুতরাং তোমরা শূদ্রের পোরোহিত্য করিয়া পতিত হইয়াছ। আমরা তোমাদের সহ আহার ব্যবহার করিব না।”

উক্ত পঞ্চ শ্রোত্রিয় রাজনিয়োগে গোড়ে গিয়াছিলেন। তাঁহারা প্রতিবেশী দ্বিজগণ কর্তৃক তিরস্কৃত হইয়া রাজার নিকট অভিযোগ করিলেন। রাজা চেষ্টা করিয়াও দলাদলি মিটাইতে পারিলেন না। তখন সেই পঞ্চ বিপ্র স্বদেশীয়দিগকে “যবন-লাঞ্ছিত হও” বলিয়া অভিসম্পাত করিলেন এবং নিজ নিজ পরিবার ও দাসদাসীগণ সহ নৌকাপথে পুনরায় গোড়ে প্রত্যাগমন করিলেন।

রাজা আদিশূর তাঁহাদিগকে পুনরায় দেখিয়া অতীব হৃষ্ট হইলেন এবং তাঁহাদিগকে নিজ রাজধানীতে বাস করিতে অনুৰোধ করিলেন। শ্রোত্রিয়গণ কহিলেন, “নগরবাসী ব্রাহ্মণেরা লোভী এবং পাপাচারী হয়। আমরা রাজধানীতে বাস করিব না। আমাদের গঙ্গাতীরে বাসস্থান প্রদান করুন।” রাজা তদনুসারে গঙ্গা ও মহানন্দা নদীর সংযোগস্থলে তাঁহাদের বাসস্থান করিয়া দিলেন এবং তাঁহাদের ভরণপোষণ জন্য প্রত্যেককে এক একখানি গ্রাম ব্রহ্মত্ব দিলেন। তাঁহাদের বাসস্থানের পার্শ্বেই তাঁহাদের ভৃত্য ও নৌকার মাগ্নীগণের বাড়ী হইল। কাজেই এখানে কনোজীয় লোকের একটি উপনিবেশ স্থাপিত হইল। উক্ত পণ্ডিতগণের আবাস হেতু ঐ স্থান ভট্টশালী গ্রাম নামে খ্যাত হইল। সন ৯৪৪ শকাব্দে ইংরেজী ১০২২ খৃষ্টাব্দে বাঙ্গালা দেশে শ্রোত্রিয়দিগের বাস হইল। ঠিক সেই বৎসরেই মহম্মদ গাজী গজনবী কর্তৃক কাছকুজ লাঞ্ছিত হইয়াছিল। শ্রোত্রিয়েরা বংশানুক্রমে একশত ছাব্বিশ বৎসর কাল সেই একমাত্র ভট্টশালী গ্রামে বাস করিয়াছিলেন। তাঁহাদের যতই বংশ বৃদ্ধি হইতেছিল, অমনি বৈষ্ণব রাজারা তাঁহাদিগকে নূতন নূতন ব্রহ্মত্ব দিতেছিলেন। কিন্তু শরীকী বিভাগে তাঁহাদের আবাসবাটী অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র হইল এবং তাঁহাদের নবলব্ধ ব্রহ্মত্ব বাসস্থান হইতে বহুদূরবর্তী হইয়া পড়িল। তাঁহারা সেই অনুবিধা তৎকালীন রাজা বল্লালসেনের নিকট বিজ্ঞাপন করিলেন।

এরূপ অনুমান হয় যে, শ্রোত্রিয়দিগের অনুচর শূদ্রগণ সেই একশত ছাব্বিশ বৎসর একমাত্র ভট্টশালী গ্রামে আবদ্ধ ছিল না। শ্রোত্রিয়েরা বিস্তীর্ণ ব্রহ্মত্ব পাইলে তাঁহাদের পরিচারকগণ তহশীলদার স্বরূপ হইয়াছিল। সেই তহশীলদারদের সম্ভানগণ মধ্যে অনেকে লেখা পড়া শিখিয়া নানা স্থানে গিয়া নানা ব্যবসায় ও

রাজকার্য্য করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন । কেননা আমরা দেখিতে পাই যে, রাজা বল্লালসেনের এবং বঙ্গাধিপতি রামপাল রায়ের কতিপয় কর্ম্মচারী কায়স্থ ছিল । আর বল্লালের সময়ে যখন শ্রেণীবিভাগ হইয়াছিল, তখন ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণবের মধ্যে কেবল বারেন্দ্র ও রাঢ়ী এই দুইটী মাত্র শ্রেণী হইয়াছিল ; কিন্তু কায়স্থদের মধ্যে তিন শ্রেণী দেখিয়া স্পষ্ট বোধ হয় যে, তাঁহারা বরেন্দ্রভূমি, রাঢ় ও বঙ্গ তিন বিভাগেই বিস্তৃত হইয়াছিলেন । আর ইহাও সহজেই অনুমান করা যায় যে, শ্রোত্রিয়দের বহু ভূত প্রয়োজনীয় ছিল না । তাঁহারা যাহাদিগকে নিজ চাকর না রাখিতেন, তাহাদের প্রতিপালনের কোনপ্রকার সুবিধার জ্ঞাতংকালীন রাজা ও প্রধান লোকদিগকে অনুরোধ করিতেন । সমস্ত লোক তাঁহাদের ভক্ত ছিল, এজ্জ্ঞ তাঁহাদের অনুরোধ কদাচ ব্যর্থ হইত না । এখানে ইহাও বলা উচিত যে, শ্রোত্রিয়েরা নিজে কোন চাকরী করিতেন না । কেহ কেহ আংশিক মত কোন কোন প্রধান রাজকার্য্য সময়ে সময়ে নির্বাহ করিতেন বটে, কিন্তু বেতনভোগী চাকরী করেন নাই ।

সেই একশত ছাব্বিশ বৎসর মধ্যে রাজা আদিশুর তৎশীয় লাউসেন (লবসেন), নবজসেন ও চন্দ্রসেনের রাজত্ব শেষ হইয়াছিল এবং চন্দ্রসেনের দৌহিত্র বল্লালসেনের রাজত্ব চলিতেছিল । লাউসেন ও নবজসেনের কোন বৃত্তান্ত জানা যায় না । কেবল অনুমান হয় যে, তাঁহারা পালবংশীয়দিগের রাজ্যের কতকাংশ অধিকার করিয়া নিজ নিজ রাজ্য বিস্তার করিয়াছিলেন । চন্দ্রসেনের পুত্র ছিল না । একমাত্র কন্যা প্রভাবতীকে তিনি বিজয়সেনের সহ বিবাহ দিয়াছিলেন । বিজয়সেন শিবভক্ত পরম তপস্বী ছিলেন । চন্দ্রসেন জামাতাকে কহিলেন, “বৎস ! যাহাকে ঈশ্বর ও জনসমাজ যে কার্য্যে নিয়োগ করিয়াছেন, সেই কার্য্য করাই তাহার পরম ধর্ম্ম । স্ববর্ম্ম ত্যাগ করিয়া পরধর্ম্ম অবলম্বন মহাপাপ । তুমি রাজকার্য্য কর এবং সেই কার্য্যে ধর্ম্মে মতি রাখিয়া চল । যোগী হইয়া স্বকার্য্য ত্যাগ করিলে পুণ্য না হইয়া পাপ হয় । ভগবান্ রামচন্দ্র ব্রাহ্মণ তপস্বীদিগকে ভক্তি করিতেন, কিন্তু শূদ্র তপস্বীর প্রাণদণ্ড করিয়াছিলেন । সকল লোক তপস্বী হইলে সংসার চলে না । তুমি সর্ব্বদা ঈশ্বর স্মরণ রাখ, সেটি ভাল ; কিন্তু নিজ ব্যবসায়িক কার্য্য করিতে অবহেলা করিও না । যদি কোন ভূত নিজ কর্তব্য কার্য্য না করিয়া কেবল প্রভুর মৌখিক প্রশংসা করিয়া সময় কর্ত্তন করে,

তবে কোন প্রভুই তাদৃশ ভৃত্যকে ভালবাসে না, বরং দণ্ডই দেয়। তেমনই তুমি ঈশ্বরের ভৃত্য। ঈশ্বর তাঁহার লক্ষ লক্ষ প্রজার ধন প্রাণ রক্ষার্থে তোমাকে শাসনকর্তা নিযুক্ত করিয়াছেন। তুমি সেই কার্য না করিয়া ধ্যান ধারণাতে সময় ক্ষেপণ করিলে, অপরাধী হইবে।” বিজয়সেন কহিলেন, “আমি রাজা বা রাজপুত্র হইয়া জন্মি নাই। আমি আপনকার জামাতা। আমি সম্পর্কে পুত্রতুল্য, কিন্তু আমি আপনকার উত্তরাধিকারী নহি। সুতরাং আমি রাজকার্য না করিলে, আমার কোন পাপ হইবে না। আপনকার ‘দৌহিত্র’ হইলে তাহাকে এই উপদেশ দিবেন। আমার বিষয়বাসনা নাই, আমি কোন বৈষয়িক কার্য করিব না।” রাজা ক্রুদ্ধ হইয়া কহিলেন, “তোমার বিষয়বাসনা নাই, কিন্তু ক্ষুধা তৃষ্ণা আছে। নিজ অন্ন-বস্ত্রের জন্ত চেষ্টা করা কর্তব্য। প্রতিপণ ব্যতীত যাহা কিছু গ্রহণ করা যায়, তাহাতেই অপহরণ হয়। তুমি যদি কোন মূল্য না দিয়া এবং কোন প্রত্যুপকার না করিয়া কাহারও নিকট অন্নবস্ত্র গ্রহণ কর, তবে তাহাও অপহরণ করা হয়।” বিজয় উগ্রভাবে কহিলেন, “আচ্ছা, আমি প্রতিজ্ঞা করিলাম যে, অগ্ৰাবধি আমি আর পরান্ন গ্রহণ করিব না, পরগৃহে বাস করিব না এবং পরপ্রদত্ত কোন বস্ত্র বা অগ্নি কোন বস্তু স্পর্শ করিব না।”

বিজয়সেন সন্ন্যাসিবেশে গঙ্গাতীরে কংসহট্টে (কানসাট) চলিলেন। শ্মশুর, শাশুড়ী বা অগ্নি কাহারও কোন অনুরোধ শুনিলেন না। প্রভাবতী তাঁহার পশ্চাতে চলিলেন। বিজয় জিজ্ঞাসা করিলেন, “তুমি কোথা যাও?” প্রভাবতী কহিলেন, “তুমি যেখানে যাও, আমিও সেখানে যাব; তুমি যে ভাবে থাক, আমিও সেই ভাবেই থাকিব।”

বিজয়। তুমি তত কষ্ট সহিতে পারিবে না।

প্রভা। যাহা তুমি সহ্য করিবে, তাহা আমিও সহিব। স্বামীই স্ত্রীলোকের একমাত্র ঈশ্বর। পত্নীর ইচ্ছাকাল পরকালের সুখ সমস্তই স্বামিসেবাতেই হয়। তুমি এখানে ছিলে তজ্জগুই আমি পিতৃ-গৃহে ছিলাম। তুমি আমাকে সঙ্গে লইয়া যাও, নতুবা প্রাণ বধ করিয়া যাও। আমি প্রাণ থাকিতে তোমাকে ছাড়িয়া থাকিতে পারিব না।

বিজয়। তবে তুমি বহুমূল্য অলঙ্কার ত্যাগ কর।

প্রভা তৎক্ষণাৎ শাঁখা খাড়ু ব্যতীত সমস্ত অলঙ্কার ত্যাগ করিয়া কহিলেন,

“আর কি করিব?” বিজয় হাশু করিয়া कहিলেন, “এখন বুঝিলাম তুমি আমার যথার্থ ধর্মপত্নী। তুমি আমার সঙ্গে চল।”

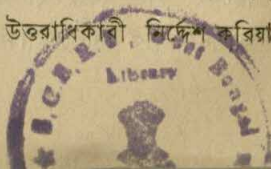
প্রভা “যে আজ্ঞা” বলিয়া স্বামীর পশ্চাতে চলিলেন। চতুর্দিকে সকলে ধন্যবাদ করিতে লাগিল। বিজয়সেন প্রভাবতীসহ কানসাটে গিয়া এক পর্ণকুটীর নির্মাণ করিয়া তাহাতে বাস করিতে লাগিলেন। বিজয় প্রত্যহ জঙ্গল হইতে ফল, মূল, কাষ্ঠ ও বৃক্ষপত্র আনিয়া বাজারে বিক্রয় করিতেন। তাহাতে যে মূল্য পাইতেন, তাহাই সাংসারিক ব্যয় জ্ঞাত পত্নীকে দিতেন। কিন্তু নিজে এক মুহূর্তও “শিব শিব বম্ বম্” শব্দ তাগ করিতেন না। প্রভাবতী দাসীর ছায় সমস্ত কার্য স্বহস্তে করিতেন এবং দিবানিশি “শিবজুর্গা” নান জপ করিতেন। রাজা ও রাণী গোপনে প্রভাবতীর আর্থিক সাহায্য করিতে চাহিলেন। প্রভাবতী कहিলেন, “আমি গোপনে প্রত্যহ সাহায্য লইলে তাহা কদাচ অপ্রকাশ থাকিবে না; বিশেষতঃ আমার স্বামী তপস্বী, তিনি দেবানুগ্রহে সমস্ত জানিতে পারিবেন। আপনারা যদি সাহায্য করিতে চাহেন, তবে আমার স্বামী যাহা বিক্রয় করেন, আপনারা অল্প লোক দ্বারা তাহাই কিছু বেশী মূল্যে ক্রয় করিবেন। ইহাতে আমার সাহায্য হইবে, অথচ কোন অপরাধ হইবে না।” রাজা রাণী এবং মন্ত্রী এই পরামর্শই সম্মত বোধ করিলেন। তাঁহারা বিজয়সেনের পণ্য যাহা পূর্বে পাঁচ ছয় বুড়ী কোড়ী মূল্যে বিক্রীত হইত, তাহাই এক কাহন মূল্যে ক্রয় করিতে লাগিলেন। বিজয়সেন তাদৃশ মূল্যবৃদ্ধির কারণ বুঝিলেন না। এইরূপে এক হাজার এক শত এগার দিন গত হইলে তাঁহার ভাগ্য প্রসন্ন হইল।

বঙ্গদেশের অধিপতি রামপাল রায় পরম শৈব ছিলেন। তিনি নিজের একমাত্র পুত্র যক্ষপালের গুরুতর অপরাধ হেতু প্রাণদণ্ড করিয়া ছিলেন। পৃথিবীতে রামপালের স্বর্গণ কেহই ছিল না। গঙ্গাতীরে কানসাট তখন তীর্থস্থান ছিল। রামপাল শর্তুধ্যানে অনশনে জীবন শেষ করিবার জ্ঞাত কানসাট আসিলেন। রাত্রিতে মহাদেব রামপালের নিকট আবির্ভূত হইয়া कहিলেন, “নৃপসত্তম! তোমার স্ত্রী, পুত্র ও বধূ সকলেই তোমার পুণ্যে কৈলাসে গিয়া তোমার প্রতীক্ষা করিতেছে। তুমি আমার পরম ভক্ত বিজয়সেন ও প্রভাবতীকে রাজ্য দান কর। পরশ্ব দিবস অর্দ্ধপ্রহর বেলায় তোমার উদ্ধার হইবে।” রাজা রামপাল রায় শৈবাদের মত বিজয়সেন ও প্রভাবতীকে নিজ উত্তরাধিকারী নির্দেশ করিয়া

LOKAY Woot Design

Date.....

5812 5912



ইহলোক ত্যাগ করিলেন। রাজমন্ত্রী দামোদর ঘোষ বিজয়সেনের কুটীরে উপস্থিত হইয়া তাঁহাদের দৈন্যাবস্থা দৃষ্টে তুচ্ছ বোধ করিয়াছিলেন। পরে তাঁহাদের অভিজাত্য ও ধর্মনিষ্ঠা জানিতে পারিয়া নূতন প্রভুকে ভক্তিপূর্বক সম্বর্দ্ধনা করিলেন। বিষয়বিরাগী বিজয়সেন প্রথমতঃ রাজ্যগ্রহণে সম্মত হইলেন না। পরে মহাদেবের আদেশে তিনি রাজ্য গ্রহণ করিলেন বটে, কিন্তু তিনি মধ্যাহ্নে আহাৰান্তে চারিদণ্ড মাত্র রাজকাৰ্য্য করিতেন। তিনি অবশিষ্ট সমস্ত সময় কেবল জপ তপে কাটাইতেন। রাজ্যী প্রভাবতী বুদ্ধিমতী ও বিদুষী ছিলেন। মন্ত্রী দামোদর অভিজ্ঞ বিচক্ষণ লোক ছিলেন। তাঁহারাই সমস্ত রাজকাৰ্য্য চালাইতেন। বিজয়সেনের পুণ্যবলে তাঁহার প্রজাগণ নীরোগ ও সুখী হইল।

বল্লালসেন।

ওষধিনাথ-নামক এক দক্ষিণী ব্রাহ্মণ একটা ক্ষত্রিয়জাতীয়া পত্নী লইয়া ত্রিবেণীতে গঙ্গাবাস করিতেছিলেন। তাঁহাদের সন্তান সামন্তসেন ব্রহ্মক্ষত্র। ক্ষত্রিয় ও বৈদ্যেরা ব্রহ্মক্ষত্রগণকে কুলীন জ্ঞান করিত। সামন্তসেন এক বৈদ্য সামন্তের কন্যা বিবাহ করিয়া বৈদ্যজাতিতে মিলিত হইয়াছিলেন। তাঁহার আহাৰ-ব্যবহার, পুত্র-কন্যার বিবাহ প্রভৃতি সমস্ত সামাজিক ক্রিয়া বোধ হয় বৈদ্যদের সহ হইয়াছিল। তাঁহার পুত্র হেমন্তসেনও বৈদ্যকন্যাই বিবাহ করিয়াছিলেন। হেমন্তের পুত্র বিজয়সেন গোড়াধিপতি চন্দ্রসেনের কন্যাকে বিবাহ করিয়াছিলেন। তাঁহারই পুত্র রাজাধিরাজ বল্লালসেন। অধুনিক অনেকে বল্লালসেনকে ব্রহ্মক্ষত্র বলেন। কিন্তু বল্লালচরিত-পাঠে জানা যায় যে, বল্লাল আপনাকে বৈদ্যজাতীয় বলিয়া পরিচয় দিতেন। সামন্তসেন ব্রহ্মক্ষত্র ছিলেন বটে, কিন্তু তিনি ও তাঁহার বংশধরেরা বৈদ্যসনাজে মিলিত হওয়ায় তাঁহাদিগকে বৈদ্যজাতীয় বলাই সম্ভব। প্রাচীন পণ্ডিতেরা সকলেই তাঁহাদিগকে বৈদ্য বলিয়া জ্ঞান করিতেন। কেহ বলেন যে, রাজা আদিশূরের বংশের পর এবং বিজয়সেনের পূর্বে বৈদ্যরাজত্ব লুপ্ত হইয়া মধ্যে কিছু দিন পালবংশের রাজত্ব হইয়াছিল; তাহা ভুল। আদিশূরের বংশের দৌহিত্রকূলে বল্লালের জন্ম হয়, ইহা বারেন্দ্রকুল-পঞ্জিকায় স্পষ্ট লেখা আছে। যৎকালে আদিশূরের বংশীয়েরা রাজত্ব করিতে-ছিলেন, সেই সময়ে স্থানে স্থানে পালউপাধিধারী রাজাও ছিল। তাহারাও আপনাদিগকে গোড়দেশাধিপতি বলিয়া পরিচয় দিতেন। তজ্জন্তই ঈদৃশ ভ্রম

হইতে পারে। প্রকৃত পক্ষে আদিশূর হইতে মুসলমান-অধিকার পর্য্যন্ত বৈষ্ণব-রাজত্ব ধারাবাহিক রূপে চলিয়াছিল, তাহার প্রচুর প্রমাণ পাওয়া যায়।

আধুনিক কেহ কেহ আদিশূরের বংশীয় প্রত্যেক ব্যক্তির নামেই ‘শূর’ শব্দ যোগ করেন। রাঢ়ী বারেন্দ্র কুলশাস্ত্রে একরূপ নাম নাই এবং বল্লালচরিতেও নাই। পূর্বে একরূপ নাম শুনা যায় নাই। অনুমান হয় যে, রাজা শূরসেনের যেমন আদিশূর উপাধি হইয়াছিল, সেইরূপ তাঁহার বংশীয় লাউসেন, নবজসেন প্রভৃতিরও ভূশূর, মৈতীশূর প্রভৃতি উপাধি হইয়া থাকিবে। উহা যে প্রকৃত নাম নহে, তাহা নিশ্চিত।

যে সময়ে বিজয়সেন বঙ্গদেশে রাজত্ব করিতেছিলেন, সেই সময়ে ১০৩৩ শকাদে রামপাল নগরে বল্লালসেনের জন্ম হয়। বল্লাল, বিজয়সেনের ঔরস পুত্র নহেন। শৈব বরে বল্লালের জন্ম হওয়াতে বিজয়সেন পুত্রের নাম “বল্লাল” রাখিয়াছিলেন। বল্লাল শব্দ তাহারই অপভ্রংশ। বল্লাল দীর্ঘকায়, বলবান, বুদ্ধিমান, মেধাবী এবং সর্বস্বলক্ষণযুক্ত পরমসুন্দরাকৃতি ছিলেন। তিনি চতুর্দশ বর্ষ বয়সেই শস্ত্রবিদ্যায় এবং শাস্ত্রবিদ্যায় পারদর্শী হইয়াছিলেন। তাঁহার শ্রায় মিষ্টভাষী এবং শিষ্টাচারী কেহ ছিল না।

বল্লালের চৌদ্দ বৎসর বয়সের সময় তাঁহার মাতামহ সাংঘাতিক পীড়িত হইয়া তাঁহাকে নিকটে আহ্বান করিলেন। বল্লাল ও প্রভাবতী বিজয়সেনের তদ্বিষয়ে অনুমতি প্রার্থনা করিলেন। বিজয় কহিলেন, “আমি স্বপ্তের কোনরূপ সাহায্য লইব না বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছি বটে, কিন্তু তাহাতে তোমাদের কোন বাধা নাই। তোমরা তাঁহার সন্তান। তাঁহার আসন্ন সময়ে তাঁহার সেবা করা তোমাদের লোকতঃ ধর্ম্মতঃ একান্ত কর্তব্য কর্ম্ম। আমি স্বচ্ছন্দচিত্তে অনুমতি দিতেছি যে, তোমরা তাঁহার নিকট গিয়া শুশ্রূষায় রত হও।” প্রভাবতী পুত্রসহ গৌড়ে গিয়া পিতার চরণ ধরিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন। রাজা চন্দ্রসেন হাস্য করিয়া কহিলেন, “তোমার কোন দোষ নাই, ক্ষমা কি করিব? তুমি যে পিতৃ-গৃহ ত্যাগ করিয়া স্বামীর অনুসরণ করিয়াছিলে, তাহা উত্তম। তুমি যে সর্বস্বত্ব ত্যাগ করিয়া দাসীর শ্রায় দরিদ্র স্বামীর সেবা করিয়াছ, তাহা শ্লাঘ্য। তোমার রাজ্যলাভ ও সুসন্তানলাভ আমি পরম লাভ জ্ঞান করি। আর বিজয় যে তোমাদিগকে এখানে আসিতে সম্মতি দিয়াছে, তাহাতে আমি তুষ্ট হইলাম।

তোমার পুত্রই আমার একমাত্র উত্তরাধিকারী। আমি তাহাকে রাজ্য দিয়া অচিরে গঙ্গাযাত্রা করিব।” বল্লালকে সিংহাসনে অভিষিক্ত করিয়া রাজা চন্দ্রসেন কানসাটে গমন করিলেন। বল্লাল ও প্রভাবতী তাঁহার সঙ্গে গেলেন। বিজয়সেনও তথায় আসিয়া শ্বশুরের সেবা করিতেন, কিন্তু কদাচ শ্বশুরগৃহে জলগ্রহণ করিতেন না। চন্দ্রসেনের মৃত্যু হইলে তৎপত্নী স্বামীর চিতায় সহ-মৃতা হইলেন। বল্লাল দুই বৎসর গোড়ে রাজত্ব করার পর তাঁহার ষোড়শ বর্ষ উত্তীর্ণ হইল দেখিয়া বিজয়সেন বল্লালের বিবাহ দিয়া বঙ্গরাজ্যেও তাঁহাকে রাজা করিলেন এবং নিজে সন্ন্যাসী হইয়া তীর্থযাত্রা করিলেন। এই তীর্থযাত্রা হইতে তিনি আর প্রত্যাগমন করেন নাই। সেতুবন্ধ রামেশ্বরে তাঁহার মৃত্যু হইয়াছিল বলিয়া প্রবাদ আছে।

এইরূপে বল্লাল মাতামহের এবং পিতার উত্তরাধিকারিস্বত্বে গোড় ও বঙ্গ দুইটি রাজ্য প্রাপ্ত হইয়া অতিশয় পরাক্রান্ত হইয়াছিলেন। তিনিই সমস্ত বরেন্দ্র-ভূমি, রাঢ়, বঙ্গ, বগ্দি, মিথিলা জয় করিয়া সম্পূর্ণ স্বায়ত্ত করিয়াছিলেন, এবং পালরাজবংশ সহ বৌদ্ধ রাজত্বের শেষ চিহ্ন* পর্যন্ত নিঃশেষ করিয়া বাঙ্গালাদেশে সনাতন ধর্ম সম্পূর্ণরূপে পুনঃ স্থাপন করিয়াছিলেন। তদ্বিন্ন আরও সাতটি দেশের রাজগণ তাঁহার অধীনতা স্বীকার করিয়া তাঁহাকে অনুকর দিতেন। বল্লাল দ্বাদশ রাজ্যের অধিপতি হইয়া বিশ্বজিৎ যজ্ঞ করিলেন, এবং সার্কর্ভৌম সম্রাট উপাধি ধারণ করিলেন। এই উপলক্ষে তিনি শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণদিগের প্রত্যেককে এক এক সুবর্ণগাভী ও অগ্ন্যাত্ত দ্রব্যাদি দান করিয়াছিলেন। প্রত্যেক সুবর্ণ গাভী ওজনে একশত আট তোলা ছিল।

ভট্টশালীগ্রাম-নিবাসী শ্রোত্রিয়দিগের সংখ্যা অতিমাত্র বৃদ্ধি হইয়াছিল, তজ্জন্ত তাঁহাদের একই গ্রামে বাস করা অসম্ভব হইয়াছিল। তাঁহারা সেই অসুবিধা সম্রাটের নিকট বিজ্ঞাপন করিলে, বল্লাল তাঁহাদের মধ্যে কতকগুলিকে নিজ প্রকাণ্ড রাজ্যের নানা স্থানে প্রেরণ করিয়া তথায় তাঁহাদের ভরণ-পোষণের

*বৌদ্ধদের বহু মঠ ও সংঘারাম ছিল। সংঘারাম শব্দটি সংস্কৃত সংগ্রহস্থ শব্দের অপভ্রংশ। ইহাতে বৌদ্ধ সন্ন্যাসীরা একত্র বাস করিতেন। বল্লাল সেই মঠ ও সংঘারামগুলি দেবালয়রূপে পরিণত করিয়াছিলেন।

যোগ্য ব্রহ্মত্র দিয়াছিলেন । আর একশত ছাপান্ন ঘর শ্রোত্রিয়গণকে নিজ রাজ-
ধানীর নিকটেই রাখিয়া এক এক বরকে এক এক বিভিন্ন গ্রামে বাসস্থান দিয়া
সেই সেই গ্রামেই তাঁহাদের ব্রহ্মত্র দিয়াছিলেন । ইহাদের মধ্যে একশত ঘর
গঙ্গার বাম পারে বারেন্দ্রভূমিতে বাসস্থান পাইয়া বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ নামে খ্যাত
হইয়াছিলেন । আর ছাপান্ন ঘর গঙ্গার অপর পারে রাঢ় দেশে ব্রহ্মত্র পাইয়া
তথায় বাস করার রাঢ়ী ব্রাহ্মণ আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন । আর •সেই সময়ে
যিনি যে গ্রামে বাস করিয়াছিলেন, তদ্বংশীয়েরা সেই গাঁই বলিয়া পারচিত হইয়া-
ছিলেন । ইহাই রাঢ়ী ও বারেন্দ্র বিভাগের প্রকৃত কারণ । ইদানীন্তন অনেকে
শ্রোত্রিয়দের রাঢ়ী ও বারেন্দ্র বিভাগের অত্যন্ত নানারূপ কারণ বলিয়া থাকেন, কিন্তু
তাহার একটিও যুক্তিসঙ্গত হয় না । যে পঞ্চ ব্রাহ্মণ প্রথম গোড়ে আগমন করেন,
তাঁহাদের নাম বারেন্দ্র মতে নারায়ণ, সূৰ্য্য, কশ্যপ, ধরাবর ও গৌতম । কিন্তু
রাঢ়ীয় মতে তাঁহাদের নাম (ভট্ট) নারায়ণ, দক্ষ, শ্রীহর্ষ, বেদগর্ভ ও ছান্দড় ।
এইরূপ নামের ভিন্নতা দৃষ্টেই বোধ হয় তাঁহাদের ভিন্নতা কল্পিত হইয়াছে । প্রকৃত
পক্ষে উক্ত নামেরই ভিন্নতা, ব্যক্তির ভিন্নতা নহে । ঘটনা যখন ঠিক একই
প্রকার, তখন নামের ভিন্নতা দৃষ্টে ব্যক্তির ভিন্নতা হইতে পারে না । ব্রাহ্মণ
মাত্র সকলেরই দুইটি করিয়া নাম থাকে । একটি প্রকাশ ডাকিবার নাম, আর
একটি সঙ্কল্পের নাম । প্রকাশ নাম কখন বিশুদ্ধ সংস্কৃত শব্দ হয়, কখন বা
পাঁচকড়ি, বেচারাম, ককীরচাঁদ প্রভৃতি অসংস্কৃত শব্দও হয় । কিন্তু সঙ্কল্পের
নামগুলি সর্বত্রই বিশুদ্ধ সংস্কৃত শব্দ । ছান্দড় শব্দটি বিশুদ্ধ সংস্কৃত শব্দ নহে ।
তদৃষ্টে অনুমান হয় যে, রাঢ়ীর কুলশাস্ত্রে উক্ত পঞ্চ ব্রাহ্মণের প্রকাশ নাম গৃহীত
হইয়াছে, আর বারেন্দ্র কুলশাস্ত্রে তাঁহাদের সঙ্কল্পের নাম গৃহীত হইয়াছে । রাঢ়ী
বারেন্দ্র বিভাগ যে কেবল ব্রাহ্মণের মধ্যে আছে, তাহা নহে । বৈষ্ণব, কায়স্থ এবং
অধিকাংশ অপর জাতির মধ্যেও আছে । বঙ্গরাজ, রামপাল কর্তৃক বহুসংখ্যক
কায়স্থ পূর্ববঙ্গে স্থাপিত হওয়ার কায়স্থদিগের মধ্যে রাঢ়ী, বারেন্দ্র এবং বঙ্গজ,
এই তিন শ্রেণী হইয়াছিল । পরে আবার কায়স্থদের মধ্যে উত্তররাঢ়ী ও দক্ষিণ-
রাঢ়ী বিভাগ হওয়ার কায়স্থের চারি শ্রেণী হইয়াছে । এই সকল শ্রেণী ও গাঁই
বিভাগ যে কেবল বাসস্থানের নাম অনুসারে হইয়াছে, তাহা সন্দেহ
নাই । কিন্তু পরবর্ত্তী কালে লোকের বাসস্থান যত কেন পরিবর্তিত হউক না,

তজ্জন্ত তাহাদের শ্রেণী বা গাঁই পরিবর্তন হয় নাই।

যত দিন শ্রোত্রিয়েরা সকলেই একমাত্র ভট্টশালী গ্রামে বাস করিয়াছিলেন, ততদিন তাঁহারা আপনাদিগকে বাঙ্গালী বলিয়া জ্ঞান করিতেন না। তাঁহারা কনোজের ভাষা, পরিচ্ছদ, আচার, ব্যবহার সমস্তই আপনাদের মধ্যে ঠিক রাখিয়াছিলেন। বাঙ্গালী লোকেও তাঁহাদিগকে পশ্চিমা ঠাকুর বলিত। পরে যখন তাঁহারা এক এক ঘর এক এক বিভিন্ন গ্রামে গিয়া বাস করিলেন, তখন সমস্ত বাঙ্গালীর মধ্যে এক ঘর পশ্চিমা ঠাকুর পূর্ববৎ পার্থক্য রক্ষা করিতে পারিলেন না। কোন কোন বিষয়ে বাঙ্গালী লোকে তাঁহাদের অনুকরণ করিল, আবার কোন কোন বিষয়ে তাঁহারা বাঙ্গালীর অনুকরণ করিলেন; ফলতঃ তদবধি তাঁহারা ক্রমে ক্রমে বাঙ্গালী হইলেন।

সভ্য জাতির মধ্যে সম্মান অতীব আদরণীয় পদার্থ। সম্মানলাভার্থে অথবা সম্মানরক্ষার্থে লোকে বহু কষ্ট স্বীকার করিতে পারে; এমন কি ধন, প্রাণ সর্বস্ব দিতে পারে। সম্মানলাভার্থে সমস্ত প্রজা সংপথে চলিবে, এই উদ্দেশ্যে বঙ্গালসেন কোলীন্ড মর্যাদা সৃষ্টি করিয়াছিলেন। শ্রোত্রিয়গণ মধ্যে যাঁহারা নবগুণবিশিষ্ট* ছিলেন, বঙ্গাল তাঁহাদিগকে কুলীন উপাধি দিয়াছিলেন। আর যাঁহারা অনূন ছয়টি গুণবিশিষ্ট, তাঁহারা সিদ্ধ শ্রোত্রিয়; অবশিষ্ট সমস্তই কষ্ট শ্রোত্রিয় হইয়াছিলেন। বৈজ্ঞানিকের মধ্যে যাঁহারা ধার্মিক ও গুণবান্ সত্রাট্ তাহাদিগকেই কুলীন করিলেন। কায়স্থদিগের মধ্যে যাঁহারা শ্রোত্রিয়দের পরিচারক-সন্তান, বঙ্গাল তাহাদিগকেই কুলীন উপাধি দিতে অনন্ত করিয়াছিলেন। পূর্বেই উক্ত হইয়াছে যে, শ্রোত্রিয়দের পরিচারক শূদ্রেরা অনেকে অবস্থা উন্নত করিয়াছিল। তন্মধ্যে দত্ত-গোষ্ঠীরদের অবস্থাই বোধ হয় সর্বাপেক্ষা ভাল হইয়াছিল। তাহারা আপনাদিগকে পরিচারক-সন্তান বলিয়া পরিচয় দিতে লজ্জা বোধ করিয়া আনুযাত্ৰিক বলিয়া পরিচয় দিল। কিন্তু ঘোষ, বসু, গুহ ও মিত্র-বংশীয় পরিচারক-সন্তানদের সাক্ষ্য দ্বারা দত্ত-গোষ্ঠীর পরিচারকত্ব প্রমাণ হওয়ায় সত্রাট্ তাহাদিগকে মিথ্যাবাদী বলিয়া অকুলীন করিলেন। তজ্জন্ত ঘোষ, বসু, গুহ ও মিত্রগোষ্ঠী কায়স্থদের মধ্যে কুলীন হইল; আর দত্তগোষ্ঠী এবং অপর অনুচর-

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯

* আচার্যে বিনয়ো বিদ্যা প্রতিষ্ঠা তীর্থদর্শনং। নিষ্ঠা শাস্তি স্তম্ভো দানং নবধা কুললক্ষণং ॥

সন্তানগণ সকলেই অকুলীন হইল । * ইহারা ই এক্ষণে মৌলিক কায়স্থ নামে খ্যাত । তিনি, তাঁতি, কামার, কুমার প্রভৃতি সংশূদ্রদের গুণ ও সঙ্গতি দেখিয়া তাহাদের শ্রেষ্ঠ লোকদিগকে বল্লাল কুলীন করিয়াছিলেন । কিন্তু তাহাদিগকে তিনি কুলীন উপাধি দেন নাই । তাহাদের কুলীনেরা মানী বা পরামাণিক নামে খ্যাত । অবশিষ্ট অপশূদ্রদের বল্লালী মর্যাদা হয় নাই । বল্লাল সেই সকল মর্যাদা পুরুষানুক্রমিক করেন নাই । তিনি নিয়ম করিয়াছিলেন যে, প্রত্যেক ছত্রিশ বৎসর অন্তে এক এক বার বাছনি হইবে, এবং তাহাতে গুণ ও কর্ম দৃষ্টে পুনরায় কুলীন ও অকুলীন নির্বাচিত হইবে । সুতরাং কুলমর্যাদা লাভার্থে সকলেই ধার্মিক এবং গুণবান হইতে চেষ্টা করিবে । বল্লালের সেই আশা প্রথম প্রথম কতক সফলও হইয়াছিল । কিন্তু লক্ষ্মণসেনকৃত ব্যবস্থায় সেই কৌলীয়া প্রথা যে কুফল হইয়াছিল, তাহা পরে বর্ণিত হইবে ।

অতি প্রাচীন বড় লোকদের যেমন সর্বত্রই একই চরিত্র দেখা যায়, কলিযুগে বড় লোকদের চরিত্র তদ্রূপ নহে । তাঁহারা বহুরূপীর ছায় অবস্থানুসারে বিভিন্ন চরিত্র ধারণ করিতেন । বল্লালও সেইরূপ ছিলেন । তিনি গুরুজনের নিকট পরম ভক্ত, পিতামাতার নিকট আদরের ছেলে, যজ্ঞস্থলে পরম ধার্মিক ও দাতা, সভা মধ্যে পণ্ডিত, যুদ্ধস্থলে মহাবীর, শত্রুদমনে চতুর প্রবঞ্চক এবং উপপন্ন-আগারে লম্পট মাতাল ছিলেন । পণ্ডিতেরা “বল্লালো নৃপসন্তমঃ” বলিয়া তাঁহার প্রশংসা করিতেন, এবং প্রজা ও ভূত্যগণ “নৃপেষু বল্লালঃ শ্রেষ্ঠঃ” বলিয়া তাঁহাকে অভিবাদন করিত । তিনি ৪২ বৎসর কাল সর্বজন-প্রশংসনীয়রূপে রাজত্ব করিয়াছিলেন । যদি শেষ পর্য্যন্ত সেই ভাব চলিত, তবে বল্লাল একজন দেবাবতার বলিয়া গণ্য হইতে পারিতেন । কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে এমন দুইটি ঘটনা ঘটিল, যাহার জন্ত সেই বল্লাল সর্বজননিন্দিত হইয়া শেষ জীবন অতিবাহিত করিলেন ।

এখন যেমন বৈষ্ণব ও কায়স্থ জাতি মধ্যে জিগীষা ভাব চলিতেছে, পূর্বে বৈষ্ণব ও বৈষ্ণব মধ্যে তদ্বৎ জিগীষা ছিল । বাঙ্গালা দেশের বৈষ্ণবরা স্ববর্ণবণিক,

* রাজা রামপাল প্রভৃতি যে সকল উন্নত অবস্থাপন্ন শূদ্র, কায়স্থ জাতিতে মিলিত হইয়াছিলেন, তাঁহারাও অকুলীন । কৃত্রিম কায়স্থ অনেক হইয়াছে, কিন্তু তাঁহারা কেহই কুলীন হইতে পারে নাই ।

স্বর্ণকার, গন্ধবণিক এবং শজাবণিক এই চারি শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল। তন্মধ্যে সুবর্ণবণিকেরাই সর্বাপেক্ষা ধনী ও প্রবল ছিল। বল্লভানন্দ শেঠ (শ্রেষ্ঠী) তাহাদের নেতা ছিলেন। তাঁহার ঘোল কোটি টাকার সম্বল ছিল। বান্দালা দেশে বৈষ্ণেবাও বৈষ্ণুশ্রেণীতেই গণ্য ছিল। বৈদোরা রাজপদ লাভ করিলে অগ্রাণ্ড বৈষ্ণেবা তাহাদের সহ স্পষ্ট কোন বিবাদ করিত না। কিন্তু সুবর্ণবণিকেরা বৈষ্ণুদিগকে ভয় না করিয়া, তাহাদের সহ জেদ বাদ করিয়া চলিত। তাহাদিগকে অপদস্থ করিতে বৈষ্ণু রাজাদের ইচ্ছা প্রবল ছিল। কিন্তু সুযোগ অভাবে কিছুই করিতে পারেন নাই। বল্লালের সময়ে সেই বিষয়ে একটি সুযোগ উপস্থিত হইল।

কুন্দন আচার্য্য নামক এক ব্রাহ্মণের বাড়ীতে অর্দ্ধরাত্র-কালে এক ব্রাহ্মণ অতিথি উপস্থিত লইল। কুন্দন বাড়ীতে ছিলেন না। তাঁহার পত্নীর হাতে কোন রোকড় টাকা কড়ী ছিল না। এত রাত্রিতে ধারে কোন দ্রব্য পাওয়া যায় না। অথচ অতিথিসেবা না করিলেও অবশ্য হয়। দ্বিজপত্নী এই সম্বন্ধে পড়িয়া রাজদত্ত সুবর্ণ দেখু গচ্ছিত রাখিয়া মণিদত্ত নামক সুবর্ণবণিকের দোকান হইতে পঞ্চ বুটকা (এক পরস) মূল্যের দ্রব্য আনিয়া অতিথির ভোজন করাইলেন। পরদিন কুন্দন গৃহে আসিয়া পত্নীর নিকট বৃত্তান্ত শুনিলেন এবং মণিদত্তের নিকটে গিয়া দ্রব্যমূল্য লইয়া স্বর্ণগাভী প্রত্যর্পণ করিতে বলিলেন।

মণিদত্ত দেখিল, সুবর্ণগাভীর মূল্য ঘোল শত টাকা এবং নিজ প্রাপ্য কেবল এক পরস মাত্র। সে তুলোভের বশীভূত হইয়া সমস্ত ঘটনাই অস্বীকার করিল। কুন্দন নগরপালকে সংবাদ দিলেন। এদিকে মণিদত্ত সুবর্ণগাভী ভাঙ্গিয়া একটি ঢেঁপা তৈয়ারী করিল। নগরপাল সেই ঢেঁপার ওজন ঠিক ১০৮ তোলা দেখিয়া সন্দিহান হইল এবং ঢেঁপা সহ বণিককে বিচারার্থ চালান করিল। বল্লাল স্বয়ং সেই মকদ্দমায় বিচার করিতে বসিলেন। এই উপলক্ষে সমস্ত সুবর্ণবণিকদিগকে পাতিত করা তাঁহার মনস্থ ছিল। মণিদত্ত বল্লভানন্দের ভাগিনেয়, সম্রাট তাহা জানিতেন। এজন্ত তিনি বল্লভানন্দ শেঠকে ডাকিয়া ঐ সোণার গোলাতে অণ্ড কিছু মিশ্রিত আছে কি না তদ্বিষয়ে প্রশ্ন করিলেন। বল্লভ ভাগিনার স্নেহে মিথ্যা বলিলেন। বল্লাল তখন অগ্রাণ্ড সুবর্ণবণিকদিগকে ডাকিয়া একে একে জিজ্ঞাসা করিলেন, তাহারা সকলেই তাহাদের দলপতি বল্লভানন্দের উক্তি সমর্থন করিল।

তাহার পর বল্লাল গন্ধবণিক ও শঙ্খবণিকদের মতামত জিজ্ঞাসা করিলেন। তাহারা কহিল, “আমরা সুবর্ণপরীক্ষায় সুপটু নহি, মহারাজ, স্বর্ণকারদিগকে জিজ্ঞাসা করুন।” সম্রাট স্বর্ণকারদিগকে তলপ করিলেন। বল্লালভানন্দ নিজ অখ্যাবাক্য ধরা পড়িবে বুঝিয়া উৎকোচ দ্বারা স্বর্ণকারদিগকে বশীভূত করিলেন। তাহারাও শেঠের উল্লিই পোষণ করিল। কুন্দন সেই স্বর্ণ-গোলা নিজ স্বর্ণ-গাভীর বিকৃতি বলিয়া জিদ করিতে লাগিলেন। বল্লাল কাশীধাম হইতে স্বর্ণকার আনিলেন। তাহাদিগকে এক্ষণে সাবধানে পরিবেষ্টিত রাখিলেন যে, তাহাদের সহ কেহ কোন ঘুষের চুক্তি করিতে পারিল না। সেই স্বর্ণকারেরা অষ্টধাতু ও অলঙ্কার-মিশ্রিত স্বর্ণ উক্ত ঢেঁপাতে প্রমাণ করিল। বল্লাল সেই বিদেশীয় স্বর্ণকারদিগকে পুরস্কার দিয়া বিদায় করিলেন। সোণার ঢেঁপা এবং ক্ষতি পূরণ দিয়া কুন্দন আচার্য্যকে বিদায় দিলেন। তাহার পর স্বর্ণকার ও সুবর্ণবণিকদিগকে পাতিত করিয়া কহিলেন, “অদ্যাবধি এই সুবর্ণকীটেরা বিষ্ঠার কুমি অপেক্ষাও অপকৃষ্ট গণ্য হইবে।” তাহাদের সমস্ত সম্পত্তি নিঃসংশয় অর্থাৎ জব্দ হইল। তিনি তাহাদের মস্তক মুণ্ডন করাইয়া বগ্দির দক্ষিণাংশে নির্বাসিত করিলেন। তাহারা ই এখন ‘সোণার বানিয়া’ এবং ‘শ্রাকরা’ নামে পরিচিত।

বাঙ্গালাদেশের আভ্যন্তরিক ইতিহাসে এই ঘটনা অতি গুরুতর। তাহার ফলাফল এখনও বাঙ্গালাদেশে বিদ্যমান আছে। স্বর্ণবণিক ও স্বর্ণকারদের পতনে দেশের অবস্থা অনেক পরিবর্তিত হইয়াছিল।

বল্লালের মাসিক লক্ষ নিক্ক আয় ছিল। দশ টাকা মূল্যের স্বর্ণ-মুদ্রার নাম নিক্ক।* সুতরাং বল্লালের প্রকাণ্ড সাম্রাজ্যের বার্ষিক আয় মোট এক কোটি বিংশতি লক্ষ টাকা ছিল। তৎকালে সমস্ত দ্রব্যের মূল্য কম ছিল। সুতরাং তখন এই আয় অসাধারণ বলিয়া গণ্য ছিল। তথাপি তাহাতে বল্লালের ব্যয় সঙ্কুলন হইত না। তাহার সদস্য ব্যয় অত্যন্ত বেশি ছিল। তিনি সর্বদাই ঋণগ্রস্ত ছিলেন। সুবর্ণবণিক ও স্বর্ণকারদের সমস্ত ধন জব্দ হওয়ায় বল্লালের দারিদ্র্য মোচন হইল। যে ধন কয়েক জন বণিকের নিজস্ব ছিল, বল্লালের দান-শীলতায় সেই ধন সমস্ত সাম্রাজ্যে বিস্তৃত হইল। তাহার রাজ্যে দরিদ্র কেহই

* তখন এক তোলা স্বর্ণের মূল্য ১৬ টাকা ছিল। এখন স্বর্ণের মূল্য বৃদ্ধি হইয়া এক তোলা দাম ২৫ টাকা হইয়াছে। সুতরাং এখন এক নিক্কের মূল্য ১৫৯০ আনা।

থাকিল না। কোন ব্যক্তির প্রচুর আয় সম্বন্ধেও সর্বদা অনাটন থাকিলে তাহার দারিদ্র্যকে লোকে এখনও “বল্লালী দারিদ্র্য” বলে। ইদানীং মুর্শিদাবাদের নবাবেরও ঠিক বল্লালের ছায় দরিদ্র অবস্থা হওয়ায় ঈদৃশ দারিদ্র্যকে “নবাবী দারিদ্র্যও” বলা হয়।

সুবর্ণবর্ণিকদের পতনে বর্ণিকের সংখ্যা কম হওয়ায় গুঁড়ী ও তিলী জাতীয় কতকগুলি লোক সম্রাটের অনুমতি লইয়া দোকানদারী ও মহাজনী ব্যবসায় আরম্ভ করিল। সংস্কৃত ভাষায় বর্ণিকদিগকে “সাবু” বলে। ব্রজভাষায় তাহার অপভ্রংশে “সাহু” বলে। বাঙ্গালা ভাষায় আবার “সাহু” শব্দের স্থানে “সাই” বলে। সো, সাহা এবং সা শব্দ সেই সাউ শব্দ হইতে উৎপন্ন। বাণিজ্য-ব্যবসায়ী গুঁড়ী ও তিলীদের সেই “সাহা” উপাধি হইয়াছে বটে, কিন্তু সামাজিক কার্যে তাহারা পূর্ববৎ গুঁড়ী ও তিলী বলিয়াই গণ্য হইতেছে।

স্বর্ণকারদিগের পতনে লৌহকারেরাই কতকটি স্বর্ণকারের ব্যবসায় আরম্ভ করিয়াছিল। তজ্জন্য স্বর্ণকার ও লৌহকার উপাধি লুপ্ত হইয়া উভয় ব্যবসায়ীদিগেরই “কর্ণকার” উপাধি হইয়াছে। বাঙ্গালা ভিন্ন অন্য কোত্রাপি “কর্ণকার” উপাধি কোন জাতির নাই। অন্যত্র সোনার এবং লোহার উপাধি চলিত আছে।

বল্লভানন্দ শেঠের কন্যা পদ্মিনী বল্লালকে প্রতিফল দিবার জন্ত ছদ্মবেশে বল্লালের প্রনোদকাননে উপস্থিত হইল। সম্রাট মত্ত অবস্থায় তাহাকে বকুল বৃক্ষের ছায়ায় দেখিতে পাইলেন। পদ্মিনীকে পরম সুন্দরী যুবতী দেখিয়া বিমোহিত বল্লাল তাহাকে নিজ উপপত্নী কারলেন। সুন্দরী নিজ পরিচয় না দিয়া কেবল মাত্র বাবল “আমি ব্রাহ্মণী নাই”। সম্রাট্ অল্পদিন মধ্যেই পদ্মিনীর বশীভূত হইলেন। তিনি তাহার উচ্ছিষ্ট সূরা পান করিলেন; তিনি তাহার বাধ্য হইয়া সন্ধ্যা পূজা ত্যাগ করিলেন এবং স্বীয় উপবীত পদ্মিনীর চরণে সমর্পণ করিলেন। তখন পদ্মিনী আপনাকে হাড়িকা বলিয়া পরিচয় দিল।

বল্লালের স্ত্রী পুত্র গুরু পুরোহিত এবং অমাত্য ভৃত্যগণ বারংবার তাহাকে হাড়িকা ত্যাগের জন্ত অনুরোধ করিল। তিনি হান্ত্রমুখে কহিলেন, “আমি কাহাকেও ত্যাগ করিতে জানি না, সুতরাং আমি তাহা পারিব না। আমি কখন কাহাকেও কটু নিষ্ঠুর বাক্য বলি নাই, এবং বলিতে পারিব না।

আমি কাহাকেও প্রতিপালন করিতে অস্বীকার করি নাই, এবং তাহা করিতে পারিব না । আমার চক্ষু লজ্জা অত্যন্ত অধিক, আমি তাহা তাগ করিতে পারিব না । ইহাতে ঈশ্বর আমার ভাগো যাহা ঘটান, তাহা আমার অনিবার্য্য ।” * সম্রাটের এই ভাষণা অথচ যথার্থ উত্তর শুনিয়া সকলেই চিন্তিত হইল । বল্লালের দিগ্‌দেশ-ব্যাপী নিন্দা হইল । তাঁহার পুত্র লক্ষ্মণসেন হড্ডিকাকে বিদূরিতা করিবার মানসে একদল সেনা সংগ্রহ করিলেন । নিজ জননী, গুরু, পুরোহিত এবং বৈষ্ণব সামন্তগণ কর্তৃক উপদিষ্ট হইয়া লক্ষ্মণসেন বলপূর্ব্বক হড্ডিকাকে দেশান্তর করিতে অগ্রসর হইলেন । কিন্তু যখন বল্লাল তাঁহাকে নিবারণ করিতে সম্মুখীন হইলেন, তখন লক্ষ্মণের সেনাগণ সম্রাটের সহ যুদ্ধ না করিয়া পলায়ন করিল । লক্ষ্মণ নিজ জননী ও কতকগুলি বৈষ্ণব সামন্ত লইয়া রাঢ় দেশে গিয়া স্বাধীন হইলেন । বল্লাল সংবাদ পাইয়া পুত্রকে পত্র লিখিলেন, “বৎস ! তুমি আমার একমাত্র পুত্র এবং দ্বাদশ রাজ্যের একমাত্র উত্তরাধিকারী । তুমি একমাত্র রাঢ় দেশের রাজা হইয়া নির্ঝোবের কার্য্য করিয়াছ । আমি বৃদ্ধ হইয়াছি, তুমি আসিয়া সমস্ত সাম্রাজ্য গ্রহণ কর । আমি তীর্থবাস করিতে যাই ।” লক্ষ্মণ পিতার পত্র পাঠে অতীব লজ্জিত হইলেন, কিন্তু মাতার প্রবর্তনায় পিতার নিকট আসিলেন না । বল্লাল, পুত্রের কোন দণ্ড করিলেন না ; বরং পুত্রবধূর অভিপ্রায় জানিয়া তাহাকেও রাঢ়ে পাঠাইয়া দিলেন । তিনি লক্ষ্মণের বিদ্রোহের সাজসী কোন ব্যক্তিকেই কোন দণ্ড করেন নাই । লক্ষ্মণসেনের সহ যে সকল বৈষ্ণব রাঢ় দেশে গিয়াছিল, তাহারা রাঢ়ীয় বৈষ্ণবদের সহ মিলিত হইয়াছিল । তাহাদের অস্থিষ্ঠ-নীতি মত উপনয়নাদি চলিতেছে । যাহারা বরেন্দ্রভূমিতে ছিল, তাহারা বল্লালের সহ সমাজবদ্ধ থাকায় হড্ডিকা-সংস্পৃষ্ট বলিয়া তাহাদের উপনয়ন হইত না । পদ্মিনী যে প্রকৃত পক্ষে বৈষ্ণবকথা, তাহা প্রকাশ হইলেও বরেন্দ্র বৈষ্ণবরা অপকৃষ্ট ভাবেই ছিল ; গত বিশ বৎসর মধ্যে তাহারাও প্রায়শ্চিত্ত করিয়া উপবীত ধারণ করিতেছেন ।

বল্লালের গুরু পুরোহিত এবং সভাস্থ পণ্ডিতেরা দেখিলেন যে, সম্রাট অপজ্ঞাতিসংস্রবে ভ্রষ্টাচার ও পতিত হইয়াছেন । তাঁহার নিকটে থাকিলে সংস্রবদোষ অবশ্য ঘটিবে । এজন্ত তাঁহারা দূরদেশে গিয়া বাস করিলেন । রাজ-পুরোহিত ভীম ওঝা কালিয়াগ্রামবাসী ছিলেন । তদংশীয়েরা অद्याপি কালিয়াই

গোষ্ঠী বলিয়া পরিচিত। সেই ভীম ওঝা কালিয়া গ্রাম ত্যাগ করিয়া পূর্ববঙ্গে গিয়া ছাতক নামক গ্রামে বাস করিয়াছিলেন। তখন পূর্ববঙ্গে আর শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণ ছিল না। এজন্ত ভীমের সন্তানদিগকে লোকে “বান্দাল ওঝা” বলিত। এই সময়ে কতকগুলি শ্রোত্রিয় দক্ষিণ-বান্দালায় গিয়া নবদ্বীপ ও শান্তিপুরে বাস করিয়াছিলেন। গোড় নগর একবারে শ্রোত্রিয়শূন্য হইয়াছিল। তথাপি বল্লাল কোনরূপ কটু ব্যবহার করেন নাই। বরং ছাতক, নবদ্বীপ ও শান্তিপুর-প্রস্থিত বিপ্রগণের ভরণ পোষণ জন্ত সেই স্থানেই তাঁহাদিগকে ব্রহ্মত্র দিয়াছিলেন। বল্লালের জামাতা হরিসেন বকদ্বীপে গিয়া বনমধ্যে বাস করিয়াছিলেন। সম্রাট তাঁহাকেও সেই স্থলে “জামাইভাতী” দিয়াছিলেন। ঐ স্থান এখন যশোর জেলার অবস্থিত এবং সেনহাটী নামে খ্যাত।

এইরূপে সুবর্ণবণিকদের পতনে বহুলোকের অবস্থা পরিবর্তন, ব্যবসায় পরিবর্তন ও বাসস্থান পরিবর্তন ঘটিয়াছিল, যাহার ফলাফল অद्याপি বান্দালাদেশে অধিকাংশই বিद्यমান আছে। বল্লাল সর্বজননির্দিত ও সজ্জনপরিত্যক্ত হইয়া আট বৎসর হুড্ডিকা-প্রেমে (?) বিমুগ্ধ থাকিলেন। তাহার পর চৌষট্টি বৎসর বয়সে বল্লালের কঠিন পীড়া হইল। বল্লাল অতি সুস্থকায় ছিলেন, তাঁহার পীড়া কদাচিৎ হইত, বিশেষতঃ গুরুতর ব্যাধি পূর্বে কখন হয় নাই। এক্ষণে বৃদ্ধকালে সর্ব প্রথম কঠিন পীড়া হওয়ায় চিকিৎসকেরা সেই রোগ সাংঘাতিক বলিয়া ব্যাখ্যা করিলেন। সম্রাট লক্ষ্মণসেনকে নিকটে আনিতে দূত পাঠাইলেন এবং স্বয়ং গঙ্গাতীরে কানসাটে চলিলেন। সেই স্থানে একদিন সন্ধ্যার পর হুড্ডিকা মলিন বেশে বল্লালের নিকটে আসিয়া উগ্রভাবে কহিল, “বল্লাল! আমি হুড্ডিকা নহি, আমি বল্লভানন্দ শেঠের কন্যা পদ্মিনী। রাজা যে প্রজার নিকট কর গ্রহণ করেন, সেই প্রজার সর্বদা হিত সাধন করাই রাজধর্ম। নতুবা রাজা দম্ভাতুলা হন এবং গৃহীত দ্রব্য অপহরণ করা হয়। তুমি জাতিবিদ্বেষের পরবশ হইয়া রাজধর্ম লঙ্ঘন করিয়া কুটবিচারে আমার পিতৃকুলকে পাতিত করিয়াছ। আমিও প্রতিহিংসা-পরবশ হইয়া সতীধর্ম লঙ্ঘন পূর্বক তোমার ভোগ্যা হইয়াছিলাম এবং তোমাকে ও তোমার স্বজাতিগণকে পাতিত করিয়াছি। অতের অনিষ্ট করিব না বলিয়া আমার প্রতিজ্ঞা ছিল। তজ্জন্ত তোমার প্রচুর রক্ষা হইয়াছে, নতুবা আমি তোমার দ্বারা ব্রহ্মহত্যা গোহত্যা সকলই করাইতে

পারিতাম । যাহা হউক, আমার উদ্দেশ্য সফল হইয়াছে । তোমার আসন্ন সময়ে আমি তোমার আর কোন অনিষ্ট করিতে চাই না । তুমি নিজকৃত পাপের প্রায়শ্চিত্ত কর ; আমি তোমার অগ্নে পালিত হইয়া কপটতা পূর্বক তোমার যে সকল অনিষ্ট করিয়াছি, সেই পাপ বিমোচন কৃত্য গঙ্গাতে আত্মবিসর্জন করিতে মনস্থ করিয়াছি । তুমি আমাকে যে সকল রত্নালঙ্কার দিয়াছিলে, তাহা গ্রহণ কর ।” এই বলিয়া পদ্মিনী বস্ত্রাবদ্ধ অলঙ্কারাদি সম্রাটের সম্মুখে ফেলিয়া দিয়া অতি দ্রুতপদে প্রস্থান করিল । বল্লাল ডাকিলেন, পদ্মিনী ফিরিল না । তিনি পদ্মিনীকে ফিরাইয়া আনিতে ভৃত্যদের প্রতি আদেশ করিলেন । কিন্তু তাহারা পদ্মিনীর কোন উদ্দেশ্য পাইল না । সম্রাট গম্ভীর ভাবে স্বীয় অপকর্ম্ম স্মরণ করিয়া অনুতাপ করিতে লাগিলেন ।

তৃতীয় দিন পূর্বাঞ্চে লক্ষ্মণসেনের পুত্র দ্বাদশবর্ষীয় মধুসেন আসিয়া পিতামহের বন্দনা করিল । বল্লাল তাহাব পরিচয় পাইয়া আত্মলাভে উষ্ণিয়া বসিলেন এবং মধুকে বক্ষে ধারণ করিয়া বারংবার চুম্বন করিলেন । এই সময়ে তিনি তিনটি শ্লোক পড়িয়াছিলেন, তাহার অর্থ এই যে—

(১) আমি যত্নপূর্বক যে বিষবৃক্ষ রোপণ করিয়া পঞ্চমৃত দ্বারা সেচন করিয়া-ছিলাম, কি আশ্চর্য্য যে, এই অমৃত ফলটি সেই বিষবৃক্ষেই উৎপন্ন হইয়াছে ।

(২) আশ্চর্য্যই বা কিরূপে বলি, যখন সর্প ব্যাঘ্রাদি মারাত্মক হিংস্র জন্তুর শরীর হইতে এমন সমস্ত মহৌষধ প্রস্তুত হয়, যদ্বারা উৎকট ব্যাধি আরাম হয় এবং মূমূর্ষু লোকের প্রাণ রক্ষা হয় ।

(৩) অথবা আমার স্ত্রী পুত্র আমার পাপের উপভোগ্য নরকস্বরূপ । আর সর্ব্ব প্রকার মধু হইতে স্নমধুর যে এই মধু (মধুসেন), সে আমার পিতৃ-পুণ্যের ফল ।

লক্ষ্মণসেন গোপনে কানসাটের সংবাদ এরূপ ঘোষণা করিয়া রাখিয়াছিলেন যে, প্রতি দণ্ডে তাহার নিকট সমাচার পৌঁছিত । তিনি পদ্মিনীর আত্মবিসর্জন-বার্ত্তা পাইবামাত্র আট জন পণ্ডিত সহ মধুসেনকে কানসাটে পাঠাইয়াছিলেন । পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, সমস্ত পণ্ডিতগণ বল্লালের সভা ত্যাগ করিয়াছিলেন । এখন মধুসেন সহ সমাগত পণ্ডিতগণ পাইয়া বল্লাল শাস্ত্রমত প্রায়শ্চিত্ত করিলেন । তদুপলক্ষে গঙ্গান্নান ও পরিশ্রমে বৃদ্ধ সম্রাটের ক্লেশদেহ একবারে অবসন্ন হইয়া

পড়িল। চিকিৎসকেরা নাড়ী ধরিয়া কহিলেন, “মহারাজ! সময় আগত।” বল্লল কহিলেন, “আমিও প্রস্তুত। পৃথিবীতে যত প্রকার সুখ হইতে পারে, আমি তাহা সমস্তই দীর্ঘ কাল ভোগ করিয়া বিতুষ্ট হইয়াছি। আমার একমাত্র দুঃখ ছিল যে, অন্তিম কালে আমার সন্তানগণ কেহই নিকটে নাই। শ্রীমান্ মধুকে পাইয়া আমার সেই দুঃখেরও অবসান হইয়াছে। সংসার দুঃখসাগর; তাহা হইতে এই সময়ে অবসর লওয়াই ক্ষেম। আমার রাজত্ব, প্রভুত্ব, ধনসম্বল আমি সমস্তই মধুকে দিলাম। এই মধুই আমার একমাত্র উত্তরাধিকারী। আমাকে অবিলম্বে গঙ্গাতে লইয়া চল।” আজ্ঞাপেক্ষী ভৃত্যগণ তাঁহাকে গঙ্গা-বক্ষে লইয়া গেল। বল্লল নাভি পর্য্যন্ত গঙ্গাজলে ডুবাইয়া ইষ্ট মন্ত্র জপ করিতে লাগিলেন। চতুর্দিকে তারকব্রহ্ম রাম নাম উচ্চৈঃস্বরে উদ্‌গীত হইল। সহস্র ব্রহ্মরক্ষু ক্ষুটিত হইয়া অগ্নিশিখার স্থায় প্রাণবায়ু নির্গত হইল। বঙ্গের অদ্বিতীয় সম্রাট বল্ললসেনের কীর্ত্তিময়ী মানবলীলা শেষ হইল। দ্রুতগামী জলযান যোগে লক্ষ্মণসেনের নিকট সমাচার প্রেরিত হইল। মধুসেন রাজপ্রতিনিধিরূপে মৃত সম্রাটের মুদ্রাস্থ ভাজিতে এবং দেহ অগ্নিসাৎ করিতে আদেশ করিলেন। তিনি নিজেই পিতামহের অগ্নিকার্য্য যথাসময়ে সমাপন করিয়া পুরক পিণ্ড দিলেন।

লক্ষ্মণসেন।

লক্ষ্মণসেন কানসাটে আসিয়া পিতার অন্তিম শ্লোকত্রয় শুনিয়া শোকে অশ্রুপাত করিলেন। তিনি কহিলেন, “আমি যথার্থই বিষবৃক্ষ; আমার স্থায় কুপুঞ্জের দায় গ্রহণ অল্পচিত। পিতা মধুকে উত্তরাধিকারী নির্দেশ করিয়াছেন, সুতরাং রাজত্ব সম্ভবরূপে তাহারই প্রাপ্য।” তিনি শোকে রোদন করিলেন। বৈজ্ঞ সামন্তেরাও বল্ললের গুণরাশি স্মরণ করিয়া আক্ষেপ করিল। উপস্থিত পণ্ডিতেরা কহিলেন, “মধু নাবালক; সে সদাশয় হইলেও তাহা দ্বারা সাম্রাজ্য শাসন চলিতে পারে না। সে রাজা হইলে অশাসন ও পরিবেদন দুইটি দোষ হইবে। অতএব আপনি রাজত্ব গ্রহণ করুন। শাস্ত্রমতে ঋক্থ ভোগে পিতাপুত্রে ভিন্নতা নাই। নাবালক মধু রাজা হইলেও আপনি তত্‌তপরি কর্ত্তা আর আপনি রাজা হইলেও মধু যুবরাজ। সুতরাং স্বর্গীয় সম্রাট রাজত্ব মধুকে দিলেও তজ্জন্ত আপনকার রাজত্ব গ্রহণে কোন দোষ হইবে না। প্রজার সুপালন

দ্বারা রাজার সর্বপাপ ধ্বংস হয়। কুরুরাজ দুর্যোধন বহুপাপী হইয়াও প্রজা-
পালনে সূত্রত হেতু স্বর্গলাভ করিয়াছিলেন। অতএব আপনি রাজত্ব গ্রহণ
করিয়া প্রজাপালনে ব্রতী হউন। তদ্বারাই সর্বপাপ-বিমুক্ত হইয়া অস্তিমে
স্বর্গলাভ করিতে পারিবেন। যদি অভিষেকের পূর্বেই পাপক্ষয় করিতে চান,
তবে যথাশাস্ত্র প্রায়শ্চিত্ত করুন। মনে কোনরূপ দ্বিধা রাখিবেন না।” লক্ষণ-
সেন পিতৃদ্রোহ-পাপ ক্ষয় জন্য একশত আটটি জলাশয় খনন করাইয়া উৎসর্গ
কারলেন। পরে তিনি ও তদনুচর বৈষ্ণব সামন্তগণ রাজদ্রোহপাপ শাস্তি জন্য চাক্ষায়ণ
প্রায়শ্চিত্ত করিলেন। এই সকল কার্যে প্রায় দুই বৎসর গত হইল। তাহার
পর লক্ষণসেন অভিষিক্ত হইয়া রাজতিলক ধারণ করিলেন। কিন্তু তাঁহার
মন সর্বদা নিরুৎসাহ থাকিত। যখন পিতার অস্তিন শ্লোক তাঁহার মনে উদয়
হইত, তিনি তখনই অশ্রুপাত করিতেন। লক্ষণসেন স্বায়ত্ত পঞ্চরাজ্যের
অধীশ্বর হইলেন। কিন্তু সামন্ত রাজগণ তাঁহাকে কর দিলেন না। এইরূপ
ঘটনা নূতন নহে। হিন্দুদের মধ্যে এরূপ ঘটনা প্রায় সর্বদাই ঘটিত। কোন
সার্কভোমের অভাব হইলে সামন্ত রাজারা অগনি স্বপ্রধান হইতে চেষ্টা করিত।
নিজ পরাক্রম না দেখাইয়া কেবল মৃত সম্রাটের উত্তরাধিকারিস্বত্বে কেহ সামন্ত
রাজাদের নিকট অম্মকর পাইত না, সুতরাং রাজ্য প্রাপ্তি মাত্র কেহ সার্কভোম
হইত না। লক্ষণসেন অবাধ্য সামন্ত রাজাদিগকে বাধ্য করিতে চেষ্টা করেন
নাই, সুতরাং তিনি সার্কভোম সম্রাট উপাধি প্রাপ্ত হন নাই।

লক্ষণসেনের রাজত্বের পঞ্চদশ বর্ষে শ্রোত্রিয়দিগের দ্বিতীয় বার নির্বাচন
করিয়া কোলীন্ড মর্যাদা দানের সময় হইল। রাজা নিজ সভাসদ পণ্ডিতগণ
লইয়া নির্বাচন করিলেন। তৎকালে কোন সাধারণ পরীক্ষার নিয়ম ছিল না।
দুই চারি দিনের পরীক্ষা দ্বারাও প্রকৃত বিজ্ঞা বুদ্ধির পরিমাণ ঠিক হয় না,
বিশেষতঃ ধর্ম্মশীলতার পরিমাণ নিরূপণ জন্য কোন সাধারণ পরীক্ষাই হইতে
পারে না। সুতরাং লক্ষণসেনের কৃত নির্বাচন যে খুব বিগত হইয়াছিল, তাহা
বলা যায় না। এই নির্বাচন হইতে কাহারও উন্নতি হয় নাই, বরং কয়েক শ্রেণীর
কয়েক জন লোকের অধঃপতন হইয়াছিল। বারেন্দ্র শ্রেণীর মধ্যে ভরদ্বাজ-
গোত্রীয় ভাদড় গাঁই কুলীনেরা পতিত হইয়া সিদ্ধ শ্রোত্রিয় হইলেন। রাঢ়ী
শ্রেণীর মধ্যে কতকগুলি কুলীন পতিত হইয়া “বংশজ” নামে খ্যাত হইলেন।

বারেন্দ্র মণ্ডো বংশজ নাই। এবার নির্বাচনক্রমে যাহাদের মর্যাদা পূর্বাপেক্ষা কম হইল অথবা যাঁহারা বাঞ্ছিত উন্নতিলাভে অথবা নিরাশ হইলেন, তাঁহারা মহা গোলযোগ উপস্থিত করিলেন। তাহাতে ক্রমশঃ তর্কবিতর্ক, রাগারাগি, গালাগালি, অবশেষে মারামারি পর্য্যন্ত হইল। যাঁহার আশা ভঙ্গ হইল, তিনি রাজাকে ও নির্বাচক পণ্ডিতগণকে শাপ দিতে দিতে চলিয়া গেলেন। পিতার ছায় লক্ষণের তেজস্বিতা ছিল না। বল্লাল হস্তমুখে ভিন্ন কটুমুখে কথা কহিতেন না, কাহারও কোন দণ্ড করিতেন না, অথচ তিনি যাহা ইচ্ছা তাহাই করিতেন; কেহ তাঁহার প্রতিবাদ করিতে সাহস পাইত না। কিন্তু এই উপলক্ষে অনেকগুলি শ্রোত্রিয় রাজা লক্ষণসেনকে প্রচুর তিরস্কার করিলেন এবং অভিসম্পাত পর্য্যন্ত করিলেন। লক্ষণসেন বিবেচনা করিলেন যে, নির্বাচন প্রথা প্রচলিত থাকিলে এইরূপ গোলযোগ প্রত্যেক নির্বাচন উপলক্ষেই হইবে। অতএব তিনি নির্বাচনপ্রথা একবারে উঠাইয়া দিয়া নিয়ম করিলেন যে, “এই অবধি কোলীজ মর্যাদা বংশানুক্রমিক হইবে এবং পুত্রকন্যার বিবাহের উৎকর্ষ অপকর্ষ দ্বারা সেই মর্যাদা হ্রাস বৃদ্ধি হইতে পারিবে। পুনরায় আর নির্বাচন করিয়া মর্যাদা প্রদান করা হইবে না।

শ্রোত্রিয়দিগের নির্বাচন করিতে বিষম গোল দেখিয়া রাজা বৈষ্ণব, কায়স্থাদি অথ কোন জাতির নির্বাচন করিলেন না। যাহার যে মর্যাদা ছিল, তাহাই বংশানুক্রমিক থাকিল। কেবল পুত্র-কন্যার বিবাহ দ্বারা সেই মর্যাদা হ্রাস বৃদ্ধির এক মাত্র উপায় করা হইল।

এই নূতন নিয়ম দ্বারা নির্বাচনের গোলযোগ শাস্তি হইল বটে, কিন্তু অত্যাচার সহস্র দোষ উপচিত হইল। শ্রোত্রিয়গণ বহুবায় করিয়া কুলীনে কন্যাদান করিয়া কুল মর্যাদা বৃদ্ধির চেষ্টা করিতে লাগিল। কুলীনেরা অর্থলোভে বহুবিবাহ করিতে লাগিলেন। কেহ কেহ জীবিকানির্ভার জন্ত বিবাহই একমাত্র ব্যবসায় করিয়া তুলিলেন! কুলীন কন্যাদের বিবাহ কেবল নামমাত্র হইত। তাহারা প্রায় সমস্ত জীবনকাল পিতৃগৃহেই থাকিত। যে যে মহদগুণে প্রথম কোলীজ মর্যাদা লাভ হইত, কুলীন পুত্রেরা সে সমস্ত গুণ উপেক্ষা করিয়া কেবল বিবাহ বিষয়ে কুল রক্ষা করত সম্পূর্ণ কুলগৌরব ভোগ করিতে লাগিলেন। কষ্ট শ্রোত্রিয়ের সম্মান সহস্র গুণবান হইয়াও নিরুপেখ থাকিলেন।

তঁাহাদের অনেকেরই বিবাহ হইত না । বিবাহ বিষয়ে এইরূপ বৈধম্য হেতু ব্যভিচার দোষ উৎপন্ন হইল । কষ্ট শ্রোত্রিয় ও বংশজদিগের বিবাহ না হওয়ার বংশলোপ হইতে লাগিল । ফলতঃ যে সচুদ্দেশ্যে বল্লাল কৌলীন্দ্ৰ মর্যাদা স্থাপ্তি করিয়াছিলেন, তাহা না হইয়া সেই মর্যাদা অসংখ্য অনিষ্টের কারণ হইয়াছিল ।

মহারাজ লক্ষ্মণসেন অতি সুন্দর, দীর্ঘ, পুষ্ট ও বলবান ছিলেন । তিনি অস্ত্র ও অশ্বচালনে সুপটু ছিলেন । তিনি বিদ্বান্, বুদ্ধিমান্, জিতেন্দ্রিয় এবং ধর্ম্মশীল ছিলেন । তিনি সদ্বক্তা, প্রজাবৎসল, অপক্ষপাতী, সুবিচারক, একান্ত গুণগ্রাহী এবং শাস্তিপ্রিয় লোক ছিলেন । কিন্তু অস্থিরচিত্ত, অনুযোগী ছিলেন । তাঁহার সাহস এবং কষ্টসহিষ্ণুতা বোধ হয় কম ছিল । তিনি মাতার পরামর্শে পিতার অবাধ্য হইয়াছিলেন এবং পিতৃশাপগ্রস্ত হইয়াছিলেন । তজ্জন্ত পরে সর্বদা আক্ষেপ করিতেন । তাঁহার মাতার গলংকুষ্ঠ রোগ হইলে তিনি মাতাকে বলিয়াছিলেন, “স্ত্রীজাতির পক্ষে স্বামী মহাগুরু । তুমি স্বামীর সহ সদ্যবহার কর নাই । তোমারই কুপরামর্শে আমিও পিতার সহ সদ্যবহার করিতে পারি নাই । তোমার এই ব্যাধি সেই মহাশাপের ফল ।” তাঁহার মাতা ক্রুদ্ধ হইয়া শাপ দিলেন, “তুই যেমন আমার কলঙ্ক উদ্‌ঘোষণা করিলি, তেমনি তোর চিরস্থায়ী কলঙ্ক হইবে ।” এইরূপে অস্থিরচিত্ত রাজা পিতার ও মাতার শাপগ্রস্ত হইয়াছিলেন এবং উভয় শাপই ফলিয়াছিল ।

লক্ষ্মণসেনের প্রজাপালনপ্রণালী অতীব উৎকৃষ্ট ; এমন কি, অতুল্য বলিলেও অত্যুক্তি হয় না । তিনি প্রত্যেক প্রজার অবস্থা ও চরিত্র তদন্ত করিতেন এবং প্রত্যেকের অভাব মোচন কবিয়া জীবিকানির্ব্বাহের সচুপায় করিয়া দিতেন । তাঁহার রাজ্যে নিতান্ত দরিদ্র কেহই ছিল না । “অভাবে স্বভাব নষ্ট” একটি প্রসিদ্ধ কথা । তাঁহার রাজত্বে কাহারও অভাব না থাকায় চুরি ডাকাতি প্রভৃতি কুকর্ম্ম করিতে কাহারও প্রবৃত্তি ছিল না । তিনি স্ববর্ণবণিক্দের পাতিতা খণ্ডন করেন নাই বটে, কিন্তু তাহাদিগকে পুনরায় বাণিজ্য ব্যবসায় করিতে অনুমতি দিয়াছিলেন । তিনি শিল্প, বাণিজ্য, জ্যোতিষ, কৃষিকার্য্য ও সঙ্গীত-বিদ্যার উন্নতি সাধনে বিশেষ যত্নশীল ছিলেন । তাঁহার পিতা বল্লালসেনের সময়ে বঙ্গদেশে “অদ্বুতসাগর” নামক জ্যোতিষ-সংহিতা সর্বপ্রথম প্রচারিত হয় । তিনি শ্রোত্রিয়দিগকে বিদ্যার এবং ধর্ম্মচর্চার জন্ত সর্বদা উৎসাহ দিতেন । তিনি নিজে

পণ্ডিত ছিলেন। তিনি পণ্ডিতদিগের পরীক্ষা করিয়া যথেষ্ট পুরস্কার দিতেন। তজ্জন্ত তাঁহার রাজত্বে বাঙ্গালা দেশ আর্ঘ্যবিজ্ঞার প্রধান স্থল হইয়াছিল। চিকিৎসাবিজ্ঞার প্রতি তাঁহার অসুরাগ সর্বাপেক্ষা অধিক ছিল। তিনি বৈজ্ঞানিককে বলিতেন যে, “চিকিৎসাই আমাদের জাতীয় বিজ্ঞা; যেমন গায়ত্রীহীন ব্রাহ্মণ, যুদ্ধবিমুখ ক্ষত্রিয়, আয়ুর্বেদবিহীন বৈজ্ঞানিক তদ্রূপ জঘন্য।” তিনি বৈজ্ঞানিককে প্রত্যেক বস্তুর গুণ নির্ণয় জন্ত আদেশ দিয়াছিলেন এবং সেই কার্যের সাহায্য জন্ত বিজ্ঞ কবিরাজদিগকে “রোম্‌থা” যোগাইতেন।

হিন্দুরাজ্যে প্রাণদণ্ডের অপরাধীদিগকে চারি প্রকারে প্রাণদণ্ড করা হইত। ১ম, মশানে লইয়া কালীদেবীর সম্মুখে বলিদান; ২য়, শূলে দেওয়া, ৩য়, হাত পা বাঁধিয়া অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ; ৪র্থ, সজীব অবস্থায় মাটিতে পুতিয়া ফেলা। অতি সম্ভ্রান্তবংশীয় অপরাধীদিগের প্রথম প্রকারে প্রাণদণ্ড হইত। আর মহাব্যাধিযুক্ত অপরাধীদিগের চতুর্থ প্রকারে প্রাণদণ্ড হইত। প্রথম ও চতুর্থ প্রকারে দণ্ডনীর অপরাধীরা রোম্‌থা হইত না। দ্বিতীয় ও তৃতীয় প্রকারের অপরাধী মধ্যে যাহাদিগকে সবল ও সুস্থদেহ দেখা যাইত, চিকিৎসকেরা তাহাদিগকে রাজার নিকট চাহিয়া লইয়া “রোম্‌থা” করিতেন। রোম্‌থাদিগের কপালে উল্কি দ্বারা “রোম্‌থা” এই শব্দটি চিরস্থায়ীরূপে লিখিয়া দেওয়া হইত। রোম্‌থাদের দেহ এবং প্রাণ কবিরাজদের সম্পূর্ণ স্বেচ্ছাধীন ছিল। কবিরাজেরা তাহাদের শরীরে ঔষধের গুণ পরীক্ষা করিতেন। কোন্ ঔষধ খাইলে বা মালিশ করিলে মনুষ্যদেহে কি ফল হয়, তাহা নিরূপণ জন্ত কবিরাজেরা সেই বস্তু রোম্‌থাদিগকে খাওয়াইতেন বা মালিশ করিতেন। তাহাতে রোম্‌থার ব্যারাম হউক বা মৃত্যু হউক, তজ্জন্ত কবিরাজের কোন অপরাধ হইত না। কখন বা রোম্‌থাকে বাঁধিয়া তপ্ততৈল বা ঘৃতপূর্ণ কটাহে ফেলিয়া দিয়া “মহামাঘ তৈল, মহামাঘ ঘৃত” তৈয়ারী করা হইত। অতঃ সময়ে রোম্‌থারা কবিরাজের ভৃত্যের কাজ করিত। কখন বা কবিরাজেরা তুষ্ট হইয়া কোন কোন রোম্‌থাকে বাড়ী যাইতে ছুটি দিতেন অথবা একবারেই মুক্তি দিতেন। কবিরাজেরা মুক্তি দিলে রোম্‌থার পূর্ব অপরাধের জন্ত আর কোন দণ্ড হইত না। ইংরেজ রাজত্বে রোম্‌থা না পাওয়ায় কবিরাজদিগের অনেক ঔষধ এখন তৈয়ারি হয় না।

লক্ষণসেনের যত্নে, ব্যয়ে এবং উৎসাহে বাঙ্গালী বৈদ্যেরা চিকিৎসাবিদ্যায় পৃথিবী মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ হইয়াছিল। কালক্রমে রাজকীয় সাহায্য অভাবে, অর্থাভাবে, ঔষধের সামগ্রী অভাবে বৈদ্যচিকিৎসার গুণ বিস্তর হ্রাস হইয়াছে বটে, তথাপি আর্ধ্য চিকিৎসাবিদ্যায় অল্প কেহ অত্মপি বাঙ্গালীদের তুল্য হইতে পারে নাই। নাড়ীজ্ঞান বাঙ্গালী চিকিৎসকের তুল্য অল্প কোন জাতীর চিকিৎসকের নাই।

লক্ষণসেন জিতেদ্রিয়, অপক্ষপাতী সুবিচারক ছিলেন। তিনি যদি শান্তিময় সময়ে রাজা হইতেন, তবে তাঁহার চিরস্থায়ী সুখশ হইত। কিন্তু তাঁহার সময়ে সকল গুণ অপেক্ষা যুদ্ধবিক্রম অধিকতর প্রয়োজনীয় ছিল, অথচ সেই গুণ লক্ষণের নিতান্ত কম ছিল। সেই জন্য তিনি চিরস্থায়ী কলঙ্কভাগী হন এবং বিদেশে নিঃসহায় অবস্থায় মানবলীলা সংবরণ করেন।

লক্ষণসেনের রাজত্বের পঁয়তাল্লিশ বর্ষে, যখন তাঁহার বয়স প্রায় আশীবৎসর, সেই সময় শেখ জালালুদ্দীন নামক একজন মুসলমান সাধু (দরবেশ) পারস্য দেশের তবরেক্জ নগর হইতে ভ্রমণ করিতে করিতে গোড় নগরে উপস্থিত হইয়াছিলেন। লক্ষণসেন সেই সাধুর অসাধারণ গুণগ্রাম দৃষ্টে তাঁহাকে বাইশ হাজার বিঘা ভূমি নিষ্কর দিয়াছিলেন। সেই বাইশ হাজারী পীরপাল এখনও মালদহ জেলায় বিদ্যমান আছে। সেই মুসলমান সাধুর বৃত্তান্ত লইয়া “শেখ শুভোদয়া” নামক গ্রন্থ রচিত হইয়াছে। সেই গ্রন্থ হইতে বৈদ্যরাজবংশের কতক বিবরণ জানা যায়।

রাজা লক্ষণসেন সেই দরবেশের প্রমুখাৎ শুনিলেন যে, তাঁহার রাজধানী অচিরে মুসলমানেরা অধিকার করিবে। রাজা নিজ সভাস্থ পণ্ডিতগণকে তদ্বিষয়ে প্রশ্ন করায় তাঁহারাও গণনা করিয়া সেই ভবিষ্যদ্বাণী সত্য বলিয়া স্বীকার করিলেন। ইহাতে লক্ষণসেনের মনে ঘোর বৈরাগ্য উপস্থিত হইল। তিনি মধুসেনের উপর রাজ্যভার দিয়া নিজে কতিপয় পণ্ডিতসহ নবদ্বীপে গিয়া গঙ্গা-বাস করিতে লাগিলেন। নবদ্বীপ তৎকালে ভাগীরথীর পবিত্র-মলিন-পরিবেষ্টিত প্রকৃত দ্বীপ ছিল এবং তীর্থস্থান বলিয়া গণ্য ছিল। নবদ্বীপ রাজধানী ছিল না। অথবা সমৃদ্ধ নগর ছিল না। তথায় কোন দুর্গ ছিল না এবং সৈন্তের ছাউনী ছিল না। তথায় কোন রাজকার্য্য হইত না এবং রাজপরিবারও তথায় থাকিত

না। লক্ষ্মণসেন একাকী তথ্য কতিপয় পণ্ডিত ও ভৃত্য সহ থাকিয়া জপ, তপ, পূজা এবং ধর্মশাস্ত্রালোচনার সময় ক্ষেপণ করিতেন মাত্র। রাজা তথ্য কেবল এক বৎসর দশমাস মাত্র থাকার পর ঐ স্থান মুসলমান কর্তৃক আক্রান্ত হইয়াছিল।

রামপ্রসাদ নামক এক জন ক্ষত্রিয় বা পাঞ্জাবী ক্ষেত্রি গজনিপতি সাহেবদীন মহম্মদ গোঁরী কর্তৃক বন্দী হইয়া উক্ত সম্রাটের গোলাম হইয়াছিল। সে মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করিয়া কুতুবুদ্দীন* নাম ধারণ করিয়াছিল এবং আদিষ্ট কার্যে দক্ষতা দেখাইয়া উক্ত সম্রাটের প্রিয়পাত্র হইয়াছিল। সম্রাটের কোন সম্মান ছিল না। তাঁহার প্রিয়তম চল্লিশ জন গোলামই তাঁহার পুত্রবৎ হইয়াছিল। সেই গোলামের দলমধ্যে উক্ত কুতুবুদ্দীন এবং এলদোস খাঁ সর্বপ্রধান ছিলেন। গোঁরীর মৃত্যুর পর ১২০৬ খৃষ্টাব্দে এলদোস খাঁ সিন্ধুর পশ্চিম পারে এবং কুতুবুদ্দীন সিন্ধুর পূর্বপারে স্বাধীন সম্রাট হইয়াছিলেন। তাঁহার প্রভুর জীবদ্দশায় যখন কুতুব দিল্লীর শাসক মাত্র ছিলেন, সেই সময়ে তিনি নিজের অধীন সেনাদল লইয়া অযোধ্যা, প্রয়াগ ও কাশীধাম পর্য্যন্ত জয় করিয়া নিজ অধিকার বৃদ্ধি করিয়াছিলেন। তাহার পর কুতুবুদ্দীন মগধ ও গৌড়রাজ্য জয় করিবার জন্ত নিজ সেনাপতি বখতিয়ার গিল্জীকে প্রেরণ করিয়াছিলেন। সেই সময়ে নবোৎসাহে মুসলমানেরা সর্বত্রই অজয় হইয়াছিল। বখতিয়ার অতি সহজেই মগধ রাজ্য অধিকার করিলেন। তিনি শুনিলেন যে, পঞ্চরাজ্যের অধিপতি লক্ষ্মণসেন নবদ্বীপে বাস করেন। এজন্ত তিনি ঐ স্থানই রাজধানী বিবেচনায় তাহাই আক্রমণ করিতে চলিলেন। তিনি ভাগীরথীর পশ্চিম পারে জঙ্গলে সমস্ত সেনা সহ গোপনে থাকিলেন এবং তাজীম খাঁর অধীনে সতর জন মাত্র অশ্বরোহী ছলপূর্বক তোরণদ্বার অধিকার জন্ত পাঠাইলেন। তাজীম প্রচার করিলেন যে, তাঁহার উপরিস্থ সেনাপতি সহ বিবাদ হওয়ায় তিনি গৌড়াদিপতির নিকট চাকরী প্রার্থনায় আসিয়াছেন।

* কোন কোন ঐতিহাসিকের মতে কুতুবুদ্দীন প্রথমে তুর্কস্থান হইতে আনীত হইয়া, নিশাপুরের এক বণিকের নিকট বিক্রীত হন। তাঁহার তীক্ষ্ণবুদ্ধি দেখিয়া, বণিক তাঁহাকে পারস্ত ও আরব্য ভাষা উত্তমরূপে শিক্ষা দেন। বণিকের মৃত্যুর পর মহম্মদ গোঁরী তাঁহাকে ক্রয় করেন। তাঁহার কনিষ্ঠ অঙ্গুলী ভগ্ন ছিল বলিয়া, মহম্মদ তাঁহাকে আয়বক বলিয়া ডাকিতেন। আয়বকের বিদ্যাবুদ্ধি দেখিয়া মহম্মদ তাঁহাকে দিন দিন উচ্চপদে উন্নীত করিতে লাগিলেন; এবং অবশেষে “কুতুবুদ্দীন” উপাধি দিয়া তাঁহাকে ভারতবর্ষের রাজপ্রতিনিধি নিযুক্ত করেন।

তাজীম বিনা বাধায় গঙ্গাপার হইয়া রাজবাটীর তোরণদ্বারে প্রবেশ করিলেন। তথায় সৈন্ত সামন্ত অল্প দেখিয়া হঠাৎ আক্রমণ দ্বারা রক্ষিণকে নষ্ট করিয়া তোরণদ্বার অধিকার করিলেন। রাজভৃত্যেরা স্বল্পকাল মধ্যে তাঁহাদিগকে নিষ্কাশিত করিতে পারিল না। সংবাদ পাইয়া বখতিয়ার অবশিষ্ট সেনা লইয়া মুক্ত তোরণদ্বার দিয়া রাজবাটীতে প্রবেশ করিলেন। লক্ষণসেনের যুদ্ধোপযোগী কোন আয়োজনই ছিল না। তাঁহার রাজধানী গোড় নগর যবনেরা অধিকার করিবে জানিয়া তিনি রাজধানী ত্যাগ করিয়া দূরদেশে নবদ্বীপে বাস করিতেছিলেন। দুর্ভাগ্যক্রমে তাহাই প্রথম আক্রান্ত হইল। উপায়ান্তর না দেখিয়া তিনি দ্রুতগামী নৌকা-যোগে জগন্নাথক্ষেত্রে পলায়ন করিলেন। তথায় বন্ধুহীন অবস্থায় তিনি মনোহুঃখে গতাস্থ হন।

রাজা লক্ষণসেন বিনা যুদ্ধে পলায়ন করায় মুসলমান ইতিবেত্তা ফেরেস্তা তাঁহাকে তুচ্ছ করিয়া “লছমনিয়া” বলিয়া লিখিয়াছেন। তাহা হইতেই ইংরেজী ইতিহাসে এবং তদনুরূপ বাঙ্গালা ইতিহাসে লাক্ষণ্যসেন বা দ্বিতীয় লক্ষণসেন রাজা এবং নবদ্বীপ তাঁহার রাজধানী বলিয়া কল্পিত হইয়াছে। তাহা সমস্তই ভুল। নবদ্বীপ কখন রাজধানী ছিল না এবং লাক্ষণ্যসেন নামে কোন রাজাও ছিল না। মীর ফজন্দ হোসেন লিখিয়াছেন যে, পারসীতে তুচ্ছার্থে নামের উত্তর ‘ইয়া’ প্রত্যয় হয়। তাহাতেই কাপুরুষ লক্ষসেনকে লছমনিয়া লেখা হইয়াছে।

“সতর জন পাঠান অশ্বারোহী বাঙ্গালা দেশ জয় করিয়াছিল” বলিয়া যাহারা বাঙ্গালীর অপবাদ করে, তাহারা মিথ্যা নিন্দুক মাত্র। সতর জন পাঠান সমস্ত বাঙ্গালাদেশ দূরে থাকুক, নবদ্বীপের ছায় অরক্ষিত পল্লীগ্রামও জয় করিতে পারে নাই। সতর জন পাঠান চাকরী প্রার্থনার ভাণ করিয়া নবদ্বীপে রাজবাটীর তোরণদ্বারে প্রবেশ করিয়াছিল এবং বিশ্বাসঘাতকতাপূর্বক দৌবারিকদিগকে হত্যা করিয়া তোরণদ্বার অধিকার করিয়াছিল। রাজভৃত্যেরা স্বল্পকাল মধ্যে তাহাদিগকে নিষ্কাশিত করিতে পারিল না। ইতিমধ্যে অবশিষ্ট পাঠান সৈন্ত আসিয়া সেই মুক্ত তোরণদ্বার দিয়া রাজবাটীতে প্রবেশ করিল। লক্ষণসেনের যুদ্ধের আয়োজন কিছুই ছিল না। তিনি হঠাৎ আক্রান্ত হইয়া অগত্যা পলায়ন করিলেন। নবদ্বীপ পাঠানদের হস্তগত হইল। ঈদৃশ ঘটনা হইতে বৃদ্ধ রাজার কিংবা বাঙ্গালীদের দৌর্বল্য বা ভীকৃত্য কিছুমাত্র প্রমাণ হয় না। যখন কামান

বন্দুকাদি অনিবার্য অস্ত্র ছিল না, তখন সঙ্গীর্ণ স্থানে অত্যন্ত লোকে বহু লোকের বিরুদ্ধে আত্মরক্ষা করিতে পারিত। ইহা যুক্তিসিদ্ধ এবং ইতিহাসে ইহার ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত দেখা যায়। টাস্কেনীর রাজা লাস্পোসেনা সম্মুখ যুদ্ধে চল্লিশ হাজার রোমীয় সৈন্য পরাজয় করিয়াছিলেন, অথচ টাইবর নদের সেতুমুখে তিন জন মাত্র রোমীয় বীর পোসেনার নব্বই হাজার যোদ্ধার গতিরোধ করিয়াছিল। তুরস্ক সেনাপতি সালারুদ্দীন তিরানী হাজার সৈন্য লইয়া ছয় লক্ষ খৃষ্টান সৈন্য পরাজিত করিয়াছিলেন, অথচ সেই পরাজিত পলায়িত খৃষ্টানদিগের মধ্যে কেবল বিরানব্বই জন যোদ্ধা ঘেরুশালমের তোরণদ্বারে সালারুদ্দীনের সমস্ত সৈন্যের বিরুদ্ধে আত্মরক্ষা করিয়াছিল। সুতরাং সতর জন পাঠান যে সহস্র বাঙ্গালীর বিরুদ্ধে নবদ্বীপের তোরণদ্বারে আত্মরক্ষা করিয়াছিল, তাহা এক পক্ষের অসাধারণ বীরত্বের অথবা অত্র পক্ষের একান্ত দৌর্বল্যের প্রমাণ নহে।

মুসলমানদিগের প্রথম উন্নতির সময়ে তাহারা সর্বত্রই অজেয় হইয়াছিল। কোন দেশের কোন জাতিই তাহাদের বিপক্ষতা করিয়া কৃতকার্য হইতে পারে নাই। সেই সময়ে যে তাহারা বাঙ্গালা দেশ জয় করিয়াছিল, ইহাও বাঙ্গালীর দৌর্বল্যের প্রমাণ নহে। বরং বাঙ্গালীরা যে পঁয়ষট্টি বৎসর কাল তাহাদের প্রতিকক্ষতা করিয়াছিল, তাহাই যথেষ্ট গরিমার বিষয়। রাজত্বের সঙ্গে সঙ্গেই বৈজ্ঞানিকদিগের বিক্রম বিলুপ্ত হইয়াছিল। ইহার পর বৈজ্ঞানিক বিজ্ঞা বুদ্ধির জন্ম অনেকে প্রসিদ্ধ হইয়াছে বটে, কিন্তু কখন কেহ বীরত্বের খ্যাতি লাভ করে নাই। কিন্তু বাঙ্গালী ব্রাহ্মণ, কায়স্থ ও চণ্ডালগণ অনেকে বিলক্ষণ শৌর্য্য বীৰ্য্য প্রকাশ করিয়াছে। তাহারা বারংবার পাঠান মোগলের প্রতিযোগিতা করিয়াছে এবং সময়ে সময়ে তাহাদিগকে পরাজয় করিয়া তাহাদের উপর আধিপত্য করিয়াছে। জেলা রঙ্গপুরে কাঁকিনার রাজারা বারেন্দ্র কায়স্থ। তাহাদের পূর্বপুরুষেরা বরাবর কোচবেহার-রাজের সেনাপতি ছিলেন এবং তাঁহারা পাঠান, মোগল ও ভুটিয়াদের সহ পুনঃ পুনঃ যুদ্ধ করিয়াছেন। দিনাজপুরের মহারাজের পূর্বপুরুষেরা বরাবর বাঙ্গালার নবাবদিগের সেনাপতি থাকিয়া বাঙ্গালা দেশের উত্তর দিক রক্ষার্থ নিযুক্ত ছিলেন। শুগুং ও বাহির-বন্দের রাজারা বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ। তাঁহাদের পূর্বপুরুষেরাও নবাবের সেনাপতিরূপে বাঙ্গালার উত্তর-পূর্বদিক রক্ষা করিতেন। রাঙ্গামাটির রাজারা

উত্তর-রাঢ়ী কারস্থ ছিলেন। পরে আসামের কলতা কায়েতের সহ আদান প্রদানে কলতা কায়েত হইয়া গিয়াছেন। তাঁহাদের পূর্বপুরুষেরা আসাম-রাজের সেনাপতি ছিলেন। ঔরঞ্জীব বাদশাহের প্রসিদ্ধ সেনাপতি নবাব মীরজুম্মাকে তাঁহারাই পরাজয় করিয়া আসাম হইতে তাড়াইয়াছিলেন। বাঙ্গালার নবাবদিগের অধিকাংশ সৈন্ত ও সেনাপতি বাঙ্গালী ছিল। নবাব শিরাজদ্দৌলা ও মীরকাশীম যে সৈন্ত লইয়া ইংরেজের সহ যুদ্ধ করিয়াছিলেন, তাহারাও অধিকাংশ বাঙ্গালী ছিল। ইংরেজদিগের দেশীয় সেনা মধ্যেও প্রথম প্রথম অনেক বাঙ্গালী যোদ্ধা ছিল। ফলতঃ বাঙ্গালী ব্রাহ্মণ ও কায়স্থেরা যেমন বুদ্ধির জ্ঞাত প্রসিদ্ধ, তেমনই বীরত্বের জ্ঞাতও প্রসিদ্ধ ছিলেন। বাস্তবিক, বীরত্ব কোন দেশবিশেষের বা জাতিবিশেষের গুণ নহে। প্রয়োজন ও সুযোগ দ্বারা এই গুণ উৎপন্ন হয় এবং অভ্যাস দ্বারা বর্দ্ধিত হয়। বীরত্ব প্রকাশের সুযোগ নাই এবং অভ্যাস নাই বলিয়াই বাঙ্গালীরা এখন নির্বীৰ্য্য হইয়াছে। নীলকরদিগের দৌরাড্য-সমন্বয়ে সলোপের সাত্তাল, বালিয়াকান্দির চৌধুরী, ভাওয়ালের রাজা, রাজাপুরের রাণী এবং নড়াইলের বাবুরা বিলক্ষণ বিক্রম প্রকাশ করিয়াছিলেন। সিপাহি-বিদ্রোহকালে প্যারীমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় (The fighting Munsiff) এবং বর্তমান কালে লেফটেন্যান্ট-কর্ণেল সুরেশচন্দ্র বিশ্বাস বীরত্বখ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন। সুতরাং বাঙ্গালীরা চিরকাল ভীক বালিয়া অনুমান ভ্রম ও কুসংস্কার-মূলক।

নবদ্বীপ অধিকার করায় বাঙ্গালা দেশের কোন অংশই যবনদিগের হস্তগত হইল না। একটি লোকও তাহাদের অধীনতা স্বীকার করিল না। তাহাদিগকে দেখিয়া প্রজাগণ পলায়ন করিত। তাহারা কেবল লুণ্ঠ পাট করিয়া জীবন ধারণ করিত। মূল্য দিয়াও তাহারা কোন দ্রব্য কিনিতে পাইত না। এই অবস্থায় বখতিয়ার গৌড়নগর আক্রমণ করিতে চলিলেন। লক্ষ্মণসেন যে কলঙ্কপক্ষে বাঙ্গালীর নাম ডুবাইয়াছিলেন, মধুসেন তাহা কতক উদ্ধার করিয়াছিলেন। গৌড়নগর সহজে বিজিত হয় নাই। বহু যুদ্ধের পর পাঠানেরা গৌড়নগর অবরোধ করিল। ইংরেজী ১২০৩ খৃষ্টাব্দে নবদ্বীপ পাঠানদিগের হস্তগত হয়। আর ১১২৭ শকাব্দে অর্থাৎ ইংরেজী ১২০৫ খৃষ্টাব্দে গৌড়নগর যবনাধিকৃত হয়। সুতরাং মধুসেন যে এক বংশের অধিককাল পাঠানদিগের সহ যুদ্ধ চালাইয়া ছিলেন, তদ্বিমুখে কোন

সন্দেহ নাই। তাহারা ঐ স্থান হানা দিয়া দখল করিতে পারে নাই। তিন মাস অবরোধের পর রসদ নিঃশেষ হওয়ার রাজা মধুসেন রাজধানী ত্যাগ করিয়া পূর্ব-বঙ্গে প্রস্থান করিলেন। গোড় বখতিয়ারের হস্তগত হইল। সেই সঙ্গে সমস্ত বরেন্দ্রভূমি, রাঢ়, মিথিলা এবং বগ্দির পশ্চিমভাগ পাঠানদিগের অধিকৃত হইল। রাজা মধুসেন কেবল বঙ্গদেশে এবং বগ্দির পূর্বাংশে রাজত্ব করিতে লাগিলেন। বিজয়ী পাঠানেরা মহোৎসাহে পূর্ববঙ্গ আক্রমণ করিল। এই সময়ে পূর্ববঙ্গে একডালা নামে এক অভেদ্য দুর্গ ছিল। যে স্থানে পদ্মা ও ব্রহ্মপুত্র নদের সন্মিলন হইয়াছে, ঠিক সেই স্থানে এই দুর্গ নিৰ্ম্মিত হইয়াছিল। এই দুর্গ প্রায় দুই শত বৎসর হইল সম্পূর্ণ জলমগ্ন হইয়াছে। ইহার প্রাচীর প্রায় ৮ হাত পুরু ছিল এবং গাঁথনি অতীব দৃঢ় ছিল। কেহ হানা দিয়া এই দুর্গ জয় করিতে পারিত না। নৌকাপথে রসদ ও নূতন সৈন্য আনিবার সুবিধা থাকায়, এই দুর্গ অবরোধ করিয়া কোন ফল ছিল না। তজ্জন্ত এই দুর্গ অজেয় বলিয়া বিখ্যাত ছিল। স্থানীয় লোকে বলে যে, “রাজা বিক্রমাদিত্য বিক্রমপুর নগর স্থাপন করিয়া তাহাতে এই দুর্গ নিৰ্ম্মাণ করিয়াছিলেন।” বিক্রমাদিত্য নামে বহু রাজা ছিলেন। তাহারা বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন দেশে রাজত্ব করিয়া গিয়াছেন। নামের একতা হেতু অনেক সময়ে একজনের কার্য্য অণ্ঠে আরোপিত হয়। কিন্তু উজ্জয়িনীর প্রসিদ্ধ সম্রাট বিক্রমাদিত্য যে এই একডালার দুর্গ-স্থাপক নহেন সে বিষয়ে সন্দেহের কোন কারণ নাই।

বখতিয়ার পূর্ববঙ্গ আক্রমণ করিলে রাজা মধুসেন একডালার দুর্গে আশ্রয় লইলেন। বখতিয়ার কিছুই করিতে পারিলেন না, বর্ষার প্রারম্ভে ফিরিয়া আসিলেন। দ্বিতীয় বৎসর পুনরায় পাঠানেরা পূর্ববঙ্গ আক্রমণ করিল। মধুসেন আসামরাজের সাহায্যে তাহাদিগকে বিমুখ করিয়া দিলেন। বখতিয়ার ক্রুদ্ধ হইয়া আসাম দেশ আক্রমণ করিলেন। তথায় জঙ্গল মধ্যে বহু সৈন্য একত্র সমাবেশ করা অসাধ্য হইল। সেই সময়ে সুযোগ পাইয়া আসামীরা পাঠানদিগকে আক্রমণ করিয়া পরাজয় করিল। জঙ্গলের জলবায়ুতে রুগ্নদেহ এবং পরাজয়ে ভগ্নমনে বখতিয়ার গোড়ে ফিরিয়া আসিয়াই লীলা সংবরণ করিলেন। খৃঃ ১২০৭ সালে এই ঘটনা হয়। ইহার পর বহু দিন পর্য্যন্ত মুসলমানেরা পূর্ববঙ্গ আক্রমণ করে নাই। পশ্চিমবঙ্গে পাঠান রাজ্য এবং পূর্ববঙ্গে

বৈষ্ণবরাজ্য স্থির ছিল। সেই সময়ে বহুসংখ্যক সুব্রাহ্মণ পশ্চিম বঙ্গ ত্যাগ করিয়া পূর্ববঙ্গে গিয়া বাস করিয়াছিলেন। বৈষ্ণব সংখ্যা পূর্ববঙ্গে প্রচুর, অথচ বরেন্দ্রভূমিতে অতি অল্প। ইহাতে জানা যায় যে, বৈষ্ণব প্রায় সমস্তই এই সময়ে পূর্ববঙ্গে গিয়া বাস করিয়াছিল। মধুসেন, কেশবসেন, শুকসেন এবং মাধব (দত্ত) সেন মোট চৌষটি বৎসর মুসলমানদের প্রতিক্রমতা করিয়া পূর্ববঙ্গে রাজত্ব করিয়াছিলেন। অবশেষে নবাব তোগরলবেগ নৌকাপথে আসিয়া হঠাৎ আক্রমণ দ্বারা একডালার দুর্গ অধিকার করিলেন। মাধবসেন পরাজিত হইয়া নৌকাপথে ত্রিপুরারাজ্যে পলাইতেছিলেন; পথিমধ্যে ঝড় হওয়াতে সপরিবারে জলমগ্ন হইলেন। তাহাতেই বৈষ্ণবরাজবংশ সমূলে নিঃশেষ হইল এবং সমস্ত বাঙ্গালা দেশ পাঠানরাজ্য হইল। খৃঃ ১২৬৮ সাল।

পুরাতন শ্রোত্রিয়েরা এই বৈষ্ণবরাজবংশের অজস্র প্রশংসা করিয়াছেন। সেই প্রশংসা কিছুমাত্র অসঙ্গত বোধ হয় না। তাঁহারা ক্ষত্রিয় রাজাদের হায় যুদ্ধপ্রিয় ছিলেন না। বল্লালসেন ভিন্ন অল্প কাহারও বিশেষ বীরত্বখ্যাতি দেখা যায় না। কিন্তু সদাচার, সুবিচার এবং প্রজাপালন বিষয়ে তাঁহারা ক্ষত্রিয় রাজাদিগের অপেক্ষা সর্বোৎকৃষ্ট শ্রেষ্ঠ ছিলেন। ক্ষত্রিয় রাজারা প্রায়ই মূর্থ ছিল। কিন্তু বৈষ্ণব রাজারা সকলেই বিদ্বান্ এবং বিত্তোৎসাহী ছিলেন। বল্লাল ও লক্ষ্মণসেনের রাজ্যমধ্যে কোন প্রজা দরিদ্র ছিল না, কেহ ভিক্ষুক ছিল না এবং কেহ চোর ছিল না। বৈষ্ণবরাজবংশের সুশাসনই বাঙ্গালাদেশের উন্নতির মূল। তাঁহারা যে নিতান্ত দুর্বল ছিলেন, তাহাও বোধ হয় না। কেননা তাঁহাদের বত বড় বিস্তীর্ণ রাজ্য সম্পূর্ণ আয়ত্ত ছিল, তত বড় রাজ্য ক্ষত্রিয় রাজাদের খুব কম দেখা যায়।

বাঙ্গালাদেশে পশমী কাপড় তৈয়ারী হইত না। কিন্তু কাপাসবস্ত্র ও রেশমী কাপড় অতি উৎকৃষ্ট হইত এবং তাহা পারস্ত, আরব, মিসর, তুরাণ এবং রোম নগর পর্য্যন্ত রপ্তানী হইয়া সমাদৃত হইত। সোণার ও রূপার অলঙ্কার এবং কাঁসা, পিতল ও তামার বাসন অতীব উৎকৃষ্ট হইত। কিন্তু এই সকল শিল্পের উন্নতি কোন্ সময়ে আরম্ভ হয় তাহা নিরূপণ করা যায় না। বৈষ্ণবরাজবংশ বাঙ্গালাদেশে স্থাপিত হইবার পূর্বেই রোমরাজ্য উৎসন্ন হইয়াছিল। রোম রাজ্যে এই সকল দ্রব্যের সমাদর দেখিয়া ইহা নিশ্চিত বলা যায় যে বৈষ্ণবরাজ-

বংশের অভ্যুদয়ের পূর্বাধি বাঙ্গলাদেশে এই সকল শিল্পের উন্নতি হইয়াছিল। বাঙ্গলাদেশে হিন্দু রাজত্ব এবং বৌদ্ধ রাজত্ব কালে যেরূপ টাকা প্রচলিত ছিল, তাহা সমতুল্যকোণ ছিল। কোন কোন রাজার সময়ে সমতুল্যকোণ টাকাও তৈয়ারী হইত। সেই টাকাতে বিগুদ্ব রৌপ্য ব্যবহৃত হইত। টাকা কাটা রূপাই আদর্শ টাঁদী বলিয়া মাগ্ন হইত। আবার সেই টাকাই সর্বপ্রকার পরিমাণের মূলীভূত ছিল। চব্বিশটি টাকা এক সারিতে রাখিলে যত বড় দীর্ঘ হইত তাহারই নাম এক হাত। সেই হাতের আশী হাতে এক রশি এবং একশত রশিতে এক ক্রোশ হইত। সুতরাং সেই টাকাই সমস্ত দৈর্ঘ্য পরিমাপের মূলীভূত ছিল। পরন্তু সেই টাকা একশতটির যে ওজন তাহারই নাম এক সের। চল্লিশ সেরে এক মাণ এবং চৌষটি মাণে এক রশি বা পুঞ্জ হইত। সুতরাং সেই টাকাই ওজনের মূলীভূত ছিল। এইরূপে সেই টাকা সর্বপ্রকার তুলনার আধার হেতু টাকাকে “তোলা” বলিত। সেই টাকা যখন যে রাজার অনুশাসনে তৈয়ারী হইত সেই রাজার নাম তাহাতে লেখা থাকিত; তাহার রাজ্যের নাম এবং শকাব্দ, কলি অদ্দ কিংবা সম্বৎ লেখা থাকিত কিন্তু কোন টাকায় কোন প্রতিমূর্তি থাকিত না। ইংরেজী টাকায় যেরূপ গবদেশ পর্য্যন্ত মূর্তি থাকে, বোধ হয় হিন্দু ও মুসলমানেরা এইরূপ গলাকাটা মূর্তি দেওয়া অন্তত জ্ঞান করিতেন। আধুলি, সিকি বা দোয়ানী ছিল না। আনা পয়সা প্রভৃতিও ছিল না। টাকা ভাঙ্গাইলে এক বোকা কড়ী পাওয়া যাইত। তদ্বারাই ক্রয় বিক্রয়াদি কার্য হইত। পাঠান রাজত্বেও ঐরূপ ব্যবহারই ছিল। মোগল রাজ্যারম্ভে সর্বপ্রথমে গোলাকার টাকা প্রচলিত হইয়াছিল। তুরানী ভাষায় গোল টাকাকে তঙ্কা বলে। সেই তঙ্কা শব্দের অপভ্রংশে “টাকা” শব্দ উৎপন্ন হইয়াছে।

মন্দির শাস্ত্রকারেরা দিগ্বিজয় জন্ত চেষ্টা করা ক্ষত্রিয় রাজাদিগের একটি প্রধান কর্তব্য কল্প বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। তজ্জন্ত প্রত্যেক পরাক্রান্ত হিন্দু রাজাই দিগ্বিজয়ের চেষ্টা করিতেন। হিন্দুরাজাদের দিগ্বিজয়ের অর্থ কি তাহা যুরোপীয় লোকের বোধগম্য হয় না। তজ্জন্ত হিন্দু রাজগণের নানা দেশ জয় করিবার বর্ণনা দেখিয়া যুরোপীয়েরা তাহা কবিদিগের কল্পনা বলিয়া জ্ঞান করেন।

হিন্দু রাজগণ বহু বিবাহ করিতেন এবং তাঁহাদের বহু সন্তান হইত। যদি রাজগণ যুদ্ধ বিগ্রহ না করিয়া শান্তি ভোগ করিতেন, তবে অল্পকাল মধ্যেই তাঁহাদের

বংশধরগণের সংখ্যা অতিমাত্র বৃদ্ধি হইত । রাজকুমারদের স্বল্প বায়ে জীবিকা নির্বাহ হয় না । এজন্ত রাজবংশ বৃদ্ধি হইলে প্রজাদের অর্থ অধিক পরিমাণে শোষণ করিয়া রাজপুত্রদের ব্যয় চালাইতে হইত । সেই হেতু রাজবংশ বৃদ্ধি পৃথিবীর ভার বৃদ্ধি নামে উক্ত হইত । সেই ভার হ্রাস করার জন্তই শাস্ত্রকারেরা ক্ষত্রিয়দিগের সর্বদা যুদ্ধ বিগ্রহে ব্যাপ্ত থাকার ব্যবস্থা করিয়াছেন । দিগ্বিজয় ও বিবাহ উপলক্ষে ক্ষত্রিয়দিগের মধ্যে ঘোরতর যুদ্ধ উপস্থিত হইত । তাহাতে বহুসংখ্যক রাজপুত্র ও ক্ষত্রিয় নিহত হইয়া পৃথিবীর ভার কম হইত । অধিকন্তু বীরত্ব অভ্যাসমূলক । যাহারা কখন যুদ্ধ করে নাই, যুদ্ধ দেখে নাই তাহারা যত কেন বলবান হউক না, এবং অস্ত্রচালনে যত সুশিক্ষিত হউক না, কদাচ বীর হইতে পারে না । তাহারা মৃত্যু হইবে অথবা শরীরে আঘাত লাগিবে ভাবিয়া ভীত হয় । তজ্জন্ত তাহারা স্থির হইয়া যুদ্ধ করিতে পারে না । ক্ষত্রিয়দিগের মধ্যে সর্বদা যুদ্ধ বিগ্রহ প্রচলিত থাকায় তাহারা যুদ্ধ করিতে অথবা মরিতে ভয় পাইত না ।

হিন্দুদিগের দিগ্বিজয়ে একটি রাজ্য অপর রাজ্যের অন্তর্গত হইত না । পরাজিত রাজা জেতার অধীনতা স্বীকার করিয়া তাঁহাকে বার্ষিক কিছু কিছু অম্বুজর দিতে স্বীকার করিলেই হইত । পরন্তু পরাজিত রাজা হত হইলে তাঁহার স্থানে তাঁহারই কোন দায়াদ রাজা হইত । পরাজিতের রাজ্য কখন জেতার নিজ রাজ্য হইত না । সুতরাং দিগ্বিজয় দ্বারা প্রজাগণের কোনরূপ ক্ষতি বৃদ্ধি হইত না । সেই জন্ত ভারতবর্ষীয় প্রজারা কখন দলবদ্ধ হইয়া বিজেতার সহ যুদ্ধ করিত না । রাজা এবং রাজপুত্রগণ পরাজয়ক্ষতিগ্রস্থ হইতেন এজন্ত তাঁহারা কেবল যুদ্ধ করিতেন । প্রজাগণ রাজাজ্ঞায় বা রাজভক্তি বশতঃ রাজার সাহায্য করিত এবং যোদ্ধৃগণ রাজার পক্ষ হইয়া যুদ্ধ করিত । রাজা যুদ্ধে হত হইবামাত্র সেনাগণ যুদ্ধে ভঙ্গ দিয়া প্রস্থান করিত । যুদ্ধ দুই প্রকার ছিল (১) দ্বৈরথ্য যুদ্ধ বা দ্বন্দ্ব যুদ্ধ (২) চমু যুদ্ধ । দ্বন্দ্ব যুদ্ধে দুই পক্ষের রাজা বা নায়ক পরস্পর যুদ্ধ করিতেন । তাহাতে উভয় পক্ষের সেনাগণ কেবল দর্শকরূপে থাকিত । তাহারা বোধমান বীরদ্বয়ের কোন সাহায্য করিতে পারিত না । চমু যুদ্ধে উভয় পক্ষের সেনাগণ যুদ্ধ করিত । রাজা ও নায়কগণ বাহু রচনা করিতেন এবং সেনা চালাইতেন মাত্র । চমু যুদ্ধেও সময়ে সময়ে

নায়কে নায়কে যুদ্ধ হইত এবং নায়ক নিহত হইলেই যুদ্ধ শেষ হইত। ক্ষত্রিয়দের মধ্যে যুদ্ধ এক প্রকার ক্রীড়া কোতুক সদৃশ ছিল। মহাভারতে দেখা যায় যে, কৃষ্ণ যুধিষ্ঠিরকে কহিলেন যে, “মগধরাজ জরাসন্ধের সৈন্যবল অত্যন্ত অধিক ; চমুষ্টিকে তাঁহাকে পরাজয় করা অসাধ্য। অথচ তাঁহাকে বিনাশ না করিলে রাজস্বয় যজ্ঞ সম্পন্ন হইবে না। এজন্ত আমি ভীমার্জুনকে লইয়া গিয়া জরাসন্ধ সহ দ্বন্দ্বযুদ্ধ করিয়া তাহাকে বিনাশ করিব।” তদনুসারে ভীমার্জুন সহ কৃষ্ণ জরাসন্ধের নিকট গিয়া দ্বন্দ্ব যুদ্ধ প্রার্থনা করিলেন। ভীম ও জরাসন্ধে যুদ্ধ তিন দিন পর্য্যন্ত চলিল। কৃষ্ণ ও অর্জুন অতিথিরূপে জরাসন্ধের বাড়ীতে থাকিলেন এবং যুদ্ধ দেখিতে লাগিলেন। জরাসন্ধ নিহত হইলে তৎপুত্র সহদেব রাজা হইলেন। যে সকল রাজা জরাসন্ধের নিকট বন্দী ছিল কৃষ্ণ তাহাদিগকে মুক্ত করিয়া ভীমার্জুন সহ ইন্দ্রপ্রস্থে ফিরিয়া আসিলেন। মগধ রাজ্যের অপর লোকদের অবস্থা কিছুই পরিবর্তন হইল না। সকল হিন্দুরাজাই মন্যাদি শাস্ত্রকারদিগের নিয়মে প্রজা শাসন করিতেন। সুতরাং রাজপরিবর্তনে প্রজার অবস্থা কিছুই পরিবর্তিত হইত না। এই রাজগণের যুদ্ধে প্রজারা মনোযোগ করিত না। জাতীয় স্বাধীনতা কাহাকে বলে প্রজারা তাহা জানিত না।

বৌদ্ধরাজত্ব অবধি দ্বন্দ্ব যুদ্ধ প্রথা রহিত হইয়াছিল। তদবধি এক রাজা যুদ্ধ করিয়া অল্প রাজার রাজ্য অধিকার করা কতক প্রচলিত হইয়াছিল। কিন্তু সকল রাজারই শাসনপ্রণালী একইরূপ ছিল এজন্ত প্রজাদের অবস্থা রাজপরিবর্তনে বিশেষ পরিবর্তিত হইত না। এই কারণে প্রজারা ঘোট করিয়া দেশের স্বাধীনতা রক্ষার্থ বা উদ্ধারার্থ কদাচ চেষ্টা করিত না।

যুরোপে গ্রীস, রোম প্রভৃতি দেশে সাধারণ তন্ত্র শাসন ছিল। তথায় এক জাতি বা এক দেশীয় লোক অল্প দেশ বা রাজ্য জয় করিলে, বিজেতৃ জাতীয় প্রত্যেক ব্যক্তি জিত দেশ হইতে নিজ স্বার্থলাভের চেষ্টা করিত। জিত জাতির সমস্ত ধন সম্পত্তি জেতৃগণ লইত এবং জিত জাতীয় লোকেরা জেতৃগণের দাস বা তত্তুল্য হইত। এইজন্ত যুরোপে প্রজাগণ প্রাণপণে জাতীয় স্বাধীনতা রক্ষার জন্ত বা তত্বদার জন্ত চেষ্টা করে। এশিয়া খণ্ডে সর্বত্রই রাজতন্ত্র শাসন প্রণালী প্রচলিত। এশিয়াতে এক দেশের রাজা অল্প দেশ জয় করিলে তিনি উভয় দেশের রাজা বলিয়া গণ্য হন এবং উভয় দেশের প্রজাগণকে তিনি তুল্য বিবেচনা

করেন। এশিয়াখণ্ডে জাতীয় দিগ্বিজয় নাই, জাতীয় পরাজয় নাই সুতরাং জাতীয় স্বাধীনতা জ্ঞানও নাই। যুরোপীয়েরা এশিয়াখণ্ডের লোকদিগের বিশেষতঃ হিন্দুদিগের দিগ্বিজয়ের উদ্দেশ্য ও ফলাফল বুঝেন না। তাঁহারা বিলাতী ধরণে এশিয়াখণ্ডে দিগ্বিজয়ের যে ফলাফল অনুমান করেন তাহা কাজে কাজেই ভ্রমপূর্ণ হয়।

গৌড়ীয় পঞ্চরাজ্য পাঠানদিগের অধিকৃত হইলে তাহারা মিথিলারাজ্য মগধ দেশের সহ মিলিত করিয়া শুবে বেহার নাম দিয়াছিল। অবশিষ্ট চারিটি রাজ্য দ্বারা শুবে বাদশালা গঠিত করিয়াছিল। এই দুই শুবার কদাচিৎ পৃথক্ পৃথক্ নবাব নিযুক্ত হইত। সচরাচর এক জন নবাবই এই দুই শুবা শাসন করিতেন। গৌড় নগরে নবাবের রাজধানী ছিল। সুবর্ণগ্রাম, সপ্তগ্রাম, পাটনা ও সাসারাম, এই চারিটি স্থানে চারিজন শরীফ বা উপনবাব ছিল। তাহারা নিকটবর্তী প্রদেশের রাজা, ভূঁইয়া ও গাঁইয়াদিগের নিকট রাজস্ব আদায় করিয়া নবাব-সরকারে পাঠাইত। ঐ পাঁচটি নগরে দুর্গ ছিল। তাহাতে কতকগুলি পাঠান সৈন্য থাকিত। ঐ সকল নগরের আশে পাশে পাঠান সর্দারদিগের জাগীর এবং মুসলমান সাধুদিগের পীরপাল ছিল। অবশিষ্ট সমস্ত দেশ হিন্দু জমীদারেরাই শাসন করিতেন। কিন্তু সেই সকল জমীদারদের জমীদার উপাধি ছিল না। বৃহৎ জমীদারদিগের “রাজা” বা “মহা-রাজ” উপাধি ছিল। আর ক্ষুদ্র জমীদারগণের “গাঁইয়া” ও “ভূঁইয়া” উপাধি ছিল। রাজা মহারাজগণের অধীনেও অনেক গাঁইয়া, ভূঁইয়া ছিল। মোগল-রাজত্বকালে সেই সকল রাজা মহারাজদের জমীদার উপাধি হইয়াছিল। তাঁহাদের অধীন গাঁইয়া ভূঁইয়াদের উপাধি তালুকদার হইয়াছিল। আর যে সকল গাঁইয়া ভূঁইয়া কোন রাজার অধীন ছিল না, তাহাদের উপাধি ছজুরী তালুকদার হইয়াছিল। তাহারা নবাব-সরকারে রাজস্ব দিত।

পাঠানেরা কুটিল রাজনীতি জানিত না। রাজ্য মধ্যে জরিপ জমাবন্দি কিংবা অত্র কোন পাকা বন্দোবস্ত ছিল না। জমীদারেরা যে রাজস্ব দিত, এবং বণিকেরা যে শুদ্ধ দিত, তাহাই নবাবদিগের আয় হইত। তাহা হইতে নিজ ব্যয় বাদে অবশিষ্ট টাকা নবাবেরা দিল্লীর সম্রাটকে পাঠাইতেন। জরিমানা ও উপঢৌকন স্বরূপে নবাবেরা যাহা পাইতেন তাহা তাঁহাদের নিজস্ব ছিল।

তাহার জ্ঞাত কোন হিসাব নিকাশ বাদশাকে দিতে হইত না। নবাবেরা সম্রাটকে মালগুজারী দিতেন বটে, কিন্তু নিজ নিজ শুবায় তাঁহারা যাহা ইচ্ছা তাহাই করিতে পারিতেন। সেইরূপ, জমীদারেরা নবাবকে রাজস্ব দিয়া নিজ নিজ চত্বরে সম্পূর্ণ স্বাধীন ভাবে কার্য্য করিতেন। প্রভু কখন অধীনগণের আভ্যন্তরিক কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতেন না।

বহুলোক এক যৌত পরিবাররূপে বাস করা হিন্দুদিগের মধ্যে চিরকাল প্রচলিত ছিল। বিলাতী কুশিক্ষায় সেই নিয়ম কতক দূর ভঙ্গ হইয়াছে বটে কিন্তু অনেক স্থানেই এখনও বিद्यমান আছে।

রাজা মহারাজদিগের রীতিমত অভিষেক হইত এবং তাঁহাদের কেবল এক জন মাত্র উত্তরাধিকারী হইত। তাঁহাদের অপর দায়াদগণ ভরণ পোষণ জ্ঞাত আয়মা* পাইত। গাঁইয়া ভূঁইয়াদের অভিষেক হইত না এবং তাঁহাদের উত্তরাধিকারিগণ শাস্ত্রমত দায় ভাগ করিয়া লইতেন। জমীদারগণের উত্তরাধিকারে বিবাদ হইলে অথবা দুই জমীদারের মধ্যে রাজ্যের সীমানা লইয়া বিবাদ উপস্থিত হইলে তাহার সীমাংসা যুদ্ধ কিংবা সালিশ দ্বারা হইত। কদাচিৎ পরাজিত পক্ষ নবাবের দরবারে নালিশ করিত। ঈদৃশ নালিশ করা নিতান্ত কাপুরুষের কার্য্য বলিয়া গণ্য ছিল। নবাবের কর্ম্মচারী সমস্তই ঘুষখোর ছিল। বিবাদের পক্ষগণ মধ্যে যে বেলা টাকা বায় করিতে পারিত, বিবাদে প্রায়শঃ তাহারই জয় হইত। সুতরাং পরাজিত পক্ষ নালিশ করিয়া প্রায়ই কোন ফল পাইত না। তজ্জন্ত ঈদৃশ নালিশ অতি অল্পই হইত। জমীদারদিগের অধীন প্রজারা কখন নবাব দরবারে নালিশ করিতে যাইত না। নবাবেরাও তাদৃশ প্রজা সাধারণ সম্বন্ধে কোন প্রকার হস্তক্ষেপ করিতেন না। সুতরাং সাধারণ প্রজার সহ নবাবের কোন সম্বন্ধ ছিল না।

বেহার প্রদেশে অধিকাংশ জমীদার ক্ষত্রিয় ছিল, অবশিষ্ট ব্রাহ্মণ ছিল। বঙ্গালা দেশে ক্ষত্রিয় না থাকায় ব্রাহ্মণ, বৈদ্য ও কায়স্থেরাই সমস্ত দেশের জমীদার ছিল। কোন নিকৃষ্টজাতীয় লোক ভূম্যধিকারী হইতে পারিত না। নবাব কিংবা শরীফগণ কোন ছোট লোককে কখন কখন গাঁইয়া ভূঁইয়া নিযুক্ত করিতেন।

* আয়মা শব্দ আরবী-ভাষামূলক। কোন রাজপুত্র বা অপর বড় মানুষের ভরণপোষণ জ্ঞাত প্রদত্ত ভূমির নাম আয়মা। ইহা সংস্কৃত 'নাথুকর' শব্দের তুল্য।

কিন্তু প্রজারা তাদৃশ জমিদারকে মাগ্ন করিত না এবং সুযোগ পাইলেই হত্যা করিত । পাঠান রাজস্ব দৃঢ়ীভূত হইলে, নবাবেরা হিন্দু জমিদারদিগকে বিচ্যুত করিয়া পাঠান সর্দারগণকে জমিদারী দিতে পারিতেন । কিন্তু নবাবেরা তদ্রূপ চেষ্টা বা ইচ্ছা করেন নাই । তাহার অনেকগুলি কারণ ছিল । বাঙ্গালাদেশে এক্ষণে যেরূপ অরক্ষণীয় সমতল ক্ষেত্র, পূর্বের একরূপ ছিল না । নদী, হ্রদ ও জঙ্গল দ্বারা বাঙ্গালাদেশ অতি দুর্ভেদ্য স্থান ছিল । ঈদৃশ দুর্গম দেশের অভ্যন্তরে স্বল্পসংখ্যক পাঠান ছড়াইয়া পড়িলে হিন্দুগণ কর্তৃক বিনষ্ট হইবার ভয় ছিল । যদি পাঠান সর্দারের সঙ্গে উপযুক্ত সৈন্য সামন্ত থাকিত, তবে তাহাদের ব্যয়েই সমস্ত রাজস্ব নিঃশেষ হইত ; নবাবের ভাণ্ডারে কিছুই প্রেরিত হইত না । অধিকন্তু পাঠান সর্দারেরা অনেকেই লেখা পড়া জানিত না, আদায় তহশীল কার্য্য কিছুমাত্র বুঝিত না, অথচ অতিশয় উগ্রপ্রকৃতি এবং বহুবায়ী ছিল । তাহারা যুদ্ধস্থলে যেমন বীর ছিল, তেমনই আবার শান্তি সময়ে নিতান্ত অলস ও বিলাসী ছিল । তাহাদিগকে জমিদারী দিলে তাহারা উপযুক্ত পরিমাণে রাজস্ব আদায় করিতে পারিত না এবং যাহা আদায় করিত, তাহাই ব্যয় করিয়া ফেলিত । সুতরাং নবাবের নিকট মালগুজারী দিতে পারিত না । সেই বাকির জন্ত পীড়াপীড়ি করিলে অমনি পাঠান সর্দার বিদ্রোহী হইত । এই সমস্ত কারণে নবাবেরা পাঠানদিগকে দেশের অভ্যন্তরে জমিদারী দিতেন না । সুতরাং বাঙ্গালাদেশ মু লমানদিগের অধিকৃত হইলো ও দেশের অভ্যন্তরে হিন্দুরাজ্যই চলিতেছিল ।

তৃতীয় অধ্যায় ।

সম্ভ্রদীন ।—সাত্তাল ও ভাহুড়ীবংশ ।—সাত্তালগড় ।—ভাহুড়ীচক্র ।—একটাকিয়া

ভাহুড়ীদের উপাধি ।—চলনবিল ।—সপ্তদুর্গা—ফুলমতী ।—কংসরাম ।—

বজ্রবাহ ।—ময়জুদীন ।—হাবসী রাজগণ ।

বাঙ্গালাদেশ মুসলমান অধিকারভুক্ত হইলে, দেড় শত বৎসরকাল দিল্লীর সম্রাটের অধীন ছিল । তাহার পর বিকৃতবুদ্ধি মহম্মদ তোগলকের অত্যাচারে সাম্রাজ্য ভঙ্গ হইতে আরম্ভ হয় । গুবার গুবার নবাবেরা স্বাধীন হইয়াছিল । বাঙ্গালার নবাব সম্ভ্রদীন* তন্মধ্যে সর্বপ্রথম পথপ্রদর্শক । এখন নানা কারণে বাঙ্গালাদেশে মুসলমানের সংখ্যা অতিমাত্র বৃদ্ধি হইয়াছে । এখন বাঙ্গালাদেশে যত মুসলমান আছে, পৃথিবীর অত্র কোন দেশেই এই পরিমাণ স্থানে এত অধিক সংখ্যক মুসলমান নাই । কিন্তু সম্ভ্রদীনের সময়ে সমস্ত বাঙ্গালা ও বেহারে চৌত্রিশ হাজারের বেশী মুসলমান ছিল না । সম্ভ্রদীন বেশ বুঝিয়াছিলেন যে, সেই স্বল্পসংখ্যক মুসলমানগণের সাহায্যে তিনি কদাচ সম্রাটের বিরুদ্ধে আত্মরক্ষা করিতে পারিবেন না । অধিকন্তু বিদ্রোহকালে সেই সকল মুসলমান তাঁহার স্বপক্ষে থাকিবে কি না তাহাও অনিশ্চিত । এজন্ত তিনি একদল হিন্দু-সেনা সংগ্রহ করিতে মনস্থ করিলেন । তিনি নিজ হিন্দু-কর্মচারীদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “তোমাদের হিন্দুর মধ্যে শ্রেষ্ঠ কে ?” তাহারা কহিল, “হিন্দুর মধ্যে শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ, ব্রাহ্মণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কুলীন, আর কুলীনের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, আমরা যতদূর জানি, দামনাশের সাত্তাল এবং ভাজনীর ভাহুড়ী ।” সেই কথা শুনিয়া নবাব দামনাশ হইতে শিখাই (শিখিবাহন) সাত্তালকে এবং ভাজনী হইতে স্রবুদ্ধিরাম ভাহুড়ী, কেশবরাম ভাহুড়ী এবং জগদানন্দ ভাহুড়ীকে আহ্বান করিয়া নিজ উদ্দেশ্য সাধনে নিযুক্ত করিলেন ।

এই ভাহুড়ীবংশ চিরবিখ্যাত । যে সময়ে পশ্চিমবঙ্গে পাঠানরাজত্ব এবং পূর্ববঙ্গে বৈষ্ণবরাজত্ব চলিতেছিল, সেই সময়ে বালিহাটী গ্রামে (বর্তমান ঢাকা

* মুদ্রায় অঙ্কিত সম্পূর্ণ নাম সম্ভ্রদীন আবুল মজঃফর ইলিয়াস শাহ । সম্ভ্রদীন অত্যন্ত ভাঙ্গ খাইতেন বলিয়া লোকে তাঁহাকে ‘ভাঙ্গরা’ বলিত ।

জেলায় বালিয়াটী) মহাত্মা উদয়নাচার্য্য ভাটুড়ীর জন্ম হয়। তাঁহার তুল্য পণ্ডিত বাঙ্গালা দেশে এ পর্য্যন্ত আর কেহ হয় নাই। তাঁহার তীর্থপর্য্যটন সময়ে চিত্রকূট পর্ব্বতে শঙ্করাচার্য্য সহ সপ্তাহকালব্যাপী যে তর্ক বিতর্ক বিচার হয়, তাহাই দিগ্দেশবিখ্যাত। দাক্ষিণাত্যবাসী শঙ্করাচার্য্য বেদবিজ্ঞান পারদর্শী ছিলেন বটে, কিন্তু বুদ্ধিমান বাঙ্গালী পণ্ডিতের ত্যায় স্মৃত্যর্কিক ছিলেন না। শঙ্কর যে তর্কে মগুন পণ্ডিত ও তৎপত্নী উভয়ভারতীকে পরাজয় করিয়াছিলেন, উদয়নের সম্মুখে তাহা খাটিল না। * উদয়নাচার্য্যের রচিত ‘কুহুমাজ্জলি’, ‘তীর্থ-মাহাত্ম্যং’ প্রভৃতি অনেক গ্রন্থ আছে, তাহা বাঙ্গালাদেশের বাহিরে প্রচার নাই। এই মহাত্মার বংশে যত পণ্ডিত, যত রাজা এবং যত বীরপুরুষ জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, তত বাঙ্গালাদেশের অগ্র কোন বংশেই দেখা যায় না। বৃহস্পতি ভাটুড়ীর পুত্র উদয়ন আচার্য্য। তাঁহার পঞ্চম পুরুষে কৃষ্ণ ভাটুড়ী। কৃষ্ণের পুত্র সুবুদ্ধি, কেশব এবং জগদানন্দ। তাঁহাদের সন্তানই একটাকিয়া রাজবংশ। এক্রূপ অনুমান হয় যে উদয়ন যখন মিথিলাদেশে ত্যায় শাস্ত্র পড়িতেন তখন তথায় এক বিবাহ করিয়াছিলেন। বোধ হয় তখন এক্রূপ বিবাহ রীতিবিরুদ্ধ ছিল না। সেই বিবাহের সন্তানও মিথিলা প্রদেশে বিদ্যমান আছে।

জগদানন্দ পারসী ভাষা জানিতেন; নবাব তাঁহাকে “রায়” উপাধি দিয়া দেওয়ান (রায়রাইয়্য) করিলেন। আর শিখাই, সুবুদ্ধি ও কেশবকে “খাঁ” উপাধি দিয়া সেনাপতিপদে বরণ করিলেন। সাত্তাল ও ভাটুড়ীত্রয় নবাবের কর্ম্ম স্বীকার করিয়া হিন্দুদের স্বাভাবিক প্রভুভক্তি অলুয়ায়ী নবাবের উদ্দেশ্য সাধনে ব্রতী হইলেন। এক বৎসর মধ্যেই নবাবের ভাণ্ডারে মহাযুদ্ধের উপযুক্ত অর্থ ও রসদ সঞ্চিত হইল। আর পঞ্চাশ হাজার হিন্দু-সেনা সংগৃহীত ও সুশিক্ষিত হইল। নবাব তাঁহার হিন্দু-কর্ম্মচারীদের যোগ্যতা এবং প্রভুভক্তি দর্শনে অতীব তুষ্ট হইলেন। তাঁহার মুসলমান-সেনাগণ বিপক্ষে যোগ না দিতে পারে এই উদ্দেশ্যে তিনি কতকগুলি মুসলমান-সৈন্য সেই হিন্দু-সেনাপতিদের অধীনে দিলেন। আবার কতকগুলি হিন্দু সৈন্য লইয়া মুসলমান-সেনাপতির অধীনস্থ করিলেন। হিন্দু ও মুসলমানগণ পরস্পরকে দৃঢ় বিশ্বাস করিত না। সুতরাং নবাবের নিজ সৈন্যদের মধ্যে ষড়যন্ত্র বা বিদ্রোহের আশঙ্কা থাকিল না। এইরূপে আট

* শঙ্কর: শঙ্করভাষ্যে উদয়নো নারায়ণ: স্বয়ম্ ।

ঘাট বাধিয়া ৭৪৬ হিজরীতে সম্ভ্রদীন “শাঃ” অর্থাৎ স্বাধীন রাজা উপাধি গ্রহণ করিলেন। সম্রাট্ মহম্মদ তোগলক এবং পরে ফেরোজ তোগলক কোন মতে সম্ভ্রদীনের আয়ত্ত করিতে না পারিয়া অবশেষে তাঁহার স্বাধীনতা স্বীকার করিলেন। এই অবধি দুইশত বৎসরকাল বাঙ্গালা ও বেহার একটি স্বাধীন সাম্রাজ্য ছিল। তৎকালে সম্রাট্ বা বাদশাঃ বলিলে দিল্লীর সম্রাট্কেই বুঝাইত, এইজন্য বাঙ্গালার সম্রাট্দিগকে “গোড়-বাদশাঃ” বলা হইত।

সাত্তাল এবং ভাছুড়ীত্রয়ই সম্ভ্রদীনের উন্নতির প্রধান সহায় ছিলেন। এজন্য তিনি তাঁহাদিগকে দুইটি প্রকাণ্ড জাগীর দিয়াছিলেন। শিখাই সাত্তালের জাগীর পদ্মার উত্তরে চলনবিলের দক্ষিণে অবস্থিত ছিল। সাত্তালগড় বা সাঁতোড়ে তাঁহার রাজধানী ছিল। তাঁহার জাগীরের বার্ষিক মুনাফা একলক্ষ টাকা ছিল। যদিও গোড়বাদশাহের দরবারে শিখাইর খাঁ উপাধি ছিল, তথাপি শিখাই বা তৎংশীয়েরা কখন মফঃস্বলে খাঁ উপাধি গ্রহণ করেন নাই। তাঁহারা ঐশ্বর্য্যজ্ঞাপক অথ কোন উপাধিও ধারণ করেন নাই। তাঁহারা কুলপতির সন্তান বলিয়া অত্যন্ত কুলাভিমानी ছিলেন। তজ্জন্ম তাঁহারা নিজ সাত্তাল উপাধিই বরাবর স্থিরতর রাখিয়াছিলেন। শিখাই সাত্তালের তিন পুত্র; প্রথম, বলাই সাঁতোড়ে রাজা হন; দ্বিতীয়, কানাই কুলের রাজা বা কুলপতি এবং তৃতীয়, সত্যবান বা প্রিয়দেব কোজদার। এই সত্যবানের পুত্র রাজা কংসরাম বাদশাঃ।

ভাছুড়ীত্রয়ের জ্যেষ্ঠভ্রাতা সুবুদ্ধি খাঁ জাগীর পাইয়া রাজা হইয়াছিলেন। তাঁহার জাগীর চলনবিলের উত্তরে ছিল। নিজ চলনবিলও এই দুই জাগীর-দারের অধিকৃত ছিল। ভাছুড়ীর জাগীর চাকলে ভাছুড়িয়া (ভাতুড়িয়া) নামে খ্যাত হইয়াছিল। পণ্ডিতেরা সেই নাম সংস্কৃত করিয়া “ভাছুড়ীচক্র” বলিতেন। এই জাগীরের মুনাফা একলক্ষ টাকার অধিক ছিল। সুবুদ্ধি খাঁ তাহাতে প্রায় স্বাধীন রাজার স্থায় ছিলেন। তিনি নিজ নামে মুদ্রা ছাপিতেন না এবং বার্ষিক এক টাকা গোড়বাদশাকে নজর দিতেন। এজন্য তৎংশীয় রাজাদিগকে “এক-টাকিয়া রাজা” বলিত। তাহার পর সুবুদ্ধি খাঁ, কেশব খাঁ এবং জগদানন্দ রায়ের সন্তানেরা সকলেই “একটাকিয়া ভাছুড়ী” বলিয়া পরিচিত হইতেন। খাঁ, সিংহ এবং রায় এই তিনটি উপাধি ইহাদের প্রসিদ্ধ। একটাকিয়া ভাছুড়ীবংশে অথ কোন উপাধি নাই।

গৌড়বাদশাহের সেনাপতি হইলেই হিন্দুদের খাঁ উপাধি হইত। তাঁহাদের সম্মান বৃদ্ধি হইলে খাঁ সাহেব বলা যাইত। বঙ্গীয় রাঢ়ী ব্রাহ্মণ এবং কায়স্থের মধ্যেও খাঁ উপাধি আছে। কিন্তু “খাঁ সাহেব” উপাধি বাদশাহী দরবারে একটাকিয়া ভাড়াটীদের ভিন্ন অত্র কাহারও হয় নাই। বাংলাদেশ ভিন্ন অত্র কোন হিন্দুর খাঁ উপাধি নাই। একটাকিয়াদের মধ্যে যিনি রাজা হইতেন, প্রথম প্রথম কেবল তাঁহারই “খাঁ সাহেব” উপাধি হইত। রাজার ভ্রাতাদের মধ্যে যিনি সৈনিক বিভাগে কর্ম করিতেন, তাঁহার সিংহ উপাধি হইত, আর যিনি দেওয়ানী বিভাগে কর্ম করিতেন, তাঁহার রায় উপাধি হইত। তাহার পর ক্রমশঃ ঐ সকল উপাধি বংশানুক্রমিক হইয়াছিল। সিংহ উপাধি ক্ষত্রিয়-দিগেরই প্রসিদ্ধ। পশ্চিমপ্রদেশে অনেক ব্রাহ্মণেরও সিংহ উপাধি আছে। বাংলাদেশে একটাকিয়া ভাড়াটীবংশে ও সুপুঞ্জের রাজবংশে ভিন্ন অত্র কোন ব্রাহ্মণের সিংহ উপাধি নাই।

“রায়” এবং মহারাজ্জিদেশীয় “রাও” উপাধি “রাজ” শব্দের অপভ্রংশ। প্রবোধচন্দ্রোদয় নাটকে দেখা যায় যে, মহারাজ শব্দের অপভ্রংশে “মহারায়” শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। তন্মধ্যে “মহা” কথাটুকু ত্যাগ করিয়া রাজ শব্দ স্থানে রায় শব্দ বা রাও শব্দ চলিত হইয়াছে। তাহারই জ্বীলিঙ্গে রায়ণী বা রাণী শব্দ হইয়াছে। রাজা ও রাণী উপাধি অনেক মুসলমানের আছে। কিন্তু রায় এবং রাও উপাধি কোত্রাপি কোন মুসলমানের নাই। জগদানন্দের বংশে রায় উপাধি এবং স্রবুদ্ধি খাঁর ও কেশব খাঁর বংশে খাঁ ও সিংহ উপাধি এখনও আছে।

বরেন্দ্রভূমিতে “চলনবিল” নামে একটি অতি প্রসিদ্ধ বিস্তীর্ণ হ্রদ আছে। পূর্বে তাহার আয়তন আরও বেশী ছিল। বহুসংখ্যক নদ নদী ও শাখানদী এই হ্রদে পতিত হইয়াছে, আর কয়েকটি নদী ও সোঁতা এই হ্রদ হইতে নির্গত হইয়াছে। সেই সকল নদ নদী দ্বারা আনীত বালুকায় এই হ্রদ ক্রমশঃ পূর্ণ হইয়া যাইতেছে। বর্ষাকালে এই হ্রদের মধ্যস্থল হইতে চারিদিক্ দৃষ্টি করিলে স্থল কূল কিছুই দৃষ্ট হয় না। বোধ হয় যেন সেই প্রকাণ্ড জলরাশি অর্দ্ধবর্তুলাকার আকাশের সহ মিলিত হইয়াছে। হ্রদের জল সর্বাংশে গভীর নহে। গ্রীষ্মকালে অনেকাংশের জল শুষ্ক হইয়া যায়। প্রতি বৎসর নূতন পলি পড়ায় এই শুষ্ক

অংশের ভূমি অতি উর্বরা। বিনা পরিশ্রমে বা অত্যল্প পরিশ্রমে সেই জমিতে প্রচুর শস্য হয়। ভাছড়ীচক্র ধনধান্যপরিপূর্ণ অতি সমৃদ্ধ রাজ্য ছিল। পুরাতন-অবস্থা-অপরিজ্ঞাত ব্যক্তির নিকট ভাছড়িয়ার লক্ষ টাকা রাজস্ব সামান্য বোধ হইতে পারে। কিন্তু তাহাদের জানা উচিত যে, তখন জিনিসের মূল্য অতি কম ছিল। তখন এক টাকায় আট দশ মণ চাউল মিলিত। এখন একমণ চাউলের দাম পাঁচ ছয় টাকা। এক্ষণে দ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধি হওয়ায় টাকার মূল্য সেই অনুপাতে কমিয়া গিয়াছে। তখনকার একলক্ষ টাকা স্মরণে এখনকার ত্রিশ চল্লিশ লক্ষ টাকার তুল্য ছিল। তখন সমস্ত বাঙ্গালা বেহারের অধিপতি গোড়াবাদশাহের বার্ষিক লভ্য পঞ্চাশ লক্ষ টাকার বেশী ছিল না। তখন বিদেশী দ্রব্যের আমদানী অতি কম ছিল। এখন আমরা যত প্রকার দ্রব্য প্রয়োজনীয় বোধ করি, তখন এত দ্রব্য প্রয়োজনীয় বলিয়া গণ্য ছিল না। স্মরণে একটাকিয়াদের বার্ষিক লক্ষ টাকা মুনাফায় অতি ধুমধামে রাজত্ব চলিত।

চলনবিলের উত্তরাংশে একটি দ্বীপে ভাছড়িয়ার রাজধানী ছিল। তখন সর্বদা রাজবিপ্লব ও দস্যভয় থাকাতে বড় মানুষেরা নিসর্গসংরক্ষিত দুর্ভাগ্য স্থানে বাসস্থান করিতে চেষ্টা করিতেন। তাহা না যুটিলে কৃত্রিম উপায়ে বাসস্থান সংরক্ষিত করিতেন। প্রাচীন রাজধানী সমস্তই পর্বত, জঙ্গল, জলাশয় বা মরুভূমি দ্বারা বেষ্টিত অতি দুর্ভেদ্য স্থানে স্থাপিত হইত। ভাছড়িয়ার রাজধানী যেমন জলাশয় দ্বারা বেষ্টিত, তেমনি আবার দুর্গ প্রাচীরাদি কৃত্রিম উপায়ে সংরক্ষিত ছিল। আদৌ সমস্ত দ্বীপই প্রাচীরবেষ্টিত ছিল, পরে নদীশ্রোতে সঞ্চিত বালুকা দ্বারা প্রাচীরের বাহিরে পশ্চিম ও দক্ষিণ দিকে চড়া পড়ায় সেই দিকে পরিখা খনন করা হইয়াছিল, আবার পরিখার উপর দুইটি কাঠের পুল নির্মিত হইয়াছিল। জলপথে সর্বদা যাতায়াতের সুবিধা থাকায় এখানে বাণিজ্যের একটি প্রধান আড্ডা ছিল। নগরে প্রচুর দ্রব্য আমদানী হইত, স্মরণে বহু লোক সত্ত্বেও এখানে কোন দ্রব্য দুষ্টমূল্য ছিল না। নগরের চতুর্দিকবর্তী জলে শ্রোত ছিল। তাহাতে নিষ্কিন্তু নয়লা সেই শ্রোতে স্রুদূরে বাহিত হইত; এজন্ত স্থানটি বেশ স্বাস্থ্যকর ছিল।

নগরের বাহিরে বিল ভরট্ট জমিতে কেহ বাস করিতে পারিত না। তথায়

কেবল বাগান, কৃষিক্ষেত্র এবং পশুচারণ ভূমি ছিল। তাহাতে কখন কখন কৃষক, পশুপালক এবং রজকেরা সামান্য কুটীর নির্মাণ করিয়া অস্থায়ী ভাবে বাস করিত। কোন শত্রু-আক্রমণের আশঙ্কা হইলে অমনি সেই সকল সামান্য কুটীর দগ্ধ করা হইত, পরিখার পুল ভাঙ্গা হইত এবং আবশ্যক হইলে শস্ত-ক্ষেত্রাদিও নষ্ট করা হইত। কোন বিপক্ষ আসিয়া নগরের বাহিরে কোন শাণ্ড্রব্য এবং বাসস্থান না পায়, ইহাই প্রধান লক্ষ্য ছিল। নগরের উত্তর প্রান্তে একটি, পূর্বে একটি ও দক্ষিণে দুইটি এবং পশ্চিমে তিনটি দুর্গ ছিল। এই জগু সেই নগরের নাম সাতগড়া হইয়াছিল। পণ্ডিতেরা সেই নাম সংস্কৃত করিয়া “সপ্তদুর্গা” বলিতেন।

প্রাচীরবেষ্টিত নগর উত্তর দক্ষিণে লম্বা ছিল। তাহার সর্বোত্তরে দুর্গবদ্ধ রাজবাটী, রাজার ঠাকুরবাড়ী, অতিথিশালা এবং বাগান ছিল। পশ্চিমদিকে অধিকাংশ দেশোয়ালীর বাস ছিল এবং সমস্ত মুসলমান-সিপাহী ও কর্মচারীগণ পশ্চিম পাড়ায় বাস করিত। ঐ দিকেই তাহাদের মসজিদ, দর্গা এবং ইমাম-বাড়ী ছিল। সমস্ত ব্রাহ্মণের বাস পূর্বে পাড়ায় ছিল। বৈষ্ণব কায়স্থদেরও কতক পূর্বে পাড়ায় থাকিত। তাহাদের ক্রীত দাস দাসী স্ব স্ব প্রভুর বাড়ীর একপার্শ্বে বাস করিত। নগরের মধ্যভাগে বাজার, থানা এবং কারাগার ছিল। অবশিষ্ট সমস্ত লোক দক্ষিণ পাড়ায় বাস করিত। বাজারের রাস্তাগুলি বেশ পরিসর ছিল, কিন্তু পাড়ার ভিতর গলি সমুদায় অতি সঙ্কীর্ণ ছিল।

হিন্দু মুসলমানে কোন বিবাদ না হয় এই উদ্দেশ্যে সাতগড়ায় কয়েকটি বিশেষ নিয়ম ছিল। সাতগড়ায় কেহ শূকর আনিতে পারিত না এবং মুসলমানের পরদিনে শঙ্খধ্বনি করিতে পারিত না। মুসলমানেরা নিজ পক্ষ উপলক্ষে রাজকীয় সাহায্য পাইত। মুসলমান সাধুরা নিষ্কর ভূমি অর্থাৎ পীরপাল পাইত; কেহ কেহ নগদ টাকা বৃত্তি পাইত। পক্ষান্তরে তাহারা গোহত্যা ও গোমাংস ভক্ষণ করিতে পারিত না; পিতৃকুলে বিবাহ করিতে পারিত না। ইহা ভিন্ন মুসলমানেরা স্বেচ্ছাপূর্ব্বক অনেক হিন্দু ব্যবহার গ্রহণ করিয়াছিল। সাতাল-রাজ্যে ও ভাটুড়ী-রাজ্যে মুসলমানদের উত্তরাধিকারিত্ব হিন্দু দায়ভাগ অনুসারে হইত। অথচ তদ্বিষয়ে কোন রাজনিয়ম ছিল না। সুবুদ্ধি থা যে উদ্দেশ্যে এই সকল নিয়ম করিয়াছিলেন, তাহা সম্পূর্ণ সফল

হইয়াছিল। যে সময়ে হিন্দু মুসলমানে এবং মুসলমানে মুসলমানে সর্বদা কাটাকাটি মারামারি হইত, সেই সময়ে সাতগড়ায় মুসলমানেরা নির্ব্বাদে বংশানুক্রমী বিশ্বস্তরূপে একটাকিয়া রাজবংশের চাকরি করিয়াছিল। তাহারা কখন রাজার সহ কোন বিবাদ করে নাই, হিন্দুদের সহ কোন বিবাদ করে নাই এবং নিজেরাও পরস্পর কোন গুরুতর বিবাদ করে নাই। একটাকিয়া রাজবংশের প্রতি সেই মুসলমানদের যে অচলা ভক্তি ছিল, তাহার ভূরি ভূরি প্রমাণ পাওয়া যায়।

জাগীরদারেরা প্রকৃত পক্ষে গোড়-বাদশাহের চাকর ছিলেন। তাঁহারা যে নিষ্কর ভূমি ভোগ করিতেন, তাহাই তাঁহাদের বেতনস্বরূপ ছিল। তাঁহারা স্বয়ং বা প্রতিনিধি দ্বারা বাদশাহের দরবারে উপস্থিত থাকিতেন এবং তাঁহার হুকুম অনুযায়ী কার্য্য নির্ব্বাহ করিতেন। ইহাতে জাগীরদারদের লাভ ভিন্ন ক্ষতি ছিল না। তাঁহাদের প্রতিনিধিরা ফৌজদার অর্থাৎ সেনাপতি নামে অভিহিত হইতেন। গোড়-বাদশাহগণ যাবতীয় রাজকার্য্য সেই ফৌজদারদের সহ পরামর্শকরিয়া নির্ব্বাহ করিতেন। প্রদেশীয় শাসনকর্ত্তা কিংবা অথ কোন সম্ভ্রান্ত কর্ম্মচারীর পদ খালি হইলে ফৌজদারগণ-মধ্য হইতে কোন কোন ব্যক্তি মনোনীত হইতেন, সুতরাং ফৌজদারদের অর্থ এবং সম্মান উভয়ই লাভ হইত। সম্ভ্রাদীনের অধীনে কেবল চারিজন হিন্দু-ফৌজদার ছিল, অবশিষ্ট সমস্তই মুসলমান ফৌজদার। সুবুদ্ধি খাঁর পক্ষে তাঁহার ত্রাতৃপুল্ল মধুসূদন খাঁ এবং শিখাই সাত্তালের পক্ষে তাঁহার তৃতীয় পুত্রের পুত্র কংসরাম সাত্তাল (খাঁ) ফৌজদার ছিলেন।

সম্ভ্রাদীন স্বর্ণগ্রামের নিকট ব্রজযোগিনী (বজ্রযোগিনী) গ্রামে একটি পরমা সুন্দরী নবযুবতী বিধবা ব্রাহ্মণকন্যা দেখিয়া বলপূর্ব্বক তাহাকে আহরণ করিয়া-ছিলেন। তাঁহার হিন্দু-ফৌজদারগণ এই কার্য্য রাজধর্ম্মের বিরুদ্ধ বলিয়া কন্যাটির মুক্তি প্রার্থনা করিল। বাদশাহ কহিলেন, “যদি কোন ব্রাহ্মণ তাহাকে বিবাহ করে, তবে আমি তাহাকে ছাড়িয়া দিতে পারি। নতুবা আমি নিজে তাহাকে নিকা করিব। আমি এই সুন্দর ফুলটি কদাচ বুথা নষ্ট হইতে দিব না।” বাদশাহ স্বয়ং তাহাকে নিকা করিয়া তাহার নাম ফুলমতী বেগম * রাখিয়াছিলেন।

* ফুলমতী বেগমের পূর্ব্বনাম ও পরিচয় এখন পাওয়া যায় না। ইনি বঙ্গদেশের ক্রিওপেট।।

তিনি ফুলমতীর প্রেমে মুগ্ধ হইয়া নিজের পূর্বপত্নী ও তৎসন্তানদের প্রতি একবারে মমতাশূন্য হইয়াছিলেন। ফুলমতীর গর্ভে সমুদ্রদীনের তিন পুত্র এবং কয়েকটি কন্যা হইয়াছিল। বৃদ্ধকালে সমুদ্রদীন ফুলমতীর জ্যেষ্ঠ পুত্র নাবালক ময়জুদ্দীনকে নিজ উত্তরাধিকারী রূপে নির্দিষ্ট করিয়াছিলেন। ফৌজদার কংসরামকে তাহার অভিভাবক নিযুক্ত করিয়াছিলেন। আর সমস্ত হিন্দু মুসলমান ফৌজদার ও প্রধান কৰ্মচারিগণকে ময়জুদ্দীনের পক্ষ সমর্থন জন্ত শপথ করাইয়াছিলেন। ভাবী বিপদ-আশঙ্কা নিবারণ জন্ত তিনি নিজ প্রথম পক্ষের স্ত্রী ও সন্তানগণকে পাণ্ডুরা দুর্গে আটক করিয়া তাহাদের ভরণপোষণ জন্ত মাসিক কেবল এক হাজার টাকা তন্থা নির্দিষ্ট করিয়াছিলেন।

বাদশাহের মৃত্যু হইবামাত্র * তাঁহার সমস্ত প্রবত্ত বার্থ হইল। অধিকাংশ মুসলমানেরা জ্যেষ্ঠ কুমারদের পক্ষ হইয়া তাহাদিগকে মুক্ত করিল এবং বড় বেগমের জ্যেষ্ঠ পুত্র গয়সুদ্দীনকে সিংহাসনে বসাইতে চেষ্টা করিল।† চতুর মধুসূদন খাঁ কোন পক্ষেই যোগ দিলেন না, কেবল কংসরাম একাকী ময়জুদ্দীনের

* হিজরী ৭৫৮ ।

† রিয়াজ-গ্রন্থকারের সহিত এই স্থলে বিশেষ অনৈক্য দৃষ্ট হয়। রিয়াজের মতে সমুদ্রদীনের মৃত্যুর পর তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র সেকেন্দর শাহ বাদশাহ হন। সেকেন্দরের দুই পত্নী। প্রথমা পত্নীর গর্ভে ১৭টা পুত্র ও দ্বিতীয়া পত্নীর গর্ভে গয়সুদ্দীন নামে একটি পুত্র হয়। বিমাতার চক্রান্তে গয়সুদ্দীন নানা বিপদে পড়িয়া পিতার নিকট হইতে পলায়ন পূর্বক সৈন্ত সংগ্রহ করিয়া পিতৃহন্ত হইতে রাজ্যভার গ্রহণ করিবার নিমিত্ত পিতার সহিত যুদ্ধার্থ গমন করেন। পুত্রের সহিত যুদ্ধে সেকেন্দর হত হন। গয়সুদ্দীন রাজ্য গ্রহণ করিয়া বৈমাত্রেয় ভ্রাতৃবৃন্দের বিনাশ করেন, পরে হিজরী ৭৭৫ অব্দে রাজা কংশের চক্রান্তে স্বয়ং নিহত হন। তাঁহার পুত্র সায়ফউদ্দিন ও তৎপরে তৎপুত্র সমুদ্রদীন সিংহাসনে অধিরূঢ় হন। ইঁহাকে রাজা কংশ হিজরী ৭৮৮ সালে হত্যা করিয়া স্বয়ং রাজা হন।

ইতিহাসে যখন দুইজন সমুদ্রদীনের উল্লেখ পাওয়া যায় তখন ময়জুদ্দীন কোন সমুদ্রদীনের পুত্র, সে বিষয়ে বিশেষ সন্দেহ হইবার কথা। কিন্তু যদি এই ময়জুদ্দীনই পরে সেকেন্দর উপাধি গ্রহণ করিয়া থাকেন তাহা হইলে ইঁহার প্রথমোক্ত সমুদ্রদীনের পুত্র হওয়াই সম্ভব। এই ইতিহাসোক্ত গয়সুদ্দীন রিয়াজোক্ত গয়সুদ্দীন কিনা, সে বিষয়েও মিমাংসা করিবার কোনও উপায় নাই।

পক্ষে থাকিলেন। ফুলমতী দেখিলেন, বিবাদ করিলে সুফলের আশা নাই। এজন্ত তিনি ঘোষণা করিলেন যে, “যদিও স্বর্গীয় সম্রাট ময়জুদ্দীনকে নিজ উত্তরাধিকারী বলিয়া নির্দেশ করিয়া গিয়াছেন, তথাপি সেই আদেশ রাজনীতি ও ধর্মনীতিবিরুদ্ধ বলিয়া প্রতিপালনীয় নহে। ‘রাজার জ্যেষ্ঠ পুত্র রাজা হয় এবং অত্যাচ পুত্রগণ যথোপযুক্ত আয়মা পার’ ইহাই সকল দেশের সকল ধর্মের বিধান। সেই নিয়মের বিরুদ্ধ চেষ্টা করিলে রাজবিপ্লবে প্রজাপীড়ন হইবে এবং রাজ্যের নানারূপ অমঙ্গল হইবে। অতএব জ্যেষ্ঠ কুমার (শাহজাদা) গয়-সুদ্দীনই সম্রাট হইবে। আর ময়জুদ্দীন প্রভৃতি সমস্ত কুমারগণ আয়মা-ভোগী হইয়া গয়সুদ্দীনের আজ্ঞাকারী থাকিবে।”

ফুলমতী ঘোষণাশ্রাব্যী প্রস্তাব করিয়া গয়সুদ্দীনের নিকট দূত পাঠাইলেন। সেই সঙ্গে গোড়ের রাজহত্ব, দণ্ড এবং সিংহাসনও গয়সুদ্দীনকে পাঠাইয়া দিলেন। তাঁহার ছায়া এবং শান্ত প্রস্তাবে গয়সুদ্দীন এবং সমস্ত পাঠান-সদারগণ সম্মতি দেওয়া উচিত বোধ করিলেন। কিন্তু বড় বেগম সক্রোধে কহিলেন, “ফুলমতী বেথুা এবং তাহার সন্তানেরা হারামজাদা। তাহারা আমাদের বহুকষ্ট দিয়াছে। এখন বিপদ দেখিয়া তাহারা ভালমানুষ হইয়াছে। তাহাদিগকে কিছুই দিব না। তাহারা আমাদের দাস দাসী হইয়া থাকিবে।” মাতার প্রবর্তনায় গয়সুদ্দীন ফুলমতীর প্রস্তাবে অগ্রাহ্য করিলেন। তখন ফুলমতী সর্বপ্রধান পাঠান সেনাপতি জুনা খাঁকে সালিশ মাগ্ন করিয়া গোড়ে আহ্বান করিলেন। জুনা খাঁ গোড়ে আসিলে ফুলমতী বস্ত্র, অলঙ্কার এবং সুগন্ধি দ্রব্যে সজ্জিতা হইয়া তাঁহার সহ নিভূতে সাক্ষাৎ করিলেন। জুনা খাঁ তাঁহার সৌন্দর্য্যে বিমোহিত হইয়া নিকার প্রস্তাব করিলেন। ফুলমতী কহিলেন, “তুমি যদি আমার পুত্রদিগকে নিরাপদ করিয়া দিতে পার, তবে তোমার ছায়া সুন্দর ও সুযোগ্য লোককে নিকা করিতে আমি পরম সন্তোষ লাভ করিব।” জুনা খাঁ অমনি ময়জুদ্দীনের পক্ষ হইয়া কংসরামের সহ যোগ দিলেন। তখন সুবিধা বুঝিয়া মধু খাঁও তাঁহাদের সহযোগী হইলেন। তাঁহাদের তিন জনের একত্রিত সৈন্য পাণ্ডুরা আক্রমণ করিল। গয়সুদ্দীন ও তাঁহার ভ্রাতৃগণ পরাজিত ও নিহত হইলেন। তাঁহার দলবল সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত হইল। বড় বেগম ও তাঁহার কন্যাগণ দাসীরূপে বিক্রীত হইল।

যুদ্ধ শেষ হইবামাত্র জুনা খাঁ ফুলমতীকে নিকা সম্পাদন করিতে অনুরোধ করিলেন। কংসরাম নিশ্চয় জানিতেন যে, জুনা খাঁ বেগমকে নিকা করিলে নিজের কোন কর্তৃত্ব থাকিবে না। এজন্য তিনি জুনা খাঁকে বিনষ্ট করিতে সংকল্প করিয়া রাখিয়াছিলেন। গয়সুন্দীনের দলবল বিনষ্ট হইবামাত্র কংসরাম জুনা খাঁর আত্মীয়গণকে উচ্চ কর্ম দিয়া পরস্পর দূরবর্তী বিভিন্ন স্থানে পাঠাইলেন। এই উপায় জুনা খাঁকে নিঃসহায় করিয়া কংস তাঁহাকে হঠাৎ বন্দী করিলেন এবং বিশ্বাসঘাতক বলিয়া প্রাণদণ্ড করিলেন। ইহাতে তাঁহার আত্মীয়গণ কেপিয়া উঠিল বটে, কিন্তু তাহারা পূর্বে কিছুই না জানায় যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইতে পারে নাই। পক্ষান্তরে কংস পূর্বেই, তাদৃশ বিপক্ষগণের প্রতিকার জন্য সমস্ত উদ্বোধন করিয়া রাখিয়াছিলেন। তাঁহার বীরবর পুত্র জনার্দন সাত্তাল, পাঠানেরা একত্র সমবেত হইবার পূর্বেই, তাহাদিগকে আক্রমণ করিয়া একে একে বিনাশ করিলেন। তখন কংসরাম * “রাজা” উপাধি গ্রহণ করিয়া ময়-জুন্দীনের অভিভাবক ও ফুলমতীর উপপতিক্রমে গোড় সাম্রাজ্য শাসন করিতে লাগিলেন।

অধিকাংশ পাঠান সামন্তগণ গয়সুন্দীনের পক্ষ হইয়া যুদ্ধে বিনষ্ট হইয়াছিল। তাহার পর আবার জুনা খাঁর আত্মীয় পাঠান সর্দারগণ বিনষ্ট বা দেশত্যাগী হইয়াছিল। এই দুই কারণে মুসলমান কর্মচারিগণের সংখ্যা অতিশয় কম হইয়াছিল। কংসরাম সেই সমস্ত পদে হিন্দুকর্মচারী নিযুক্ত করিয়াছিলেন। মীর ফজন্দ হোসেন লিখিয়াছেন যে, “রাজা কংস অতিশয় মুসলমান-বিদ্বেষী

* গোলাম হোসেন এই কংসরামের কোন উল্লেখ করেন নাই। তাঁহার মতে গয়সুন্দীনের মৃত্যু হইলে তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র সেকেন্দর শাহ সিংহাসনে অধিরোহণ করেন। গোলাম হোসেন যে রাজা কংসের কথা উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা ভ্রমপূর্ণ, কারণ, তাহা রাজা গণেশের বৃত্তান্তের সহিত অনেক ঐক্য হয়। ‘গণেশের’ পার্সী বর্ণবিজ্ঞানে ‘কন্স’ হইয়া পড়া স্বাভাবিক। ষ্টুয়ার্ট সাহেব ‘কংস’ স্থলে ‘গণেশ’ লিখিয়াছেন। আরও, গোলাম হোসেন যে সময়ে কংসের রাজত্ব নির্দেশ করিয়াছেন তাহা রাজা গণেশ হইলে উক্ত সময়ের বহু পরবর্তী কালের ঘটনা। গোলাম হোসেনের মতে কংসের পুত্র বহু মুসলমান হইয়াছিলেন, কিন্তু রাজা গণেশের পুত্র বহুই মুসলমান ছিলেন। ইহা হইতে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়, গোলাম হোসেন সময়ের ঠিক সামঞ্জস্য রাখিতে পারেন নাই।

ছিলেন। তিনি তাহাদের প্রতি ঘোর অত্যাচার করিতেন এবং মুসলমান সর্দার ও ফৌজদারদিগকে পদচ্যুত করিয়া হিন্দুদিগকে সেই সকল কৰ্ম্ম দিয়া নিজ পরাক্রম বৃদ্ধি করিয়াছিলেন। ময়জুদ্দীনকে বিনাশ করিয়া স্বয়ং সম্রাট হওয়া তাঁহার অভিপ্রায় ছিল।” কিন্তু এই সকল কথার কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। তিনি মুসলমানদের প্রতি যে কিছু দণ্ড করিয়াছিলেন, রাজবিপ্লবই তাহার একমাত্র কারণ; ধর্ম্মবিদ্বেষ তাহার হেতু বলা যায় না। কারণ, শান্তি-স্থাপনের পর তিনি কোন মুসলমানকেই বিনাশ কিংবা কৰ্ম্মচ্যুত করেন নাই। সাধারণ লোকে তাঁহাকে কংসরাম বাদশাহ বলিত বটে, কিন্তু তিনি নিজে কখন বাদশাহ উপাধি গ্রহণ করেন নাই অথবা ময়জুদ্দীনকে বিনাশ করিতে চেষ্টা করেন নাই। যুদ্ধবিপ্লবে বহুসংখ্যক মুসলমান বিনষ্ট হওয়ায়, কংস তাহাদের স্থানে হিন্দুদিগকে নিযুক্ত করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু স্বপক্ষীয় মুসলমানদেরও প্রচুর উন্নতি সাধন করিয়াছিলেন। সেইজন্য মীর ফজল হোসেনের উক্তি পক্ষপাত-দূষিত বলিয়া বোধ হয়।

কংসরামের শাসনসময়ে ব্রহ্মদেশের মগরাজ অতিশয় প্রবল হইয়া উঠিয়াছিলেন। তিনি আরাকানের রাজাকে দূরীকৃত করিয়া তাহার সমস্ত রাজ্য নিজ সাম্রাজ্যভুক্ত করিয়াছিলেন এবং ত্রিপুরার রাজার অধিকাংশ রাজ্য দখল করিয়া লইয়াছিলেন। আরাকান-রাজ মৌসং আসিয়া রাজা কংসরামের শরণা-পন্ন হইলেন। কংসরাম ত্রিশ হাজার সৈন্য সহ নিজ পুত্র জনার্দনকে তাঁহার সাহায্যার্থে পাঠাইলেন। তাঁহারা মেঘনা-নদী পার হইলে, ত্রিপুরার রাজা জনার্দনের সাহায্যার্থী হইলেন। জনার্দন বহু যুদ্ধে মগদিগকে পরাজয় করিয়া আশ্রিত রাজদ্বয়কে স্ব স্ব রাজ্যে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত ও প্রপন্ন করিলেন। তাঁহার বীরত্ব ও সদ্যবহার জন্ত তিনি সর্বত্র প্রশংসিত হইলেন। তিনি গোড়ে প্রত্যাগমন করিলে, অমনি পাটনার নবাবী পদে নিযুক্ত হইলেন। তিনি পূর্বে বারংবার মুসলমানদিগকে পরাজয় করিয়াছিলেন, এক্ষণে মগদিগকে পরাজয় করিয়া তিনি ‘বজ্রবাহু’ উপাধি প্রাপ্ত হইলেন। তাঁহাদের উন্নতি দ্বারা সাতোড় রাজ্যেরও প্রচুর উন্নতি হইয়াছিল এবং সাম্রাজ্যের সমস্ত হিন্দুদিগের সমুন্নতি হইয়াছিল।

কংসরাম প্রভূত পরাক্রম সহ অতি প্রশংসিতরূপে সাত বৎসরকাল গোড়-সাম্রাজ্য শাসন করিয়াছিলেন। ইতিমধ্যে ময়জুদ্দীন বয়ঃপ্রাপ্ত হইলেন। তাহার

পর একবৎসর গত হইল অথচ কংসরাম ময়জুদ্দীনের হাতে রাজ্য ছাড়িয়া দিলেন না। টহাতে ময়জুদ্দীনের মনে সন্দেহ এবং ক্রোধ হইল। তিনি কংসরামের বিনাশে চেষ্টিত হইলেন। তিনি প্রকাশ্যে কোন বিবাদ না করিয়া বরং অধিক-তর আত্মগত্যা করিতে লাগিলেন। ফুলমতীর এক দাসী ময়জুদ্দীনের ধাত্রী ছিল। সম্রাট তাহার দ্বারা পানের খিলিতে তীক্ষ্ণ বিষ প্রয়োগ করিয়া কংসরামের জীবন শেষ করিলেন এবং স্বয়ং সেকেন্দর উপাধি গ্রহণ করিয়া প্রকাশ্যরূপে শাসন-ভার স্বহস্তে লইলেন। তিনি নিজ মাতাকেও এক প্রকোষ্ঠে আটক করিয়া রাখিলেন।

কংসরামের পুত্র বজ্রবাহু তৎকালে পাটনার নবাব ছিলেন। তিনি পিতার অপহত্যার সংবাদ প্রাপ্তিমাত্র জলন্ত কোপে পিতৃহত্যা শত্রুর বিরুদ্ধে চলিলেন। গঙ্গা পার হইবার সময় ময়জুদ্দীন তাঁহাকে প্রতিরোধ করিতে চেষ্টা করিলেন, কিন্তু সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হইয়া গোড়ের দ্বর্গে আশ্রয় লইলেন। জনাঙ্গিন গোড়নগর অবরোধ করিলেন। ময়জুদ্দীন বিপদে পড়িয়া মাতার নিকট সত্ৰুপদেশ জিজ্ঞাসা করিলেন। কংসরামের অপহত্যা জ্ঞাত ফুলমতী ময়জুদ্দীনকে বহু তিরস্কার করিলেন। তিনি কহিলেন, “সাম্রাজ্য রক্ষা করিবার ক্ষমতা যখন তোমার নাই, তখন রাজ্যশাসন হস্তগত করিবার জ্ঞাত বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া দেওয়ানজীকে বিনাশ করিলে কেন? রাজা কংস আমার সম্পূর্ণ বাধ্য ছিল। তুমি আমাকে বলিলে আমি নির্বিবাদে সমস্ত শাসনভার তোমার হাতে দেওয়া-ইতে পারিতাম। এখন প্রকাশ্য যুদ্ধে আমি কি করিতে পারি? আমি জ্বীলোক, আমার সাধ্য কি? তুমি মধুসূদন খাঁকে স্বপক্ষ করিতে চেষ্টা কর। নতুবা রক্ষার কোন সত্ৰুপায় হইবে না।” ফুলমতী উভয়পক্ষের মধ্যে সন্ধিস্থাপন জ্ঞাত মধু খাঁকে আহ্বান করিলেন। তিনি যে উপায়ে জুনা খাঁকে বশ করিয়াছিলেন, আবার সেই উপায়েই মধু খাঁকে বশীভূত করিলেন। মধু খাঁ বজ্রবাহুর সহ যুদ্ধ করিতে সাহসী হইলেন না। মধু খাঁ সন্ধির প্রস্তাব করিয়া বজ্রবাহুর নিকট দূত পাঠাইলেন। এদিকে নানাপ্রকার চক্রান্তমূলক চিঠিসমূহ এরূপভাবে বজ্রবাহুর সামন্তদের নামে পাঠাইতে লাগিলেন, যাহা বহু কষ্টে ধরা পড়ে।

সেই সকল চিঠি পাইয়া বজ্রবাহু অলীক ভ্রমে পতিত হইলেন। তাঁহার বিশ্বাস হইল যে “আমার অধিকাংশ সৈন্য ও সেনাপতি উৎকোচের বশ হইয়া

বিপক্ষের সহ ষড়যন্ত্র করিতেছে। তাহারা আমাকে বন্দী করিয়া শত্রুহস্তে অর্পণ করিবে।” সেই অলীক ভয়ে প্রতারিত হইয়া জনার্দন তিনশত মাত্র বিশ্বস্ত লোকসহ নিজ ছাউনী ত্যাগ করিয়া আরাকান যাত্রা করিলেন। অমনি মধুখাঁ বজ্রবাহুর তান্ত্রিক সেনাগণকে ময়জুদীনের বশীভূত করিয়া দিলেন। মধুখাঁর মিথ্যা চিঠি কাজে সত্যবৎ প্রতীয়মান হইল। ময়জুদীন মধুখাঁর কৌশলে রক্ষা পাইলেন।

বজ্রবাহু আরাকানে উপস্থিত হইলে মৌসং অতি সমাদরপূর্বক তাঁহাকে গ্রহণ করিলেন এবং তাঁহার সাহায্যার্থ উদ্বোধন করিতে লাগিলেন। ত্রিপুরার রাজাও জনার্দনের সাহায্য করিতে স্বীকার করিলেন। ইতিমধ্যে আরাকানের জ্যোতির্বিদগণ মৌসংকে জানাইলেন যে “বাঙ্গালাদেশে বজ্রবাহুর ভাগ্য প্রসন্ন হইবে না। তিনি লঙ্কার অধীশ্বর হইবেন এবং তৎক্ষণাৎ বহুকাল লঙ্কার রাজত্ব করিবে।” জনার্দন সেই ভবিষ্যৎ কথা শুনিয়া উপহাস করিলেন। এদিকে মৌসংয়ের কণ্ঠ তুল্লা বজ্রবাহুর পত্নী হইতে ব্যগ্র হইল। মৌসং জনার্দনকে তাঁহার কণ্ঠার পাণিগ্রহণ করিতে অনুরোধ করিলেন। জনার্দন সম্মত হইলেন না। মৌসং ক্রুদ্ধ হইয়া একদিন মধ্যে তাঁহাকে নিজরাজ্য ত্যাগ করিতে বলিলেন। স্থলপথে তিন দিনের কমে আরাকান রাজ্য ত্যাগ করা যায় না। এজন্ত মৌসং তাঁহাকে জাহাজে * উঠিতে বলিলেন। জনার্দন সন্দিগ্ধ

* বহুকাল হইতে ভারতবর্ষে অর্ণবপোত নির্মাণ হইত। সংস্কৃত কলেজ পুস্তকালয়ে “মুক্তিকল্পতরু” নামক একখানি প্রাচীন হস্তলিপি গ্রন্থে জলযান নির্মাণ শিল্পের বিস্তারিত আলোচনা আছে। পূর্বকালে যানের কক্ষগুলি কনক, রজত ও তাম্র এই ধাতুত্রয় বা তিনের মিশ্রিত দ্রব্য দ্বারা স্নসজ্জিত করা হইত। চতুঃশৃঙ্গ বা চারি মান্ডলের অর্ণবপোত সিত বা শাদা বর্ণে, ত্রিশৃঙ্গযান রক্তবর্ণে, দ্বিশৃঙ্গযান পীতবর্ণে এবং একশৃঙ্গযান নীলবর্ণে চিত্রিত করিবার নিয়ম ছিল। যানের মুখ বা গলুই কেশরী, মহিষ, নাগ, হস্তী, ব্যাঘ্র, পক্ষী, ভেক বা মানুষের মুখের মত করিয়া প্রস্তুত করা হইত। আবার, মন্দির বা কক্ষের হিসাবে যানগুলিকে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা হইত। যে জলযানে খুব বৃহৎ মন্দির থাকিত তাহাকে “সর্বমন্দিরা” বলা হইত। এই শ্রেণীর যান রাজধান, অশ্ব ও রমণী বহনে ব্যবহৃত হইত। দ্বিতীয় শ্রেণীর যানকে “মধ্যমন্দিরা” বলা হইত। এই জাতীয় পোতের মধ্যভাগে মন্দির থাকিত, এবং ইহা বর্ষাকালে রাজাদের বিলাস যাত্রার জন্ত ব্যবহৃত হইত। তৃতীয় শ্রেণীর যানগুলির গলুইর দিকে কক্ষ থাকিত এবং ইহাদিগকে “অগ্রমন্দিরা” বলা হইত। এই যানগুলি চিরপ্রবাস যাত্রায় ও রণে ব্যবহৃত হইত।

সহ জাহাজে উঠিয়া নাবিকদিগকে উৎকলে যাইতে বলিলেন। উৎকল তখন স্বাধীন পরাক্রান্ত হিন্দুরাজ্য ছিল। জনার্দন উড়িয়া রাজ্যে সহায়তার আশা করিলেন। জাহাজ মধ্যসমুদ্রে পৌঁছিলে নাবিকেরা বজ্রবাহকে কহিল, “আপনি যদি রাজকুমারী তুপ্পাকে বিবাহ করেন, তবে আমরা আপনার আজ্ঞাবহ হইয়া চলিব, নতুবা এইখানে জাহাজ ডুবাইয়া সহচরগণ সহ আপনাকে বধ করিব, ইহাই আমাদের প্রতি রাজাজ্ঞা।” জনার্দনের আনুষ্ঠানিক মধ্যে সাতাইশ জন ব্রাহ্মণ ছিল। তাহারা প্রাণভয়ে জনার্দনকে বিবাহে সম্মত হইতে বাধ্য করিল। রাজকুমারী তুপ্পা সেই সঙ্গেই অগ্ন জাহাজে গুপ্তভাবে ছিলেন। বজ্রবাহ সম্মত হইলে তুপ্পা জনার্দনের নিকটে আসিয়া কহিলেন, “আপনি আমাকে গ্রহণ না করিলে আমি আত্মহত্যা করিব” এই কথা আমি পিতার নিকট প্রকাশ করায় তিনি এই কৌশল করিয়াছিলেন। আপনি আমাকে ক্ষমা করিবেন, অশ্রদ্ধা করিবেন না।” জনার্দন পূর্বে তুপ্পাকে দেখেন নাই। এখন তাঁহার রূপ, যৌবন, দৃঢ় প্রণয় ও সরলতা দৃষ্টে মুগ্ধ হইলেন। প্রাণভয়ে বিবাহ করিলে দম্পতির মনোমিলন হয় না। কিন্তু তুপ্পার চরিত্রে ও সৌন্দর্য্যে বজ্রবাহর অসন্তোষ তিরোহিত হইল। অমনি সেই জাহাজেই মালা বদল করিয়া বিবাহ হইল। বিবাহের পর জনার্দন জানিলেন যে তাঁহার উড়িয়ায় যাইতেছেন। কিন্তু শেষে জানিলেন যে তিনি লঙ্কাদ্বীপে উপস্থিত হইয়াছেন। সেই স্থানে মৌসঙের মন্ত্রী বজ্রবাহর নিকট উপস্থিত হইয়া কহিলেন, “ঠাকুর! তুমি মগেব কণ্ঠা বিবাহ করিয়াছ, এখন উৎকলের হিন্দুসমাজে গেলে তোমার সম্মান থাকিবে না। আর আমাদের রাজকুমারীর তদধিক লাঞ্ছনা হইবে। উৎকলরাজ তোমার কোন সাহায্য করিবে না। বাঙ্গলাদেশে তোমার জাতি কুটুম্বেরাও তোমার সহায় হইবে না, বরং তোমাকে একঘরিয়া করিয়া আত্মীয়-গণ ঘৃণা প্রকাশ করিবে। বাঙ্গলাদেশে তোমার ভাগ্য প্রবল হইবে না। এই জন্য তোমাকে লঙ্কায় আনিয়াছি। এখানে চারিজন রাজপদের দাবীদার হইয়া ঘোর যুদ্ধ ও বিপ্লব উপস্থিত করিয়াছে। মহারাজ মৌসং তোমার সাহায্যার্থে প্রচুর সেনা পাঠাইয়াছেন। তুমি অতি সহজে ঐ দ্বীপ অধিকার করিতে পারিবে। এখানকার লোক আরাকানী মগদের সমধর্ম্মী। এখানে তুমি অতি সুখে পুরুষানুক্রমে রাজত্ব করিতে পারিবে।”

মন্ত্রীর কথাই কার্যতঃ ঠিক হইল। বিপ্লবকারীদের মধ্যে দুর্বলপক্ষ আসিয়া জনার্দনের শরণাগত হইল। ক্রমে তিন পক্ষ আসিয়া বজ্রবাহুর আশ্রয় লইলে তাঁহার দলবল প্রবল হইল। তখন প্রবল পক্ষও ক্রমশঃ জনার্দনের অধীনতা স্বীকার করিল। বজ্রবাহু বিনা যুদ্ধে সমগ্র লঙ্কার অধীশ্বর হইলেন। তৎপরে শীয়েরা বুদ্ধধর্মাবলম্বী হইয়াছিল এবং বহুকাল লঙ্কায় রাজত্ব করিয়াছিল। *

এদিকে ময়জুদ্দীন নিরাপদ হইয়া সাঁতোড় রাজ্য ধ্বংস করিতে মনস্থ করিয়াছিলেন। কিন্তু ফুলমতী ও মধু খাঁর উপদেশে ক্ষান্ত হইলেন। তথাপি তিনি জাগীর সাত্তালচক্র জব্দ করিয়া তাহার উপর বার্ষিক চৌদ হাজার টাকা মাল-গুজারী দাখ্য করিলেন এবং সাঁতোড়রাজের “খাঁ সাহেব” উপাধি রহিত করিলেন; তদবধি সাঁতোড়ের রাজারা “ভূঁইয়া” শ্রেণীতে অবনীত হইলেন। এখানে বলা আবশ্যক যে, ঔরঙ্গজীব বাদশাহের সময় হইতে ভূম্যধিকারীদের “জমীদার” উপাধি হইয়াছে। তৎপূর্বে জমীদারদিগের “ভূঁইয়া বা ভূমিয়া” উপাধি ছিল। আর “পরগণা” শব্দের পরিবর্তে “চাকলা” শব্দ প্রচলিত ছিল। “পরগণা” ও “জমিন্দার” শব্দ আরবী ভাষামূলক। আর “ভূমিয়া, ভূঁইয়া ও চাকলা” শব্দ

* কথিত আছে, বিজয় সিংহ খৃষ্টপূর্ব ৬ষ্ঠ শতাব্দীতে সিংহল অধিকার করেন। আধুনিক ঐতিহাসিকেরা কিম্বদন্তী অপেক্ষা লিখিত বৃত্তান্তের উপর সমধিক বিশ্বাস করেন। কিন্তু ইহার কোন বিশেষ কারণ দেখা যায় না। যে ব্যক্তি মিথ্যা বলিতে পারে সে তাহা লিখিতেও পারে। বজ্রবাহু সম্বন্ধে রাজসাহী ও চট্টগ্রাম প্রদেশে যেরূপ জনপ্রবাদ আছে তাহা হইতে এই বৃত্তান্ত লিখিত হইয়াছে। এই বহজনকথিত বহুকালব্যাপি প্রবাদ মধ্যে অনেক সত্য নিহিত থাকিবে সম্ভব। আরও, শাস্ত্রীয় মতানুসারে লঙ্কা ও সিংহল দুইটি স্বতন্ত্র দ্বীপ। মার্কণ্ডেয় পুরাণ ৫৮ অধ্যায়—“লঙ্কাকালাজিনাশ্চৈব শৈলিকা নিকটস্থতা ॥ ধ্বংসাঃ সিংহলাশ্চৈব তথা কাঞ্চীনিবাসিনঃ ॥” ভাগবত, ৫।১৯।৩০, বৃহৎসংহিতা, ১৪।১৫, প্রভৃতি প্রাচীন গ্রন্থেও লঙ্কা ও সিংহল দুইটি স্বতন্ত্র দ্বীপ বলিয়াই উল্লিখিত হইয়াছে। কেবল পালিগ্রন্থ “মহাবংশের” মতে সিংহলের অপর নাম লঙ্কা। ভাস্করাচার্য লিখিয়াছেন—যখন লঙ্কায় সূর্য্যোদয় হয়, তখন (তাহার নব্বই অংশ পূর্বে) যমকোটতে মধ্যাহ্ন, ইত্যাদি। যমকোট উজ্জয়িনীর ঠিক পূর্বে নব্বই অক্ষাংশ দূরে অবস্থিত, আবার লঙ্কা যমকোটের ঠিক পশ্চিমে, উজ্জয়িনীর পশ্চিমে নহে। সূর্য্যসিদ্ধান্তের মতে—(১২।৩৯) লঙ্কা ভারতবর্ষের একটি নগর। ব্রহ্মাওপুরাণের মতে (অনুসঙ্গপাদে ৫৫ অঃ) যবদ্বীপের পর মলয় দ্বীপ, এই মলয় নামক দ্বীপের অন্তর্গত পর্ব্বতের সান্নিধ্যদেশে লঙ্কাপুরী। পূর্ব্বকালে ভারতমহাসাগরীয় দ্বীপগুলিও ভারতবর্ষের মধ্যেই গণিত হইত। অতরাং ব্রহ্মাওপুরাণের মতানুসারে মলয়দ্বীপের অন্তর্গত লঙ্কাপুরী বলিলে, পৌরাণিক মতে তাহা ভারতবর্ষ ছাড়া নহে, এবং সূর্য্যসিদ্ধান্তের সহিতও অনৈক্য হয় না। এই সমস্ত হইতে বোধ হয়, বজ্রবাহুর লঙ্কা বিজয় নিতান্ত অমূলক নহে।

সংস্কৃতমূলক—ভূমি এবং চক্র শব্দ হইতে উৎপন্ন। ভূঁইয়া বা জমীদারগণের অধিকার বৃহৎ হইলে যথাক্রমে চৌধারী, রায়, রায়চৌধারী এবং রাজা উপাধি হইত *। সাতোড়ের রাজার “রাজা” উপাধি পূর্ববৎ থাকিল; “খাঁ সাহেব” উপাধি তাঁহারা ধারণ করিতেন না। সুতরাং সেই উপাধি রহিত হওয়ায়, সাতোড়-রাজ ক্ষতি বোধ করেন নাই। কেবল চৌদ্দ হাজার টাকা মালগুজারী ধার্য হওয়াই তাঁহাদের লোকসান হইল।

আইন আকবরীতে রাজা কংসের যে বৃত্তান্ত আছে, তাহা ভ্রমপূর্ণ। উক্ত গ্রন্থে লিখিত আছে যে, “রাজা কংস সমুদ্রদীনের অব্যবহিত পরে গোঁড়ে স্বাধীন সম্রাট হইয়াছিলেন। তিনি মুসলমানদিগের প্রতি ঘোর অত্যাচার করিতেন। তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র মুসলমানধর্ম গ্রহণ করিয়াছিল।” রাজা কংস-রামকে লোকে কংসরাম বাদশাহ বলিত বটে, কিন্তু তিনি প্রকাশ্যরূপে সম্রাট বা বাদশাহ উপাধি গ্রহণ করেন নাই। তাঁহার পুত্র সম্রাট হয় নাই এবং মুসলমানও হয় নাই। উপরি উক্ত বৃত্তান্ত গণেশনারায়ণ খাঁর সহ কতক ঐক্য হয়। গণেশ স্বাধীন সম্রাট হইয়াছিলেন এবং তাঁহার পুত্র মুসলমান হইয়াছিল বটে, কিন্তু গণেশ ৫০ বর্ষ পরবর্তী কালের লোক। তিনি মুসলমানদের প্রতি কখন কোন অত্যাচার করেন নাই বরং তাহাদের পরম বন্ধু ছিলেন। তাঁহার শত্রুপক্ষীয় গোঁড়া মুসলমানেরা তাঁহাকে অত্যাচারী বলিয়া মিথ্যা প্রচার করে। আর একজন রাজা কংসনারায়ণ রায় আরও পরবর্তী কালের লোক। তিনি তাহিরপুরের রাজা ছিলেন। তিনি আকবর বাদশাহের সময়ে শুবে বাঙ্গালার নবাব-দেওয়ান ছিলেন এবং কিছুদিন নবাব-নাভিমের কাজও করিয়াছিলেন। তিনি সম্রাট আকবরের সমকালীন লোক। অতএব আইন আকবরীতে যে রাজা কংসের বৃত্তান্ত আছে, তাহা অশুদ্ধ। সময়ের প্রতি লক্ষ্য করিলে বোধ হয় যে আইন আকবরীতে রাজা কংসরাম সাংঘ্যালের কথাই ভ্রমবশতঃ অশুদ্ধ-রূপে লেখা হইয়াছে। তাহাতে কতক কংসরামের বৃত্তান্ত এবং কতক গণেশের বৃত্তান্ত মিশ্রিত করা হইয়াছে।

* চৌধারী শব্দের অর্থ চতুর্পার্শ্ববর্তী ভূমির ঐশ্বর্য। এখন চৌধারী শব্দের স্থানে চৌধুরী লেখা হয়, তাহা ভুল। চৌধুরী শব্দে চারি ভাণ্ড বিশিষ্ট; কিন্তু সেই চারি ভাণ্ড কি, তাহা কেহই জানে না।

মুসলমানেরা অধিকাংশ গয়সুদদীনের পক্ষ হইয়া ময়জুদীনের বিপক্ষ হইয়াছিল, এই জন্য ময়জুদীন মুসলমান কর্মচারীদিগকে দৃঢ় বিশ্বাস করিতেন না। সাতোড়ের রাজবংশের প্রতিও তাঁহার বিদ্বেষ ছিল। এজন্য মধু খাঁ তাঁহার একমাত্র প্রিয়পাত্র ও বিশ্বাসী হইয়াছিলেন। ময়জুদীন নিতান্ত অলস, বিলাসী এবং অকর্মণ্য লোক ছিলেন। তিনি নানা জাতীয় বহুসংখ্যক উপপত্নী সংগ্রহ করিয়াছিলেন। তাহাদিগকে লইয়া নৃত্য, গীত, বাজ, উত্তম আহার, বস্ত্র, গন্ধ, শয্যা ইত্যাদি বিলাসজনপ্রিয় বস্তু লইয়া দিবারাত্রি সময়ক্ষেপণ করিতেন। তিনি রাজকার্য্য কিছুই করিতেন না। মধু খাঁ তাঁহার নিকট যে সকল কাগজ পাঠাইতেন, তিনি সেই বিলাস-মন্দিরে বসিয়াই তাহা দস্তখত মোহর করিয়া দিতেন। মধু খাঁ বাদশাহের উজির এবং ফুলমতীর উপপতি হইয়া সমস্ত রাজকার্য্য চালাইতেন। মধু খাঁর কর্তৃত্বসময়ে ভাছুড়িয়ার রাজা তাঁহার জাগীর ভাছুড়িয়ার চতুর্পার্শ্বে রামবাজু, প্রতাপবাজু, সোণাবাজু ও বড়বাজু নামে চারিটি পরগণা অতি অল্প মালগুজারীতে ভূমীদারীরূপে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। আর একটাকিয়া ভাছুড়ীদের এবং তাহাদের আত্মীয় কুটুম্বদের মধ্যে অনেকেই প্রধান প্রধান রাজকার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছিল। লোকের মনোরঞ্জন করিবার জন্য একটাকিয়াদিগের বিশেষ ক্ষমতা ছিল। তাহারা যে কেহ যে কোন কার্য্যে নিযুক্ত হউক, তাহাতেই সকলের নিকট প্রশংসিত হইত। ইহাতে একটাকিয়া বংশের মান, পদবী, ঐশ্বর্য্য এবং ক্ষমতা অত্যন্ত অধিক হইয়াছিল।

ময়জুদীনের একান্ত অকর্মণ্যতা বাঙ্গালাদেশের পক্ষে অত্যন্ত কল্যাণকর হইয়াছিল। কারণ মধু খাঁ ও ফুলমতী একরূপ সূচাকরূপে রাজকার্য্য চালাইতেন যে, ময়জুদীনের রাজত্ব রামরাজ্যের ত্রায় প্রজাগণের সুখকর হইয়াছিল। ফুলমতী দয়া এবং দানশীলতার জন্য প্রসিদ্ধা এবং মধু খাঁ সুবিচার ও কার্য্যদক্ষতার জন্য সর্বত্র প্রশংসিত হইয়াছিলেন। ফুলমতীর অত্যাশ্রয় সদৃশ এত অধিক ছিল যে, তাহার অসতীত্ব সত্ত্বেও লোকে তাহাকে ভক্তি করিত। গোড় বাদশাহের ঘরে একটাকিয়া ভাছুড়ীদের সম্মান ও কর্তৃত্ব যথেষ্ট ছিল। তাহাদের কেহ উজির, কেহ নাজির, কেহ মন্ত্রী, কেহ সেনাপতি, কেহ বা প্রদেশীয় শাসনকর্ত্তা ছিল। পরবর্ত্তী কালে মোগল সম্রাটদের ঘরে রাজপুত রাজাদের বাদৃশ সন্তান ও ক্ষমতা হইয়াছিল গোড়বাদশাহের ঘরে একটাকিয়াদের তদপেক্ষা বেশী বই কম ছিল।

না । রাজপুত্র রাজারা দিল্লীস্বরকে কণ্ঠা দিতেন, একটাকিয়ারা গোড়েশ্বরকে কখন কণ্ঠা দিতেন না । কিন্তু মধ্যে মধ্যে পাত্র দিতে বাধ্য হইতেন ।

ময়জুদ্দীনের দুই পত্নী ও বহু উপপত্নী ছিল । তাঁহার বড় বেগমের এক মাত্র পুত্র গয়সুদ্দীনই সর্ব জ্যেষ্ঠ এবং কার্যক্ষম লোক ছিলেন । ফুলমতী ও মধু খাঁ তাঁহাকেই ভাল বাসিতেন এবং সকলেই তাঁহাকে ভাবী সম্রাট বলিয়া জ্ঞান করিত । ময়জুদ্দীন নিজে তাঁহার ছোট বেগমের বশীভূত ছিলেন । সেই ছোট বেগমের আঠার পুত্র ছিল । ছোট বেগম গয়সুদ্দীনকে অপহৃত্য করিয়া নিজ পুত্রকে ভাবী সম্রাট করিতে চেষ্টা করিলেন । চতুরা ফুলমতী ও মধু খাঁ তাহা জানিতে পারিয়া তাঁহাকে সাবধান হইতে উপদেশ দিলেন । গয়সুদ্দীন বিদ্রোহী হইয়া একদল সৈন্য সংগ্রহ করিলেন । বাদশাহ তাঁহার দ্বিতীয় পক্ষের পুত্রগণ লইয়া গয়সুদ্দীনকে দমনের জন্য যুদ্ধযাত্রা করিলেন । কিন্তু যুদ্ধে তিনি নিহত হইলেন । গয়সুদ্দীন সমস্ত বৈমাত্র ভ্রাতাদিগকে বিনাশ করিয়া বাদশাহ হইলেন । তিনি অপক্ষপাতী সুবিচারক ছিলেন । তিনি পিতার মৃত্যুর জন্য প্রকাণ্ডে আক্ষেপ করিতেন এবং কতিপয় মসজিদ নির্মাণ করিয়া পিতার নামে উৎসর্গ করিয়াছিলেন । তাঁহার রাজত্বকালে একটাকিয়াদের প্রাধান্ত কতদূর ছিল তাহা জানা যায় না । বোধ হয় তিনি ভাঙ্গড়ীদের কর্তৃত্ব হ্রাস করিতে ইচ্ছুক ছিলেন । সেই জন্য একটাকিয়ারা চক্রান্ত করিয়া তাঁহাকে হত্যা করিয়া তৎপুত্র সৈফুদ্দীনকে নান মাত্র বাদশাহ করিয়া সাম্রাজ্যের সমস্ত কর্তৃত্ব আপনারা একচাটয়া করিয়াছিল ।

সৈফুদ্দীন নিতান্ত অকর্মণ্য ও ভোগবিলাসী ছিলেন । পাছে ভাঙ্গড়ীরা তাঁহাকেও বিনাশ করে এই ভয়ে তিনি কতকগুলি হাবশী ও খোজা আনিয়া নিজ শরীর ও বিলাসভবন (রংমহাল) রক্ষার্থ নিযুক্ত করিয়াছিলেন । তাঁহারও দুই পত্নী এবং বহু উপপত্নী ছিল । তাঁহার ছোট বেগমের পুত্র নসেরিৎ বয়সে জ্যেষ্ঠ পুত্র ছিলেন আর বড় বেগমের পুত্র আজিম তদপেক্ষা কনিষ্ঠ ছিলেন । কিন্তু আজিম নসেরিতের জননীকে পিতার উপপত্নী বলিয়া প্রকাশ করিতেন এবং নিজে পিতার একমাত্র স্নেহিত পুত্র এবং দায়াদ বলিয়া প্রকাশ করিতেন । ভাঙ্গড়ীরা তাঁহারই পক্ষে ছিল আর মুসলমান সর্দারেরা নসেরিতের পক্ষে ছিল ।

চতুর্থ অধ্যায় ।

শ্রামচাঁদ ও রামচাঁদ ।—রাজা অবনীনাথ ।—আজিম ও নসেরিংশাহ ।—রাজা গণেশ ।

শাহ সমুদ্দীন চলনবিলের দক্ষিণে শিখাই সাগ্রালকে এবং উত্তরে সুবুদ্ধি থাঁকে জাগীর দিয়াছিলেন । কিন্তু চলনবিল কাহাকেও দেন নাই । অথচ বিলটী উভয়েই দখল করিয়া লইয়াছিলেন । বহুদিন পর্য্যন্ত তাঁহাদের মধ্যে সীমানা লইয়া কোন গোলযোগ হয় নাই । ক্রমে বিলের মধ্যে কয়েকটী দ্বীপ পরিস্ফুট * হইল এবং তাহারই অধিকার লইয়া উভয় রাজ্যে বিবাদের সূচনা হইল । সাগ্রাল রাজ্যের অধীন টেরীগ্রাম-নিবাসী শ্রামচাঁদ ও রামচাঁদ নামে দুইজন বারেন্দ্র কায়স্থ চলনবিলের মধ্যে দুইটি দ্বীপে বাস করিয়া জলপথে দস্যুবৃত্তি আরম্ভ করিল । ক্রমে তাহাদের দলবল বৃদ্ধি হইল । তাহারা বিলের মধ্যে নৌকা লুণ্ঠ করিত এবং বিলের চতুর্পার্শ্ববর্তী গ্রামে পড়িয়া লুণ্ঠ করিয়া আনিত । ক্রমেই তাহাদের সাহস ও পরাক্রম বর্দ্ধিত হইল । তাহারা নদী দিয়া দূরবর্তী স্থানে গিয়া দৌরাগ করিতে লাগিল । তাহাদের বাসস্থান অতাপি “শ্রাম রামার ভিটা” নামে প্রসিদ্ধ । সেই দস্যুদিগকে দমন করিতে সাতোড়ের রাজা এবং ভাছড়িয়ার রাজা বহু চেষ্টা করিয়াও কৃতকার্য হন নাই । পরে গোড়ের সম্রাট ও তাহাদের বিনাশের জন্ত চেষ্টা করিলেন, তাহাদের নিবাসদ্বীপ অধিকার করিলেন ; কিন্তু তাহাদিগকে বশীভূত করিতে পারিলেন না । তাহারা নৌকায় থাকিয়া যমুনা, পদ্মা এবং মেঘনা নদীর তীরবর্তী স্থান সমস্ত উৎসন্ন করিতে লাগিল । বাদশাহী সেনা ফিরিয়া গেলে অমনি আসিয়া নিজ নিজ বাসদ্বীপ পুনরধিকার করিল । তাহারা ব্রাহ্মণ-হত্যা করিত না, কিন্তু সর্বস্ব হরণ করিয়া তিন কাহন কড়ী এবং এক ধুতি চাদর দিয়া ছাড়িয়া দিত । অল্প লোকের ঘর বাড়ী দাহ করিত, সুন্দরী রমণী হরণ করিয়া নিজ দলস্থ লোকের মধ্যে বিতরণ করিত অথবা স্থানান্তরে বিক্রয়

* অর্থাৎ alluvium—পলল ।

+ তৎকালে ডাকাতী করা বীর পুরুষের কার্য বলিয়া গণ্য ছিল । তাহাতে বিশেষ নিন্দা হইত না ।

করিত এবং বহু লোকের ধন প্রাণ হরণ করিত । তাহাদের দৌরাশ্রয় বাঙ্গালা দেশের অধিকাংশ প্রকম্পিত হইত । অথচ তাহাদিগকে দমনের কেহ কোন সজুপার করিতে পারিলেন না ।

অবশেষে সাঁতোড়ের রাজা অবনীনাথ সেই দম্ভাধ্বয়কে সম্ভাবে শাস্ত করিতে মনস্থ করিলেন । কোলা গ্রামের কালীকিশোর আচার্য্য, শ্রামা রামার গুরুঠাকুর ছিলেন । রাজা তাঁহাকে আনিয়া এই নিয়মে সন্ধি করাইয়া দিতে অমুরোধ করিলেন যে, শ্রামচাঁদ ও রামচাঁদ প্রত্যেকে পঁচিশ খাদা অর্থাৎ ৪০০/বিঘা ভূমি বার্ষিক তিন টাকা দুই আনা জমায় আয়না পাইবে । কালীকিশোর নিজে দুই খাদা জমি ব্রহ্মত্ব পাইবেন । শ্রামা রামার অনুচরগণ সাঁতোড়ের সৈন্যদলে চাকরী করিবে । আর তাহারা দুই ভ্রাতা প্রত্যেকে একশত এক টাকা বেতনে রাজার সৈন্যগণের সেনানী হইবে * । তাহাদের গত কালের কুকার্য্য জন্ত কোন দণ্ড হইবে না, এবং তাহারা ভবিষ্যতে কোনরূপ দৌরাশ্রয় করিবে না । কালীকিশোর অনেক ইতস্ততঃ করিয়া সন্ধি করাইতে সম্মত হইলেন । শ্রামা রামা গুরুর উপদেশ লঙ্ঘন করিল না । কেবল আয়না ৮০০/বিঘা স্থলে ১০০৮/বিঘা লইয়া অত্যাগত সমস্ত প্রস্তাব স্বীকার করিল । তদবধি সাঁতোড়রাজ্য-ধ্বংস পর্য্যন্ত শ্রামা রামার বংশ সাত্তালরাজ্যের সেনাপতি ছিল । তাহাদের বংশী-য়েরা এখনও অষ্টমিন্‌সা গ্রামে বাস করিতেছে । গোড় বাদশাহ শ্রামা রামাকে ধরিয়া দিতে রাজা অবনীনাথকে অমুরোধ করিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি নিজ প্রতিজ্ঞা হেতু সম্মত হন নাই । অধিকন্তু তিনি ইহাও বাদশাহকে জানাইলেন যে, শ্রামা রামাকে দণ্ড করিলে পুনরায় ডাকাতি ও নানারূপ অশান্তি আরম্ভ হইবে ।

জাগীর লাভের পর রাজা কংসরামের অধিপত্যসময়ে সাঁতোড়ের রাজার আঁরও পাঁচ পরগণা জমিদারী পাইয়াছিলেন । একটাকিয়ারাও মধু খাঁর অধিপত্য-কালে রামবাজু, প্রতাপবাজু, নোণাবাজু এবং বড়বাজু নামে চারি পরগণা জমিদারী পাইয়াছিলেন । ইহাতে উভয় রাজ্যেরই পরাক্রম বৃদ্ধি হইয়াছিল । সাঁতোড় চলনবিল হইতে দূরে ছিল, কিন্তু সাতগড়া চলনবিলের মধ্যে ছিল । শ্রামা রামা রাজা অবনীনাথের চাকরী স্বীকার করায় সমস্ত চলনবিল সাঁতোড় রাজ্যের অধীন

* হিন্দুরা অন্ধের শেষে শূন্য থাকি অশুভ জ্ঞান করিত । এজন্য বিবাহের পণ, বেতন ও ঋণ গ্রহণে অন্ধের শেষে শূন্য রাখিত না ।

হইল। তাহাতে অপমান এবং অসুবিধা দেখিয়া ভাড়াড়িয়ার রাজা গণেশনারায়ণ খাঁ চলনবিলের অন্ধার্কি করিয়া সীমা নির্দিষ্ট করিতে রাজা অবনীনাথের নিকট প্রস্তাব করিলেন। অবনীনাথ তাহাতে সম্মত না হওয়ায় বিবাদ এবং যুদ্ধোদ্বোধন হইল। অবনীনাথের সেনার প্রায় সমস্তই হিন্দু এবং সেনাপতিগণ ব্রাহ্মণ এবং কায়স্থ। একটাকিয়াদের হিন্দু সমাজ অপেক্ষা মুসলমান সমাজেই মাগু বেশী ছিল এবং মুসলমানেরাই তাঁহাদের প্রধান সহায় ছিল। গণেশের সৈন্তের অধিকাংশ মুসলমান এবং সেনাপতিগণ পাঠান ছিল। গ্রামা গ্রামা জলপথে ভাড়াড়িয়ার উপর পড়িয়া লুণ্ঠপাট আরম্ভ করিল। গণেশ চলনবিল ঘুরিয়া সাঁতোড় রাজা আক্রমণ করিলেন। রাজা অবনীনাথও তাহার প্রতিকার জন্য সৈন্তে উপস্থিত হইলেন। এমন সময়ে কালীকিশোর মধ্যবর্তী হইয়া সন্ধির প্রস্তাব করিলেন।

কালীকিশোর আচার্য্য প্রথমে গণেশের নিকট গিয়া কহিলেন, “যাহাতে আপনাদের উভয় রাজ্যের জরলাভ হয়, উভয়ের সুখ ও সম্মান বৃদ্ধি হয়, আমি এমন সত্বে পারি। আপনি সেই নিয়মে সন্ধি করুন।” গণেশ কহিলেন, “উভয় পক্ষের জয় কিরূপ?” কালীকিশোর কহিলেন, “তাহা পরে বলিব। যদি আপনি চলনবিলের উত্তরার্কি পান এবং আপনার সম্মান বৃদ্ধি হয়, তবে আপনি সম্মত হন কি না?” গণেশ সম্মতি দিলেন। পরে কালীকিশোর অবনীনাথের নিকট ঐরূপ সন্ধিতে তাঁহার সম্মতি লইলেন। তাহার পর কালীকিশোর গণেশের পুত্র যদুনারায়ণের সহ অবনীনাথের কন্যা নবকিশোরীর বিবাহ দিয়া চলনবিলের উত্তরার্কি কন্যাকে যৌতুক দিতে বলিলেন। উভয়েই কুলীনব্রাহ্মণ এবং রাজা। অবনীনাথ বাংশগোত্র এবং গণেশ কাণ্ডগোত্র। উভয়েরই পুত্র কন্যা সুন্দর। সুতরাং সেই প্রস্তাব উভয়েই সাগ্রহে স্বীকার করিলেন। কাটাকাটি, লুণ্ঠপাট প্রজাপীড়নের পরিবর্তে আমোদ প্রমোদ ও পুণ্য প্রতিষ্ঠায় যদুর সহ নবকিশোরীর বিবাহ হইল। রাজা অবনীনাথ চলনবিলে উত্তরার্কিসহ বহুলক্ষ টাকার দ্রব্যজাত যৌতুক দিলেন। গণেশ কহিলেন, “বহু আমার এ পর্য্যন্ত একমাত্র পুত্র। যদি ভবিষ্যতে অল্প পুত্র হয়, তথাপি জ্যেষ্ঠ পুত্রই রাজ্য পাইবে। সুতরাং আমি সর্বস্বই এই পুত্র ও বধূকে দিতে পারি।” যাহা হউক, তিনি নিজের অর্দ্ধরাজ্য তৎক্ষণাৎ পুত্রবধূকে দান করিলেন। উভয়পক্ষ হইতে জয়ধ্বনি হইল।

যুদ্ধের পরিবর্তে নৃত্য, গীত, বাজ্ঞ এবং মহোৎসব হইল। উভয়পক্ষ বহুতর দান বিতরণ করিলেন। কালীকিশোর উভয় রাজার নিকট নানারূপ পুরস্কার এবং ব্রহ্মত্র পাইলেন। উভয় রাজারই সম্মান ও পরাক্রম বৃদ্ধি হইল। গণেশ মহানন্দে সাতগড়ায় প্রত্যাগমন করিলেন।

এই সময়ে গোড়বাদশাহ সৈফুদ্দীনের মৃত্যু হইল। তাঁহার বড় বেগমের পুত্র আজিম শাহ বয়সে ছোট ছিলেন এবং ছোট বেগমের পুত্র নসেরিং শাহ বয়সে বড় ছিলেন। নসেরিং মুসলমানদিগের সাহায্যে দ্বিতীয় সমুদ্রদ্বীপ নাম ধারণপূর্বক গোড়সিংহাসন অধিকার করিলেন। আজিম গোড়নগর হইতে বাহির হইয়া শাহ উপাধি ধারণ করিলেন। তিনি ভাছুড়ীদের সাহায্যে একদল সেনা সংগ্রহ করিলেন এবং তৎকালীন একটাকিয়া রাজা গণেশের সাহায্য প্রার্থনা করিলেন। গণেশ তাঁহার সহায়তা করিতে স্বীকার করিয়া নিজ দলবল ও রসদ সংগ্রহ করিতে লাগিলেন, তাঁহার নূতন বৈবাহিকের নিকটও সাহায্য চাহিলেন। রাজা অবনীনাথ শ্যামা রামার অধীনে দ্বাদশসহস্র সৈন্য পাঠাইলেন। গণেশ নিজের বিশ হাজার সিপাহী এবং বৈবাহিকের বার হাজার, মোট বত্রিশ হাজার সৈন্য লইয়া আজিমের সাহায্যার্থ চলিলেন।

তখন সাতগড়া হইতে গোড়ে যাইবার দুইটি পথ ছিল। একটি চলনবিলের উত্তরবর্তী, অপরটি দক্ষিণবর্তী। গণেশ উত্তরবর্তী পথে আজিম শাহের সহ যোগ দিতে গোড়াভিমুখে চলিলেন। কিন্তু আজিম শাহ শত্রুতাড়িত হইয়া সে দিকে যাইতে পারিলেন না। তিনি দক্ষিণবর্তী পথে সাতগড়া চলিলেন। নসেরিং শাহ আজিমের পশ্চাৎ ধাবিত হইলেন।

তানোরের নিকট উভয় ভ্রাতার যে যুদ্ধ হইল, আজিম তাহাতে হত হইলেন। এ দিকে গণেশ আসিয়া গোড়নগর অধিকার করিলেন। নসেরিং সংবাদ পাইয়া ফিরিয়া আসিলেন, কিন্তু গণেশের সহ যুদ্ধে তিনিও হত হইলেন। এই ঘটনা হিজরী ৭৮৭ সালে সংঘটিত হয়। নসেরিতের কোন সন্তান ছিল না। আশমানতারা নামে আজিম শাহের একটি নাবালিকা কন্যা মাত্র ছিল। মুসলমান-রীতি অনুসারে জ্বীলোকে রাজত্ব পাইতে পারে না, সুতরাং গণেশ নিজেই সম্রাট হইলেন। একটাকিয়া রাজারা হিন্দু মুসলমান উভয় জাতিরই সমান ভক্তিপাত্র ছিলেন, সুতরাং কেহই তাঁহাকে কোন বাধা দিল না। তিনি রাজা অবনীনাথকে

সহায়তার পুরস্কারস্বরূপ চারি পরগণা জমীদারী দিয়াছিলেন। নসেরিতেৱ ও আজিমের বেগমেরা গণেশের উপপত্নীরূপে গোড়ের রাজপ্রাসাদেই থাকিলেন। গণেশের নিজ পরিবার পাণ্ডুয়াতে থাকিত। মীর ফজল্ হোসেন লিখিয়াছেন যে, “রাজা গণেশ বেগমদিগকে গোপনে নিকা করিয়াছিলেন। তিনি যখন গোড়ে থাকিতেন, তখন প্রায় মুসলমানের ছায় চলিতেন। আবার যখন তিনি পাণ্ডুয়াতে থাকিতেন অতি নিষ্ঠাচারী ব্রাহ্মণের ছায় সদাচারে থাকিতেন। হিন্দু মুসলমান উভয় জাতিই তাঁহাকে স্বজাতি জ্ঞান করিত। তিনি বেগমদের নামে গোড়নগরে অনেক দর্গা ও মসজীদ নির্মাণ করাইয়াছিলেন। আবার পাণ্ডুয়া, টাণ্ডা এবং বাটরাতে নিজ নামে বহুতর দেবমন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। তিনি অতি মিষ্টভাষী ও শিষ্টাচারী ছিলেন। তিনি উভয় ধর্মেরই উৎসাহ দিতেন। কিন্তু কাহাকেও ভিন্ন ধর্মের নিন্দা করিতে দিতেন না।” তিনি পরমস্বখে সাত বৎসর সাম্রাজ্য ভোগ করিয়া উপরত হইলে তৎপুত্র যজ্ঞনারায়ণ খাঁ সম্রাট্ হইয়াছিলেন।

পঞ্চম অধ্যায়।

জেলালুদ্দীন (যহুন্ন)।—আশমানতার।—অনুপনারায়ণের একটাকিয়ায় অভিষেক।—

রাণী কিশোরী।—জেলালুদ্দীনের মৃত্যু।

গণেশ সম্মুখ যুদ্ধে মুসলমান সম্রাটকে নষ্ট করিয়া প্রকাশরূপে সম্রাট হইয়াছিলেন এবং তিন পুরুষ বরাবর রাজত্ব করিয়াছিলেন। মহারাষ্ট্রে শিবজী এবং পঞ্জাবে রণজিৎ সিংহ ভিন্ন আর কোন হিন্দু রাজা একরূপ করিতে পারেন নাই। যদি গণেশের সন্তানেরা বরাবর স্বধর্ম্যে থাকিতেন, তবে এই ঘটনা ভাঙুড়ী বংশের এবং সমস্ত বাঙ্গালীর বড়ই গৌরবের বিষয় হইত। কিন্তু যহ্ননারায়ণ মুসলমান ধর্ম্য গ্রহণ করায়, বাঙ্গালী হিন্দুরা ভাঙুড়ীবংশের বৈষয়িক উন্নতি স্বজাতির গৌরব জ্ঞান না করিয়া বরং কলঙ্ক জ্ঞান করিতেন। যহ্ন মল্লযুদ্ধে পটুতা জ্ঞাত যহ্নমল্ল নামে খ্যাত ছিলেন। সেই যহ্নমল্ল (যদুমাল) শব্দের অগভ্রংশে ফেরেস্টা তাঁহার নাম চেংমল লিখিয়াছেন। গণেশের জীবদশাতেই যহ্ন আজিম শাহের কথা আশমানতারার প্রতি আসক্ত হইয়াছিলেন। তৎকালে ধনবান্ লোকের পক্ষে উপপত্নী রাখা এবং যবনীগমন দুষ্ট ছিল না। আশমানতারার মাতা গণেশের উপপত্নী ছিলেন। সুতরাং গণেশ যহ্নকে নিবারণের কোন চেষ্টা করেন নাই। যহ্ন সম্রাট হওয়ার তিন বৎসর পর আশমানতারার গর্ভ হইল। তিনি যহ্নকে কহিলেন, “আমি বাদশাহের কথা; আমার সন্তান ঘৃণিত জারজ হইবে, ইহা আমি সহ্য করিতে পারিব না। তুমি যদি আমাকে বিবাহ না কর, তবে আমি আত্মহত্যা করিব।” যহ্ন নানাস্থান হইতে পণ্ডিত আনাইয়া কৌশলে তাঁহা-দিগকে প্রশ্ন করিলেন যে, “যবনীকে প্রায়শ্চিত্ত করাইয়া ব্রাহ্মণে তাহাকে বিবাহ করিতে পারে কি না?” পণ্ডিতেরা কহিলেন, “যবনীকে হিন্দুয়ানী করা যায়, কিন্তু তাহারা শূদ্রাণী হয়। ব্রাহ্মণের সহ তাহার বিবাহ লোকতঃ ধর্ম্যতঃ অসিদ্ধ। দ্বাপর যুগে গর্গমুনি যবনীগর্ভে কালযবনকে উৎপাদন করিয়া-ছিলেন বটে, কিন্তু বৈধবিবাহ হয় নাই। ক্ষত্রিয় রাজারা স্নেচ্ছযবনা-রাজকন্যা

সময়ে সময়ে বিবাহ করিয়াছেন, কিন্তু ব্রাহ্মণের তাদৃশ বিবাহ কোন শাস্ত্রে বা ব্যবহারে নাই।” যহ্ন সনাতন ধর্ম্মে থাকিয়া আশমানতারাকে বিবাহ করিবার কোন পন্থা না পাইয়া নিজেই মুসলমান হইলেন এবং জেলালুদ্দীন নাম ধারণপূর্ব্বক আশমানতারাকে বিবাহ করিলেন।

যহ্নর মাতা বুদ্ধা রাণী ত্রিপুরা, যহ্নর পত্নী নবকিশোরী এবং যহ্নর শিশুপুত্র অনুপনারায়ণ পাণ্ডুরাতে ছিলেন। রাণীরা এই দুর্ঘটনার সংবাদ পাইয়া দলবল সহ গোঁড়ে উপস্থিত হইলেন। তাঁহাদের আগমনে যহ্ন আশমানতারা সহ গোড়ের দুর্গে প্রচ্ছন্ন থাকিলেন। রাণী কিশোরী দুঃখে ও ক্রোধে লজ্জা ত্যাগ করিয়া খড়্গহস্তে উগ্রচণ্ডার ছায়া আশমানতারাকে কাটিতে বাহির হইলেন, কিন্তু দুর্গে প্রবেশ করিতে না পারিয়া ফিরিয়া আসিলেন। তখন রাণী ত্রিপুরা সমস্ত সৈন্য, সামন্ত, অমাত্য, ভৃত্য এবং প্রজাগণকে সমবেত করিয়া কহিলেন, “শাস্ত্রমতে জাতিপাত অপমৃত্যুর তুল্য। যহ্নর জাতিনাশ হওয়াতে সমস্ত স্বত্ব নাশ হইয়াছে। এখন তৎপুত্র এই শিশু অনুপনারায়ণ সাম্রাজ্যের প্রকৃত অধিকারী। আমি তাহাকে বাদশাহী দিব। তোমরা আমার সাহায্য করিতে প্রতিজ্ঞা কর। তোমরা পুরুষানুক্রমে একটাকিয়ার আশ্রিত ও প্রতিপালিত। তোমাদের রক্তমাংস একটাকিয়ার অঙ্গে গঠিত। তোমরা ভয় এবং লোভ ত্যাগ করিয়া ধর্ম্মের প্রতি দৃষ্টি কর। এই শিশুকে উপেক্ষা করিলে তোমাদের ইহকাল পরকাল উভয়ই নষ্ট হইবে।” রাণী কিশোরী এবং অত্যাচার রাজমহিলাগণ অমনি তীব্র করুণ স্বরে রোদন আরম্ভ করিল। এই রোদনধ্বনিতে গোড়ের রাজভবন প্রতিধ্বনিত হইল।

সভাস্থ সকলেই দুঃখিত হইল, কেহ কেহ অশ্রুমোচন করিল; কিন্তু কেহই সাহস করিয়া তাঁহার সাহায্য করিতে স্বীকৃত হইতে পারিল না। তাহিরপুরের রাজা জীবনরায় যহ্ননারায়ণের মাস্তো ভাই এবং দেওয়ান ছিলেন। তিনি কিছু দূরবর্ত্তী সম্পর্কে রাণী কিশোরীর মামাতো ভাই। তিনি অনেকক্ষণ চিন্তা করিয়া বিনীতভাবে কহিলেন, “মহারাণী যাহা বলিলেন, তাহাই শাস্ত্রসম্মত বটে। কিন্তু গোধ কাল ও পাত্র ভেদে সকল ব্যবস্থাই পরিবর্ত্তিত হয়। বর্ত্তমান অবস্থায় ধর্ম্মভ্রষ্ট রাজাকে বিচ্যুত করিতে গেলে প্রচুর অনিষ্ট হইবে। দেশ মধ্যে মুসলমানেরা অতি প্রবল। আপনকার সৈন্য ও সেনাপতির সারাংশ মুসলমান।

মহারাজ মুসলমানধর্ম গ্রহণ করায় তাহারা অতিশয় তুষ্ট হইয়াছে। তাহারা অবশ্যই তাঁহার পক্ষ হইবে। মহারাজ নিজে অতি বুদ্ধিমান বীরপুরুষ। তাঁহাকে রাজ্যভ্রষ্ট করা আমাদের অসাধ্য। তিনি কেবল লজ্জা প্রযুক্ত পলাইয়া আছেন, তিনি ভীত হন নাই। আপনারা তাঁহার বিরোধী হইলে অনেকের প্রাণ নাশ অবশিষ্টের ধ্বংসনাশ হইবে। একটাকিয়ায় জলপিণ্ড লোপ পাইবে। আপনারা এই সংকল্প ত্যাগ করুন। ভাড়াটীচক্রই একটাকিয়ার প্রকৃত রাজ্য। আপনারা সেখানে অনুপক্ষে রাজ্য করুন। তাহাতে বোধ হয় বাদশাহ কোন আপত্তি করিবেন না। যদি করেন, তবে আমরা তাঁহাকে নিবারণ করিব। আশমানতার গোড়বাদশাহের কথা। তাহার সন্তানকে গোড়ে বাদশাহী করিতে দিন। ইহাতে দশদিক্ রক্ষা হইবে এবং সর্বত্র মঙ্গল হইবে।” সভাস্থ সকলে অমানি “সাধু সাধু!” বলিয়া তাঁহার মতের পোষকতা করিল। রাণীরাও অবশেষে দেওয়ানজীর উপদেশই অনুসরণ করা কর্তব্য স্থির করিলেন।

রাণীদের সাতগড়া গমন নৌকা সংগৃহীত হইল। গোড়ের ছত্র দণ্ড সিংহাসন এবং গোড় ও পাণ্ডুর রাজপ্রাসাদ হইতে যাবতীয় উৎকৃষ্ট মূল্যবান দ্রব্য সেই সকল নৌকায় বোঝাই করা হইল। তাহার পর বৃদ্ধা রাণী জীবন রায়কে তোষাখানা খুলিয়া দিতে হুকুম দিলেন। দেওয়ানজী নিজ দায়িত্ব বুঝিয়া যত্ন নিকট এত্তেলা দিলেন। যত্ন কহিলেন, “তোষাখানা খুলিয়া দাও, মাতৃদেবীর যাহা ইচ্ছা তাহাই লইয়া যাইতে দাও, তাঁহারা যাহাতে শীঘ্র চলিয়া যান তাহারই চেষ্টা কর।” অনুমতি পাইয়া জীবন রায় সমস্ত ধনাগার খুলিয়া দিলেন। রাণীরা সমস্ত অস্থাবর সম্পত্তি লইয়া সাতগড়া চলিলেন। যত্ন দূত দ্বারা জননীকে প্রণাম পাঠাইলেন। বৃদ্ধা রাণী সক্রোধে কহিলেন, “আমার যত্ন এখন নাই, সে মরিয়াছে।” তাঁহার ক্রোধ দেখিয়া দূত ভয়ে পলায়ন করিল।

রাণীদের প্রস্থানের পর যত্ন দুর্গ হইতে বাহির হইয়া রাজকার্য্য আরম্ভ করিলেন। তিনি নামের মোহর পরিবর্তন করিয়া জেলালুদ্দীন শাহ নামে মোহর করিলেন। তিনি ধর্মোপাসনা বিষয়ে গোড়া মুসলমান হইয়াছিলেন। তিনি প্রত্যহ পাঁচ সন্ধ্যা নমাজ পড়িতেন; প্রাতে এবং সন্ধ্যার পর কোরাণ পাঠ করিতেন; রমজান ও মহরমের রোজা অর্থাৎ উপবাস করিতেন এবং যাবতীয় মুসলমান পর্ক যথারীতি নির্বাহ করিতেন। কিন্তু তাহার ব্যবহারে পূর্ববৎ

হিন্দু-পদ্ধতি স্থির রাখিয়াছিলেন। তিনি কখন বিছানায় বসিয়া আহার করিতেন না; ব্রাহ্মণের অথাত্ত কোন দ্রব্য খাইতেন না এবং স্নান না করিয়া ভোজন করিতেন না। তিনি পাণ্ডুয়ায় দেবসেবার ব্যয় পূর্ববৎ রাজকোষ হইতে দিতেন। তিনি গোহত্যা এবং পিতৃকুলে বিবাহ পূর্ববৎ নিষিদ্ধ রাখিয়াছিলেন। প্রকাশ্য স্থানে কেহ কোন ধর্মের নিন্দা করিলে কঠিন দণ্ড হইত। তাঁহার হিন্দু মুসলমান কর্মচারী সকলেই পূর্ববৎ থাকিল। তাঁহার হিন্দু উপপত্নীগণ বিদায় প্রার্থনা করায় তাহাদিগকে কিছু কিছু অর্থ দিয়া বিদায় করিলেন। সংক্ষেপতঃ একটাকিয়ার রাজারা যেমন সমদর্শী এবং সমতাগ্রিয় ছিলেন, যহু মুসলমান হইয়াও তদ্রূপই থাকিলেন। দিনরাজ ঘোষ নামক একজন উত্তররাষ্ট্রী কুলীন কায়স্থকে তিনি উত্তর বাঙ্গালার নবাব নিযুক্ত করিয়াছিলেন। তাঁহারই সন্তান দিনাজপুরের রাজা।

রাণীরা সাতগড়ায় আসিয়া ভাঙ্গড়িয়া এবং বাজুচতুষ্টয় অধিকার করিলেন। তাহার পর ছিন্দাবাজু প্রভৃতি আর তিনটি পরগণা অতিরিক্ত দখল করিলেন। একটাকিয়ার রাজারা গোড়বাদশাহকে যেরূপ নম' (নজরানা) ও রাজস্ব দিতেন, রাণী ত্রিপুরা তাহা বন্ধ করিয়া অল্পের অভিভাবিকারূপে রাজ্য শাসন করিতে লাগিলেন। অল্প যহুর কুশনির্মিত মূর্তি দাহ করিলেন। জাতিভ্রষ্টের শাস্ত হয় না, এ জন্ত তিনি মস্তক মুণ্ডন ও স্বর্ণ উৎসর্গ করিয়া প্রায়শ্চিত্ত করিলেন। এই অবধি রাণী নবকিশোরী বৈধব্য আচরণ করিতেন। জেলালুদ্দীন সমস্ত সংবাদ পাইলেন, কিন্তু কিছুতেই কোন আপত্তি করিলেন না।

ইহার পর পঞ্চম বৎসরে অল্পের ষোল বৎসর বয়স পূর্ণ হইল। রাণী ত্রিপুরা গোড় হইতে প্রচুর ধনরাশি আনিয়াছিলেন, তিনি সেই অর্থবলে মহাধুমধামে অল্পের বিবাহের এবং রাজ্যাভিষেকের আয়োজন করিলেন। তিনি যহুকে কোন কথা কিছুই জানান নাই। কেবল রাণী কিশোরী, বাদশাহকে এইরূপ ব্যঙ্গ করিয়া নিমন্ত্রণপত্র পাঠাইয়াছিলেন। যথা—

প্রবল প্রতাপবিত্ত শ্রীল শ্রীযুক্ত জেলালুদ্দীন শাহ বাহাদুর রাজোন্নতিম্—

লম্বা সেলামপূর্বক নিবেদনঞ্চ বিশেষ—

মৃত মহারাজা যহুনারায়ে খাঁ সাহেবের পুত্র শ্রীমান্ অনুপনারায়ণ শর্ম্ম খাঁ সাহেবের শুভ বিবাহ ও ভাঙ্গড়ীরাজ্যে অভিষেক হইবে। পত্র দ্বারা নিমন্ত্রণ করিলাম। হজুর আলি বেগম সহ

আগমন পূর্বক শ্রীমানের কল্যাণ প্রার্থনা করিবেন এবং সময়োচিত সভাসৌষ্ঠব করিবেন । ইতি—

আজ্ঞাধীনা—

শ্রীনবকিশোরী দেব্যাঃ ।

বাদশাহ সেই পত্র পাইয়া চিন্তা করিলেন, “যহ্ননারায়ণ প্রকৃতই এখন মৃত । যহ্নর মাতা, জ্ঞী, পুত্র, জ্ঞাতি, কুটুম্ব সকলই আছে । কিন্তু এখন আমার সহ তাহাদের কোন সম্পর্ক নাই । যহ্নর মাতা সর্বদা যহ্নর দীর্ঘ জীবন প্রার্থনা করিতেন, যহ্নর ব্যারাম হইলে আহার নিদ্রা ত্যাগ করিয়া তাহার শুশ্রূষা করিতেন এবং যহ্নকে দেখিলে তাঁহার আনন্দের সীমা থাকিত না । সেই মা এখন আমাকে দেখিতে চান না, আমার নাম শুনিতে পারেন না, সর্বদা আমাকে শাপ দেন । যে সকল লোক যহ্নর পাদোদক এবং উচ্ছিষ্ট সেবন করিয়া পুণ্য জ্ঞান করিত, এখন আমি স্পর্শ করিলে তাহাদের অন্নজল অপবিত্র হয় । তবে আমি কি সেই যহ্ননারায়ণ দেবশর্মা আছি ? ভদ্রং ন কৃতং—আমি ভাল কাজ করি নাই । যে কোন ব্যক্তি যখন ইচ্ছা তখনই মুসলমান হইতে পারে, কিন্তু নূতন কেহ সহস্র তপশ্চা করিয়াও যহ্নর গ্রায় কুলীন ব্রাহ্মণ হইতে পারে না । এখন পুনরায় ব্রাহ্মণ হইতে পারিব না । আত্মগ্লানি প্রকাশ করিলে মুসলমানেরাও তুচ্ছ জ্ঞান করিবে । অতএব মনের ভাব গোপন রাখাই উচিত । এখন রাণীর পত্রের কি উত্তর দেই ?”

তিনি অনেক চিন্তা করিয়া রাণী কিশোরীকে কি পাঠ লিখিবেন, তাহা স্থির করিতে পারিলেন না । এজন্ত নিজ পক্ষ হইতে কোন উত্তর না দিয়া বেগমের পক্ষ হইতে লিখিলেন যে—

এবল প্রতাপাবিতা শ্রীল শ্রীযুক্ত মহারাজী নবকিশোরী দেবী বাহাদুরা

রাজোন্নতিযু—

প্রণামা নিবেদনঞ্চ বিশেষ—

শ্রীযুত বাদশাহের নামিক আপনকার প্রেরিত পত্রে শ্রীমান্ অনুপনারায়ণ বাবাজীর শুভ বিবাহ ও রাজ্যাভিষেক সংবাদ প্রাপ্তে শ্রীযুত বাদশাহ নামদার এবং আমরা সকলেই পরম সন্তোষ লাভ করিলাম । স্বর্গীয় মহারাজ গণেশনারায়ণ ঠাকুরের প্রতিষ্ঠিত পাণ্ডুর দেবালয়ে এবং গোঁড়ের মসজিদে শ্রীমানের কল্যাণার্থ পূজা ও উপাসনার আদেশ করা হইল । নিমন্ত্ৰণ রক্ষার্থ শ্রীযুত রাজা জীবন রায় দেওয়ানজীকে অভিষেকসামগ্রী সহ পাঠাইলাম । লজ্জাপ্রযুক্ত আমি ও বাদশাহ নিজে

যাইতে পারিলাম না। অপরোধ ক্ষমা করিবেন। ইতি—

আজ্ঞাধীনা—

শ্রীআশমানতারা বেগম।

রাণী কিশোরী লেখা পড়া জানিতেন। তিনি যত্নর হস্তাক্ষর দেখিয়া চিনিতে পারিলেন। যত্নর প্রেরিত ঠাণ্ডা চিঠি এবং অভিষেকসামগ্রী পাইয়া স্বামীর পূর্বপ্রেম রাণীর মনে নবভাবে উদ্দীপিত হইল। পুরাতন শোক আবার নূতন হইল। তিনি কান্দিতে কান্দিতে কহিলেন, “আমি রাজার কন্যা, মহারাজার রাণী। পঁয়ত্রিশ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত কখন কোন রকম দুঃখ কষ্ট পাই নাই। চব্বিশ বৎসর স্বামীর কাছে ছিলাম, সে কখন কোন অপ্রিয় কার্য্য করে নাই কিম্বা কখন একটি কটু কথাও বলে নাই।” এই বলিয়া তিনি মন্তকে করাবাত করিলেন এবং মুচ্ছিত হইয়া ভূতলে পড়িলেন। তাঁহার এই অবস্থা দেখিয়া সমস্ত লোক ব্যস্ত হইল।

পুরন্দ্রীগণ এবং দাসীরা নানাপ্রকার শুশ্রূষা করিতে লাগিল। কেহ বাতাস দিল, কেহ মাথায় গোলাপজল দিল, কেহ বুকে পিঠে শতধৌত ঘৃত মালিশ করিল। তাঁহার মুচ্ছার সংবাদ মুহূর্ত্ত মধ্যে সমস্ত রাজবাটীতে ও সমস্ত সহরে প্রচারিত হইল। চারিদিক্ হইতে লোক দৌড়িয়া আসিল। রাণী কিশোরীর সংজ্ঞা হইল, কিন্তু শোক দুঃখের ন্যানতা হইল না।

হিন্দু রমণীরা প্রথম বয়সে কোন কর্তৃত্ব করিতে পারিত না, কিন্তু বেশী বয়সে সংসারের সমস্ত কর্তৃত্বই তাহাদের হাতে পড়িত। বিশেষতঃ পুত্রবধূর উপর শাশুড়ীর প্রভুত্বের সীমা ছিল না। রাণী ত্রিপুরা বধূর মুচ্ছার কারণ শুনিয়া ক্রুদ্ধ হইলেন। আজ অনুপের অভিষেক—শুভদিন জন্ম বেশী গালাগালি দিলেন না, কেবল উগ্রভাবে কহিলেন, “কি লো বো! এত বেলা হ’লো তুই মঙ্গলচণ্ডীর পূজায় বসিস্ নাই, পুরাণো কান্না কান্দিছিস্। যা গিয়েছে তা হাতের বালাই পায়ের বালাই গিয়েছে, যা আছে তারই মঙ্গল দেখ্। তুই কি এই শুভদিনে সেই অপিণ্ডিয়ার জন্ম কেঁদে আমার অনুপের অমঙ্গল ক’রবি?” শাশুড়ীর তর্জনে রাণী কিশোরী ভয়ে ব্যস্ত হইলেন। তাঁহার শোকাবেগ অজ্ঞাতসারে অন্তর্হিত হইল। তিনি উঠিয়া শাশুড়ীকে প্রণাম করিলেন এবং অর্গোণে গরদের ধূতী ও নামাবলী পরিয়া পূজার জন্ম চণ্ডীমণ্ডপে গেলেন।

যহু, রাণী ত্রিপুরার একমাত্র সন্তান এবং সমগ্র স্নেহের পাত্র ছিলেন। জাতি-পাত অবধি সমস্ত মাতৃস্নেহ তাঁহার ভাগ্য হইতে বিস্থলিত হইয়া অনুপের উপর পড়িয়াছিল। রাণী জানিতেন, শাস্ত্রমতে পুত্র, পৌত্র, প্রপৌত্র তিনই সমান। সুতরাং তিনি অনুপকেই একমাত্র সন্তান জ্ঞান করিতেন। গোড়ের সমস্ত রাজ-বৈভব তিনি সাতগড়ায় লইয়া আসিয়াছিলেন এবং যত্নপূর্ব্বক অনুপের জন্ত রাখিয়াছিলেন। এখন তাহারারা তিনি মহানন্দে সাতগড়া স্মরণোত্তীর্ণ করিলেন। হিন্দু রমণীরা মুসলমান রমণীদের হায়ে তত বেশী পরদানসিন ছিলেন না। রাণী ত্রিপুরা বৃদ্ধকালে বাহির বাড়ীতে যাইতেন। তিনি রাজগদীতে বসিতেন না বটে, কিন্তু বাহির দরবারে পৃথক আসনে বসিয়া নিজে রাজকার্য্য করিতেন। অতঃপর তিনি অনুপ ও তাঁহার পত্নীকে কোলে করিয়া প্রকাশ্য দরবারে সিংহাসনে বসিলেন। তাহার পর একত্র দুই হাতী বাঁধিয়া তাহার উপর হাওদায় চড়িয়া নব দম্পতি সহ সমস্ত নগরে গন্ত ফিরিলেন। তাঁহার ধনের অভাব ছিল না। সপ্তাহ পর্য্যন্ত অজস্র দান বিতরণ করিলেন। সাতগড়া দীপে যে কেহ আসিল, তাহাকেই অন্ন বস্ত্র দিলেন। পণ্ডিত ব্রাহ্মণদিগকে প্রচুর ধন দান করিলেন। অত্র ব্রাহ্মণদিগকেও যথেষ্ট পুরস্কার দিয়া বিদায় করিলেন। সমস্ত কয়েদীদিগকে মুক্ত করিয়া পথথরচা দিলেন। কুটুম্বদিগকে মহাই বস্ত্র অলঙ্কার দিয়া লৌকিকতা করিলেন। ভৃত্যদিগকে প্রচুর ইনাম দিলেন। সমস্ত প্রজার এক বৎসরের খাজনা মাফ দিলেন। জেলাবুদ্দীনের প্রেরিত লোকদিগকেও প্রচুর পুরস্কার দিলেন। তন্মধ্যে একজন মুসলমান কর্মচারী রাণীর মন বুক্কাবার জন্ত কহিল, “রাণী-মা! আপনার পুত্রের—”। বুদ্ধা রাণী অমনি কহিলেন, “আমার পুত্র, পৌত্র, সর্ব্বত্র এই অনুপ; পৃথিবীতে আমার আর কেহ নাই।” বলিতে বলিতে চক্ষের জলে তাঁহার বক্ষ ভাসিয়া গেল। রাজা জীবন রায় সক্রোধে ভ্রতঙ্গি করিবামাত্র অমনি সেই মুসলমানটি দূরে সরিয়া গেল।

রাণী কিশোরী নিজের শাড়ী এবং অলঙ্কারগুলি একটি ঝালি (পেটরা) ভরিয়া জীবন রায়ের সহ আশ্রয়ভাষ্যকে উপঢৌকন পাঠাইলেন। তিনি বৈধব্য বেশ ধারণকালে ভগ্ন শাখা খাড়ুর টুকরাগুলি একটি কোটার রাখিয়া ছিলেন, এখন সেই কোটাটি বাদশাহকে উপহার পাঠাইলেন।

বেগমকে রাণী কিশোরী এইরূপ চিঠি লিখিলেন—

সকল-মঙ্গলালয়া শ্রীশ্রীমতী আশমানতার। বেগম বাহাদুরা

রাজোন্নতিবু—

আশীর্বাদপূর্বক নিবেদনক বিশেষ—

দেওয়ানজী সাহেব সহ তোমার প্রেরিত স্রব্যজাত যথাসময়ে পাইয়া সন্তোষ লাভ করিলাম। তোমাদের আশীর্বাদে শ্রীমানের অভিব্যক্তি নির্বিঘ্নে হৃদয়ঙ্গম হইয়াছে। আমি বিধবা, আমার শাড়ী ও অলঙ্কার অব্যবহার্য। অনুপের বধূকে রাণী-মা সমস্তই নূতন তৈয়ারী করিয়া দিয়াছেন। এতদ্ভিন্ন আমার বসন ভূষণ তোমাকে পাঠাইয়া দিলাম। তুমি ভাগ্যবতী, তাহা ব্যবহার করিয়া সার্থক করিবে। আমি পাগল হইয়াছি বলিয়া সকল দোষ ক্ষমা করিবে। ইতি—

আশীর্বাদিকা—

শ্রীনবকিশোরী দেব্যাঃ।

তিনি বাদশাহকে যে কোটা পাঠাইলেন, তন্মধ্যে একটু ভূর্জপত্রে নিম্নলিখিত কয়েকটি শ্লোক * লিখিয়া পাঠাইলেন,—

যবনীর তরে যদি স্বামী দেয় জাতি।

কি পাঠ লিখিবে তারে কহ গোড়পতি ॥

* * * *

ধর্ম্মার্থে রমণীগণ পতিব্রতা হয়।

ধর্ম্মার্থে কিশোরী পতি ছেড়ে দূরে রয় ॥

জীবিত থাকিতে পতি, বিধবা কিশোরী।

হেন অভাগিনী কেবা আছে মরি মরি ॥

জেলালুদ্দীন দেওয়ানজীর নিকট অনুপের ধুমধামে অভিষেক এবং তাহাতে বৃদ্ধা রাণীর উৎসাহ শুনিয়া হাসিতে হাসিতে কহিলেন, “রাণী-মা গোড়ের সিংহাসন অনুপকে দিতে চাহিয়াছিলেন, তাহা দিয়াছেন। আমি সাহায্য ভিন্ন তাঁর কোন কার্যেই বাধা দেই নাই। তবে তাঁর আক্ষেপ কি?” তাহার পর তিনি রাণী কিশোরীর প্রেরিত উপহার পাইয়া নীরবে আত্মগোপন ভোগ করিতে লাগিলেন।

অতঃপর রাণী কিশোরী ক্রমেই কঠোরতর ব্রত আরম্ভ করিলেন। তিনি মাসে মাসে প্রায় আঠার দিন উপবাস করিতেন। তাঁহার শরীর ক্রমশঃ শুষ্ক ও দুর্বল হইল। চতুর্থ বৎসরে তাঁহার গঙ্গাপ্রাপ্তি হইল। জেলালুদ্দীন সমস্ত

* মধ্যবর্তী শ্লোকগুলি অপ্রাপ্য।

অবস্থার তদন্ত রাখিতেন। সাধ্বী স্নশীলা কিশোরীর অকালমৃত্যুর তিনি নিজেই একমাত্র কারণ ইহা জানিয়া বাদশাহ একান্তে বসিয়া নীরবে অশ্রুপাত করিতে-
ছিলেন, এমন সময়ে আশমানতারার উপস্থিত হইয়া তাঁহার রোদনের কারণ
জিজ্ঞাসা করিলেন। বাদশাহ দীর্ঘশ্বাস ছাড়িয়া কহিলেন, “স্নশীলা রাণী কিশোরী
কঠোর ব্রহ্মচর্য্য আচরণ করিয়া অকালে ইহলোক ত্যাগ করিলেন। আমি
তোমার খাতিরে তাঁহার সহ সদ্যবহার করিতে পারি নাই। ইহাই তাঁহার মৃত্যুর
কারণ।” বেগম কহিলেন, “আমি কখন তোমার কাছে রাণী কিশোরীর কোন
নিন্দা করি নাই কিংবা তৎপ্রতি কোন বিদ্বেষ প্রকাশ করি নাই। তুমি তজ্জপ
স্নন্দরী স্নশীলা পত্নী অকারণে ত্যাগ করিয়া অন্তায় করিয়াছ। আমার সন্দেহ
হয় পাছে অন্নের খাতিরে আমার প্রতিও এইরূপ নিষ্ঠুর হইতে পার।” বাদশাহ
কহিলেন, “যার জন্ত করি চুরি সেই বলে চোর—তোমারই অনুরোধে মুসলমান
হইলাম, তজ্জন্ত অণু স্ত্রী, পুত্র, মাতা, জ্ঞাতি, কুটুম্ব সহ বিচ্ছেদ হইল। তুমি
তাঁহাদিগকে ত্যাগ করিতে বল নাই, আমিও ত্যাগ করি নাই। বিধর্ষাশ্রিত
দেখিয়া আমাকে তাঁহারাই ত্যাগ করিয়া গিয়াছেন।” বেগম কহিলেন, “তবে
আমার দোষ কি?” বাদশাহ কহিলেন, “আমি তোমার দোষ দিই না কিংবা অণু
কাহারও দোষ দিই না, সকলই আমার নিজের দোষ। তুমি যে রাণী কিশোরীর
গুণরাশি স্বীকার করিলে, আমি তজ্জন্ত প্রশংসা করি; কেননা তোমার নিজের
গুণ না থাকিলে কদাচ সপত্নীর গুণ স্বীকার করিতে পারিতে না। তিনি এখন
স্বর্গে গিয়াছেন, তাঁহার কোন উপকার বা অপকার করা আমাদের সাধ্য নাই।
তাঁহার পুত্র অনুপকে তুমি কদাচ হিংসা করিও না।” বেগম কহিলেন, “আমি
অনুপকে জ্যেষ্ঠপুত্র জ্ঞান করি এবং চিরজীবন তাহাই জ্ঞান করিব।”

জেলালুদ্দীন দেখিলেন যে, অনুপ সাম্রাজ্যের প্রকৃত উত্তরাধিকারী, কিন্তু
সে নির্বিক্রমে দখল পাইবে না এবং বিবাদ করিলেও কৃতকার্য্য হইবে না।
ভাবী গোলযোগ নিবারণ জন্ত তিনি আশমানতারার জ্যেষ্ঠ পুত্র আহমেদ শাহকে
নিজ জীবনানে সাম্রাজ্য দিলেন। কিন্তু তাঁহাকে এবং যাবতীয় প্রধান সেনাপতি
ও কর্মচারীদিগকে প্রতিজ্ঞা করাইলেন যে, তাহার অনুপকে তাহার দখলী
আট পরগণা হইতে বঞ্চিত না করে। অষ্টাদশ বর্ষ পর্য্যন্ত নির্বিক্রমে রাজত্ব
করিয়া জেলালুদ্দীন হিজরী ৮১২ সালে গৌড়নগরে দেহত্যাগ করেন।

ষষ্ঠ অধ্যায় ।

আহমেদ শাহ ।—অনুপনারায়ণ ।—নাশের শাহ ।—কালাপাহাড় ।—হাব্‌সী রাজগণ ।

জেলালুদ্দীনের মৃত্যুসংবাদ পাইয়া অনুপ নিজ কর্তব্য সম্বন্ধে পণ্ডিতগণকে প্রশ্ন করিলেন । কোন পণ্ডিতই কোন সহত্তর দিতে পারিলেন না । সেই সময়ে বিদ্যাভূষণ উপাধিধারী বিক্রমপুরনিবাসী একটি পণ্ডিত তাঁহাকে গয়াতে পিণ্ডদান করিতে ব্যবস্থা দিলেন * । সেই ব্যবস্থাই অনুপের মনোমত হইল । তদবধি অনুপ বিদ্যাভূষণের একান্ত অনুগত হইলেন । বিদ্যাভূষণ যাহা বলিতেন, অনুপ তাহাই করিতেন । তিনি অগোণে বিদ্যাভূষণকে লইয়া গয়াযাত্রা করিলেন । গয়ালীরা আপত্তি উত্থাপন করিল । গয়ালীরা কেবল তীর্থগুরু ব্রাহ্মণ বলিয়া মাত্র । তাহাদের বিদ্যাসাধ্য বিশেষ কিছু ছিল না । তাহারা বিদ্যাভূষণের সম্মুখে তর্ক করিতে অপারগ হইয়া “মুসলমানের পিণ্ড দিব না” বলিয়া জিদ করিল । বিদ্যাভূষণ কহিলেন, “মুসলমানের শ্রাদ্ধ রাজা করিবেন না এবং অপনারাও করাইবেন না । যে দিন তাঁহার জাতি গিয়াছে, সেই দিন হইতে আমরা তাঁহাকে মৃত জ্ঞান করি ; কিন্তু তৎপূর্ব্ববর্তী যছনারায়ণ শর্ম্মার শ্রাদ্ধ অবশ্য করাইবেন ।” গয়ালীরা তাহাতে সন্মত হইলে, অনুপ বহুব্যায়ে যছনারায়ণের পিণ্ডদান করিলেন । এদিকে পাটনার অপর পারে হাজীপুরে আহমেদ শাহ এক মস্জিদ, অতিথিশালা ও পুষ্করিণী জেলালুদ্দীনের নামে উৎসর্গ করিলেন । এইরূপে যছর দুই পুত্র দুই ধর্ম্মানুসারে তাঁহার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া করিয়াছিলেন ।

অনুপ গয়া হইতে ফিরিয়া পাটনাতে নোকায় উঠিলেন । ঠিক সেই সময়ে আহমেদ শাহ হাজীপুর হইতে আসিয়া তাঁহার সহ সাক্ষাৎ করিলেন । তিনি যাবনিক রীতি অনুসারে সেলাম না করিয়া হিন্দুর গ্রায় জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে প্রণাম করিলেন এবং সাম্রাজ্য গ্রহণ জন্ত অনুরোধ করিলেন । অনুপ কহিলেন, “গরুর জন্ত রাখাল, রাখালের জন্ত গরু নহে । রাজ্য নিজ স্মৃথের জন্ত নহে, বরং প্রজার

* এই পণ্ডিতের নাম আমরা জানিতে পারি নাই, তিনি বিদ্যাভূষণ উপাধি দ্বারাই প্রসিদ্ধ ।

স্থলের জন্ত রাজপদ সৃষ্ট হইয়াছে। পিতা তোমাকে সাম্রাজ্য দিয়াছেন, তুমি তাহা ভোগ করিয়া পিত্রাজ্ঞা পালন কর, প্রজার হিত সাধন করিয়া যশস্বী হও, আমি তাহাতে তুষ্ট আছি। আমি এই গঙ্গার মধ্যে বসিয়া, সাম্রাজ্যে আমার যে কিছু দাবী আছে, তাহা তোমাকে দান করিলাম। তুমি 'নিঃসন্দেহ হইয়া' রাজত্ব ভোগ কর।”

অনুপের বার্ষিক মুনাকা প্রায় পাঁচ লক্ষ টাকা ছিল। আহমেদ আর কিছু ভূমি তাঁহাকে দিয়া মুনাকা ছয় লক্ষ টাকা সম্পূর্ণ করিয়া দিলেন এবং তাঁহার স্বাধীনতা স্বীকার করিলেন। তাঁহাদের সদ্ভাব দেখিয়া মুসলমানেরা চমৎকৃত হইল।

আহমেদ শাহ প্রায় ষোল বৎসর রাজত্ব ভোগ করিয়াছিলেন। তাঁহার রাজত্ব কালে জুয়ানপুরের সুলতান ইব্রাহিম বহু সৈন্য লইয়া বঙ্গদেশ আক্রমণ করেন। আহমেদ ইব্রাহিমের নিকট পরাস্ত হইয়া হিরাটের রাজার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করেন। হিরাটরাজ সারস ইব্রাহিমকে গোড়াধিপতির উপর উৎপীড়ন করিতে নিষেধ করায়, বঙ্গদেশ ইব্রাহিমের অত্যাচার হইতে নিষ্কৃতি লাভ করে। আহমেদ অতিশয় অত্যাচারী ও রক্তপিপাসু ছিলেন। গোলাম হোসেন বলেন যে, তিনি প্রজাবর্গকে নিরর্থক হত্যা ও গর্ভবতী রমণীগণের উদর বিদীর্ণ করিতেন *। তাঁহার অত্যাচারের মাত্রা এতদূর বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছিল যে তাহা রাজ্যের ছোট বড় সকলেরই অসহ্য হইয়া উঠিল। তাঁহার অমাত্যবর্গ তাঁহাকে নিহত করিয়া সমুদ্রতীরের এক পৌজকে ‘নাশের শাহ’ উপাধি প্রদানপূর্বক গোড় সিংহাসনে অভিষিক্ত করিল।

আহমেদেব পতনের পর আশমানতারা অগত্যা অনুপের আশ্রয় লইলেন। বৃদ্ধা রাণী ত্রিপুরা তখনও জীবিতা ছিলেন। বেগম তাঁহাকে অত্যন্ত ভয় করিলেন, অনুপ বেগমকে অতি সম্মানপূর্বক নিজ বাড়ীতে উঠাইলেন। রাজবাড়ীর এক সম্পূর্ণ প্রকোষ্ঠ তাঁহার বাসের জন্ত ছাড়িয়া দিলেন। তাঁহার নিজ ব্যয় নির্বাহের জন্ত মাসিক ৩০০ টাকা বৃত্তি দিলেন। তাঁহার আনুষ্ঠানিক

* ষ্টুয়ার্ট সাহেব কৃত বঙ্গের ইতিহাসে আহমেদ শাহের অত্যাচারের কথা আদৌ উল্লিখিত নাই, বরং তিনি অতি নিরপেক্ষ ভাবে প্রজাপালন করিতেন।

লোকগণকে নিজ চাকরীতে বহাল করিলেন। অল্প তঁাহাকে মা বলিয়া ডাকিতেন এবং প্রত্যহ তাঁহার সহ সাক্ষাৎ করিয়া সমস্ত কর্তব্য কার্য্যে পরামর্শ করিতেন।

বেগম অপমানভয়ে রাণী ত্রিপুরার সহ সাক্ষাৎ করেন নাই। বৃদ্ধা রাণী তাহা জানিতে পারিয়া নিজেই আসিয়া বেগমের প্রকোষ্ঠে উপস্থিত হইলেন। বেগম কাঁপিতে কাঁপিতে গিয়া তাঁহার পদানত হইলেন। বৃদ্ধা রাণী তাঁহার প্রতি কোন কটু ব্যবহার করিলেন না; বরং তাঁহার বংশলোপে ভাছড়ী বংশের বাদশাহী লোপ হইল বলিয়া শোক প্রকাশ করিলেন। বেগমকে নানারূপ প্রবোধ দিলেন। তিনি বেগমকে কহিলেন, “যাহা গিয়াছে, তাহার চিন্তায় কোন ফল নাই। এখন অল্পকেই পুত্র জ্ঞান কর এবং তাহার সন্তান-দিগকে পৌত্র জ্ঞান কর। সকলের সহ দেখা-সাক্ষাৎ আলাপ-আপ্যায়ন কর তাহাতেই মনের শান্তি হইবে। যতই নির্জনে থাকিবে, ততই শোক ও হুশ্চিন্তা বৃদ্ধি হইবে। আমার সহ মধ্যে মধ্যে দেখা করিবে এবং যে কোন দ্রব্য প্রয়োজন হয় আমাকে বলিও। মেয়েলোকের পক্ষে শাশুড়ী মায়ের উপরে। মায়ের কাছে থাকা দশ বৎসর, শাশুড়ীর কাছে চল্লিশ বৎসর। আমার কাছে চাহিতে লজ্জা নাই। তোমার যখন যা লাগে আমি দিব।” শাশুড়ীর দয়া দেখিয়া বেগমের ভয় ভাঙ্গিল। বেগম নানারূপ স্তুতি মিনতি করিলেন। ইহার পর বৃদ্ধা রাণী এক বৎসর জীবিতা ছিলেন। বেগম প্রত্যহ তাঁহার সহ সাক্ষাৎ করিতেন। হিন্দুর মধ্যে থাকিয়া বেগম ক্রমে হরিভক্ত হইয়াছিলেন। তিনি ব্রাহ্মণী বিধবার গ্রাম নিবাসি একাহার করিতেন; একবস্ত্রে থাকিতেন এবং তুলসীতলায় বসিয়া হরিনাম জপ করিতেন। তিনি প্রত্যহ সন্ধ্যার পর ঠাকুরবাড়ীতে আরতি দেখিয়া সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিতেন। তিনি অনেক দিন জীবিতা ছিলেন। তাঁহার মৃত্যু হইলে গঙ্গার কাঁচি চড়ামধ্যে তাঁহার গোর দেওয়া হইয়াছিল।

অল্প বিদ্যাভূষণের একান্ত বাধ্য ছিলেন, এবং তাঁহার পরামর্শে ব্রহ্মচারীর মত চলিতেন। বিদ্যাভূষণ অতি সুপণ্ডিত ও পরিনিষ্ঠ ব্রাহ্মণ ছিলেন বটে, কিন্তু অতিশয় কটুভাষী এবং মুসলমান-বিদ্বেষী ছিলেন। অল্প তঁাহাকে ঠাকুর-বাড়ীতে বাসা দিয়াছিলেন। সেখানে মুসলমানের গতিবিধি ছিল না, সুতরাং

সেখানে তাঁহার যবনবিষে তত প্রকাশ পাইত না। পাঠানেরা একটাকিয়া-দিগের বরাবর প্রধান সহায় ছিল। ভাড়াটী রাজ্যে তাহাদের কর্তৃত্ব প্রচুর ছিল। রাজারা পাঠান সর্দারদিগকে নাম ধরিয়া ডাকিতেন না কিংবা চাকর বলিয়া জ্ঞান করিতেন না। একটাকিয়ারা পাঠানদিগকে নিজ জাতি কুটুম্বসদৃশ ব্যবহার করিতেন এবং কাহাকে দাদা, কাহাকে খুড়া, কাহাকে মামা বলিয়া ডাকিতেন এবং অতি সদ্ভাবে বশীভূত রাখিতেন। বিজ্ঞাভূষণ গল্পীগ্রামবাসী ব্রাহ্মণ। তিনি পাঠানদের হৃদান্ত স্বভাব অবগত ছিলেন না। তিনি একদিন প্রকাশ্য সভায় বলিয়া উঠিলেন “নাধমো যবনাং পরঃ” (যবন জাতি হইতে অধম কেহই নাই)। সেই কথা শুনিয়া উপস্থিত পাঠানেরা অমনি তরবারি খুলিয়া বসিল। অনুপ বহুকণ্ঠে বিজ্ঞাভূষণকে ঠাকুরবাড়ী পৌছাইলেন এবং বাহির হইতে নিষেধ করিলেন। ব্রাহ্মণের ক্রোধ অস্থায়ী, কিন্তু পাঠানের ক্রোধ চিরস্থায়ী। এই ঘটনার সাত মাস পর বিজ্ঞাভূষণ বিগে স্নান করিতে আরম্ভ করিলেন। পাঠানেরা স্বেয়োগ পাইয়া একদিন তাঁহাকে হত্যা করিল। অনুপ সংবাদ পাইয়া মনস্তাপে আহার নিদ্রা ত্যাগ করিলেন। হত্যাকারীর সন্ধান পাওয়া গেল না। হিন্দুরাজ্যে ব্রহ্মহত্যা হইল বলিয়া অনুপ প্রায়শ্চিত্ত করিলেন। কিন্তু তাঁহার মনোমালিঙ্গ গেল না। সেই মনস্তাপেই তৃতীয় দিবসে তাঁহার মৃত্যু হইল।

অনুপ একান্ত সোহাগের ছেলে ছিলেন। বালাকালে পিতামহীর আদরে প্রতিপালিত হইয়াছিলেন। তাহার পর বিজ্ঞাভূষণের পরামর্শে ব্রহ্মচর্য্য আচরণ করিতেন। তাঁহার শরীর অতি সুন্দর হৃষ্টপুষ্টি বলিষ্ঠ ছিল। কিন্তু তাঁহার সাহস বা তেজস্বিতা ছিল না। অনুপ মেধাবী ছিলেন, কিন্তু কষ্ট স্বীকার না করায় অধিক বিজ্ঞা হয় নাই। বাঙ্গালা ও পারসীতে তিনি সাধারণ লেখাপড়া ও কথাবার্ত্তা চালাইতে পারিতেন। পরে বিজ্ঞাভূষণের কাছে অসংখ্য সংস্কৃত শ্লোক শুনিয়া মুগ্ধ করিয়াছিলেন। অস্ত্রশস্ত্র চালনা কিছু কিছু শিখিয়াছিলেন বটে, কিন্তু তাহাতে তাঁহার পটুতা জন্মে নাই। ধর্ম্মের প্রতি তাঁহার দৃঢ় ভক্তি ছিল। তিনি সুদীর্ঘ জীবনে কদাচ একটি মিথ্যা কথা বলেন নাই কিংবা কাহারও কোন অনিষ্ট করেন নাই। তিনি দীর্ঘস্থত্রী ছিলেন, কোন কাজ শীঘ্র করিতে পারিতেন না। অথচ আলস্রমাত্র তাঁহার ছিল না। তিনি অতি অল্পকাল

নিদ্রা যাইতেন এবং এক মুহূর্তও নিদ্রা বসিয়া থাকিতেন না; এজন্ত তাঁহার ধীরতা হেতু কোন কৰ্ত্তব্য কার্য অকৃত থাকিত না। তিনি বাল্যকালে বিলাসী ছিলেন, যৌবনে, বিদ্যভূষণের পরামর্শে তাহা সম্পূর্ণ ত্যাগ করিয়াছিলেন। তাঁহার কখন কোন ব্যারাম হয় নাই। তিনি কখন কোন কষ্টে বা বিপদে পড়েন নাই। তিনি অতি শান্ত ও দয়ালু ছিলেন। কাহারও কোন দুঃখের সংবাদ পাইলেই তিনি তাহা মোচন জন্ত প্রাণপণে চেষ্টা করিতেন। তিনি জিতেন্দ্রিয় ছিলেন এবং একমাত্র বিবাহ করিয়াছিলেন। তাঁহার কোন উপপত্নী ছিল না। তিনি কাহাকেও নিন্দা করিতেন না কিংবা কটুবাক্য বলিতেন না। তিনি ব্রাহ্মণ পণ্ডিত লইয়া শাস্ত্রালোচনা করিতে ভাল বাসিতেন এবং পণ্ডিতদিগকে প্রচুর দান করিতেন। কৃষকদের প্রতি তাঁহার প্রচুর অনুরাগ ছিল। সেই সময়ে যুদ্ধবীরদিগের সর্বত্র সম্মান ও সমাদর ছিল। কিন্তু অনুপ তাহাদিগকে কিছুমাত্র আদর করিতেন না। শিল্পী ও বণিকদের প্রতিও অনুরূপের আদর ছিল না। তিনি নর্তক, গায়ক, ভাঁড়, বাজীকরদিগকেও ঘৃণা করিতেন। পণ্ডিতেরা তাঁহাকে “অনুপম নারায়ণ” বলিয়া প্রশংসা করিতেন। সিপাহীরা তাঁহাকে “না-মরদ” অর্থাৎ কাপুরুষ বলিত।

অনুপনারায়ণ পরম স্মৃতে ৬৪ বৎসর কাল রাজ্যভোগ করেন। তাঁহার রাজত্বকাল মধ্যেই নাশের শাহের মৃত্যু হয়। নাশের শাহ প্রায় ৩২ বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন। তৎপরে তাঁহার পুত্র বারবক গোড় সিংহাসনে অধিরোহণ করেন। তিনিই প্রথম ভারতবর্ষে আবিসিনীয় ও কাক্রি দাসগণকে রাজকার্যে নিযুক্ত করেন। এই সময়েই প্রসিদ্ধ কালাপাহাড়ের দৌরাভ্য হইয়াছিল। কালাপাহাড়ের প্রকৃত নাম কালাচাঁদ রায়। বাল্যকালে তাঁহার মাতা তাঁহাকে “রাজু” বলিয়া ডাকিতেন। তিনি জগদানন্দ রায়ের বংশজাত একটাকিয়ার ভাছড়ী। বর্তমান জেলা রাজশাহী, থানা মান্দা, * বীরজাওন গ্রামে তাঁহার বাড়ী ছিল। তাঁহার পিতা নঞানচাঁদ রায় ঐ গ্রাম ও তৎপাশ্চবর্তী স্থানের ভূঁইয়া ছিলেন এবং গোড় বাদশাহের অধীনে ফৌজদারী কৰ্ম করিতেন। তাঁহার রাজা উপাধি না থাকিলেও তিনি বিলক্ষণ সঙ্গতিপন্ন লোক ছিলেন।

* থানা মান্দা পূর্বে দিনাজপুর জেলার সামিল ছিল।

নঞানচাঁদের অল্প বয়সেই মৃত্যু হয়। কালাচাঁদ তখন নিতান্ত শিশু ছিলেন। তিনিই পিতা মাতার একমাত্র সন্তান। তাঁহার মাতামহ তাঁহার অভিভাবক ছিলেন। কালাচাঁদের পিতৃকুল শাক্ত এবং মাতামহ পরম বৈষ্ণব ছিলেন। মাতামহের শিক্ষাশ্রমে কালাচাঁদ হরিভক্ত হইয়াছিলেন। কালাচাঁদ অতিশয় বুদ্ধিমান, মেধাবী, বলবান, দীর্ঘকায় ও গৌরবর্ণ অত্যন্ত সুন্দর পুরুষ ছিলেন। তৎকালীয় একটাকিয়ারা যেরূপ শিক্ষা পাইতেন, কালাচাঁদ তাহা সমস্তই পাইয়াছিলেন। তিনি বাঙ্গালা ও পারসী ভাষায় সুবিজ্ঞ ছিলেন। তিনি সংস্কৃত জানিতেন না বটে, কিন্তু বহুসংখ্যক সংস্কৃত শ্লোক মুখস্থ করিয়া-ছিলেন। বিষ্ণুপূজা এবং সাধারণ প্রয়োজনীয় মন্ত্রাদিও তিনি জানিতেন এবং পঞ্জিকা দেখিয়া শুভাশুভ দিন ঠিক করিতে পারিতেন। তিনি শস্ত্র-চালনায় এবং অশ্বারোহণেও পটু ছিলেন। তিনি শ্রীপুর গ্রামনিবাসী রাধা-মোহন লাহিড়ীর ছই কন্যাকে বিবাহ করিয়াছিলেন।

বিবাহের ছই বৎসর পর তিনি তৎকালীন গোড় বাদশাহের নিকট চাকরী প্রার্থনা করিলেন। সম্রাট তাঁহার বিদ্যা, বুদ্ধি, সৌন্দর্য্য এবং আভিজাত্য দেখিয়া তাঁহাকে গোড় নগরের ফৌজদার নিযুক্ত করিয়াছিলেন। কালাচাঁদ গোড় নগরে সম্রাটের বাড়ীর নিকটেই বাসা করিলেন। সুন্দরী রমণী হরণ করা মুসলমান বড়মানুষের প্রধান কলঙ্ক ছিল। এজন্ত যে গ্রামে বা নগরে মুসলমান রাজপুরুষ বা জমিদার বাস করিত, তথায় কোন হিন্দু ভদ্রলোক পরিবার লইয়া বাস করিত না। যাহারা ব্যবসায় উপলক্ষে উক্ত স্থানে থাকিত, তাহাদের পরিবার দূরে পল্লীগ্রামে থাকিত। চাকরিরারা কর্মস্থানে প্রায় সকলেই উপপত্নী রাখিতেন। তখন বেলা চারি দণ্ডের সময় কাচারীতে যাইতে হইত এবং ঠিক মধ্যাহ্ন সময়ে কাচারী ভঙ্গ হইত। আগলারা মধ্যাহ্নে বাসায় আসিয়া স্নানাহার করিয়া বিশ্রাম করিত। গ্রীষ্মপ্রধান দেশে আহারান্তে পরিশ্রম করিলে অল্পপিত্ত ব্যারাম হয়। অধুনা ইংরাজ রাজ্যে দেশীয় কর্মচারীদের এই ব্যারাম প্রচুর হইতেছে। পূর্বে ঈদৃশ ব্যাধি কদাচিৎ হইত। কালাচাঁদ প্রত্যহ প্রত্যাষে মহানন্দায় স্নান করিয়া স্তব পাঠ করিতে করিতে বাসায় যাইতেন। তথায় আত্মিক পূজা ও জলযোগ করিয়া দরবারী পোষাক পরিয়া কাচারী যাইতেন। কাচারী হইতে আসিয়া পুনরায় স্নান করিয়া আহার

করিতেন। ধূতীর উপর চাপকান চোগা এবং মাথায় পাগড়ী লাগাইয়া হিন্দুরা কাচারীতে যাইত। মুসলমানেরা ধূতীর স্থলে ইজার পরিত। কালাচাঁদ যে পথে মহানন্দায় যাইতেন, তাহা সম্রাটের বাড়ীর পশ্চাদ্ভাগের অতি নিকট-বর্তী ছিল।

বাদশাহের কন্যা ছলারী বিবি অতীব সুন্দরী ছিলেন। তাঁহার বয়স সতর বৎসর হইয়াছিল, কিন্তু সুপাত্র অভাবে তখনও বিবাহ হয় নাই। তিনি একদিন অট্টালিকার ছাদে দাসীগণ সহ বিচরণ করিতেছিলেন, এমন সময় কালাচাঁদ মহানন্দায় স্নান ও তর্পণ করিয়া স্তব পাঠ করিতে করিতে বাসায় যাইতেছিলেন। ছত্রধর তাঁহার মাথায় ছত্র ধরিয়া যাইতেছিল। ছলারী তাঁহাকে দেখিতে পাইলেন। তাদৃশ সুন্দর পুরুষ তিনি আর কখন দেখেন নাই। কুমারী অমনি বিমোহিত হইতে সেই সুন্দর যুবককে আত্মসমর্পণ করিতে প্রতিজ্ঞা করিলেন। দাসীগণ কহিল, “এই ব্যক্তির কোন পরিচয় না জানিয়া ঈদৃশ প্রতিজ্ঞা করা অনুচিত।” ছলারী কহিলেন, “পরিচয় আমি যাহা পাইলাম তাহাই যথেষ্ট, উহার গলায় পৈতা দেখিয়া জানিলাম যে নীচজাতীয় নহে। উহার ছাতা বরদার এবং হাতে সোণার কোষা দেখিয়া বুঝিলাম যে, সে ধনী লোক। তাহার মস্ত পাঠ শুনিয়া আমি বুঝিলাম যে, সে মুর্খ লোক নহে। তাহার শরীর দেখিয়াই জানিলাম যে, সে পরম সুন্দর বলবান্ নবযুবক। আর বেশী পরিচয় নিম্প্রয়োজন।”

দাসীগণ সেই বৃত্তান্ত বেগমের নিকট বলিল। বেগম পর দিন প্রত্যুষে ছাদ হইতে কালাচাঁদকে দেখিলেন এবং দাসী পাঠাইয়া কালাচাঁদের জাতি কুল ব্যবসায়াদি সমস্ত পরিচয় লইলেন। তাঁহাকে নিজ কন্যার উপযুক্ত পাত্র বুঝিয়া কন্যার অভিলাষ পূর্ণ করিবার জন্ত সম্রাটকে অনুরোধ করিলেন। বাদশাহ দেখিলেন কালাচাঁদ গোড় বাদশাহদিগের মেলবন্ধ কুলীন এবং সর্ব্বাংশেই উপযুক্ত পাত্র; সুতরাং বেগমের প্রস্তাবে সন্মত হইলেন।

পরদিন কালাচাঁদকে আটক করিয়া বাদশাহ বিবাহের প্রস্তাব করিলেন। কালাচাঁদ তাহা স্বীকার করিলেন না। সম্রাট নানা প্রকার লোভ ও ভয় প্রদর্শন করিয়াও কালাচাঁদকে সন্মত করিতে না পারিয়া অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইলেন এবং তাঁহাকে তৎক্ষণাৎ শুলে দিতে আদেশ দিলেন। জল্লাদেরা কালাচাঁদকে বন্দী করিয়া বধ্যভূমিতে লইয়া চলিল। মুহূর্ত্ত মধ্যে সেই সংবাদ সমস্ত নগরে প্রচার

হইল। ছলারী সেই সংবাদে উন্মত্ত হইয়া খিড়কী দ্বার দিয়া রাজবাড়ী হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। তিনি কাদিতে কাদিতে গিয়া কালাচাঁদকে জড়াইয়া ধরিলেন এবং ঘাতুকদিগকে বলিলেন, “আমাকে হত্যা না করিয়া কেহ ইহাকে স্পর্শ করিতে পারিবে না।” জন্মদেৱা হতবুদ্ধি হইয়া বাদশাহের নিকট সংবাদ দিল। বাদশাহ কিংকর্তব্য চিন্তা করিতে করিতে ছলারীর নিকট চলিলেন। এদিকে কালাচাঁদ সেই সম্রাটকুমারীর অদ্ভুত প্রেম, তাঁহার সৌন্দর্য্য ও নরযৌবন দৃষ্টে বিমোহিত হইয়া তাঁহাকে বিবাহ করিতে সম্মত হইলেন। সম্রাট কালাচাঁদকে সম্মত দেখিয়া হুষ্ঠ হইলেন এবং সেই দিনই বিবাহ দিলেন। সেই বিবাহ কি প্রণালীতে হইয়াছিল, তাহা জানা যায় না; কিন্তু ইহা নিশ্চিত যে, কালাচাঁদ তখনও মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করেন নাই।

এই বিবাহ হেতু কালাচাঁদ সমাজচ্যুত হইলেন। তাঁহার মাতা তাঁহাকে নানারূপ তিরস্কার করিলেন এবং তাঁহার প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা নহিলেন। তৎকালীন হিন্দু সমাজ যেন আত্মবিনাশের জন্ত ব্যাকুল ছিল। তখন অতি সামান্য কার্য্য বা কথাতেই হিন্দুদের জাতিপাত হইত এবং সহস্র প্রায়শ্চিত্ত করিয়াও পতিত ব্যক্তি সমাজে উঠিতে পারিত না। তখন সেই ব্যক্তি অগত্যা মুসলমান হইত এবং যথাসাধ্য হিন্দুদের অনিষ্ট করিত। কালাচাঁদের জীবন-বৃত্তান্ত তাহার সর্বোৎকৃষ্ট উদাহরণ। কালাচাঁদ যে অবস্থায় ছলারীকে বিবাহ করিয়াছিলেন, তাদৃশ অবস্থায় ঐ কার্য্য কোন মতেই দৃব্য নহে। অতি সামান্য প্রায়শ্চিত্ত করিলেই তাঁহাকে সমাজে গ্রহণ করা উচিত ছিল। কিন্তু হিন্দু সমাজ অতি অত্যাচাররূপে ধর্ম্মনিষ্ঠ কালাচাঁদকে হিন্দু সমাজ হইতে তাড়াইয়া দিয়াছিল। কালাচাঁদও তাহার জন্ত চূড়ান্ত প্রতিফল দিয়াছিলেন। মাতার উপদেশ মত কালাচাঁদ প্রায়শ্চিত্ত করিলেন, তথাপি সমাজে একঘরিয়া হইয়া থাকিলেন। অবশেষে তিনি জগন্নাথক্ষেত্রে গিয়া ধন্না দিলেন। সপ্তাহ কাল অনাহারে ধন্না দিয়া থাকিলেন, তথাপি তাঁহার প্রতি ভগবানের কোন প্রত্যাদেশ হইল না, অধিকন্তু পাণ্ডরা তাঁহার পরিচয় পাইয়া তাঁহাকে অপমান করিয়া শ্রীমন্দির হইতে বাহির করিয়া দিল। তখন কালাচাঁদ ক্রোধে অধির হইয়া মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করিলেন এবং হিন্দু ধর্ম্ম একবারে বিলোপ করিতে প্রতিজ্ঞা করিলেন। তিনি মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করিলে তাঁহার নাম মহম্মদ ফর্ম্মুলি হইয়াছিল। কিন্তু তাঁহার অত্যাচরণ

হেতু হিন্দুরা তাঁহাকে “কালাপাহাড়” বলিত। সেই নামই সর্বত্র বিখ্যাত; তাঁহার অল্প কোন নামই বিখ্যাত নহে।

কালাপাহাড় উড়িষ্যা হইতে ফিরিয়া আসিয়াই ঋগুরকে উৎকল বিজয়ের জন্ত অনুরোধ করিলেন। বাদশাহ সাগ্রহে সম্মত হইয়া নিজের সমস্ত সেনা জামাতার অধীনে উড়িষ্যায় পাঠাইলেন। উড়িষ্যা তখন একটি পরাক্রান্ত হিন্দুরাজ্য ছিল। ভাগীরথীতীর হইতে গোদাবরী পর্য্যন্ত এই রাজ্য বিস্তৃত ছিল। মুসলমানেরা বারংবার উড়িষ্যা আক্রমণ করিয়া পরাজিত হইয়াছিল। কিন্তু কালাপাহাড়ের বিক্রমে উৎকলপতি পরাজিত ও নিহত হইলেন। উড়িষ্যা মুসলমানদিগের অধীন এবং বাঙ্গালাদেশের অংশ হইল। তিনি উড়িষ্যায়, বিশেষতঃ শ্রীক্ষেত্রে যেরূপ অত্যাচার করিয়াছিলেন, তাহা বর্ণনা করা অসাধ্য।

তিনি উড়িষ্যা হইতে গোঁড়ে প্রত্যাগমনকালে রাঢ় দেশেও ঘোরতর অত্যাচার করিয়াছিলেন। তিনি যাবতীয় দেবমূর্ত্তি চূর্ণ করিয়া বিষ্ঠায় ফেলিতেন। তিনি কতকগুলি শালগ্রাম শিলা সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছিলেন প্রত্যহ তাহাদের উপর প্রস্রাব করিতেন। গোড়ের নিকটবর্ত্তী বরেন্দ্রভূমিতে ও মিথিলাতেও তাঁহার ঐরূপ অত্যাচার হইয়াছিল। তিনি লক্ষ লক্ষ হিন্দুকে মুসলমান ধর্ম গ্রহণে বাধ্য করিয়াছিলেন। যে ব্যক্তি যতক্ষণ মুসলমান না হইত, ততক্ষণ তিনি তাহার উপর অকথা নিষ্ঠুর ভাবে উৎপীড়ন করিতেন। সেই উৎপীড়নে বহু লোকের জীবন শেষ হইত। এক কালাপাহাড় কর্তৃক হিন্দুদের যত অনিষ্ট হইয়াছে, অল্প সমস্ত মুসলমানের অত্যাচার একত্র করিলেও তত হইবে না।

ইহার পর কালাপাহাড় ভাটুড়িয়া ও সাঁতোড়ে হিন্দু ধর্ম বিনাশার্থ চলিলেন। ভাটুড়িয়ার রাজা কালারাজের জননী ও পত্নীদ্বয়কে নিজ বাড়ীতে আনাইয়া রাখিলেন। কালাপাহাড় সেই সংবাদ জানিতে পারিয়া আর পূর্বদিকে গেলেন না। তদ্বারা ভাটুড়িয়া, সাঁতোড়, পূর্ববঙ্গ এবং বকদ্বীপের পূর্বাংশ কালাপাহাড়ের অত্যাচার হইতে রক্ষা পাইল।

তৃতীয় উত্তমে কালাপাহাড় কামরূপ ও আসাম দেশ আক্রমণ করিয়াছিলেন। পথিমধ্যে তিনি দিনাজপুর (দিনরাজপুর), রঙ্গপুর ও কোচবেহারের কতক অংশে ঘোর অত্যাচার করিয়া বহুলোককে মুসলমান করিয়াছিলেন। হিন্দুদের প্রতি তাঁহার অসহনীয় উৎপীড়ন দর্শনে মুসলমানদের মনেও দয়া

হইত। অনেক হিন্দুকে মুসলমানেরা গোপন করিয়া কালাপাহাড়ের অত্যাচার হইতে রক্ষা করিয়াছিল।

আসাম দেশ উড়িষ্যার স্থায় একটি স্বাধীন পরাক্রান্ত হিন্দুরাজ্য ছিল। মুসলমানেরা বারংবার চেষ্টা করিয়াও এই দেশ জয় করিতে পারে নাই। কিন্তু কালাপাহাড় কামরূপ ও আসামের পশ্চিমভাগ অধিকার করিয়া অত্যাচারের একশেষ করিয়াছিলেন। আসাম দেশ জঙ্গলময় এবং অতীব দুর্গম ছিল। কালাপাহাড় আসামের পূর্বভাগে যান নাই। আসামরাজ সেই দিকে প্রচ্ছন্ন ছিলেন। কালাপাহাড় বাঙ্গালায় প্রত্যাগমন করিলেই আসামীরা মুসলমানদিগকে সমস্ত আসাম হইতে তাড়াইয়া স্বদেশ উদ্ধার করিল। কিন্তু কামরূপে কালাপাহাড় যেক্রূপ নিষ্ঠুর অত্যাচার করিয়াছিলেন, তাহা তথাকার লোকে এখনও ভুলিতে পারে নাই।

এই সময়ে বেলোল লোদী দিল্লীর সম্রাট ছিলেন এবং বার্বাক শাহ জৌনপুরের সম্রাট ছিলেন। সমস্ত অযোধ্যা, প্রয়াগ ও কাশী জৌনপুরের অধীন ছিল। জৌনপুরের সম্রাট দিল্লীপতির প্রায় তুল্যকক্ষ ছিলেন। উভয় সম্রাটের মধ্যে চব্বিশ বৎসর যাবৎ ঘোরতর যুদ্ধ চলিতেছিল। কেহই অপরকে নিরস্ত করিতে পারিতেছিলেন না। বার্বাক শাহ কালাপাহাড়ের অতুল বিক্রম শুনিয়া তাঁহাকে নিজ সেনাপতি হইতে নিমন্ত্রণ করিলেন। কালাপাহাড়কে মাতৃভক্ত জানিয়া তিনি তাঁহাকে ভাগিনেয় বলিয়া সম্বোধন করিয়াছিলেন। আর কালাপাহাড়কে পাঠাইবার জন্ত তিনি গোড় বাদশাহকেও অনুরোধপত্র পাঠাইয়াছিলেন। সেই নিমন্ত্রণ স্বীকার করিয়া কালাপাহাড় অন্ন মাত্র ঘোড়া সহ নৌকাপথে জৌনপুর চলিলেন। কাশী, গয়া, অযোধ্যা, প্রয়াগ ও বৃন্দাবনে হিন্দুধর্ম লোপ করা তাঁহার এই নিমন্ত্রণ স্বীকারের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল।

এ দিকে বেলোল লোদী সেই সংবাদ পাইয়া অতিশয় ব্যস্ত হইলেন এবং কালাপাহাড় যাহাতে জৌনপুরে না যাইতে পারে, তাহার উপায় করিতে চেষ্টা করিলেন। মীর আবুল হোসেন নামক একজন অতি চতুর সৈয়দ বেলোলের মন্ত্রী ছিলেন। দিল্লীপতি তাঁহাকে এক সহস্র অশ্বরোহী সহ কালাপাহাড়কে বাধা দিতে পাঠাইলেন এবং আদেশ দিলেন যে, “কালাপাহাড়কে ধৃত করিয়া আনিতে হইবে, নতুবা বিনাশ করিতে হইবে; যেন সে কোন মতে জৌনপুরে

না যাইতে পারে, তাহাই করিতে হইবে।” মন্ত্রিবর সসৈন্তে গিয়া বক্সারের নিকট কালাপাহাড়ের নৌকা দেখিতে পাইলেন। চতুৰ সৈয়দ কালাপাহাড়কে নৌকায় গিয়া আপনাকে বাৰ্বাক শাহের অনুচর প্রকাশে বিনীত ভাবে কহিলেন, “হুজুরের জলপথে যাইতে দীর্ঘকাল লাগিবে। ওদিকে বাৰ্বাক শাহ নিতান্ত বিপদে পড়িয়াছেন। আমাদের অনুরোধ যে, আপনি অশ্বারোহণে শীঘ্র চলুন। আপনার অনুচরগণ ধীরে ধীরে নৌকাপথে যাউক। আপনার সেবার জন্ত এক সহস্র লোক আসিয়াছে। পথিমধ্যে আপনার কোন বিষয়ে কোন কষ্ট হইবে না। আপনি যখন যাহা চাহিবেন, আমরা তখনই তাহা ঘোড়াইয়া দিব।” বাৰ্বাক শাহের কয়েকজন লোকও কালাপাহাড়ের নৌকায় ছিল। তাহারা কিংবা কালাপাহাড় নিজে সৈয়দের চাতুরী বুঝিতে পারিলেন না। কালাপাহাড় আটজন লোক মাত্র লইয়া অশ্বারোহণ করিলেন। রাত্রিকালে অশ্বারোহিণ সরাই মধ্যে কালাপাহাড়কে আক্রমণ করিয়া বন্দী করিল এবং তাঁহার সঙ্গী আটজনকে হত্যা করিল।

কালাপাহাড় বন্দীভাবে দিল্লীতে আনীত হইলে, দিল্লীস্থর তাঁহাকে অতি সম্মানপূৰ্বক গ্রহণ করিলেন। তিনি তাঁহার বন্ধন মুক্ত করিয়া নিজ সিংহাসনের পার্শ্বে বসাইলেন এবং তাঁহাকে পিতা বলিয়া সম্বোধন করিলেন। কিছুদিন পরে নিজ কন্ঠার সহ কালাপাহাড়ের বিবাহ দিলেন। এইরূপে দুই বৎসরে কালাপাহাড়কে সম্পূর্ণ বশীভূত করিলেন। তাহার পর কালাপাহাড়কে সেনাপতি করিয়া বেলাল জৌনপুর আক্রমণে চলিলেন। কালাপাহাড় বিপক্ষে আসিয়াছেন শুনিয়াই জৌনপুরী সেনার সাহস ভঙ্গ হইল। এবারে বাৰ্বাক শাহ সম্পূর্ণরূপে পরাজিত ও নিহত হইলেন। সমস্ত জৌনপুর সাম্রাজ্য দিল্লীর সম্রাটের অধীন হইল। কালাপাহাড়ের বীরত্ব সমস্ত ভারতবর্ষে বিঘোষিত হইল এবং সর্বত্র হিন্দুদিগের হৃৎকম্প উপস্থিত হইল।

জৌনপুর রাজ্য মধ্যে বহুসংখ্যক তীর্থস্থান ছিল, তন্মধ্যে কাশীধাম সর্বপ্রধান। এজন্ত কালাপাহাড় সৰ্ব্বাঙ্গে কাশীধামে হিন্দুধর্ম লোপের প্রয়াসী হইলেন। বলা বহুল্য যে তিনি শ্রীক্ষেত্রে ও কামরূপে যেরূপ অত্যাচার করিয়া ছিলেন, কাশীতেও তাহাই করিতে লাগিলেন।

কালাপাহাড়ের এক মাতুলানী কাশীধামে ছিলেন। কালাপাহাড় তাহা



জানিতেন না। অত্যাচারীদিগকে একজন যবন তাঁহাকে বলাৎকার করিল। তিনি রোদন করিতে করিতে কালাপাহাড়ের নিকট গিয়া আত্মপরিচয় দিয়া বহু তিরস্কার করিলেন এবং সেই থানেই আত্মহত্যা করিলেন। কালাপাহাড় তদদর্শনে স্তম্ভিত হইয়া অমনি অত্যাচার ক্ষান্তি জ্ঞাত আদেশ দিলেন। কালাপাহাড়ের অসাধারণ তেজস্বিতা ছিল। তাঁহার আদেশ মাত্র অত্যাচার শাস্তি হইল। তাহাতেই কেদারেশ্বর শিবলিঙ্গ রক্ষা পাইল। কাশীধামে কেবল কেদারেশ্বরই একমাত্র অনাদিলিঙ্গ এখন পর্য্যন্ত বর্তমান আছে। আর সমস্ত লিঙ্গ ও বিগ্রহই কালাপাহাড়ের পরে স্থাপিত।

সেই দিবস রাত্রিতে কালাপাহাড় সুরক্ষিত গৃহে শয়ন করিয়াছিলেন, কিন্তু পরদিন আর তাঁহাকে দেখা গেল না। তদবধি আর তাঁহার কোন অনুসন্ধান পাওয়া যায় নাই। তাঁহার অনুদেশ হইবার কারণ কি, তৎসম্বন্ধে নানাপ্রকার বিভিন্ন প্রবাদ জনসমাজে প্রচলিত আছে। কেহ বলে, তিনি মনের অনুতাপে সন্ন্যাসী হইয়াছিলেন। কেহ বলে, তিনি গোপনে গঙ্গায় ডুবিয়া মরিয়াছিলেন। মতান্তরে কেহ বলে, কাশীর পাণ্ডরা তাঁহাকে অচেতন অবস্থায় হরণ করিয়া গোপনে হত্যা করিয়া মাটিতে শব পুতিয়া ফেলিয়াছিল। অত্রে বলে, বেলোল লোদী তাঁহার বিক্রম দর্শনে ভীত হইয়া গুপ্তভাবে তাঁহাকে হত্যা করিয়াছিলেন। আবার কেহ বলে যে, তিনি মহাদেবের অংশ ছিলেন এবং বিশ্বেশ্বরে লীন হইয়াছিলেন। এই সকল প্রবাদের স্থির মীমাংসা করা এক্ষণে অসম্ভব। আর কথা যে, কাশীতে অত্যাচারের তৃতীয় দিবস রাত্রিতে তিনি অনুদেশ হইয়াছিলেন। তিনি একাদশ বৎসর হিন্দুধর্মানাশে ব্রতী ছিলেন। বেলোল লোদীর কল্লার গর্ভে ফতেমা নামে তাঁহার এক কন্যা হইয়াছিল। সেই কন্যাই তাঁহার একমাত্র সন্তান।

কালাপাহাড় নিজ সমকালে অদ্বিতীয় বীর ছিলেন, ইহা হিন্দু মুসলমান সকলেই এক বাক্যে স্বীকার করিয়াছেন। অথচ তিনি অমিশ্রিত বাঙ্গালী ব্রাহ্মণের সন্তান এবং বাঙ্গালা দেশেই শিক্ষিত ও বর্দ্ধিত হইয়াছিলেন। বীরত্ব জাতিবিশেষের বা দেশবিশেষের জ্ঞাত নির্দিষ্ট শক্তি নহে। সর্বপ্রকার শক্তিই কেবল শিক্ষা ও অভ্যাস হইতে উৎপন্ন হয় এবং সুযোগ দ্বারা পরিস্ফুট হয়। জুলিয়স সিজর, তৈমুরলঙ্গ এবং হজরৎ মহম্মদের বাল্যকালে বীরত্বের কিছু মাত্র

আভাস ছিল না। কিন্তু তাঁহারা শেষে বিবিধ ঘটনার সুযোগে মহাবীর হইয়া উঠিয়াছিলেন। কালাপাহাড়, নাদির শাহ এবং নেপোলিয়ন বোনাপার্টের বাল্যাবধি কিছু কিছু বীরত্বের লক্ষণ ছিল বটে, কিন্তু ঘটনাস্রোতেই সেই শক্তি পরিস্ফুট হইয়াছিল। পৃথিবীতে বহুসহস্র লোক ইহাদের অপেক্ষাও সমধিক ক্ষমতাশালী ছিল; কিন্তু সুযোগ অভাবে তাহাদের সেই ক্ষমতা প্রকাশিত হয় নাই। যদি ছলারী বিবি কালাচাঁদের রূপে বিমুগ্ধ না হইতেন, তবে কালাচাঁদ অপ্রসিদ্ধ ভাবেই বোধ হয় ইহলোক পরিত্যাগ করিতেন। পৃথিবীতে যিনি যখন মাত্র গণ্য বড় লোক হইয়াছেন, তখনই দেখা যায় যে, তাঁহার ভাগ্যক্রমে এমন সমস্ত ঘটনাবলী উপস্থিত হইয়াছিল, যাহার সঙ্কর্ষণে তিনি উচ্চ পদে আরুষ্ঠ হইয়াছিলেন। তদ্বারাই তাঁহার সুখ্যাতি বা কুখ্যাতি চিরপ্রসিদ্ধ হইয়াছিল। একটাকিয়া ভাড়াড়ী বংশের প্রধান খ্যাতি এই যে, উদয়নাচার্যের তুল্য পণ্ডিত, গণেশের তুল্য রাজা, কালাপাহাড়ের তুল্য বীর এবং মধুখাঁর তুল্য বিষয়বোদ্ধা লোক বাঙ্গালা দেশে আর কোন বংশে কেহ হয় নাই। আমাদের বিবেচনা হয় যে, তাঁহারা যেক্রপ সুযোগ পাইয়াছিলেন, সেইরূপ সুযোগ পাইলে আরও অনেক লোক তদ্রূপ বা তদধিক বিখ্যাত বড় লোক হইতে পারিত। খ্যাতি প্রতিপত্তি লাভ করিতে নিজের ক্ষমতা আবশ্যক বটে, কিন্তু সেই ক্ষমতা সুযোগ ব্যতীত প্রকাশ হয় না। অতএব সুযোগই প্রসিদ্ধির প্রধান কারণ, সন্দেহ নাই।

তারিখ-ই-খাঁজেহান লোদী, তারিখ-ই-শেরশাহী প্রভৃতি পারসী ইতিহাস এবং রাজসাহী অঞ্চলের কিম্বদন্তী অবলম্বনে কালাপাহাড়ের জীবনচরিত লেখা হইল। তারিখ-ই-শেরশাহী মতে কালাপাহাড় বিলোল লোদীর নিকট অযোধ্যা জাগীর পান। ইতিহাস প্রসিদ্ধ কালাপাহাড়ের পরবর্তী কালে যে কোন হিন্দু বড়লোক হিন্দুধর্মের প্রতি অত্যাচার করিত তাহাকেই লোকে কালাপাহাড় বলিত। এখনও যে সকল জমিদার অনেক দেবত্র ব্রহ্মত্র জব্দ করে, তাহাকে লোকে কালাপাহাড় বলে।

অনুপনারায়ণের সময়ে বাঙ্গালা ভাষার বিশেষ উন্নতি সাধন হয়। অনুপের রাজত্বের পূর্বে বাঙ্গালা ভাষার রচনা কদাচিৎ দৃষ্ট হয়, তখন কেবল সংস্কৃত ভাষার ও পারসী ভাষার বিশেষ আলোচনা হইত, বঙ্গভাষায় পুস্তকাদি লেখা

লোকে লজ্জার বিষয় মনে করিত। অল্পের সময়েই বঙ্গদেশে চণ্ডীদাসের ও মিথিলার বিদ্যাপতির আবির্ভাব। পূর্বে বেহার প্রদেশের ও বঙ্গদেশের লোকেরা আপনাদিগকে এক দেশের লোক বলিয়া মনে করিত। মিথিলা পঞ্চগৌড়ের মধ্যে পরিগণিত ও অনেক দিন অবধি সেনবংশীয় রাজাদিগের অধিকারভুক্ত ছিল। চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতির কবিতা বঙ্গ-সাহিত্যে চিরকীর্তিমান। এই সময়ে লোকে রাধাকৃষ্ণের লীলা বিষয়ক গ্রন্থ অতি আদরের সহিত গ্রহণ করিত, সুতরাং তখন চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতি যে বিশেষ সমাদৃত হইয়াছিলেন তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। বস্তুতঃ বলিতে গেলে, চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতি বঙ্গকবিতার প্রথম প্রবর্তক।

আহমেদ শাহের পতনের সঙ্গেই ভাড়াড়ীবংশের বাদশাহী শেষ হয় পূর্বে বলা হইয়াছে যে, গোলাম হোসেন প্রভৃতি মুসলমান ঐতিহাসিকগণ তাঁহাকে অত্যাচারী বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। কিন্তু এ বিষয়ে বিশেষ সন্দেহ হইবার কথা। যে সমস্ত বাদশাহ হিন্দুদিগের প্রতি অনুগ্রহ করিতেন এবং তাহাদিগের পরামর্শানুসারে চলিতেন, মুসলমান ঐতিহাসিকেরা তাহাদিগকে অত্যাচারী বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। আহমেদ শাহ মুসলমানদিগের প্রতি অযথা অনুগ্রহ করিতেন না। কার্যদক্ষতার মুসলমানেরা কোন কালে হিন্দুদিগের তুল্য হয় নাই। মুসলমান বাদশাহদিগের বিশেষ অনুগ্রহেই মুসলমানেরা উচ্চপদ পাইত। আহমেদ তদ্রূপ পক্ষপাতী ছিলেন না। তিনি অযোগ্য মুসলমান কর্মচারীদিগকে অবনত বা কর্মচ্যুত করিয়া তৎপদে সুযোগ্য হিন্দুকর্মচারী নিযুক্ত করিতেন। ইহাতে মুসলমানেরা ষড়যন্ত্র করিয়া তাঁহাকে বিনাশ করিয়া সমুদ্রতীরের এক পৌত্রকে ‘নাশের শাহ’ উপাধি দিয়া বাদশাহ করিল। গোলাম হোসেন প্রভৃতি ঐতিহাসিকগণ আহমেদের অবস্থা মিথ্যা নিন্দা করিয়াছেন, কিন্তু ষ্টুয়ার্ট সাহেব প্রভৃতি অপক্ষপাতী ঐতিহাসিকেরা তাহা বিশ্বাস করেন নাই। বরং তাঁহার চরিত্র ও শাসন প্রশংসা করিয়াছেন। আহমেদ শাহ নিঃসন্তান ছিলেন।

নাশের শাহের বংশধরেরা প্রায় ২৫ বৎসর রাজত্ব করে। তাহারা প্রায় সকলেই অলস, বিলাসী এবং অকর্মণ্য ছিল। সেই অকর্মণ্য গোড় বাদশাহগণ আপনাদের শরীর এবং উপপত্নী-প্রকোষ্ঠ (রঙ্গমহল) রক্ষার্থ কতকগুলি

খোজা (ক্লীব) এবং হাব্‌সী (কাফ্রী) নিযুক্ত করিয়াছিল। শেষে এই হাব্‌সীগণ নাশের শাহের বংশ ধ্বংস করিয়া নিজেরাই বাদশাহ হইয়াছিল। হিন্দু মুসলমান সকলেই তাহাদিগকে ঘৃণা করিত। দূরবর্তী প্রদেশের জমিদার ও শাসকগণ তাহাদিগকে রাজস্ব দিত না। এই অরাজক অবস্থা প্রায় আট বৎসর ছিল। তাহার পর সৈয়দ হোসেন শাহ বহুসংখ্যক হিন্দু মুসলমান প্রবল লোকদিগকে হস্তগত করিয়া গোড়ের সিংহাসন অধিকার করেন।

সপ্তম অধ্যায়।

সৈয়দ হোসেন শাহ।—একটাকিয়ার হিন্দুদিগের সহিত মুসলমান বাদশাহ ও নবাব কতাদিগের বিবাহ।—খ্রীষ্টেতত্ত্বদেব।—বৈষ্ণবকবিগণ।—শেরশাহ কর্তৃক গোড় অধিকার।—অনুজনারায়ণ।—মুকুন্দনারায়ণ।—বঙ্গদেশে ডাকঘর।

মুসলমান ধর্মের উৎপত্তিহান আরবদেশ অতি দরিদ্র মরুভূমি। ঐ ধর্মের উৎপত্তিসময়ে আরবদেশে ধনবান্ বা বিদ্বান্ লোক কেহ ছিল না। মহম্মদ নিজেও নিরক্ষর মুর্থ ছিলেন। আবার মুসলমান দায়ভাগ অনুসারে মৃত ধনীর বহু উত্তরাধিকারী হয়। সুতরাং কোন ব্যক্তির কিঞ্চিৎ সম্পত্তি হইলে, তাহার মৃত্যুর পর অমনি তাহা শত খণ্ডে বিভক্ত হইয়া যায়। সেই জন্য আরবে পুরুষানুক্রমিক বড় লোক কেহ না থাকায়, কুলমর্যাদা কাহাকে বলে, আরব দেশে কেহ তাহা জানিত না। মুসলমান ধর্মপুস্তকে কোথাপি কুল-মানের কোন উল্লেখ নাই বরং মহম্মদের স্পষ্ট মত এই যে, “প্রত্যেক ব্যক্তি কেবল নিজের গুণ ও কর্ম দ্বারা যে কিছু ছোট বড় হউক, তন্নিম্ন আর কোন ইতর বিশেষ নাই, সকল মনুষ্যই সমান।” মুসলমানেরা প্রথম প্রথম সেই মত অনুসারেই চলিত। দশ দিরম্ অর্থাৎ ৩/০ তিন টাকা পাঁচ আনা মূল্যেই একটি আরবী লোককে দাসদাসীরূপে ক্রয় করা যাইত। আবার সেই দাস দাসী অল্পকাল মধ্যেই ক্রেতার পতি, পত্নী, জামাতা বা পুত্রবধূ হইতে পারিত। মহম্মদ নিজেও খাদিজা বিবির

রাখালী চাকরীতে নিযুক্ত হইয়া, তিন বৎসর মধ্যে তাহার স্বামী হইয়াছিলেন। যখন মুসলমানেরা নানা দেশ জয় করিয়া ধনবান্ হইল, নানা দেশের বিত্তা শিক্ষা করিয়া অনেক লোক বিদ্বান্ হইল, তখন তাহাদের মধ্যে অনেকে বংশানুক্রমে বড়লোক হইল। অমনি তাহাদের কুলাভিমান উৎপন্ন হইল। কত্কার যাব-জীবন বিবাহ না হইলেও আত্মীয় ও সৈয়দগণ নীচ কুলে তাহাদের বিবাহ দিত না। কিন্তু পুরুষের বিবাহে তদ্রূপ বিচার ছিল না। বেষ্টা কিংবা মেথরাণীকে পত্নীরূপে গ্রহণ করিতে তাহারা কিছুমাত্র লজ্জা বোধ করিত না।

সৈয়দ হোসেন শাহের পূর্বপুরুষ সুবুদ্ধি খাঁর চাকর ছিলেন।* মধুখাঁর কর্তৃত্বসময়ে সৈয়দ আলি গোড়বাদশাহের ফৌজদারী কর্ম পাইয়াছিলেন। তৎপুত্র সৈয়দ হোসেন হাব্‌সী বাদশাহের সেনাপতি হইয়াছিলেন। তিনি বিদ্রোহদমনের ব্যাপদেশে সৈয়দ লইয়া গিয়া বিদ্রোহীদের সহ মিলিত হইয়াছিলেন। মাতোড় ও ভাঙ্কড়িয়ার রাজারাও সৈয়দ হোসেনের সাহায্য করিতে লাগিলেন। এইরূপে প্রবল হইয়া সৈয়দ হোসেন হাব্‌সীদিগকে পরাজয় করিয়া গোড়ে বাদশাহ হইলেন। তিনি বহুসংখ্যক হাব্‌সীর প্রাণবধ করিলেন। অবশিষ্টেরা দাক্ষিণাত্যে পলায়ন করিল। হাব্‌সী রাজত্বে যে সমস্ত হিন্দু ও মুসলমান জমিদার বিদ্রোহী হইয়াছিল, তাহারা সহজেই সৈয়দের বশ্যতা স্বীকার করিল।

সৈয়দ হোসেন অতি উগ্রস্বভাব এবং স্বৈচ্ছাচারী ছিলেন। কিন্তু বুদ্ধিমান, সদাশয় ও কার্যদক্ষ লোক ছিলেন। পাঠান-রাজত্বে কোন শৃঙ্খলা ছিল না। রাজধানী হইতে দূরবর্তী স্থানে যে যাহা করুক, নবাব ও গোড়বাদশাহগণ

* হোসেন শাহের জন্মভূমি সম্বন্ধে বিভিন্ন মত দৃষ্ট হয়। ডাক্তার বুক্‌নান্ কৃত রঙ্গপুরের বিবরণ পাঠে অবগত হওয়া যায় যে, হোসেন শাহ রঙ্গপুরের বোদা বিভাগের দেবনগরে জন্ম-গ্রহণ করেন। ঐতিহাসিক গোলাম হোসেন বলেন, “হোসেন শাহের জন্মভূমি মক্কা অথবা তেরমুজ, তথা হইতে ঘটনাক্রমে বঙ্গদেশে আগমন করিয়া রাঢ় ভূমির অন্তর্গত চাঁদপুর গ্রামে বাসস্থান নির্মাণ করেন।” চাঁদপুর মুর্শিদাবাদ জেলার জঙ্গীপুর উপবিভাগে। মুর্শিদাবাদ জেলায় এখনও জনপ্রবাদ প্রচলিত আছে যে, হোসেন শাহ বাল্যকালে চাঁদপুরের এক ব্রাহ্মণ গৃহস্থের রাখাল ছিলেন। কিন্তু সৈয়দ বংশীয়েরা রাখালী করা অতি মানহানিকর কার্য মনে করিতেন। হইতে পারে, হোসেন শাহ নামে অল্প কোন লোক ছিল এবং নামের একা থাকাতে এইরূপ পৌলযোগ হইয়াছে।

তদ্বিবরে কোনই তদন্ত করিতেন না। দূরবর্তী জমিদারেরা রাজস্ব দিলেই নবাব ও গোড়বাদশাহগণ তৃপ্ত থাকিতেন। তাঁহাদের দৌৰ গুণের ফলাফল কেবল নিকটবর্তী স্থানেই অনুভূত হইত। মধু খাঁর শাসন সময়ে তিনি সমস্ত সাম্রাজ্য সুশাসনের জন্ত চেষ্টা করিয়াছিলেন এবং কিয়ৎ পরিমাণে কৃতকার্য হইয়াছিলেন। সেই সকল নিয়মাবলী সৈয়দ হোসেন কার্যে পরিণত করিলেন। তিনি সমস্ত জমিদারগণের নিকট কবুলীয়ৎ লইয়া তাহাদিগকে পাট্টা দিয়াছিলেন। সেই সকল পাট্টায় তাহাদের কি কি কর্তব্য তাহা লেখা থাকিত। অধিকন্তু তিনি সৰ্ব্বদা অনুসন্ধান রাখিতেন এবং জমিদারগণকে নিজ হুকুম মত কার্য করিতে বাধ্য করিতেন। মদ খাওয়া এবং জুয়া খেলা তাঁহার রাজত্বে সম্পূর্ণ তিরোহিত হইয়াছিল। চোর ডাকাইত এবং ঠগগণ তাঁহার ভয়ে সৰ্ব্বদা শঙ্কিত থাকিত। লোকে বলে, তাঁহার ভয়ে বাঘে ছাগে একঘাটে জল খাইত অথচ কেহ কাহারও মুখের প্রতি দৃষ্টি করিতে সাহস পাইত না। তিনি আপনাকে ঈশ্বরের প্রতিনিধি বলিয়া জ্ঞান করিতেন। তিনি প্রজা ও ভৃত্যদিগকে বাধ্য করিয়া প্রণাম গ্রহণ করিতেন। তিনি কাহারও কথার বাধ্য ছিলেন না। তজ্জন্ত তাঁহার কর্মচারীদের কোন প্রাধাত্য ছিল না; কাজেই তাহাদিগকে কেহ প্রচুর উৎকোচ দিত না। তাঁহার আহার ও পরিচ্ছদ অতি সামান্য ছিল। তিনি নৃত্য, গীত, বাজ, চাটুকায়ী, তামাসা ভালবাসিতেন না। তিনি গোঁড়া মুসলমান ছিলেন। তিনি হিন্দুদের প্রতি বিশেষ কোন অত্যাচার করেন নাই। তাঁহার সময়ে অনেক হিন্দুও প্রধান প্রধান রাজকার্যে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। পুরন্দর খাঁ তাঁহার প্রধান মন্ত্রী ছিলেন। বৈষ্ণবাবাচার্য্য সনাতন ও তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা রূপ গোস্বামী বিশিষ্ট রাজকার্যে নিযুক্ত ছিলেন। হোসেন শাহ জেলায় জেলায় শাসন কার্য নির্বাহ জন্ত উপযুক্ত কর্মচারী প্রেরণ করিতেন। পূর্ববর্তী বাদশাহগণের রাজত্ব সময়ে যে সকল বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইত, "তাঁহার এই সুব্যবস্থায় তাহা বিদূরিত হয়, এবং সকলেই শান্তিতে কালযাপন করে। তিনি বহুসংখ্যক মসজিদ, পাহুনিবাস (সরাই) ও শড়ক প্রস্তুত করাইয়াছিলেন। তিনি পারসী ও আরবী ভাষা শিক্ষার জন্ত বহু-বিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি অতি সহজেই ক্রুদ্ধ হইতেন এবং ক্ষুদ্র অপরাধে কঠিন দণ্ড করিতেন। তাঁহার স্ত্রীপুত্রও তাঁহার নিকট কথা বলিতে ভয় পাইত। ফলতঃ যে সকল লোক তাঁহার

নিকটস্থ ছিল তাহারা তাঁহাকে ভালবাসিত না। অথচ দূরস্থ প্রজা ও ভৃত্যগণ তাঁহার গুণ গান করিত। তাঁহার সময়ে বার জন প্রধান জমিদার বাঙ্গলা দেশে ছিল। তাহাদিগকে বারভূঁইয়া বলিত। সেই বারভূঁইয়ারা পূর্বে প্রায় স্বাধীন ছিল। সৈয়দ হোসেন তাহাদের ক্ষমতা সঙ্কুচিত করিয়া তাহাদিগকে সম্পূর্ণ আঙ্গাকারী করিয়াছিলেন। কিন্তু বোধ হয় চন্দ্রদ্বীপের রাজাকে ততদূর আয়ত্ত করিতে পারেন নাই।

সৈয়দ হোসেন শাহের চারি পত্নীর গর্ভজাত বহু কন্যা হইয়াছিল। তন্মধ্যে দুইটি কন্যার বয়স বিংশতি বৎসরের অধিক হইয়াছিল, অথচ সমকক্ষ পাত্র না পাওয়ায় তাহাদের বিবাহ দিতে না পারিয়া তিনি চিন্তিত ছিলেন। জাগীরদারেরা প্রতিবৎসর নিতান্ত পক্ষে একবার বাদশাহের নিকট গিয়া তাঁহাকে বন্দনা করিতে বাধ্য ছিলেন। সেই নিয়মানুসারে একটাকিয়ার রাজা মদন খাঁ নিজের দুই পুত্র কন্দর্প ও কামদেব খাঁকে সঙ্গে লইয়া বাদশাহের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিলেন। সম্রাট্ দেখিলেন, মদনের পুত্রদ্বয় অতি সুন্দর, সাক্ষাৎ করিতে আসিলেন। সম্রাট্ দেখিলেন, মদনের পুত্রদ্বয় অতি সুন্দর, বিদ্বান্, বুদ্ধিমান্ এবং যুবা পুরুষ। তাহারা কুলীন ব্রাহ্মণ এবং রাজপুত্র সূতরাং সর্বাংশেই তাঁহার কন্যার যোগ্যপাত্র। তিনি অমনি মদনকে সপুত্রক আটক করিয়া বিবাহের প্রস্তাব করিলেন। মদন অতি বিনীতভাবে কহিলেন, “ধর্ম্মাবতার! আপনি আমাদের রাজা এবং রক্ষক, আমি আপনকার একান্ত অনুগত এবং হিতার্থী ভৃত্য। আমার প্রতি অত্যাচার করা হুজুরের পদবীর অযোগ্য।” বাদশাহ চতুরতা পূর্বক কহিলেন, “খাঁ সাহেব! আমি একটাকিয়ার রাজবংশীয়দিগকে অতিশয় ভালবাসি এবং মাগ্ন করি। তোমরা যেমন হিন্দুর গুরু ব্রাহ্মণ, আমরা তেমনি মুসলমানগণের গুরু সৈয়দ। তোমাদের কন্যা যেমন অপর হিন্দু বিবাহ করিতে পারে না, তেমনি আমাদের কন্যা কোন অপর মুসলমানে বিবাহ করিতে পারে না। তোমাকে অতীব সম্ভ্রান্ত জানিয়াই তোমার পুত্রসহ আমি কন্যার বিবাহ দিতে ইচ্ছা করি। কোনরূপ অত্যাচার করা অভিপ্রায় নহে। আমি তোমার পুত্রগণকে মুসলমান হইতে বলি না। বরং পত্নীই পতির ধর্ম্ম অনুসরণ করে, ইহাই জগতের সাধারণ রীতি। তুমি যদি আমার কন্যাদিগকে স্বজাতিতে মিলাইয়া লইতে চাও, তাহাতেও আমি সম্মত আছি। নতুবা তোমার পুত্রেরা আমার ধর্ম্ম গ্রহণ করুক, আমি তাহাদিগকে স্বজাতিতে মিলাইয়া লইব। এই উভয়

প্রস্তাব মধ্যে যেটি তোমার বাঞ্ছিত হয়, আমি তাহাই স্বীকার করিব। কিন্তু যদি তুমি উভয়ই অস্বীকার কর, তবে আমি বলপূর্ব্বক তোমাকে বাধ্য করিব।” মদন বাদশাহের উগ্র স্বভাব জানিতেন। তিনি দেখিলেন বাদশাহের উভয় প্রস্তাব অস্বীকার করিলে বহুলোকের প্রাণনাশ ও জাতিনাশ হইবে। আর মুসলমানীকে নিজ জাতিতে মিলাইবার কোন উপায়ও নাই। অগত্যা তিনি দুই পুত্রের মায়া ত্যাগ করিলেন। তাহারা মুসলমান হইয়া শাহজাদীদ্বয়কে বিবাহ করিল।

এইরূপে বলপূর্ব্বক ধৃত জামাতারা কত্য়ার প্রতি অনুরক্ত হইবে কি না তদ্বিষয়ে বাদশাহের অতিশয় সন্দেহ ছিল। তিনি তাহাদিগকে বশীভূত করিবার জন্ত প্রচুর সম্পত্তি এবং রাজকীয় উচ্চ পদ দিয়াছিলেন। বাদশাহের কত্য়ারা অতি সুন্দরী ছিল। সম্রাট দেখিলেন কত্য়ার ও জামাতার বেশ প্রণয় হইয়াছে এবং তাহারা সুখী হইয়াছে। সেই জামাতারা বিদ্বান্ ও কার্যদক্ষ লোক। বাদশাহ তাহাদিগকে যখন যে কার্যে নিযুক্ত করিতেন, তাহারা সেই কার্যই সুচারুরূপে নির্বাহ করিয়া প্রশংসিত হইত। ইহাতে বাদশাহের উৎসাহ বৃদ্ধি হইল। তিনি পরিভ্রমণচ্ছলে সাতগড়ার উপস্থিত হইয়া মদনের পুত্র ও ভ্রাতুষ্পুত্র আরও এগার জনকে ধরিয়া আনিয়া মুসলমানধর্মে দীক্ষিত করিলেন, এবং তাহাদের সহ নিজের অবশিষ্ট সমস্ত কত্য়ার বিবাহ দিলেন। মদনের চতুর্থ পুত্র রতিকান্তের দৃষ্টান্তই কম ছিল। সে রাত্রিতে একেবারেই দেখিতে পাইত না। বাদশাহ কেবল তাহাকে ছাড়িয়া দিয়াছিলেন। তাহারই দ্বারা মদনের বংশরক্ষা হইয়াছিল। সম্রাট্ রহস্ত করিয়া মদনকে বলিতেন, “বুঝেছ বিবাহ! যে অন্ধ, সেই হিন্দু থাকুক; যাহার চক্ষু আছে, তাহার মুসলমান হওয়াই উচিত।”

এই অবধি পথ পড়িল। ইহার পর অনেক নবাব ও বাদশাহ একটাকিয়ার যুবক ধরিয়া তৎসহ কত্য়ার বিবাহ দিয়াছিলেন। ঘটকদের পুস্তকে ২৯ জন একটাকিয়ার, মুসলমান রাজকুমারী বিবাহ করিয়া জাতিভ্রষ্ট হওয়া জানা যায়। তজ্জন্ত একটাকিয়ারা হিন্দু ও মুসলমানের কুলীন বলিয়া খ্যাত হইয়াছিলেন। প্রথম যখন কন্দর্প ও কামদেব মুসলমান হইয়া শাহজাদীদ্বয়কে বিবাহ করিয়াছিল, তখন দেশব্যাপী অধ্যাতি এবং আন্দোলন হইয়াছিল। তাহার পর পুনঃ পুনঃ ঐরূপ ঘটনা হওয়ায় তাহা অভ্যস্ত হইল। তখন আর বেশী কিছু আন্দোলন বা আক্ষেপের কারণ হইত না। মুসলমান রাজকুমারীরা প্রায়শঃ অতি সুন্দরী

হইত । যে সকল একটাকিয়া রাজকুমার তাহাদিগকে বিবাহ করিত, তাহারা মুসলমান সমাজে বিলক্ষণ সম্মান পাইত, প্রচুর সম্পত্তি এবং রাজকীয় উচ্চপদ পাইত । সুতরাং জাতিপাত জন্ত বিশেষ দুঃখিত হইত না । বরং অনেকে তাহা সুখকর জ্ঞান করিত । তাহাদের হিন্দু জাতি কুটুম্বেরা প্রথম প্রথম তাহাদের সহ কোনরূপ আত্মীয়তা করিত না ; কিন্তু অভ্যস্ত হওয়ার পর পরস্পর আত্মীয়তা থাকিয়া যাইত এবং পরস্পর সাহায্যও করিত । জাতিভ্রষ্ট একটাকিয়ারা হিন্দুর উত্তরাধিকারী হইত না এবং তজ্জন্ত চেষ্টাও করিত না ।

সর্বত্রই মুসলমানেরা কোন বিধর্মীকে স্বধর্ম্মে আনিতে পারিলে মহা পুণ্য জ্ঞান করে । ভারতবর্ষীয় মুসলমানেরা কোন ব্রাহ্মণকে মুসলমান করিতে পারিলে, সমধিক পুণ্য জ্ঞান করিত । একটাকিয়াদের ছায় সঙ্গতিপন্ন সম্রাট কুলীন ব্রাহ্মণকে মুসলমান করা বাঙ্গালার নবাব ও বাদশাহগণ অতীব গৌরবের বিষয় বোধ করিতেন । মুসলমান আর্মীরেরা সচরাচর নিজের ভ্রাতৃপুত্র, ভাগিনেয় সহ কন্যার বিবাহ দিত । তাহা না যুটিলেই একটাকিয়ার যুবক বরিয় তাহাকে মুসলমান করিত এবং তৎসহ কন্যার বিবাহ দিত । মুসলমানেরা অনেক হিন্দুর কন্যা হরণ করিত ; একটাকিয়াদের মুসলমান শাখা হইতে অনেক কন্যা নবাব ও বাদশাহগণ বিবাহ করিয়াছেন । কিন্তু একটাকিয়াদের হিন্দুশাখা হইতে কখন কোন কন্যা মুসলমান কর্তৃক হৃত হয় নাই । একটাকিয়ারা ধনী ছিল, তাহাদের অঙ্গনাগণ অন্তঃপুরে গুপ্ত থাকিত । মুসলমানেরা তাহাদের বিষয় কিছুই জানিতে পারিত না । ইহাই তাহাদের ধর্ম্মরক্ষার কারণ বলিয়া অনুমিত হয় । পরন্তু একটাকিয়ারা অতিশয় প্রবল লোক ছিল, তাহাদের ঘর হইতে রমণী হরণ করা সহজ ছিল না, ইহাই দ্বিতীয় কারণ বোধ হয় ।

এই সময়ে বাঙ্গালা দেশে কতকগুলি প্রসিদ্ধ ঘটনা হইয়াছিল, যাহার ফলাফল অদ্ব্যপিত কিয়ৎপরিমাণে বাঙ্গালা দেশে দেখা যায় । হিন্দুসমাজে শাক্ত, বৈষ্ণব, শৈব, সৌর ও গাণপত্য এই পাঁচ প্রকার উপাসনা প্রসিদ্ধ । তন্মধ্যে শৈব, সৌর এবং গাণপত্য মতের উপাসক বাঙ্গালা দেশে ছিল না । বৈষ্ণব-দিগের সংখ্যাও অতি কম ছিল । প্রায় সমস্ত বাঙ্গালীই শাক্ত মতের উপাসক ছিল । কিন্তু সাময়িক প্রয়োজনানুসারে অনুপের সময় হইতেই বৈষ্ণব মত প্রবল হইয়া উঠে ।

হিন্দুসমাজ অতি বিশৃঙ্খল ও আত্মঘাতী হইয়া উঠিয়াছিল। কথায় কথায় হিন্দুর জাতিপাত হইত এবং সহস্র প্রায়শ্চিত্ত করিলেও আর সেই পতিত ব্যক্তি সমাজে গৃহীত হইত না। মল্লব্য সামাজিক জীব, সমাজ হইতে পৃথক হইয়া একাকী থাকিতে পারে না। সুতরাং হিন্দুসমাজ হইতে পরিত্যক্ত লোকেরা মুসলমানধর্ম গ্রহণ করিয়া সেই সমাজে মিলিত হইতে বাধ্য হইত। কর্ম দ্বারা লোকের পাপপুণ্য, এবং অবস্থার উন্নতি বা অবনতি হইতে পারে বটে, কিন্তু জাতি পরিবর্তন হইতে পারে না। কেননা জন্ম দ্বারাই জাতিত্ব হয়, কর্ম দ্বারা জাতি হয় না। কর্মজ পাপ সমস্তই প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা খণ্ডন হইতে পারে এবং শাস্ত্রে তাহার যথোচিত বিধানও আছে; কিন্তু সেই শাস্ত্রীয় বিধান তৎকালীয় হিন্দুসমাজে মাথ হইত না। তজ্জগৎ বহুলোক মুসলমান হইতে বা দেশান্তরী হইতে বাধ্য হইত। সম্রাট যত্ননারায়ণ নিজেও সেই জগত্ই মুসলমান হইয়াছিলেন। হিন্দু সমাজের সেই কষ্ট নিবারণ জগত্ই শ্রীচৈতন্য প্রভুর বৈষ্ণব-মত সহজে প্রবল হইয়া উঠিল। বৈষ্ণব-মতে তিনবার হরিবোল বলিলেই অতি সহজে সর্বপাপ খণ্ডন হইত, এমন কি যবনাদি বিধর্মীও কয়েকবার 'হরিবোল' বলিয়া পরম সাধু-বৈষ্ণব হইতে পারিত এবং অনেক মুসলমান সেই উপায়ে হিন্দু বৈষ্ণব হইয়াছিল, কেহ কেহ বা গোস্বামী গুরু পর্য্যন্তও হইয়াছিল। তন্মধ্যে ব্রহ্ম-হরিদাসই সর্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ।

নিমাই পণ্ডিত তাৎকালিক বৈষ্ণবদিগের প্রধান গুরু এবং অনেকের নিকট নারায়ণের অবতার বলিয়া পূজিত। তিনি ইংরাজী ১৪৮৬ খৃষ্টাব্দের ১৮ই ফেব্রুয়ারী রাত্রি প্রায় ১১টার সময় চন্দ্রগ্রহণ কালীন নবদ্বীপধামে পণ্ডিত জগন্নাথ মিশ্রের ঔরসে তৎপত্নী শচীদেবীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার কোন সন্তান হইবার পূর্বেই তিনি অল্পবয়সে সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণ করিয়াছিলেন। সুতরাং তাঁহার কোন বংশধর নাই। তিনি সন্ন্যাসী হইলে তাঁহার নাম কৃষ্ণচৈতন্য বা চৈতন্য প্রভু হইয়াছিল। জগাই ও মাধাই তাঁহার প্রিয় শিষ্য ছিল। তাহারাও সন্ন্যাসী হইয়াছিল। তাহাদেরও বংশ নাই।

নিত্যানন্দ বা নিতাই প্রভু রাঢ়ী ব্রাহ্মণের সন্তান। বাল্যকালেই সন্ন্যাস-ধর্মে দীক্ষিত হইয়া পরে সংসারী হইয়াছিলেন। খড়দহের গোস্বামীরাই তাঁহার বংশধর। সন্ন্যাসী হইয়া পরে সংসারী হওয়ার ইহাদের বীরভদ্রী দোষ আছে।

শান্তিপুরের অদ্বৈত গোস্বামী বা অদ্বৈত প্রভু কখন সন্ন্যাসী হন নাই । তিনি সংসারে থাকিয়াই পরম বৈষ্ণব ছিলেন । শান্তিপুর ও উথুলীর গোস্বামী এই অদ্বৈত প্রভুর সন্তান এবং বৈষ্ণবদিগের সর্বশ্রেষ্ঠ গুরু । ইহারা বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ ।

ঘনশ্যাম আচার্য্য, মাধব আচার্য্যের পুত্র । তিনি অদ্বৈত প্রভুর ভাগিনেয় এবং প্রিয় শিষ্য ছিলেন । অদ্বৈত ও নিত্যানন্দ একমতাবলম্বী বলিয়া পরস্পরের পরম বন্ধু ছিলেন । অদ্বৈত ঘনশ্যামকে সঙ্গে লইয়া নিত্যানন্দের বাড়ীতে দেখা করিতে গিয়াছিলেন । নিত্যানন্দের গঙ্গা নাম্নী এক কন্যা ছিল । নিতাই সেই কন্যা ঘনশ্যামের সহ বিবাহ দিতে অদ্বৈতের সম্মতি চাহিলেন । অদ্বৈত কহিলেন, “মাধবাচার্য্যের সম্মতি ব্যতীত এরূপ সম্বন্ধ হইতে পারে না ।” তখন নিত্যানন্দ ও অদ্বৈত উভয়ে গিয়া মাধবাচার্য্যের সম্মতি চাহিলেন । মাধব নিজে বৈষ্ণব ছিলেন । তিনি প্রভুদ্বয়ের নিকট প্রণত হইয়া কহিলেন, “যদি সামাজিক বাধা না হয়, তবে আপনাদের আদেশ আমার শিরোধার্য্য ।” তখন অদ্বৈত ও নিত্যানন্দ বহুসংখ্যক রাঢ়ী ও বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের ও কুলীন কুলজ্ঞদের পাতি ও লিখিত সম্মতি লইয়াছিলেন । তাঁহারা সকলেই মত দিয়াছিলেন যে, “রাঢ়ী বারেন্দ্রে বিবাহ হইলে, কোন দোষ হয় না ।” তদনুসারে ঘনশ্যামের সহ গঙ্গার প্রকাশরূপে বিবাহ হইয়াছিল । শ্রেণীবিভাগের পর ইহাই বিভিন্নশ্রেণীর শ্রোত্রিয় মধ্যে একমাত্র প্রকাশ বিবাহ । প্রয়োজন বশে কোন কোন রাঢ়ী ব্রাহ্মণ আপনাকে বারেন্দ্র বলিয়া পরিচয় দিয়া প্রকৃত বারেন্দ্র সহ বিবাহে আদান প্রদান করিয়াছে, কোথাও বা কোন বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ আপনাকে রাঢ়ী পরিচয় দিয়া রাঢ়ী ব্রাহ্মণ সহ ঐরূপ আদান প্রদান করিয়াছে । তাহার পর প্রকৃত পরিচয় প্রকাশ পাইলে কিছুদিন দলাদলি চলিত ; শেষে ক্রমশঃ দলাদলি মিটিয়া যাইত । এইরূপ দৃষ্টান্ত অনেক পাওয়া যায় । কিন্তু একপক্ষ রাঢ়ী, অগ্রপক্ষ বারেন্দ্র, ইহা স্পষ্ট প্রকাশ করিয়া গঙ্গার সহ ঘনশ্যামের যেরূপ বিবাহ হইয়াছিল, তাদৃশ বিবাহ আর পূর্বে বা পরে হয় নাই ।

শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাবে বঙ্গসাহিত্যেও এক প্রবল বন্যা আসিয়াছিল । এই সময়ে গোবিন্দদাস, জ্ঞানদাস, বলরামদাস প্রভৃতি বহুতর বৈষ্ণব কবি মধুর পদাবলীর দ্বারা বঙ্গভাষা অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন । প্রায় অধিকাংশ কবিতাই শ্রীগৌরানন্দের জীবন সম্বন্ধীয় । সে সময়ের কবিদিগের সহজ সরল ভাষায়, ভাব

বিকাশ আজও সাহিত্য জগতে অতুলনীয়। *

হোসেনশাহ ৯২৭ হিজরীতে পরলোক গমন করিলে তৎপুত্র নশরৎ শাহ বাদশাহ হন। নশরৎ শাহের সময়েই বাবর ইব্রাহিম লোদীকে বিনাশ করিয়া দিল্লীর সিংহাসন অধিকার করেন। বহুসংখ্যক বিশিষ্ট আফগান নশরৎ শাহের আশ্রয় গ্রহণ করেন। ইব্রাহিম লোদীর কণ্ঠা তদীয় খুল্লতাত মাহমুদের সঙ্গে বঙ্গদেশে আসেন। নশরৎ সকলকেই সম্মানে গ্রহণ করিয়া ইব্রাহিমের কণ্ঠাকে বিবাহ করেন। পরে হিজরী ৯৩৫ সালে বাবর জোনপুরে উপনীত হইয়া তৎপার্শ্ববর্তী স্থান সমূহ স্বীয় অধিকারভুক্ত করিলেন এবং তৎপরে বঙ্গদেশ আক্রমণ করিতে সক্ষম করিলে নশরৎ শাহ তাঁহার সহিত সন্ধি সংস্থাপন করেন।

নশরৎ শাহ ১৩ বৎসর রাজত্ব করিয়া হিজরী ৯৪০ সালে নিহত হন। তাঁহার মৃত্যুর পর সরদারগণ তাঁহার পুত্র ফিরোজ শাহকে বঙ্গের সিংহাসন প্রদান করিল; কিন্তু তিনমাস অতীত না হইতেই তাঁহার পিতৃব্য মাহমুদ শাহ তাঁহাকে হত্যা করিয়া সিংহাসন অধিকার করিলেন। ইতিমধ্যে সামারামের জাগীরদার শের শাহ প্রবল হইয়া গোড় অধিকার করিবার জন্ত অতিশয় বত্বপরায়ণ ছিলেন। শের শাহের পুত্র জালাল খাঁ ৯৪৪ হিজরীতে গোড় আক্রমণ করিল। মাহমুদ শাহ যুদ্ধ করিতে অসমর্থ হইয়া পলায়ন করিলেন। এমন সময়ে শের শাহ স্বয়ং মাহমুদের পশ্চাদ্ভ্রমণ করিলেন। অগত্যা মাহমুদ শাহ তাঁহার সহিত যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইলেন, এবং যুদ্ধে আহত হইয়া পুনরায় পলায়ন করিলেন। শের শাহও নির্বিবাদে গোড়নগরে উপনীত হইয়া বঙ্গদেশ অধিকার করিলেন। তাহার পর শের শাহ ভাট্টিয়া আক্রমণ করিলেন। তৎকালীন ভাট্টিয়ার রাজা অনুজনারায়ণ যুদ্ধ না করিয়া তাঁহার শরণাগত হইলেন। শের শাহ তাঁহাকে ভাট্টিয়া এবং সাবেক বাজুচতুষ্টয়ের জন্ত পূর্ব নিয়মে নর্মা এবং মালগুজারী দিতে এবং সমস্ত অতিরিক্ত পরগণা ছাড়িয়া দিতে বলিলেন। অনুজ তাহাতে

* এই সকল পদাবলী সম্বন্ধে প্রদ্বাদ্য রমেশ চন্দ্র দত্ত "Literature of Bengal" নামক গ্রন্থে লিখিয়াছেন,—“They are always sweet and often display a vivid fancy and considerable depth of feeling.....The admirer of modern Bengali literature will be surprised at the sweetness and beauty that pervade these old compositions.”

সম্মত হইলেন। শের মোগল সম্রাট্ হুমায়ুনের সহ যুদ্ধে অমুজের সাহায্য চাহিলেন। অমুজ নিজ জ্যেষ্ঠপুত্র মুকুন্দনারায়ণের অধীনে পাঁচ হাজার সৈন্য এবং নগদ পাঁচ লক্ষ টাকা দিলেন। ইহাতে শের শাহ সন্তুষ্ট হইয়া অমুজকে একটাকিয়া রাজা স্বীকার করিয়া সনন্দ দিলেন। এই সনন্দ এখনও বিদ্যমান আছে।

তদবধি কুমার মুকুন্দনারায়ণ খাঁ শের শাহের আদিষ্ট কার্যে ব্যাপৃত ছিলেন। শের শাহ দিল্লীর সম্রাট্ হইলে মুকুন্দ বিদায় প্রার্থনা করিলেন। শের দেখিলেন বাহুবল ভিন্ন দিল্লী সাম্রাজ্যে তাঁহার অস্ত্র কোন দাবী নাই; হুমায়ুন তখনও ভারতবর্ষেই আছেন; সহজেই আবার প্রবল হইয়া উঠিতে পারেন। মুকুন্দ বুদ্ধিমান্ বীরপুরুষ এবং গোড়বাদশাহের বংশজাত। এ সময় তাহাকে ছাড়িয়া দিলে সে দেশে গিয়া বাঙ্গালাদেশ পুনরায় দখল করিতে চেষ্টা করিতে পারে। এজন্ত তিনি মুকুন্দকে বিদায় দিলেন না। কিন্তু প্রকৃত অভিপ্রায় গোপন করিয়া কহিলেন, “খাঁ সাহেব! আমি তোমাকে যতদূর বিশ্বাস করি, অস্ত্র কাহাকেও ততদূর বিশ্বাস করিতে পারি না। তুমি আমার দক্ষিণ হস্ত। আমার সাম্রাজ্য এখনও নির্বিলম্ব হয় নাই। হুমায়ুন এখনও ভারতবর্ষেই ঘুরিতেছে। এ সময় তোমার মত সহায় আমার নিতান্তই আবশ্যক। তোমার বাড়ী অতি দূরবর্তী। তুমি একবার বাড়ী গেলে পুনরায় আমার সাহায্যের জন্ত আসা সহজ ব্যাপার নহে। এজন্ত আমার অনুরোধ যে, তুমি আর কিছু দিন থাকিয়া আমার উপকার কর। তাহার পর ধনে মানে সম্পন্ন হইয়া দেশে যাইও।” শের এইরূপ কপট স্নেহ প্রকাশ করিয়া মুকুন্দকে আরও পাঁচ বৎসর আটক রাখিয়াছিলেন।

শের শাহ বোধপূরের রাজার সহ যুদ্ধ করিয়াছিলেন। তাহাতে মুকুন্দ ক্ষতবিক্ষত হইয়া বহুকষ্টে শের শাহের প্রাণরক্ষা করিয়াছিলেন। শের অতি যত্নপূর্বক মুকুন্দের স্ফটিকিংসা করাইলেন। মুকুন্দ আরাম হইলেন বটে, কিন্তু তাঁহার দক্ষিণ পদখানি প্রায় অবশ হইয়া গেল। তখন শের শাহ বিবেচনা করিলেন, “এখন হুমায়ুন দেশত্যাগী হইয়াছে। আমার রাজ্য নিরূপদ্রব হইয়াছে এবং মুকুন্দও অকর্ম্মণ্য হইয়াছে। সুতরাং এখন মুকুন্দকে ছাড়িয়া দিতে কোন ভয় নাই।” তিনি মুকুন্দকে প্রচুর ধন ও সম্ভ্রান্ত খেলাত দিলেন। তিনি অনুরোধের নিকট হইতে যে সকল পরগণা খাস করিয়া লইয়াছিলেন, তাহা

পুনরায় মুকুন্দকে জমিদারী স্বত্ত্বে বন্দোবস্ত করিয়া দিয়া নৌকাপথে তাঁহাকে দেশে পাঠাইয়া দিলেন। মুকুন্দ দেশে আসিয়া কেবল চারি বৎসর জীবিত ছিলেন। তিনি একটি শিশুপুত্র রাখিয়া পিতৃবর্ত্তমানেই গতান্ব হইলেন।

সম্রাট্ শের শাহ সর্বপ্রথমে চিঠি চলাচল জন্ত ভারতবর্ষে ডাকঘর স্থাপন করিয়াছিলেন। সেই সকল ডাকঘর কেবল সহরে এবং থানায় থানায় ছিল। অস্থারোহী বাহকগণ এক থানা হইতে চিঠির পুলিন্দা অত্র থানায় পৌছাইত। টিকিট ছিল না, সমস্ত চিঠি ব্যায়িং যাইত। চিঠির ওজন অনুসারে মাণ্ডল কম বেশী হইত না। স্থানের দূরত্ব অনুসারে যত থানা দিয়া বাহিত হইত (থানা প্রতি আধআনা) তত আধ আনা মাণ্ডল লাগিত। প্রত্যেক থানায় একজন করিয়া ডাক মুন্সী এবং একজন বরকন্দাজ থাকিত। বাদশাহী চিঠি, সরকারী কর্মচারীদিগের চিঠি এবং জমিদারদের চিঠিমাত্র বিলি হইত। তাহার মাণ্ডল লাগিত না। জমিদারেরা ডাক খরচা বলিয়া একটি টেক্স দিত। তাহা দ্বারা ডাকঘরের খরচা, মুন্সী ও বরকন্দাজের বেতন ও রাস্তা ঘাটের মেরামতী খরচ চলিত। অপর লোকের চিঠি বিলি হইত না। তাহা এক বৎসর পর্য্যন্ত ডাকঘরে থাকিত। লোকে ডাকঘরে তদন্ত করিয়া মাণ্ডল দিয়া চিঠি লইয়া যাইত। এক বৎসর পর্য্যন্ত কেহ চিঠি না লইলে তাহা দগ্ধ করা হইত।

অষ্টম অধ্যায় ।

রাজা জগৎনারায়ণ খাঁ ।—দ্বিতীয় কালাপাহাড় ।—দাউদ খাঁ ।—পাঠান রাজত্বের শেষ ।—

তৌড়রমল কর্তৃক জগৎনারায়ণের ক্ষমতা হ্রাস ।—রাজা কংসনারায়ণ ।—

ছুর্গোৎসব ও বাসন্তী ।—বারেন্দ্র ব্রাহ্মণদের কুলমর্যাদা

সংশোধন ।—জগৎনারায়ণের মৃত্যু ।

মুকুন্দনারায়ণের নাবালক পুত্র জগৎনারায়ণ খাঁ পিতামহের উত্তরাধিকারী হইলেন । তাঁহার জননী সুধামণি তাঁহার শরীররক্ষিকা অভিভাবিকা হইলেন ; কিন্তু রাজ্যশাসন বিষয়ে সুধামণির কোন কর্তৃত্ব ছিল না । অনুজের পাঁচ পুত্র তখন জীবিত ছিলেন । তাঁহারা প্রত্যেকে নিজ নিজ ব্যয় নির্বাহ জন্ত যথাযোগ্য আয়মা পাইয়াছিলেন । তাঁহারাই রাজ্য শাসন ও সংরক্ষণ করিতেন ।

নাবালক রাজার মৃত্যুতে তাঁহাদের লাভ ছিল, এই জন্ত তাঁহারা নাবালকের শরীররক্ষক হইতে পারেন নাই । এই হেতু সেই ভার রাজার মাতার উপর ছিল । অধিকন্তু দেবর ও ভৃত্যগণের উপরেও রাণী সুধামণির কতক কর্তৃত্ব ছিল । অল্পকাল মধ্যেই রাণী সুধামণি রাজপুরোহিত গুরুদাস চক্রবর্তীর সহ গুপ্তপ্রেমে লিপ্তা হইলেন । তাহাতেই তাঁহার গর্ভসঞ্চার হইল । রাণী সেই ঘটনা গোপন রাখিবার উদ্দেশ্যে বৈরাগ্যের ভাগ করিয়া কাশীবাস করিতে গেলেন । তিনি নাবালক পুত্রের শরীররক্ষার ভার ভাগুরনবিস স্বরূপচন্দ্র সরকারের হাতে দিয়া গিয়াছিলেন । তখন রেলওয়ে, টেলিগ্রাফ ছিল না এবং চিঠি চলাচলের রীতিমত সুবিধা ছিল না । যাতায়াতের পথে দস্যুভয় খুব ছিল । কাশীধামে কে কি করিত, তাহা বাঙ্গালাদেশে কেহ সহজে জানিতে পারিত না । রাণী সুধামণির পরবর্তী বিবরণ সুপরিজ্ঞাত নহে । তিনি কাশীতে বহুদিন জীবিতা ছিলেন এবং জগৎনারায়ণের প্রথম বিবাহ উপলক্ষে একবারমাত্র দেশে আসিয়াছিলেন ।

পূর্বে দরিদ্র শূদ্রেরা বহুসন্তান প্রতিপালনে অক্ষম হইলে, ব্রাহ্মণের নিকট অল্পমূল্যে সন্তান বিক্রয় করিত । উপযুক্তমূল্য লইয়া অস্বাস্থ্য লোকের নিকটও সন্তান

বিক্রয় করিত। দেবসেবা বিপ্রসেবা তুল্য গণ্য ছিল। ব্রাহ্মণের দাসত্ব করিলে কাহারও জাতিপাত বা মানহানি হইত না। আধুনিক শিক্ষিত শূদ্রেরা যেমন পিতা মাতা এবং ব্রাহ্মণের পরিচর্যা করা অপমান জ্ঞান করে, তখন কেহ তদ্রূপ জ্ঞান করিত না। এজন্ত সৎ শূদ্রেরা কম মূল্যে ব্রাহ্মণের নিকট সন্তান বিক্রয় করা শ্রেয়ঃ জ্ঞান করিত। কখন কখন সম্পূর্ণ বিনা মূল্যে বিপ্রসেবার জন্ত তাহারা পুত্র-কন্যা দিত। যদিও তৎকালীন ব্যবহারে প্রভুরা দাসদিগকে হত্যা করিলেও দণ্ডনীয় হইতেন না, তথাপি ব্রাহ্মণের ক্রীতদাসদের উপর বিশেষ কোন অত্যাচার ছিল না; বরং ধনী বা বিদ্বান্ ব্রাহ্মণের দাসেরা শীঘ্রই উন্নতিলাভ করিতে পারিত। স্বরূপ সরকারের পিতা হারাণ দাস রাজা অনুজনারায়ণের ক্রীতদাস ছিল। স্বরূপের মাতাও বিনা মূল্যে গৃহীতা দাসী ছিল। তাহারা উভয়েই কায়স্থ সন্তান। অনুজের রাণী তাহাদিগের বিবাহ দিয়া নিজ পরিচর্যা রাখিয়াছিলেন। তাহাদের পুত্র স্বরূপ দাস বাঙ্গালা লেখাপড়া শিখিয়া সরকার উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছিল এবং ভাণ্ডারনবিসী কর্ম্ম পাইয়াছিল। তাহার পর ক্রমেই তাহাদের বংশের অবস্থা উন্নত হইয়াছে।

এখানে ভাণ্ডারনবিস অর্থ ধনাগারের অধ্যক্ষ নহে। দেশের অবস্থা পরিবর্তনে অনেক শব্দের অর্থও পরিবর্তিত হয়। ইংরেজী জজ শব্দের অর্থ বিচারক আর আরবী মুন্সেফ শব্দের অর্থ সুবিচারক। স্মরণ্যে মূল্যে জজ শব্দ অপেক্ষা মুন্সেফ শব্দ অধিক সম্মানাত্মক। কিন্তু ইংরেজের আমলে ইংরেজী শব্দের সম্মান বেশী। সেই জন্ত উচ্চতর বিচারকের উপাধি জজ এবং নিম্নতর বিচারকের উপাধি মুন্সেফ। মুসলমান রাজত্বকালে ভাণ্ডারী এবং খাজাঞ্চী শব্দেরও ঐরূপ তারতম্য হইয়াছিল। খাজাঞ্চী অপেক্ষা ভাণ্ডারী শব্দের মূল্য উৎকৃষ্ট। কিন্তু কার্যতঃ খাজাঞ্চী সমস্ত ধনের কর্তা অতীব সম্ভ্রান্তপদস্থ ছিলেন। আর ভাণ্ডারী সাধারণ পরিচারক অপেক্ষা কিঞ্চিৎ উচ্চপদস্থ সামান্য ভৃত্যমাত্র ছিল। চাউল, ডাইল প্রভৃতি খাদ্য দ্রব্য, দাও, কুড়াল, খন্তা প্রভৃতি গৃহ-কর্ম্মের অস্ত্র এবং নিত্য ব্যবহার্য বস্ত্র প্রভৃতি অল্প মূল্যের জিনিষ ভাণ্ডারীর জিন্মায় থাকিত। সোণা রূপা, মণি মুক্তা, শাল বনাত প্রভৃতি বহুমূল্যের দ্রব্যের সহ ভাণ্ডারীর কোন সংশ্লিষ্ট ছিল না। ভাণ্ডারী লেখা পড়া জানিলে পারসী ভাষার “নবিস্” শব্দ যোগে তাহার ভাণ্ডারনবিস উপাধি হইত। সেই পারসী শব্দটি যোগ

হওয়ায় সম্মান বৃদ্ধি হইত। ভাণ্ডারী শব্দ হইতে ভাণ্ডারনবিস শব্দ সম্মানকর ছিল। রাজার খুড়া রামদেব খাঁ নিজেই খাজাকী ছিলেন।

নাবালক রাজার অভিভাবক হইবামাত্র স্বরূপের সৌভাগ্য প্রচীয়মান হইল। বহু লোক এখন তাহার অনুগ্রহের জন্ত নানারূপ উপসর্পণ করিতে লাগিল। স্বরূপ সকলের সহ ভদ্রতা করিতেন, কিন্তু নিজ কর্তব্য সাধন ভুলিতেন না। কোন ঘটনায় সহজে না হয় এই অভিপ্রায়ে স্বরূপ নানাদেশীয় নানাজাতীয় মোট আট জন লোক রাজার শরীররক্ষকরূপে নিযুক্ত করিয়া নিজ পুত্র লালারামচন্দ্র সরকারকে তাহাদের পরিচালক করিলেন। উত্তরপশ্চিম প্রদেশে সঙ্গতিপন্ন শূদ্র ও বৈশ্যদিগকে “লালা” বলে। বেহার প্রদেশে কেবল কায়স্থদিগকে লালা বলে। যেমন কাশ্মীরী ব্রাহ্মণ লেখা পড়া জানুক বা না জানুক সকলেরই উপাধি পণ্ডিত এবং বাঙ্গালা দেশের অস্থিষ্ঠ চিকিৎসাশাস্ত্র কিছুমাত্র না জানিলেও তাহার বৈজ্ঞ উপাধি হয়, সেইরূপ বেহারে লাল শব্দ কায়স্থের জাতিবাচক হইয়া গিয়াছে। বাঙ্গালা দেশে কায়স্থের মধ্যে বাহারী পাবসী-শিক্ষিত, তাহাদেরই লালা উপাধি হইত। কায়স্থ ভিন্ন অগ্র জাতীয় লোক পারসী পড়িলে লালা উপাধি হইত না। এখন বাঙ্গালা দেশে পারসীর চর্চা না থাকায় লালা উপাধি অপ্রচলিত হইয়াছে। লালা উপাধি পূর্বে অতি সম্ভ্রান্ত উপাধি ছিল। তখন বাবু উপাধি ছিল না। লালারামচন্দ্র সরকার পরীক্ষা না করিয়া কোন বস্তুরাজাকে খাইতে দিতেন না। রাজার জন্ত খাদ্য প্রস্তুত হইলে সর্বপ্রথমে তাহার কিয়দংশ পাচককে কিংবা তাহার পুত্রকে খাইতে দিতেন। রাজার জন্ত পাণ, রাম লালার নিজ ঘর হইতে তৈয়ার করিয়া আনিতেন। রাজার শয়নঘরে স্বরূপ নিজে কিংবা রাম লালার শয়ন করিতেন। অগ্র কাহাকেও থাকিতে দিতেন না। রাম লালার নিজেই রাজাকে বাঙ্গালা ও পারসী শিক্ষা দিতেন। তাহারই তত্ত্বাবধানে সিপাহীরা রাজাকে অস্ত্র চালনা এবং অস্ত্র শিক্ষা দিত। পণ্ডিতেরা তাহাকে ধর্মশাস্ত্র শিক্ষা দিতেন। রাজার খুল্লতাতগণ, গুরু, পুরোহিত এবং রাম লালার পরামর্শ করিয়া প্রথমে এক কুলীনকন্যা সহ, পরে দুইটি সিদ্ধ শ্রোত্রিয়ের কন্যা সহ রাজার বিবাহ দিলেন। ষোল বৎসর উত্তীর্ণ হইলে রাজা বয়ঃপ্রাপ্ত হইলেন, তখন যাগ যজ্ঞ করিয়া রাজার অভিষেক-ক্রিয়া সম্পাদিত হইল। রাণী সুধামণি এই সময়ে তপস্বিনী বেশে দেশে আসিয়াছিলেন, পুত্রের বিবাহ ও অভিষেক সমাপ্ত হইলে

পুনরায় কাশীবাসে গেলেন। বড় ঘরের কথা কেহ মুখ ফুটিয়া বলিতে পারে না, অথচ কাহারও অজ্ঞাত থাকে না। রাণী সুধামণির কাশীবাসের প্রকৃত কারণ অনেকেই অবগত হইয়াছিল।

রাজা জগৎনারায়ণ সর্বপ্রাণে স্বরূপ সরকারের বিশ্বস্ততার পুরস্কার করিলেন। সাতগড়ার দক্ষিণ পাড়ায় দালান, পুষ্করিণী এবং বাগানযুক্ত এক বাড়ী তৈয়ারী করিয়া স্বরূপের বাসের জন্ত দিলেন। আর তারাস নামক একখানি গ্রাম কম জমার মক্ৰরী মৌরসী তালুক করিয়া স্বরূপ সরকারকে দিলেন। বুদ্ধ স্বরূপ কৰ্ম্ম করিতে অক্ষম হইলে তাহার পুত্র রাম লালাকে জমানবিসী কৰ্ম্ম দিয়া স্বরূপকে অবসর দিলেন। পূর্বে কেবল ব্রাহ্মণেরাই নিষ্কর ভূমি ভোগ করিতে পারিত। তাহার পর মুসলমান পীর মোল্লা প্রভৃতিও নিষ্কর জমি পাইতেছিল। ধর্ম-ব্যবসায়ী লোক ভিন্ন অত্রে নিষ্কর ভূমি ভোগ করিলে নির্বংশ হয় বলিয়া সর্ব-সাধারণের বিশ্বাস ছিল। অত্ৰ লোকের উপর রাজার অমুগ্ৰহ হইলে কম জমার জমি মক্ৰরী করিয়া দেওয়া হইত। সেই জন্ত স্বরূপকে তাহাই দেওয়া হইল। এই অবধি বাস্তবিক স্বরূপের দাসত্বমুক্তি হইল। কিন্তু স্বরূপ কিংবা তৎসংশী-দিগকে রাজারা কখন স্পষ্টরূপে দাসত্বমুক্ত করেন নাই। আর তাহারাও কখন দাসত্ব হইতে অব্যাহতি পাইতে প্রার্থনা করে নাই অথবা তাদৃশ প্রার্থনা প্রয়োজনীয় বোধ করে নাই।

এই সময়ে সলিমান কেরাণী বাঙ্গালা ও বেহারের সম্রাট ছিলেন। তাঁহার রাজত্ব সময়ে দিল্লীতে পুনঃ পুনঃ রাজবিপ্লব হইয়া অবশেষে পাঠান সাম্রাজ্য সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হইল। মোগল জাতীয় আকবর শাহ দিল্লীর সম্রাট হইলেন। মোগলেরা সংখ্যায় অতি অল্প ছিল। ভারতবর্ষীয় অন্যান্য মুসলমানদিগের সহ তাহাদের সন্মুখ ছিল না, এজন্য তাহারা হিন্দুদিগকে স্বপক্ষ করিতে চেষ্টা করিয়া-ছিল। পাঠান কর্তৃক উৎপীড়িত হিন্দুর অধিকাংশই মোগলদেব সহায় হইয়া-ছিলেন। বিশেষতঃ আন্ধের ও যোধপুরের রাজপুত রাজগণ মোগল সম্রাটদিগের সহ কুটুম্বিতা করিয়া প্রাণপণে তাঁহাদের হিত চেষ্টা করিতেন। তাহাতেই মোগল সম্রাটেরা পাঠান ও উজ্জ্বকদিগকে পরাজয় করিয়া “দিল্লীখরো বা জগদীশ্বরো বা” হইতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

রাজা জগৎনারায়ণের সময়ে দ্বিতীয় কালাপাহাড় আবির্ভূত হইয়াছিল। লোকে কালাপাহাড়ের বৃত্তান্ত ঘেঁরুপ বলিয়া থাকে তাহাতে বোধ হয় যেন কালাপাহাড় কেবল একজন মাত্র ছিল। কিন্তু সময়ের প্রতি লক্ষ্য করিলে তাহা সম্পূর্ণ অসম্ভব হইয়া পড়ে। কেননা দিল্লীর সম্রাট বিলোল লোদী গোড় বাদশাহ সলিমান কেরানীর ৬০ বৎসর পূর্ববর্তী লোক। একজন কালাপাহাড় প্রথমে সলিমান কেরানীর সৈন্যপতি করিয়া তাহার পর বিলোল লোদীর সেনাপতি হওয়া অসম্ভব। পরন্তু প্রথম কালাপাহাড় অনুদ্দিশ্য হওয়ার কালে তাহার বয়স ৩৪ বৎসর মাত্র হইয়াছিল। সুতরাং একই ব্যক্তি দ্বারা উভয় কার্য্য কদাচ হইতে পারে না। বিশ্বকোষ অভিধানেও কালাপাহাড় দুই জন বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। দ্বিতীয় কালাপাহাড়ের বৃত্তান্ত সম্পূর্ণ বলিবার উপায় নাই। তাহার পূর্ব নাম কি ছিল এবং শিক্ষা কত দূর হইয়াছিল এবং তাহার পিতার নাম কি ছিল কিছুই জানা যায় না। কেবল জানা যায় যে সে এক জন রাঢ়ী ব্রাহ্মণের জ্যেষ্ঠ পুত্র, তাহার বাটী বর্ধমান জেলায় কাটোয়ার নিকট ছিল। সে একটি মুসলমান রমণীর প্রেমে মুগ্ধ হইয়া তাহার প্রবর্তনায় মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করিয়া উক্ত রমণীকে বিবাহ করিয়াছিল। হিন্দুরা তজ্জন্ত তাহাকে নিন্দা ও ঘৃণা করায় সে অতিশয় হিন্দুবিদ্বেষী হইয়াছিল। সে পরিচিত লোক মধ্যে থাকিতে না পারিয়া গোড় নগরে গিয়া গোড় বাদশাহের সৈনিক কর্ম্মে নিযুক্ত হয়।

প্রথম কালাপাহাড় যে উড়িষ্যা জয় করিয়াছিলেন সেই বিজয় দীর্ঘ কাল স্থায়ী হয় নাই। উড়িষ্যার গঙ্গবংশীয় * আর একজনকে রাজা করিয়া দেশের কতক অংশের স্বাধীনতা উদ্ধার করিয়াছিল। তাহার পর ত্রৈলঙ্করাজ গঙ্গপতিবংশীয় মুকুন্দদেব গঙ্গবংশীয়দিগকে পরাজয় ও নিজেদের অধীন করিয়া অতিশয় পরাক্রান্ত হইয়াছিলেন। তিনি সমস্ত উড়িষ্যা হইতে মুসলমানগণকে নিষ্কাশিত করিয়া বাদশাহ দক্ষিণ ভাগে কিছু দূর পর্য্যন্ত অধিকার করিয়াছিলেন। তখন গোড় বাদশাহ দ্বিতীয় কালাপাহাড়ের অধীনে একদল সেনা উড়িষ্যা বিজয়ের

* অনেকে গঙ্গবংশ বলেন কিন্তু চোড়গঙ্গদেব নাম হইতে স্পষ্ট বুঝা যায় যে গঙ্গবংশ প্রকৃত নাম। চোড়গঙ্গদেবের প্রপৌত্র অনঙ্গ ভীমদেবের সময়ে জগন্নাথ দেবের মন্দির বর্তমান আকারে পরিণত হয়। প্রতাপ রুদ্রদেবের রাজত্বকালে (১৫০৪—১৫৩২ খৃষ্টাব্দে) চৈতন্যদেব উড়িষ্যা দেশে বৈষ্ণবধর্ম প্রচার করেন।

জয় পাঠাইলেন। এবারে ঘোরতর যুদ্ধের পর মুকুন্দদেব নিহত হইলেন। তাঁহার সেনাগণ পলায়ন করিল। কালাপাহাড় সমস্ত উড়িষ্যা দখল করিতে করিতে জগন্নাথ ক্ষেত্রে উপস্থিত হইলেন। প্রথম কালাপাহাড়ের আক্রমণকালে শাণ্ডারা জগন্নাথ বিগ্রহ চিহ্ন হুদে ডুবাইয়া রক্ষা করিয়াছিল। এবারও তদ্রূপ গোপন করিল। কিন্তু দ্বিতীয় কালাপাহাড় তাহা জানিতে পারিয়া তথা হইতে বিগ্রহ উঠাইলেন এবং ত্রিবেণীতে লইয়া গিয়া সেই বিগ্রহ অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করিলেন। এক জন ভক্ত জীবন নিরপেক্ষ হইয়া অগ্নিকুণ্ড মধ্যে প্রবেশ করিল এবং অর্দ্ধ দগ্ধ বিগ্রহ লইয়া গঙ্গাজলে পড়িয়া দেহ ত্যাগ করিল। বিগ্রহ জলের তলে শ্রোতবেগে দক্ষিণ দিকে যাইতে লাগিল। দ্বিতীয় কালাপাহাড় বহু চেষ্টা করিয়াও আর ঐ বিগ্রহ ধরিতে পারিলেন না। সন্ধ্যার পর গোবিন্দ দাস নামক এক বৈরাগী গঙ্গা হইতে বিগ্রহ উঠাইয়া নিজ বাটীতে গোপন করিয়া রাখিল। উড়িয়া মাদলী পঞ্জি মতে এই ঘটনা ১৪৮১ শকাব্দে * হইয়াছিল।

এদিকে উড়িয়ারা গজপতিবংশীয় আর এক ব্যক্তিকে রাজা বলিয়া স্বাধীনতা রক্ষার চেষ্টা করিতে লাগিল। তাহারা আর সন্মুখ যুদ্ধ না করিয়া মুসলমানদিগকে বিবিধপ্রকারে উৎপাত করিতে লাগিল। প্রায় দশ বৎসর কাল সেই উৎপাতিক যুদ্ধ চলিয়াছিল। ইতিমধ্যে ১৫৬৪ খৃঃ অব্দে সলিমান কেরানী গোড় বাদশাহ হইয়াছিলেন। তিনি দেখিলেন যে ঈদৃশ উৎপাতিক যুদ্ধ সুদীর্ঘ কাল চলিলে তাহাতে উভয় পক্ষেরই ক্ষতি। এজন্য তিনি নব নিকষাচিত রাজার সহিত সন্ধি করিলেন। সেই সন্ধি মতে জেলা ফুরদা উক্ত রাজার থাকিল অবশিষ্ট সমস্ত উড়িষ্যা পাঠানদের অধীন হইল। অধিকন্তু ফুরদার রাজা গোড় বাদশাহের অধীনতা স্বীকার করিয়া বার্ষিক ৫০০০ টাকা নালবন্দি দিতে বাধ্য হইলেন। ১৫৬৮ খ্রীঃ অব্দে এই সন্ধি হয়। তদবধি উড়িয়ার স্বাধীনতা শেষ হইল।

সন্ধির পর ফুরদার রাজা গোবিন্দ দাসের নিকট হইতে অর্দ্ধ দগ্ধ বিগ্রহ লইয়া তদ্রূপ হইতে বিষ্ণু পঙ্কর বাহির করত নিম্ন কাষ্ঠে নিশ্চিত নূতন বিগ্রহ মধ্যে সেই বিষ্ণু পঙ্কর ভরিয়া তাহাই জগন্নাথ দেবের মন্দিরে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। সেই বিগ্রহই এখনও বিদ্যমান আছে। আর গজপতিবংশীয়েরাই ধারাবাহিক রূপে এপর্যন্ত ফুরদার রাজা আছেন। কিন্তু ইংরেজের অধীনে তাঁহাদের

* কোন কোন ইতিহাসিকের মতে এই ঘটনা ১৫৬৭ খৃষ্টাব্দে সংঘটিত হয়।

এখন রাজকীয় শক্তি কিছুই নাই। অপর সাধারণ জমিদারের তায় তিনিও একজন জমিদার হইয়াছেন।

দ্বিতীয় কালাপাহাড়ও প্রথম কালাপাহাড়ের তায় সুন্দরাকৃতি ও বলবান পুরুষ ছিলেন। উভয়েই ব্রাহ্মণ সন্তান কিন্তু মুসলমান হইয়াছিলেন এবং মুসলমানী বিবাহ করিয়াছিলেন। উভয়েই ঘোরতর হিন্দুবিদ্বেষী হইয়াছিলেন এবং হিন্দুধর্মের অনিষ্ট করিয়াছিলেন। এইজন্তই এই দ্বিতীয় অত্যাচারীর কালাপাহাড় উপাধি হইয়াছিল। এখনও যে কোন হিন্দু সন্তান হিন্দুদের প্রতি এবং হিন্দু ধর্মের প্রতি অত্যাচার করে লোকে তাহাকে কালাপাহাড় বলে। তজ্জন্তু কালাপাহাড় কেবল একজন মাত্র ছিল বলিয়া অনুমান করা ভ্রম মাত্র। দ্বিতীয় কালাপাহাড় কামরূপ * ও কাশী প্রভৃতি দূরবর্তী দেশে যান নাই। স্বদেশে তিনি হিন্দুবিদ্বেষ বশতঃ কি কি কার্য্য করিয়াছিলেন তাহার বিবরণ পাওয়া যায় না। কেবল রিয়াজ-উস-সালাতিন নামক পুস্তকে যৎকিঞ্চিৎ বাহা আছে তদতিরিক্ত কিছুই পাওয়া যায় না। এজন্ত বোধ হয় যে তিনি প্রথম কালাপাহাড়ের সদৃশ ভয়ঙ্কর হিন্দুপোড়ক ছিলেন না। তিনি সলিমান কেরাণী ও তৎপরে তৎপুত্র দাউদ খাঁর সেনাপতি ছিলেন। ইনি দাউদ খাঁর পরাজয়ের পর, বিহারের শাসন কর্ত্তা মজাফর খাঁর সেনাপতি মাসুম খাঁর সহিত রোটার্স দুর্গ আক্রমণ সময়ে হত হন।

রামলীলা কৃষ্ণলীলা সম্বন্ধে গদ্য পদ্য গান বাঙ্গালা দেশে কত আছে তাহা গণনা করিয়া শেষ করা যায় না। কিন্তু স্বদেশীয় বড় লোক সম্বন্ধীয় কোন প্রকার লিখিত বৃত্তান্ত বাঙ্গালা দেশে নাই। রাজপুতানার ইতিহাস তথাকার ভাটেরা রক্ষা করিয়াছিল। টড সাহেব তাহাই সংগ্রহ করিয়া রাজস্থানের ইতিহাস লিখিয়াছেন। বাঙ্গালাদেশেও ভাট ছিল এবং এখনও আছে। কিন্তু তাহারা যথোচিত আদৃত বা পুরস্কৃত না হওয়ায় দেশের ইতিহাস রক্ষা করে নাই। রাজা কংশরাম এবং রাজা গণেশের বৃত্তান্ত যেমন মিশ্রিত করিয়া মুসলমান ইতিবেত্তাগণ দুই জনকে একজন বলিয়াছেন ঠিক

* উড়িষ্যা বিজয়ের পর (হিঃ ৯৫৭) সলিমান কেরাণী কোচবিহার ও তৎপার্ববর্তী স্থান সমূহ আক্রমণ করিয়াছিলেন। এই সময়ে দ্বিতীয় কালাপাহাড় তাঁহার সঙ্গে ছিল কি না তাহা জানা যায় না।

সেইরূপেই দুইজন কালাপাহাড়কে একজন করিয়া ফেলিয়াছেন।

কালাপাহাড়ের উপদ্রবে বহুসংখ্যক বাঙ্গালী হিন্দু জমিদার ধর্ম্মরক্ষার্থ ধন-সম্পত্তি পরিত্যাগ করিয়া গুপ্তভাবে স্থানে স্থানে ছিলেন। হিন্দুর প্রতি মোগল সম্রাট আকবরের অনুগ্রহ শুনিয়া অনেকে দিল্লী গিয়া আকবরের চাকরীতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন এবং তাঁহারা সর্বদা আকবরকে বাঙ্গালা দেশ জয়ের জন্য উত্তেজিত করিতেন। এই সকল লোকের মধ্যে তাহিরপুরের জমিদার কংসনারায়ণ রায়, সিন্দুরীর জমিদার ঠাকুর কালিদাস রায়, সঁতোড়ের রাজকুমার গদাধর সাত্তাল এবং দিনাজপুরের রাজভ্রাতা গোপীকান্ত রায় বিশেষ সম্ভ্রান্ত ছিলেন। বাঙ্গালাদেশ অধিকার করিতে আকবরের নিজেরও ইচ্ছা ছিল। তাহার উপর ঐ সকল ব্যক্তির উত্তেজনায় সেই ইচ্ছা সমধিক বলবতী হইয়াছিল। কিন্তু তাঁহার পার্শ্ববর্তী পাঠান ও উজ্জ্বকদের বিদ্রোহ এবং চিতোরের মহারাণার সহ বিবাদ হেতু আকবর বহুদিন পর্য্যন্ত বাঙ্গালাদেশ আক্রমণে অবসর পান নাই। এদিকে গোড় বাদশাহ সলিমান নিজের প্রচুর ধনবল ও সৈন্যবল সত্ত্বেও সর্বদা আকবর শাহের আনুগত্য করিতেন এবং উপঢৌকন পাঠাইতেন। তজ্জন্ত তাঁহাকে আক্রমণ করিতে আকবরের চক্ষু লজ্জা হইত। খৃঃ ১৫৭২ সালে সলিমান বাদশাহের মৃত্যু হইল। তাঁহার মৃত্যুর পর তদীয় পুত্র দাউদ খাঁ গোড় বাদশাহ হইলেন। তিনি নিজবিভূতিগর্বিত হইয়া নিজ পাঠান অমাত্যগণের পরামর্শে মোগল সম্রাটের বিপক্ষ হইলেন। আকবর স্বয়ং সসৈন্যে দাউদের সহ যুদ্ধে চলিলেন। উপরি উক্ত চারিজন বাঙ্গালী সম্ভ্রান্ত লোক মোগলদিগের অপরিচিত পথের পথপ্রদর্শক হইলেন। দাউদ নিজে অত্যাচারী ছিলেন না; কিন্তু তাঁহার পিতার আমলে যে সকল অত্যাচার হইয়াছিল, তজ্জন্ত সমস্ত হিন্দুই পাঠানদিগের প্রতি অসন্তুষ্ট ছিল। তাহারা কেবল ভয় প্রযুক্তই বিদ্রোহী হয় নাই। পাঠান সৈন্য হাজিপুরের নিকট একটী যুদ্ধে পরাজিত হইবামাত্র সমস্ত বাঙ্গালী হিন্দুরা পাঠানদিগের বিপক্ষ হইয়া উঠিল। ভাটুড়িয়ার রাজা এবং চন্দনার বঙ্গজ কায়স্থ রাজবংশীয় বিক্রমাদিত্য * ভিন্ন কোন হিন্দু বড় মানুষ পাঠানদের পক্ষে থাকিলেন না। দাউদ

* ইনি বিখ্যাত রাজা প্রতাপাদিত্যের পিতা। ইহার প্রকৃত নাম শ্রীহরি। ইহাকে সলিমন কেরানী “বিক্রমাদিত্য” আখ্যা দেন।

তদর্শনে ভীত হইয়া একবারে উড়িয়া পলায়ন করিলেন । বাঙ্গলা ও বেহার দিল্লীসাম্রাজ্যভুক্ত হইল । এই অবধি বাঙ্গলাদেশে পাঠান রাজত্ব শেষ হইল ।

দাউদ খাঁ পরাজিত হইয়া পলায়ন করিলে মোগল সেনাপতি কটক পর্য্যন্ত তাঁহার অনুসরণ করিলেন । শেষে দাউদ খাঁ আত্মসমর্পণ করিলেন এবং মোগল সম্রাটের অনুগ্রহে উড়িয়া রাজ্য জাগীর পাইলেন । বাঙ্গলা বেহার মোগল সাম্রাজ্যভুক্ত হইলে সেনাপতি মুনিম খাঁ গুবাদার পদে নিযুক্ত হইলেন । সেই সময়ে গোড়ে ভয়ঙ্কর মড়ক উপস্থিত হইল । স্থানের সিক্ততা, জলের অস্বাস্থ্যকারিতা, অথবা বায়ুর দূষিতাবস্থা বশতঃ এইরূপ ঘটিল । সহস্র সহস্র লোক মরিতে লাগিল । মৃতাবশিষ্টেরা সমুদয় মৃতদেহের সংকার করিতে না পারিয়া মৃতদেহ নদীতে নিক্ষেপ করিতে লাগিল । মুনিম খাঁরও মৃত্যু হইল । মুনিম খাঁর মৃত্যু হইলে দাউদ পুনরায় বঙ্গদেশ আক্রমণ করেন, কিন্তু যুদ্ধে পরাজিত ও বন্দী হইয়া মোগল সম্রাটের নিকট আনীত হইলেন, এবং বিদ্রোহ-প্রাধে তাঁহার প্রাণদণ্ড হইল । এই ঘটনা হিজরী ৯৮৪ (খৃষ্টাব্দ ১৫৭৫) সালে ঘটিয়াছিল ।

পাঠান রাজত্বে রীতিমত শাসনপ্রণালী ছিল না । মধুসূদন খাঁ, সৈয়দ হোসেন শাহ এবং শের শাহ দেশীয় জমিদারদিগকে সম্পূর্ণ আয়ত্ত করিয়াছিলেন এবং রীতিমত মালগুজারী দিতে বাধ্য করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু জরীপ জমাবন্দি করেন নাই । অত্যাচার সম্রাট বা নবাবদের সময়ে কোনই শৃঙ্খলা ছিল না । জমিদারেরা স্বৈচ্ছামত আপন জমিদারী শাসন করিত, পার্শ্ববর্তী জমিদার সহ সন্ধি বিগ্রহ করিত । সম্রাটকে রাজস্ব দিত, এই মাত্র সম্বন্ধ ছিল । সেই রাজস্ব বাকি পড়িলে সম্রাট জমিদারের বিরুদ্ধে সৈন্য পাঠাইতেন । রাজস্ব বৃদ্ধি করিতে হইলে ধনবান জমিদারদিগের উপর আন্দাজী জমা বেশী ধরা হইত ।

পাঠান সৈন্যদেরা অধিকাংশই লেখা পড়া জানিত না । তাহাদের কর্মচারি-গণকে সচরাচর অনেক অপমান সহ করিতে হইত, কিন্তু তাহাদের প্রচুর অর্থলাভ হইত । প্রায়শঃ শূদ্রেরাই পারসী পড়িয়া তাহাদের চাকরী করিত । সেই শূদ্রদের নামের শেষে “লাল” শব্দ থাকিত ; যথা রামলাল, শ্রামলাল, কিশণলাল, প্যারী-লাল ইত্যাদি । এইজন্ত পাঠানেরা তাহাদিগকে “লালা লোক” বলিত । তাহারা আপনাদিগকে “কায়ত” বলিত এবং বাহারা জাতিতে কায়স্থ নহে, তাহারাও

অর্থব্যয় করিয়া ক্রমে ক্রমে কায়স্থ জাতিতে মিলিত হইত। পাঠানেরা সুন্দরী রমণী দেখিলেই হরণ করিতে চেষ্টা করিত। তাহারা অতিব্যয়ী ছিল, তজ্জহা ধনীর ধনও হরণ করিত। বিশেষতঃ তাহাদের শূদ্র কর্মচারীরা অর্থশোষণে একান্ত ব্রতী ছিল। পাঠান সর্দারগণের আবাসের নিকটে কোন ধনী বা ভদ্রলোক বাস করিত না। দূরবাসী লোকেরাও ধন এবং সুন্দরী রমণী সংগোপনে রাখিত। পাঠানদিগের শূদ্র কর্মচারীরাও নিজবাড়ী ও পরিবার দূরে রাখিত। পশ্চিম প্রদেশে পাঠানদিগকে “যম রাজা” এবং তাহাদের শূদ্র কর্মচারীদিগকে “চিত্রগুপ্ত” বলিত। তাহা হইতেই পশ্চিমা কায়েতেরা আপনাদিগকে চিত্রগুপ্তের সন্তান বলে। বাঙ্গালী কায়েতদের অত্যাচার বোধ হয় কম ছিল। তাহাদের চিত্রগুপ্ত উপাধি ছিল না। বাঙ্গালী কায়েতেরা পূর্বে কখনও আপনাদিগকে চিত্রগুপ্তের সন্তান বলিয়া পরিচয় দিত না। বাস্তবিক চিত্রগুপ্ত কোন ব্যক্তি নহে। মনের গুপ্ত পাপকে রূপক অলঙ্কারে চিত্রগুপ্ত বলে।

পাঠান রাজত্বে বিচার চর্চা কম হইয়াছিল। উৎপীড়ন ও দস্যভয়ে শিল্প বাণিজ্যের অবনতি ঘটিয়াছিল। মূর্থতাজনিত কুসংস্কার অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়াছিল। তখন প্রায় সকল লোকেই অস্ত্র রাখিত এবং তাহা চালাইতে জানিত। লোকেরা অপেক্ষাকৃত সাহসী, বলবান্, পরিশ্রমী ও সৃষ্টিকায় ছিল। দেব দ্বিজ গুরুজনের প্রতি ভক্তি খুব বেশী ছিল। খাণ্ডদ্রব্যের পারিপাট্য প্রচুর হ্রাস হইয়া ছিল কিন্তু লোকের আহার প্রচুর বেশী ছিল। সমস্ত দ্রব্য শস্তা ছিল। যে ব্যক্তি মাসে ২৬ ছই টাকা অর্জন করিত, তাহার পরিবার প্রতিপালনে কোন কষ্ট হইত না। তখন পয়সা, আধুলি, সিকি, ছয়ানী ছিল না। টাকা ভাঙ্গাইলে এক বোঝা কড়ী পাওয়া হইত, তাহা দ্বারাই সাধারণ সমস্ত দ্রব্যাদি ক্রয় করা চলিত। সেলাইকরা অঙ্গ-বস্ত্র এবং জুতার ব্যবহার হিন্দুদিগের মধ্যে অতি কম ছিল। তখন স্ত্রীলোকের উপর অতিশয় উৎপীড়ন ছিল। বৃদ্ধাদিগের স্মৃতি ও সম্মান বরং এখন অপেক্ষা তখন ভাল ছিল। কিন্তু বৌদিগের কষ্ট ও অপমান অত্যধিক ছিল। বৌদের পিতা মাতা এবং ভ্রাতাদিগকেও বহু কষ্ট ও অপমান সহ্য করিতে হইত। সেই জহাই এই সময় হইতে শালক, শালী, শ্বশুর, প্রভৃতি শব্দ গালি বলিয়া গণ্য হইয়াছিল। তখন রাজবিদ্রোহ এবং ডাকাতি বীরপুরুষের কার্য্য বলিয়া গণ্য ছিল। চুরি, ছুঁচামি, ঠগামি তখন অতি ঘৃণিত কার্য্য বলিয়া গণ্য হইত।

বান্ধালা বেহার ও উড়িষ্যা মোগল সাম্রাজ্যভুক্ত হইলে ১৫৮০ খৃষ্টাব্দে রাজা তোড়রমল্ল দেওয়ান হইলেন। তাঁহারা ভাছড়ীদিগকে পাঠানের পক্ষীয় জানিয়া জগৎনারায়ণের ক্ষমতা হ্রাস করিতে মনস্থ করিলেন। তাঁহারা একটাকিয়ার জমিদারী সাত পরগণা মধ্যে পাঁচ পরগণা জব্দ করিয়া তাহা সাঁতোড়ের রাজাকে দিয়াছিলেন। বৃহৎ পরগণা রামবাজু ভাঙ্গিয়া কালীগাঁও এবং কুশুম্ভী নাম দিয়া দুই পরগণা করিলেন। তন্মধ্যে কালীগাঁও পরগণা খাস করিলেন। কেবল প্রতাপবাজু ও কুশুম্ভী এই দেড় পরগণা মাত্র জগৎনারায়ণের থাকিল। কিন্তু তাহারও মালগুজারী প্রায় দ্বিগুণ হইল। আর জাগীর ভাছড়িয়ার নজরানা এক টাকা এখন মালগুজারী স্বরূপ হইল। কিন্তু সেই টাকা দাখিলের পূর্বে এক হাজার টাকা নর্মী বা নজরানা দিবার হুকুম হইল। এই রূপে একটাকিয়ার বার্ষিক মুনাফা সাড়ে ছয় লক্ষ টাকার স্থলে কেবল দুই লক্ষ টাকা মাত্র থাকিল। তদবধি ভাছড়ীদের ক্ষমতা ও মুনাফা সাঁতোড়ের রাজার অপেক্ষা অনেক কম হইল।

রাজা জগৎনারায়ণ মন্ত্রিগণ সহ পরামর্শ করিয়া সম্রাটের নিকট অতিবাদ* করিলেন। সেই অতিবাদে তিনি তিনটি বিষয়ে আপত্তি করিয়াছিলেন ; যথা—

১। চাকলে ভাছড়িয়া এ অধীনের বহুকালীন পুরুষানুক্রমিক নিষ্কর জাগীর আমরা কেবল গোড়বাদশাহের অধীনতা স্বীকারে একটাকা নর্মী দিতাম। দেওয়ান রাজা তোড়রমল্ল সেই জাগীরে মালগুজারী ধার্য্য করিয়া পুনরায় যে এক হাজার টাকা নর্মী ধার্য্য করিয়াছেন তাহা অত্যাচার।

২। আমরা আপদ বিপদে সাহায্য করার অঙ্গীকারে গোড়বাদশাহের অধীনে জাগীর ভোগ করিতাম। হুজুরের সহ দাউদ শাহের যুদ্ধকালে আমি দাউদ

* উপরিতল বিচারকের নিকট নালিশের নাম অধিবাদ এবং সর্বপ্রধান বিচারকের নিকট নালিশের নাম অতিবাদ। আপীল ও খাস আপীল হইতে অধিবাদ এবং অতিবাদ বিভিন্ন। নালীশ না করিয়া একবারে অধিবাদ হইতে পারিত এবং নালিশ ও অধিবাদ না করিয়া একবারে অতিবাদ করা যাইতে পারিত। উপরিস্থ হাকীম নিজ বিবেচনা মত সাক্ষ্য প্রমাণাদি লইতেন, উপযুক্ত তদন্ত করিতেন এবং তদনুসারে বিচার করিতেন। আপীলে যেমন নিম্ন আদালতের লিখিত নথী দৃষ্টে বিচার হয়, অধিবাদে তাহা হইত না। সুতরাং আপীল ও খাস আপীল শব্দের স্থলে অধিবাদ এবং অতিবাদ ব্যবহার করা যাইতে পারে না।

শাহের পক্ষে থাকিয়া নিজ কর্তব্য কর্ম করিয়াছি। এখন হজুরের কোন শত্রু উপস্থিত হইলে আমি অবশ্যই হজুরের পক্ষেই থাকিব। ঠাউদের স্বপক্ষতা হেতু দেওয়ানজী যে আমার সাড়ে পাঁচ পরগণা জমিদারী জব্দ করিয়াছেন, তাহা অস্থায় হইয়াছে।

৩। এখন আমার যে দেড় পরগণা জমিদারী বহাল আছে, তাহার মাল-গুজারী অত্যন্ত অধিক হইয়াছে। তাঁহা চালান অধীনের অসাধ্য।

সেই অতিবাদ সমর্থনার্থ রাজার জ্যেষ্ঠ পুত্র কুমার চন্দ্রনারায়ণ খাঁ বহুতর ভেট লইয়া আগরা রাজধানীতে গেলেন। তাঁহার সাহায্যার্থে লালারামচন্দ্র সরকার এবং একজন সুযোগ্য মুসলমান মৌলবীও প্রেরিত হইল।

সম্রাট্ আকবর সেই অতিবাদ শুনিয়া রাজা তোড়রমল্লের নিকট সবিস্তার কৈফিয়ত তলপ করিলেন। সেই কৈফিয়ত আসা সাপেক্ষে চন্দ্রনারায়ণ আগরাতে থাকিলেন। মধ্যে একবার মথুরা বৃন্দাবন গিয়া তীর্থ করিয়া আসিলেন। সময়ে সময়ে বাদশাহের সহিত সাক্ষাৎ করিতে থাকিলেন। তাঁহার আকৃতি প্রকৃতি কথাবার্তায় তিনি যে সুশিক্ষিত এবং উচ্চবংশজাত, তাহা আকবর বুঝিতে পারিলেন। কুমারের আনুযাত্তিক লালারাম ও মৌলবীর নিকট সম্রাট্ তাঁহার সম্পূর্ণ পরিচয় পাইলেন।

অত্যাচার দিগ্ভিজয়ী জাতি হইতে ভারতীয় জাতির রীতি সম্পূর্ণ বিপরীত। অত্যাচার জাতীয় লোক কোন দেশ জয় করিলে তথায় স্বকীয় ধর্ম, ভাষা, রীতিনীতি প্রচলিত করিতে চেষ্টা করে। কিন্তু ভারতীয় জাতি কোন দেশ জয় করিলে নিজেরাই সেই দেশের ধর্ম, ভাষা এবং আচার ব্যবহার গ্রহণ করে। মোগলেরা আগে মুসলমান রাজ্য জয় করিয়া মুসলমান হইয়াছিল, তাহার পরে ভারতবর্ষে আসিয়াছিল। এইজন্য তাহারা সম্পূর্ণ হিন্দু ব্যবহার অনুকরণ করে নাই। তথাপি মোগল সম্রাটদিগের ব্যবহার মুসলমান অপেক্ষা হিন্দু রাজনীতির অধিক অনুযায়ী ছিল। আকবরের অধিকাংশ বেগমগুলি ক্ষত্রিয়রাজকন্যা। তাহারা প্রায় হিন্দু ব্যবহারেই থাকিত। সম্রাট্ হিন্দুর মধ্যে হিন্দু, মুসলমানের মধ্যে মুসলমান ছিলেন। তিনি মধ্যে মধ্যে খৃষ্টধর্মের উপদেশও শুনিতেন। সকল ধর্মের প্রতিই তাঁহার বাহ্য ভক্তি ছিল, কিন্তু কোন ধর্মেই তাঁহার প্রকৃত আস্থা ছিল না। তিনি চন্দ্রনারায়ণের অভিজাত্যের পরিচয় তাঁহাকে আটক করত

নিজের এক কণ্ঠার সহ তাঁহার বিবাহ দিয়া তাঁহাকে মুলতানের শুবাদার নিযুক্ত করিলেন । জাতিপাত হওয়ায় চন্দ্রনারায়ণ আর দেশে আসেন নাই । তাঁহার পরবর্তী বিবরণ জানা যায় না ।

বহুদিন পর রাজা তোড়রমল্ল কৈফিয়ৎ পাঠাইলেন । তিনি লিখিলেন যে—

১। যে ব্যক্তি বিবাদের একপক্ষকে আশ্রয় করে, তাহার আশ্রয় জয়ী হইলে আশ্রিতের লাভ হয় এবং পরাজয় হইলেই আশ্রিতের দণ্ড হয় । জগৎনারায়ণ ঠাকুরের পিতামহ শের শাহের পক্ষে থাকিয়া স্বর্গীয় হুমায়ুন বাদশাহের সহ যুদ্ধ করিয়াছিলেন । শের শাহ জয়ী হওয়ায় ঠাকুরেরা পুরস্কারও পাইয়াছিলেন । এখন ঠাকুরদের আশ্রয় দাউদ শাহ পরাজিত হইয়াছেন । আমরা উচিত রূপেই জগৎ ঠাকুরের কতক সম্পত্তি জব্দ করিয়াছি । সম্পত্তি নূতন উৎপন্ন হয় না । একজনের ক্ষতি ব্যতীত অত্রের লাভ হইতে পারে না । বাঙ্গালা দেশের যে সকল লোক আমাদের সাহায্য করিয়াছে, তাহাদিগকে সমুচিত পুরস্কার দেওয়া আবশ্যিক । এইজন্ত বিপক্ষপক্ষীয়দের কতক সম্পত্তি জব্দ করিয়া তাহাই স্বপক্ষদিগকে দেওয়া হইয়াছে ।

২। নবাব সম্ভ্রদীন দিল্লীর বাদশাহের বিদ্রোহী হইয়া স্বাধীন হইয়াছিলেন । জগৎ ঠাকুরের পূর্বপুরুষ ঠাকুর সুবুদ্ধিরাম সেই বিদ্রোহী নবাবের সাহায্য করিয়া জাগীর পাইয়াছিলেন । এখন বাঙ্গালা মুলুক পুনরায় দিল্লী সাম্রাজ্যভুক্ত হওয়ায় সেই জাগীর জব্দ হওয়াই উচিত । নবাব নাজিমের ইচ্ছা ছিল যে, জাগীর জব্দ করিয়া জমিদারী রূপে বন্দোবস্ত করা হয় । কিন্তু ব্রাহ্মণ ঠাকুর অতি পুরাতন আমীর এবং তাঁহার অধীনে হিন্দু মুসলমান সকলেই তুষ্ট আছে । আমি তাহা দেখিয়া ঠাকুরের জাগীর স্থিরতর রাখিয়াছি । তাঁহার যে একহাজার টাকা মাত্র নর্ম ধার্য্য হইয়াছে, তজ্জন্ত অধিবাদ না করিয়া ধন্যবাদ করাই তাঁহার উচিত ।

৩। হিন্দু শাস্ত্র ও ব্যবহার মতে জমিদারেরা মোট রাজস্বের $\frac{১}{১০}$ ভাগ পাইত । আমিও প্রায় তদ্রূপই দিয়াছি অর্থাৎ হাল বন্দোবস্তে সমস্ত জমিদারের উপরই স্ফনার জমার (মোট সংস্থার) দুই তৃতীয়াংশ মালগুজারী ধার্য্য করিয়াছি এবং $\frac{১}{১০}$ ভাগ তাহাদের খরচ ও মুনাফা বাবত দিয়াছি । জগৎ ঠাকুরের উপরও তাহাই ধার্য্য হইয়াছে । তাঁহার জমিদারীতে কিছুমাত্র বেশী মালগুজারী ধরা

হয় নাই। ফলতঃ আমি ঠাকুর সাহেবের প্রতি অনুগ্রহভিন্ন কোন নিগ্রহ করি নাই। তবে কি না, আমি সরকারী চাকর; মালিকের বোল আনা ঠিক রাখিয়া কাজ করিতে হইয়াছে। ঠাকুর জগৎনারায়ণ এখন আপনকার বৈবাহিক। তৎপ্রতি অনুগ্রহঃ করা হুজুরালির উচিত বটে। আমরাও তাহাতে তুষ্ট হইব।

আকবর সেই কৈফিয়ত দৃষ্টে জগৎনারায়ণের প্রথম দুই আপত্তি সম্পূর্ণ অগ্রাহ করিলেন। তৃতীয় আপত্তি সম্বন্ধে লিখিলেন যে, অগ্রাণ্ড জমিদারগণ অপেক্ষা একটাকিয়া ঠাকুরদের সম্মান অনেক বেশী। তাঁহাদের মালগুজারী অগ্রাণ্ড জমিদারগণ সহ তুল্য হইতে পারে না। তাঁহাদের মালগুজারী স্ত্রমার জমার নিষ্পী অর্থাৎ অর্দ্ধেক হারে ধার্য্য করা যায়। এই হুকুমামুসারে জগৎনারায়ণের মালগুজারী বার্ষিক ছয় হাজার টাকা কমিল।

রাজা জগৎনারায়ণের তিন পত্নী এবং বহু উপপত্নী ছিল। এক স্ত্রীকে ভাল বাসিলে যে, অত্র কাহাকেও ভালবাসা যায় না, ইহা নিতান্ত অযৌক্তিক বিলাতী মত মাত্র। যুরোপীয়েরা যখন পশুর খায় অসভ্য ছিল, তখনও তাহাদের বহুবিবাহের রীতি ছিল না। অথচ এশিয়া খণ্ডে চিরকালই বহুবিবাহ প্রচলিত আছে। রাজা তাঁহার সমস্ত পত্নী ও উপপত্নী এবং তাহাদের সম্মানদিগকে ভাল বাসিতেন। তন্মিন্ন তাঁহার ভ্রাতা, ভ্রাতুষ্পুত্র, ভগিনী, জ্ঞাতি, কুটুম্ব সকলকেই আন্তরিক ভাল বাসিতেন এবং সকলকে লইয়া সাংসারিক সুখ ভোগ করিতেন। অথচ সেই বহু পরিবারের মধ্যে কোন বিবাদ ঝগড়া হইত না।

জগৎনারায়ণ বৃদ্ধকালে কানসাট গিয়া গঙ্গাবাস করিয়াছিলেন। তাঁহার পাটরাণীর গর্ভজাত জ্যেষ্ঠপুত্র চন্দ্রনারায়ণের জাতিপাত হইয়াছিল। পাটরাণীর উপেন্দ্রনারায়ণ নামে একটি পুত্র শেষে হইয়াছিল। রাজার গঙ্গাবাত্রাকালে উপেন্দ্রের বয়স দেড় বৎসর মাত্র। মধ্যম রাণীর কোন পুত্রসন্তান ছিল না। কনিষ্ঠা রাণীর পুত্র মহেন্দ্রনারায়ণ খাঁ বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন। জগৎনারায়ণ মহেন্দ্রের উপর সমস্ত ভার দিয়া তের বৎসর কাল জপ তপে গঙ্গাতীরে বাস করিয়াছিলেন। হিন্দুদের উইল করিবার রীতি ছিল না। বরং উইল বা তৎসদৃশ অত্র উপায়ে শাস্ত্রমত উত্তরাধিকারীর স্বত্বের কোনরূপ ব্যতিক্রম করা ধর্ম্মবিরুদ্ধ কার্য্য বলিয়া গণ্য হইত। শাস্ত্রমত যাহার যাহা প্রাপ্য, মুমূর্ষু ধনীর তাহাতে কোন পরিবর্তন করিতে অধিকার ছিল না। রাজ্য অবিভাজ্য

সম্পত্তি ছিল। সুতরাং জগৎনারায়ণের গঙ্গাপ্রাপ্তি হইলে মহেন্দ্রনারায়ণ একাকী সমস্ত রাজ্যে অভিষিক্ত হইলেন।

জগৎনারায়ণের রাজত্বকাল বাঙ্গালা দেশের ইতিহাসে অতীব প্রসিদ্ধ। এই সময়ে বাঙ্গালা বেহার পুনরায় দিল্লীর সম্রাটের অধীন হইয়াছিল। এবং পাঠান রাজত্ব বিলুপ্ত হইয়া মোগল সাম্রাজ্য আরম্ভ হইয়াছিল। এই সময়ে বাঙ্গালার প্রসিদ্ধ রাজধানী গোড়নগর মহামারীতে উৎসন্ন হইয়াছিল। এই সময়েই বাঙ্গালা দেশে জগদ্বিখ্যাত দুর্গোৎসব প্রচারিত হইয়াছিল। তাহার সঙ্গে সঙ্গে বাসন্তী পূজাও আরম্ভ হইয়াছিল। আর এই সময়ে বারেন্দ্র ব্রাহ্মণদের কোলীভ প্রথার সংস্কার হইয়াছিল। এই সময়ে তাহিরপুরের রাজা কংসনারায়ণ রায় বাঙ্গালী হিন্দুসমাজের নেতা হইয়াছিলেন। এই সময়েই রাজা তোড়রমল সমস্ত বাঙ্গালা ও বেহার জরিপ করিয়া রীতিমত জমাবন্দী করিয়াছিলেন।

রাজা কংসনারায়ণ, মনুসংহিতার টীকাকারক প্রসিদ্ধ পণ্ডিত কল্লুক ভট্টের সন্তান। তাঁহার পিতামহ উদয়নারায়ণ, সম্রাট গণেশ খাঁর শালক এবং সাহায্যকারী ছিলেন, তিনিই প্রথম “রাজা” উপাধি প্রাপ্ত হন। তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র জীবন রায়, গোড় বাদশাহ যতুনারায়ণ খাঁর দেওয়ান ছিলেন। জীবনের ভ্রাতুষ্পুত্র কংসনারায়ণ, গোড় বাদশাহ সলিমানের অধীনে ফৌজদার ছিলেন। কালাপাহাড়ের দৌরাত্ম-সময়ে তিনি কস্মত্যাগ করিয়া ছদ্মবেশে গুপ্ত ছিলেন। যখন দাউদ খাঁ মোগল সম্রাট আকবরের সহ বিবাদ উপস্থিত করিলেন, তখন কংসনারায়ণ, সম্রাট আকবরের চোপদারী কক্ষে নিযুক্ত ছিলেন। মোগল সেনা বাঙ্গালা দেশ আক্রমণ করিতে আসিলে, তিনি সেই সেনার পথপ্রদর্শক এবং প্রধান মন্ত্রী হইয়াছিলেন। দেওয়ান তোড়রমল বাঙ্গালা দেশের বন্দোবস্ত শেষ করিবার পূর্বেই দিল্লীতে আহৃত হইলে, কংসনারায়ণ “রাজা” উপাধি প্রাপ্ত হইয়া শুবে বাঙ্গালা বেহারের দেওয়ান নিযুক্ত হইয়াছিলেন। শুবাদার মুনিম খাঁ মহামারীতে গতাস্থ হইলে, রাজা কংসনারায়ণ প্রায় দুই বৎসর কাল দেওয়ানী ও শুবাদারী উভয় কার্যই নির্বাহ করিয়া-ছিলেন। যখন সম্রাট আকবর তাঁহাকে শুবাদারী পদে স্থায়ীরূপে নিযুক্ত না করিয়া বাঙ্গালা ও বেহারের পৃথক পৃথক শুবাদার নিযুক্ত করিলেন এবং কংসনারায়ণকে কেবল শুবে বাঙ্গালার দেওয়ানী করিতে আদেশ দিলেন, তখন

তিনি চাকরী ত্যাগ করিয়া নিজ জমিদারী শাসন এবং সামাজিক উন্নতি সাধনে প্রবৃত্ত হইলেন। রাজা কংসনারায়ণ একটি মহাযজ্ঞ করিতে উৎসুক হইয়া বাঙ্গালা দেশের সমস্ত প্রধান পণ্ডিতগণকে আহ্বান করিয়া তাঁহাদের পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিলেন। বাসুদেবপুরের ভট্টাচার্য্যগণ বংশানুক্রমে তাহির-পুরের রাজাদের পুরোহিত ছিলেন। সেই পুরোহিতগোষ্ঠীর মধ্যে রমেশ শাস্ত্রী তৎকালে বাঙ্গালা বেহারের মধ্যে সর্বপ্রধান পণ্ডিত ছিলেন। তিনি কহিলেন, “বিশ্বজিৎ, রাজসূয়, অশ্বমেধ ও গোমেধ এই চারিটি মহাযজ্ঞ নামে কথিত। বিশ্বজিৎ এবং রাজসূয় কেবল সার্বভৌম সম্রাটেরা করিতে পারেন। তুমি বাদশাহের অধীন নৃপতি; ঐ দুই যজ্ঞ তোমার সাধ্যাতীত। অশ্বমেধ, গোমেধ কলিতে নিষিদ্ধ। অপিচ এই যজ্ঞচতুষ্টয় ক্ষত্রিয়ের জন্তই প্রসিদ্ধ, উহা ব্রাহ্মণের পক্ষে শোভনীয় নহে। তোমার পক্ষে দুর্গোৎসব ভিন্ন অণ্ড কোন মহাযজ্ঞ উপযুক্ত নাই। সত্যযুগে সুরথ রাজা আত্মশক্তির অর্চনা করিয়া চতুর্ভুজ ফল প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ত্রেতাযুগে স্বয়ং ভগবান্ রামচন্দ্র রাবণবধের জন্ত অকালে সেই পূজা করিয়াছিলেন। তাহার ফলশ্রুতি মধ্যে উক্ত আছে, যে কেহ রামচন্দ্রের বিধানে ভক্তিভাবে দুর্গোৎসব করিবে, সে সর্বযজ্ঞের ফল লাভ করিবে। এই যজ্ঞ, সকল যুগে সকল জাতীয় লোকেই করিতে পারে এবং এই এক যজ্ঞেই সকল যজ্ঞের ফল হয়। অতএব আমার বিবেচনায় তোমার এই যজ্ঞ কর্তব্য।” সমাগত সমস্ত পণ্ডিতগণ তন্মতে সন্মতি দিলেন। তদনুসারে রাজা কংসনারায়ণ সাড়ে আট লক্ষ টাকা ব্যয়ে রাজসিক বিধানে দুর্গোৎসব করিলেন।

যদিও মার্কণ্ডেয় পুরাণে দুর্গোৎসবের কতক বৃত্তান্ত আছে বটে, কিন্তু সমগ্র বিধান কোন প্রাচীন গ্রন্থে নাই। আধুনিক দুর্গোৎসবপদ্ধতি রমেশ শাস্ত্রী-প্রণীত। যৎকালে সমুদায় দ্রব্য শস্তা ছিল, সেই সময়ে সাড়ে আটলক্ষ টাকা ব্যয়ে এই মহাযজ্ঞ প্রথম অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। সেই যজ্ঞের ধুমধাম, আনন্দ ও উৎসাহ দৃষ্টে সকলেই মোহিত হইয়াছিল। রাজা কংসনারায়ণের পুণ্য ও প্রতিষ্ঠা রাঢ়ে বঙ্গে প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। রাজা জগৎনারায়ণ তদৃষ্টে দ্বিষাপরবশ হইয়া কংসনারায়ণকে অপাকরণ জন্ত নয় লক্ষ টাকা ব্যয় করিয়া সুরথ রাজার বিধানে বাসন্তী দুর্গোৎসব করিলেন। কিন্তু বাসন্তী পূজা শারদীয়া পূজার স্থায় প্রতিষ্ঠা লাভ করিল না। জগৎনারায়ণ নিজ পুরোহিতকে তাহার

কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, পুরোহিত কহিলেন, “রাজা কংসনারায়ণ ধর্মার্থে শারদীয়া পূজা করিয়াছেন আর তুমি ঈর্ষা ও অহঙ্কার বশে বাসন্তী পূজা করিয়াছ ; এই জন্ত তাঁহার প্রতিষ্ঠা বেশী এবং তোমার প্রতিষ্ঠা কম হইয়াছে ।”

জগৎনারায়ণ লজ্জিত হইয়া তদবধি উভয় পূজাই যথাকালে করিতে লাগিলেন । সাঁতোড়ের রাজা এবং অগ্র্য হিন্দু বড় লোকেরা দেখাদেখি শারদীয় দুর্গোৎসব আরম্ভ করিলেন । কেহ কেহ বাসন্তী পূজাও আরম্ভ করিলেন । সম্রাট শাহ জেহান বাঙ্গালা দেশে শারদীয়া পূজা দৃষ্টে মোহিত হইয়াছিলেন এবং নিজবায়ে ব্রাহ্মণ দ্বারা মহা আড়ম্বরে দুর্গোৎসব করিতেন । তৎপুত্র ঔরংজেব অতিশয় গৌড়া মুসলমান ছিলেন । তিনি দুর্গোৎসব রহিত করিয়া সেই ব্যয়ে মুসলমানদের প্রধান পর্ব মহরমে প্রচুর ধুমধাম করিতে লাগিলেন এবং নিজের বাবীয় হিন্দু মুসলমান কর্মচারিগণকে মহাসমারোহে মহরম করিতে আদেশ দিলেন । সেই আদেশ প্রতিপালিতও হইয়াছিল । কিন্তু মহরম আনন্দের ব্যাপার নহে । ইমাম হাসন ও হোসেনের অকালে বিনাশ জন্ত শোক প্রকাশ করাই মহরমের উদ্দেশ্য । তাহাতে ধুমধাম সমারোহ করা প্রকৃত পক্ষে মুসলমান ধর্মের বিরুদ্ধ কার্য্য । গৌড়ামীতে অনেক সময়েই মূল উদ্দেশ্য হারাইয়া যায় । ঔরংজেবের পক্ষেও তাহাই হইয়াছিল । যাহা হউক, বাদশাহ এবং নবাবদিগের যত্ন ও অসাধারণ ব্যয় সত্ত্বেও মহরম পর্ব কোন ক্রমে দুর্গোৎসবের তুল্য হইতে পারিল না ।

বারেন্দ্র ব্রাহ্মণদের কুলমর্য্যাদা সংশোধন রাজা কংসনারায়ণের দ্বিতীয় প্রসিদ্ধ কার্য্য । উদয়নাচার্য্য ভাছুড়ী তাঁহার প্রথম পক্ষের পুত্র উমাপতি, শ্রামাপতি প্রভৃতি ছয় জনকে ত্যাগ করিয়া নিয়ম করিয়াছিলেন যে, সেই ছয়জন কৌলীমর্য্যাদা-ভ্রষ্ট হইবে । আর যে কোন কুলীন তাহাদের সহ আদান প্রদান ও আহার ব্যবহার করিবে, তাহারাও পতিত হইবে । আবার তাদৃশ পতিত কুলীন সহ যাহারা কোন প্রকার সংস্রব করিবে, তাহারাও ভ্রষ্ট হইবে । পরবর্ত্তী কালে মধু মৈত্রের পুত্রেরাও পিতৃদ্রোহ অপরাধে ধৈ বাগছি কর্ত্ত্বক ঐরূপ কৌলীমর্য্যাদা-ভ্রষ্ট হইয়াছিল এবং তাহাদের সহ সংস্রবেও অগ্র কুলীনের কুলপাত হইবার নিয়ম হইয়াছিল । সেই পতিত কুলীনেরা কপটভাবে সংস্রব করিয়া বহুসংখ্যক কুলীনকে নিজ দলভুক্ত করিয়া বিলক্ষণ প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল । এই কপট কুলীনদিগকে কাপকুলীন কিংবা সংক্ষেপে কাপ বলিত । রাজা কংসনারায়ণের

সময়ে কাপের সংখ্যা বিশুদ্ধ কুলীন অপেক্ষা অনেক বেশী হইয়াছিল। রাজার পুরোহিত বামুদেবপুরের ভট্টাচার্য্যেরাও কাপ হইয়াছিলেন। কাপের প্রাবল্যে বিশুদ্ধ কুলীন নিঃশেষ হইবার উপক্রম হইয়াছিল। তজ্জন্তু বিশুদ্ধ কুলীনেরা রাজা কংসনারায়ণকে ব্যবস্থা সংশোধন করিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন। রাজা নিজে সিদ্ধ-শ্রোত্রিয় মধ্যে শ্রেষ্ঠ অন্তাচল নামে খ্যাত ছিলেন।

রাজা কংসনারায়ণ সমস্ত কুলজ্ঞদিগকে, সমস্ত গাঁইকর্তা কুলীনদিগকে এবং বহুসংখ্যক কুলীন, কাপ-কুলীন ও সিদ্ধ-শ্রোত্রিয়দিগকে নিমন্ত্রণ করিয়া আনিলেন। পরে তাঁহাদের নিকট উদয়নাচার্য্য ও ধৈ (ধ্যানরাম) বাগছির কৃত ব্যবস্থা সংশোধনের প্রয়োজন ব্যাখ্যা করিলেন। উক্ত দুই ব্যবস্থার কঠোরতা সকলেই অনুভব করিতেছিলেন ; স্মরণ্য সকলেই আগ্রহের সহিত রাজার পোষকতা করিলেন। তখন রাজা কংসনারায়ণ নিয়ম করিলেন যে, (১) কাপ-কুলীনেরা বিশুদ্ধ কুলীন ও সিদ্ধ-শ্রোত্রিয়ের মধ্যবর্তী হইবেন। (২) কাপ ও কুলীনের মধ্যে পুত্র কন্যার বিবাহ উপলক্ষে কুশবারি দ্বারা মর্যাদা পরিবর্তন করিলেই কুলীন ভঙ্গ হইয়া কাপ হইবেন অথবা কুলীনের পুত্র কাপে দত্তক দিলে কুলীন ভঙ্গ হইয়া কাপ হইবেন। কাপের সহ আহার ব্যবহার বা অল্প কোন সংস্রবে কুলভঙ্গ হইবে না। (৩) সিদ্ধ-শ্রোত্রিয়েরা কাপে কন্যা না দিয়া পঠী পরিবর্তন করিতে পারিবে না। (৪) সাধ্য ও কষ্ট শ্রোত্রিয়েরা অগ্রে কাপে বিবাহ না দিয়া কুলীনে বিবাহ দিতে পারিবেন না। (৫) কুলীন ও কাপগণ শ্রোত্রিয়ের কন্যা গ্রহণ করিতে পারিবেন, কিন্তু শ্রোত্রিয়ে কন্যা দিলে অমনি কুলভঙ্গ হইয়া শ্রোত্রিয় হইবেন। (৬) কুলীন ও কাপগণ কোন কুলীন বা কাপের বন্ধুহীনা কন্যা বিবাহ করিতে পারিবেন না ; তাদৃশী কন্যা কেবল শ্রোত্রিয়ের গ্রাহ্য। (৭) কুলীন ও কাপের বিবাহে যেমন মর্যাদা পরিবর্তন করিয়া সমীকরণ বা করণ করিতে হয়, শ্রোত্রিয়ের সমীকরণ করিতে হইবে না।

রাজার উক্ত ব্যবস্থা সভাস্থ সকলেই স্বীকার করিলেন। রাজা তাঁহার নিজের তিন কন্যা কাপে বিবাহ দিয়া তদুপলক্ষে কুলীন, কাপ ও শ্রোত্রিয়দিগকে একত্র ভোজন করাইলেন। তদবধি তাহিরপুরের রাজার সম্মান সাঁতোড় ও ভাছড়িয়ার রাজাদের তুল্য হইল।

রাজা কংসনারায়ণের সময়েই বঙ্গ সাহিত্যের বিশেষ উন্নতি হয়। এই

সময়ে প্রসিদ্ধ কবি কুন্তিবাস পণ্ডিতের আবির্ভাব হয়। ১৪৩০ শকে নদীয়া জেলার ফুলিয়া গ্রামে মুখুটী ব্রাহ্মণের ঘরে কুন্তিবাসের জন্ম হয়। কথিত আছে কুন্তিবাস রাজপণ্ডিত হইবার জন্ত কংসনারায়ণের রাজসভার দ্বারে উপস্থিত হইলেন, দ্বাররক্ষকের দ্বারা স্বরচিত পাঁচটি শ্লোক রাজার নিকট প্রেবণ করিলেন। রাজা এই শ্লোক পাঠ করিয়া অত্যন্ত প্রীত হইয়া তাঁহাকে রাজদরবারে ডাকাইয়া পাঠাইলেন। রাজসমীপে বাইয়া কুন্তিবাস আরও সাতটি শ্লোক পাঠ করিলেন। সভায় তাঁহার পাণ্ডিত্যের ভূয়সী প্রশংসা হইল। রাজাদেশে রাজকৰ্ম্মচারী তাঁহার মন্তকে চন্দনের ছড়া ছিটাইলেন। রাজা তাঁহাকে পটুবস্ত্র পুরস্কার করিলেন। পরে তাঁহাকে ভাষাকাব্যে রামায়ণ রচনার আদেশ করেন। ১৪৬০ শকে রামায়ণ রচিত হয়। কুন্তিবাসের পরবর্ত্তী কবি মুকুন্দরাম। বৰ্দ্ধমান জেলার দামুন্ডা গ্রামে সম্ভবত ১৪৭০ শকাদে মুকুন্দরামের জন্ম হয়। ইহার। রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ। তিনি পারসী এবং সংস্কৃত ভাষায় পণ্ডিত ছিলেন। কবিকঙ্কণ মুকুন্দরামের চণ্ডী সম্ভবতঃ ১৫২০ শকাদে রচিত হয়। কি মানব চরিত্র অঙ্কণে, কি করুণ রসের উদ্দীপনে, কি নিসর্গ বর্ণনে, মুকুন্দরাম সৰ্ব্ব বিষয়েই, চণ্ডীকাব্যে অসামান্য প্রতিভার পরিচয় দিয়াছেন। তিনি আপন সাময়িক আচার ব্যবহার যেরূপ বর্ণন করিয়াছেন, এবং প্রাচীন সমাজের যেরূপ সৰ্ব্বাঙ্গ সুন্দর আলেখ্য আঁকিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার চণ্ডী কেবল কাব্যাংশে নহে, ঐতিহাসিক হিসাবেও অতি উপাদেয় গ্রন্থ।

রাজা জগৎনারায়ণের শেষাবস্থায় অম্বরের (জয়পুরের) রাজা মানসিংহ বাঙ্গালার গুবেদার হইয়া আসিয়াছিলেন। ইহার পূর্বে বা পরে কখন কোন হিন্দু বাঙ্গালার গুবেদার হইতে পারেন নাই। রাজা কংসনারায়ণ কিছুদিন গুবেদারের কাজ চালাইয়াছিলেন বটে, কিন্তু তিনি গুবেদাররূপে নিযুক্ত হন নাই।

নবম অধ্যায় ।

তোড়রমল্লের বন্দোবস্ত ।—কায়স্থ জাতির ইতিহাস ।—রাজা মানসিংহ ।

রাজা তোড়রমল্ল পঞ্চাবী ক্ষেত্রি বা ক্ষত্রিয় ছিলেন । তিনি দিল্লীতে সামান্তরূপ বাগিজ্য ব্যবসায় করিতেন । আকবরের নাবালকী সময়ে নবাব খানখানান বেহাঁম খাঁ খাওয়ার্য্যে বিষ দিয়া আকবরকে অপহৃত্য করিতে উত্থোগ করিয়াছিলেন । বেহাঁমের এক দাসী তোড়রমল্লের উপপত্নী ছিল । তোড়র সেই দাসীর যোগে সেই চক্রান্ত জানিয়া আকবরের জননী নিয়ামত বেগমকে সংবাদ দিয়াছিলেন । তদন্তে চক্রান্ত ধরা পড়িল, স্ততরাং সত্ৰাটের প্রাণরক্ষা হইল । ইহাতেই তোড়রমল্লের উন্নতি হইল এবং আকবরের হিন্দুপ্রীতি সঞ্চার হইল । তিনি হিন্দুদের প্রতি যতই অধিকতর বিশ্বাস করিতে লাগিলেন, ততই বেশী উপকার পাইতে লাগিলেন । তাঁহার মুসলমান জ্ঞাতিকুটুম্বেরা বিদ্রোহী হইলেও আকবর হিন্দুদের সহায়তায় রক্ষা পাইয়াছিলেন । আকবরের হিন্দুয়ানী, মুসলমানী ও খৃষ্টানী বহু পত্নী ও উপপত্নী ছিল, কিন্তু আকবর কখন হিন্দু বেগমের ঘরে ভিন্ন অস্ত্রের ঘরে নিদ্রা যাইতে সাহসী হইতেন না । ইহাই মোগল রাজত্বে হিন্দুদিগের উন্নতির কারণ । রাজা তোড়রমল্ল আকবরের দেওয়ান হইয়া ঠিক হিন্দুরীতিক্রমে জরিপ জমাবন্দী করিয়াছিলেন এবং হিন্দু রাজ্যাশাসনপ্রণালী অধিকাংশ মোগল দরবারে প্রচলিত করিয়াছিলেন । তৎকৃত বন্দোবস্তের বিস্তৃত বিবরণ যাহা পাওয়া যায়, তাহা এই যে—

(১) অম্বর, যোধপুর প্রভৃতি প্রদেশীয় মহারাজগণ—যাঁহারা মোগল সত্ৰাটের অধীন ছিলেন, রাজা তোড়রমল্ল তাঁহাদিগকে বশী রাজা গণ্য করিয়াছিলেন । তিনি তাঁহাদের রাজ্যের জরিপ জমাবন্দী না করিয়া কেবল তাঁহাদের উপর একটি নির্দিষ্ট কর ধার্য্য করিয়াছিলেন, অধিকন্তু তাঁহারা সত্ৰাটের আবশ্যক মতে কোন নির্দিষ্ট পরিমাণ সেনা সহ সত্ৰাটের আদিষ্ট যুদ্ধকার্য্যে সাহায্য করিতে বাধ্য ছিলেন । যিনি যে পরিমাণ সৈন্য দিতে বাধ্য ছিলেন, তিনি সেই পরিমাণ সেনার মনসবদার উপাধি পাইতেন ।

(২) অপর জমিদারগণকে তোড়রমল্ল করদ রাজা গণ্য করিয়াছিলেন। তিনি তাঁহাদের জমিদারী জরিপ করিয়া বিভিন্ন প্রকার জমির পৃথক্ পৃথক্ পরিমাণ নিরূপণ করিয়াছিলেন। সেই সময়ে যেক্রপ “হাত” জরিপে ব্যবহৃত হইয়াছিল, তাহার দৈর্ঘ্য ইংরেজী ২২½ ইঞ্চি।* সেই হাতের ১০০ হাত দীর্ঘ এবং ১০০ হাত প্রস্থ ভূমিকে কুলা, কুড়া বা বিঘা বলা যাইত। দীর্ঘে বেশী প্রস্থে কম হইলেও যদি মোট পরিমাণে ১০,০০০ বর্গহস্ত হইত, তাহাও এক কুড়া বলিয়া গণ্য হইত। এক কুড়ার ১/১০ বিশ ভাগের এক ভাগ অর্থাৎ ৫০০ বর্গ হস্তে এক বিশোয়া হইত। আবার তাহার ১/১০ অংশে অর্থাৎ ২৫ বর্গহস্তে এক ধুল বা ধুর হইত। এক হাত দীর্ঘ এক হাত প্রস্থ জমিকে অর্থাৎ এক বর্গহস্ত ভূমিকে এক কোণী ধরা হইত। থাক বস্তার নিয়মে জরিপ করিয়া নকশা তৈয়ারি করা হইয়াছিল এবং তাহার চিঠাপৈঠা তৈয়ারি করা হইয়াছিল। সেই চিঠাপৈঠাতে জমিদারের প্রত্যেক প্রজার কি প্রকারের কত পরিমাণ জমি আছে, তাহা লিখিত হইয়াছিল। বিল, পুষ্করিণী, দোবী, ইন্দাবাগুলি জলা জমি বলিয়া গণ্য হইয়াছিল। নদী ও বৃহৎ হ্রদগুলি জলকর নামে অভিহিত হইত।

(৩) ভারতবর্ষীয় জমিতে সাধারণতঃ দুই বৎসর ভাল রূপ শস্য হয়। তৃতীয় বর্ষে শস্য কিছু কম হয় এবং চতুর্থ বর্ষে অত্যন্ত কম হয়। ফলতঃ সকল বৎসরে শস্য সমান হয় না। গড় পড়তায় চারি বৎসরের লভ্য একুন করিয়া তাহার ১/৩ চতুর্থাংশ রাজা তোড়রমল্ল প্রত্যেক কৃষিক্ষেত্রের বার্ষিক লভ্য ধরিয়াছিলেন। সেই লভ্যের ১/৩ বর্ষাংশ তিনি প্রজার দেয় রাজস্ব ধার্য্য করিয়াছিলেন। জলকর, ফলকর, বনকর ও ধনকরের পাঁচ বৎসরের লভ্যের ১/৩ পঞ্চমাংশ বার্ষিক লভ্য ধরিয়া তাহার ১/৩ বর্ষাংশ রাজস্ব ধার্য্য করিয়াছিলেন। শিল্পী, বণিক্, দালাল, মহাজন, গোপ, চিত্রকর, বেষ্টা, গায়ক প্রভৃতি ব্যবসায়ীদিগের লভ্যের নাম বনকর। এইরূপ রাজস্ব যাহা জমিদার মোট আদায় করিবেন, তাহার নাম স্তমার জমা (মোট সংস্থা)। হিন্দু শাস্ত্রমত করদ রাজারা মোট সংস্থার ১/৩ ভাগ পাইতেন। রাজা তোড়রমল্ল সেই স্থলে স্তমার জমার ১/৩ তৃতীয়াংশ জমিদারের প্রাপ্য নির্দেশ করিয়াছিলেন। বাকি ১/৩ ভাগ সন্ত্রাটের প্রাপ্য ছিল।

* সেই ২২½ ইঞ্চি হাতই তখন ওচলিত ছিল। তদ্বারা প্রতিপন্ন হয় যে, তখন মনুয্যদের আকৃতি বৃহৎ ছিল।

(৫) জমিদারের অধীনে যে সকল তালুকদার ছিল, তাহারা উপরি উক্ত নিয়মে নিজ প্রজার নিকট বাহা আদায় করিবে, তাহার $\frac{1}{3}$ তৃতীয়াংশ তাহার পাইবে। অবশিষ্ট $\frac{2}{3}$ অংশ জমিদারকে দিবে। আবার জমিদার সেই টাকার $\frac{1}{3}$ তৃতীয়াংশ নিজে পাইবেন, বাকি $\frac{2}{3}$ ভাগ অর্থাৎ তালুকদারী জমির স্ফর্মার জমার $\frac{1}{3}$ ভাগ সম্রাটের প্রাপ্য ছিল।

ইংরেজ ঐতিহাসিকগণ প্রজার সহ দেওয়ান তোড়রমল্লের বন্দোবস্ত দেখিয়া অনুমান করেন যে, আকবরের সময়ে জমিদার তালুকদার প্রভৃতি মধ্যবর্তী ভূম্যধিকারী ছিল না। কিন্তু তাহা ভুল। আকবর ও অগ্র্য মুসলমান সম্রাটের আমলে সমস্ত দেশই জমিদার ও তালুকদারগণ কর্তৃক শাসিত হইত। সম্রাটদের খাস দখলী কোন ভূমি ছিল না। তোড়রমল্ল যে প্রজা সহ রাজস্ব ধাৰ্য্য করিয়াছিলেন, জমিদারগণের সংস্থা নিরূপণ করাই তাহার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। অধিকন্তু জমিদার ও তালুকদারগণ প্রজার নিকট অতিরিক্ত খাজনা না লইতে পারে, ইহাও অগ্রতর অভিপ্রায় ছিল। রাজা তোড়রমল্ল যেমন জমিদার, প্রজা এবং সম্রাটের হিতকর বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন, পরবর্তী কেহই তদ্রূপ করিতে পারেন নাই। এমন কি, আধুনিক ইংরেজ গবর্ণমেন্ট বারংবার প্রজা ভূম্যধিকারী সম্বন্ধীয় আইন সংশোধন করিয়াও ততদূর উৎকৃষ্ট বন্দোবস্ত করিতে সমর্থ হন নাই। এখন বহুবার করিয়া মকদ্দমা করতঃ প্রজা ও জমিদার সর্বস্বান্ত হয়, অথচ যথোচিত সুফল লাভ করিতে পারে না। তোড়রমল্ল-কৃত বন্দোবস্তে অতি সহজে বিনা ব্যয়ে সম্রাট, জমিদার এবং প্রজার উচিত স্বার্থ রক্ষা হইত।

ইংরেজ ইতিবৃত্তবেত্তারা আরও বলেন যে, মোগল সাম্রাজ্যে জমিদারেরা কেবল করসংগ্রাহক কর্মচারী নাত্র ছিল। ইংরেজের আমলে লর্ড কর্নওয়ালিস্ সাহেব জমিদারদিগকে নালিকী স্বত্ব দিয়াছেন। তাহাও ভুল। জমিদারেরা পূর্বেও পুরুষাঙ্কক্রমিক ভূম্যধিকারী ছিলেন বরং তাঁহাদের ক্ষমতা অনেক বেশী ছিল। তখন শান্তিরক্ষার ভার জমিদারের উপর ছিল এবং তাঁহাদের বিচারাধিকার ছিল। তৎকালে তাঁহারা সর্বোংশেই করদ রাজা ছিলেন। কিন্তু জমিদান বিক্রয়াদি দ্বারা হস্তান্তর করিবার স্পষ্ট ক্ষমতা জমিদার বা প্রজার ছিল না। কেননা জমিদারগণের যে সকল ক্ষমতা ছিল, তাহাতে হস্তান্তর করিতে ক্ষমতা দেওয়া যাইতে পারে না। আবার প্রজাদিগকে জমি হস্তান্তর করিবার ক্ষমতা

দিলে তাহারা মহাজন কিংবা বিপক্ষ জমিদারের নিকট জমি বিক্রয় করিয়া অনেক অনিষ্ট ঘটাইতে পারিত । এই জন্ত হস্তান্তর করিবার ক্ষমতা স্পষ্টরূপে কাহাকেও প্রদত্ত হইত না । অথচ যেখানে কোন আপত্তির কারণ না থাকিত, সেখানে প্রজা-জমি হস্তান্তর করিলে জমিদারগণ গ্রহীতাকে প্রজারূপে স্বীকার করিয়া লইতেন । তেমনই জমিদার নিজ জমিদারী অথবা কোন সুযোগ্য লোককে দিলে, নবাব ও সম্রাটগণ গ্রহীতাকে জমিদার বলিয়া সনন্দ দিতেন । এইরূপে নির্দোষ হস্তান্তর প্রচলিত ছিল, তাহার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায় । ইংরেজ গবর্ণমেন্ট জমিদারগণের রাজকীয় ক্ষমতা সমস্তই হরণ করিয়াছেন, সুতরাং জমিদারী সমস্ত বা আংশিক হস্তান্তর করিতে কোন বাধা দেওয়া আবশ্যক হয় না । শুবে বাঙ্গালা ও বেহারের বন্দোবস্ত সম্পূর্ণ শেষ হইবার পূর্বেই রাজা তোড়রমল্ল দিল্লীতে আহৃত হইয়াছিলেন । নায়েব দেওয়ান রাজা কংসনারায়ণ রায় বন্দোবস্ত শেষ করিয়া চিঠাঠৈঠা এবং নক্সা সম্রাটের নিকট পাঠাইয়াছিলেন । তাহাতে শুবে বাঙ্গালার রাজস্ব ৬৭,০০,০০০ সাতবাড়ি লক্ষ এবং শুবে বেহারের রাজস্ব ৪০,০০,০০০ চল্লিশ লক্ষ, মোট এক কোটি সাত লক্ষ টাকা সম্রাটের বার্ষিক প্রাপ্য হইয়াছিল । সম্রাট তুষ্ট হইয়া রাজা কংসনারায়ণকে খেলাত ও দেওয়ানী সনন্দ দিয়াছিলেন ।

*

*

*

*

ভগবান্ পরশুরাম তৎকাল-জীবিত সমস্ত ক্ষত্রিয়দিগকে বিনষ্ট বা জাতিভ্রষ্ট করিয়া পৃথিবী নিঃক্ষত্রিয়া করিয়াছিলেন । তখন সমস্ত মহর্ষিগণ তাঁহাকে ক্রোধ পরিত্যাগ করিতে অনুরোধ করিলেন । ভৃগুরাম কহিলেন, “বহুসংখ্যক ক্ষত্রিয় পত্নী এখন গর্ভবতী আছে । স্ত্রীবধ-পাপাশঙ্কায় আমি তাহাদের গর্ভস্থ সন্তান নষ্ট করিতে পারি নাই । তাহাদের সন্তান জন্মিলে সমস্ত পুত্রসন্তান নষ্ট করিয়া তাহার পর আমি ক্রোধ পরিত্যাগ করিব । এক্ষণে ক্রোধ ত্যাগ করিলে, নব-প্রসূত ক্ষত্রপুত্রগণ দ্বারা ক্ষত্রিয় বংশ বিচলমান থাকিবে, সুতরাং আমার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হইবে ।” ঋষিগণ কহিলেন, “আপনি বহুল ক্ষত্রিয়গণকে জাতিচ্যুত করিয়া জীবন রক্ষা করিয়াছেন । গর্ভস্থ ক্ষত্রিয়সন্তানদিগকে তদ্রূপ শূদ্রত্বে পাতিত করিয়া তাহাদের প্রাণ রক্ষা করুন এবং ক্রোধাগ্নি ত্যাগ করুন ।” পরশুরাম সন্মত হইলেন । তখন ভৃগুরাম ঋষিগণ সহকারে বিধান করিলেন যে, “বর্ত্তমান

গর্ভবতী ক্ষত্রপত্নীদের যে সন্তান হইবে, তাহারা শূদ্র হইবে। আর বিধবা ক্ষত্র-
পত্নীদের গর্ভে ব্রাহ্মণের ঔরসে যে সন্তান হইবে, তাহারাই ক্ষত্রিয় জাতি গণ্য
হইবে। তদনুসারে সেই গুর্ভিণী ক্ষত্রিয়াদের সন্তানেরা শূদ্র হইল। তাহারা
গর্ভে ছিল, এইজন্ত তাহারা কায়স্থ (কায়+স্থ+ড) জাতি নামে অভিহিত হইল।
কায়স্থেরা বিশুদ্ধ ক্ষত্রিয় সন্তান, আর তাহারা যে পাপে পতিত হইয়াছিল, তাহা
তাহাদের স্বকৃত নহে। এইজন্ত তাহারা সকল শূদ্র হইতে শ্রেষ্ঠ গণ্য হইত।

জাতিমালায় কায়স্থজাতির এই ইতিহাস পাওয়া যায়। অত্ৰ কোন সংস্কৃত
পুস্তকে এই কায়স্থ জাতির কোন উল্লেখ পাওয়া যায় না। কিন্তু “কায়স্থ” শব্দটি
বহু গ্রন্থে অত্যাশ্চর্য্য অর্থে ব্যবহৃত দেখা যায়। কায়স্থ শব্দের মূলার্থ “শরীর-স্থিত”।
চিকিৎসা শাস্ত্রে এবং গীতাতে সর্বত্রই এই মূলার্থে কায়স্থ শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে।

যথা,— (১) কায়স্থঃ নিগূঢ়বাসিং (শরীরস্থিত গুপ্তরোগ)।

(২) কায়স্থাঃ কুমিনিকরাঃ—(শরীরস্থিত চর্ম্মকুমিসমূহ)।

গীতাতে (৩) কায়স্থোহপি ন কায়স্থাঃ—(শরীরের মধ্যে থাকিয়াও
শরীরের অংশ নহে)।

হিন্দু রাজাদিগের গুপ্ত মন্ত্রী বা গুপ্তচরদিগকেও কায়স্থ বলা যাইত।
তাহারা যে রাজার চাকর, তাহা কেহ জানিতে পারিত না। তাহারা রাজ্য মধ্যে
চোর, দস্যু এবং রাজবিপক্ষ লোকদের কার্য্য, গতিবিধি এবং গুপ্তস্থান অনুসন্ধান
করিত। এই অর্থে রাজতরঙ্গিণী ও রাজনীতিতে অনেক স্থলে “কায়স্থ” শব্দ
দেখা যায়। তাহা কেবল চাকরীর উপাধি মাত্র, কোন জাতিবিশেষ-বোধক
নহে। কাশ্মীরে ব্রাহ্মণ ভিন্ন অগ্রজাতীয় লোকের বসতি ছিল না। রাজতর-
ঙ্গিণীর কথিত কায়স্থ পদবীর লোকেরা সকলেই জাতিতে ব্রাহ্মণ।

আধুনিক কায়স্থেরা আপনাদিগকে ক্ষত্রিয় প্রতিপাদন করিবার জন্ত নানাবিধ
কৃত্রিম শ্লোক প্রস্তুত করিয়া তাহা পুরাণাদি গ্রন্থে ভরতি করিয়া মুদ্রিত করিয়া
থাকে। অনেক স্থলে যথার্থ শ্লোকের মিথ্যা অর্থ করিয়া প্রচার করিতে চেষ্টা
করে। তাহা ত্যাগ করিলে দেখা যায় যে, কায়স্থ জাতির কোন উল্লেখ জাতি-
মালা ভিন্ন অত্ৰ কোন পুরাতন পুস্তকে নাই। তাহা হইতে অনুমান হয় যে, হিন্দু
রাজত্বকালে কায়স্থজাতি কুত্রাপি প্রতিভা পায় নাই। বরং অনেকে অনুমান
করেন যে, কায়স্থ জাতি অত্যাশ্চর্য্য শূদ্রগণ সহ মিলিত হইয়া পৃথক্ অস্তিত্বশূণ্ণ

হইয়াছিল। কিন্তু আমরা এই মতটি যুক্তিসঙ্গত বোধ করি না। কারণ, যাহার আসল নাই, তাহার নকল হইতে পারে না। সুতরাং প্রকৃত কায়স্থজাতি না থাকিলে কদাচ কৃত্রিম কায়স্থ হইত না। প্রাচীন গ্রন্থাদিতে শ্রেণী উল্লেখের রীতি ছিল না তজ্জন্ত প্রাচীন গ্রন্থে কেবল শূদ্র শব্দ দেখা যায়। তাহারা কায়স্থ, কি অগ্র জাতীয় শূদ্র তাহা প্রকাশ নাই। পাঠান রাজত্বই বোধ হয় বর্তমান কায়স্থজাতির উৎপত্তি বা উন্নতি হইয়াছে। সেই উন্নতির কারণ যতদূর জানা যায় তাহা এই যে, মুসলমান রাজত্ব স্থাপিত হইলে পারসী, আরবী প্রভৃতি যাবনিক ভাষা রাজভাষা হইল। উচ্চজাতীয় হিন্দুবা বহুদিন পর্যন্ত সেই যাবনিক ভাষা পাঠ করিত না। সেই সুযোগে কতকগুলি শূদ্র পারসী পড়িয়া পাঠানদিগের চাকরী লইয়াছিল। তাহারা অগ্র পাঠানদিগকে ঠকাইয়া এবং প্রজাপীড়ন, উৎকোচ গ্রহণাদি উপায়ে প্রচুর উপার্জন করিত। তাহারা আপনাদিগকে কায়েত বলিয়া পরিচয় দিত। কায়েত শব্দ বোধ হয় কায়স্থ শব্দেরই অপভ্রংশ। কিন্তু কায়েত শব্দ কোন জাতিবিশেষে আবদ্ধ ছিল না। যে কোন জাতীয় হউক, সমস্ত শিক্ষিত শূদ্রই কায়েত উপাধিতে অধিকারী ছিল। ইহাদের নামের শেষে প্রায়ই “লাল” শব্দ যুক্ত থাকিত, এইজন্ত পাঠানেরা ইহাদিগকে লাল লোক বলিত। সেই কায়েত বা লালাগণ কিছু অর্থব্যয় করিয়া কোন পুরাতন কায়স্থ পরিবার সহ ছুই একটি বিবাহ আদান প্রদান করিলেই, তাহারা কায়স্থ বলিয়া গণ্য হইত।

পশ্চিম ভারতের কায়েতদিগের দেখাদেখি বাঙ্গালা দেশের উন্নত শূদ্রেরাও কায়েত উপাধি ধারণ করিয়াছিল। কিন্তু তাহারা পূর্বে আপনাদিগকে চিত্র-গুপ্তের সন্তান বলিত না। যে সকল পশ্চিমা শূদ্র শ্রোত্রিয়দের সেবক রূপে আসিয়া বাঙ্গালাদেশে বাস করিয়াছিল, তাহাদের সন্তানেরা অধিকাংশই কায়েত উপাধি ধারণ করিল। তন্নিম্ন নানা শ্রেণীর শূদ্রগণ মধ্যে যাহারা বিদ্যা বা সঙ্গতিতে উন্নতলাভ করিয়াছে, তাহারাই কায়স্থ জাতিতে প্রবেশ করিয়াছে। এই রূপে অধিকাংশ উন্নত শূদ্র কায়স্থ হওয়ায় কাজেই অগ্রাগ্র শূদ্রগণ অপেক্ষা কায়স্থ-জাতির বিদ্যা, বুদ্ধি এবং অবস্থা সমুন্নত হইয়াছে। এখানে ইহা প্রকাশ করা আবশ্যক যে, শ্রোত্রিয়দের সেবক ও নাবিকরূপে যে সকল শূদ্র কানোজ হইতে বাঙ্গালা দেশে আসিয়াছিল, তাহারা কায়স্থ ছিল কি না, তাহা কুত্রাপি প্রকাশ নাই। সমস্ত কুলশাস্ত্রে তাহাদিগকে কেবল শূদ্র বলিয়া উক্তি আছে। কোন

শ্রেণীর শূদ্র তাহা ব্যক্ত নাই। কেননা প্রাচীনকালে কোন জাতির শ্রেণীর উল্লেখ করিয়া লিখিবার রীতি ছিল না। কোন ব্রাহ্মণেরও কুত্রাপি “কোন শ্রেণীর ব্রাহ্মণ” তাহা প্রকাশ নাই। তজ্জন্ত ব্রাহ্মণদের অনুচরদিগকেও কেবল শূদ্র বলিয়া লেখা হইয়াছে। সেই উক্তি হইতে, তাহারা কায়স্থ ছিল কিনা, ইহা নিরূপণ করা যায় না।

কানোজীয় ব্রাহ্মণেরা বাঙ্গালা দেশের শূদ্রগণ অপেক্ষা আপনাদের অনুচর পশ্চিমা শূদ্রদিগকে শ্রেষ্ঠ জ্ঞান করিতেন। তাহাদের অনুকরণে গোড়ের বৈজ্ঞ রাজারাও সেই পশ্চিমা শূদ্রদিগকে অপর শূদ্রাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ পদ দিয়াছিলেন। বঙ্গদেশের বৌদ্ধরাজা ধর্মপাল, হিন্দুধর্ম গ্রহণ করিয়া শূদ্র শ্রেণীতে গণ্য হইয়াছিলেন। তৎপুত্র দেবপাল পশ্চিমা শূদ্রদিগকে সমধিক সম্ভ্রান্ত দেখিয়া তাহাদের দলে প্রবেশ করিতে ইচ্ছুক হইলেন। তিনি গোড় নগর হইতে কয়েকটি পশ্চিমা শূদ্র আনিয়া বঙ্গদেশে স্থাপন করিয়াছিলেন। আবার তাহাদের ঘরে নিজ পুত্র কণ্ঠার বিবাহ দিয়া তাহাদের সমাজে মিলিত হইয়াছিলেন। তিনি তাহাদিগকে উচ্চ রাজকীয় চাকরী এবং সম্পত্তি দিয়া তাহাদের সম্মান বৃদ্ধি করিয়াছিলেন। আধুনিক বঙ্গজ কায়স্থগণ তাহাদেরই সম্মান বলিয়া পরিচিত। ইহাই বাঙ্গালী কায়স্থদের প্রথম উন্নতি।

সম্রাট বল্লাল সেন কতিপয় পশ্চিমা শূদ্রকে রাজকীয় পদ দিয়াছিলেন। দত্ত-গোষ্ঠীয় একজনকে সেনাপতি করিয়াছিলেন। পরে কুলমর্ঘ্যাদা স্থাপন সময়ে ব্রাহ্মণ ও বৈজ্ঞের পরেই পশ্চিমা শূদ্রগণকে স্থাপন করিয়াছিলেন। ইহাই বাঙ্গালী কায়স্থদের উন্নতির দ্বিতীয় সিঁড়ি।

* * * *

রাজা মানসিংহ বাজপুতনার অন্তর্গত অম্বর রাজ্যের রাজা ছিলেন। ইহারা সূর্য্যবংশীয় ক্ষত্রিয় এবং ভগবান্ রামচন্দ্রের জ্যেষ্ঠপুত্র কুশের সম্মান বলিয়া পরিচিত (কাছোয়া বা কুশাবহ বংশ)। এই বংশীয় রাজারা মোগল সম্রাটদিগের নিতান্ত অনুগত এবং অনুগ্রহীত ছিলেন। ইহাদের স্ত্রন্দরী কণ্ঠা প্রায় সমস্তই বাদশাহের ঘরে বিবাহ দিতেন এবং ইহারা বংশানুক্রমে বাদশাহের সেনাপতি ছিলেন। এই বংশীয় রাজারা এবং যোধপুরের ঝাথোর বংশীয় রাজারা সময়ে সময়ে বাদশাহের অধীনে শুবাদারী করিতেন। সেবাই

জয়সিংহ বা দ্বিতীয় জয়সিংহের সময়ে জয়পুর নগর নির্মিত হইলে, তাহাতেই রাজধানী হইয়াছে। তদবধি এই রাজ্যটি জয়পুর রাজ্য নামে খ্যাত হইয়াছে।

হিঃ ৯৯৭ সালে মানসিংহ বঙ্গদেশে উপস্থিত হন। উড়িষ্যা পাঠানদিগকে দমন, বেণীরায়ের দস্যুতা নিবারণ, কোচবিহারের মহারাজের সহ সন্ধিস্থাপন এবং যশোহরের রাজা প্রতাপাদিত্যকে দমন এই চারিটি মানসিংহের বাঙ্গালা দেশে প্রধান কার্য।

বাঙ্গালা দেশের অধিকাংশ পাঠান দাউদ খাঁর সহ উড়িষ্যা গিয়া বাস করিয়াছিল। তাহারা সুযোগ পাইলেই বাঙ্গালাদেশ অধিকার করিতে চেষ্টা করিত। রাজা মানসিংহ বারংবার পাঠানদিগকে পরাস্ত করিয়া, তাহাদিগকে মোগল সম্রাটের অধীনতা স্বীকারে বাধ্য করিয়াছিলেন। এই সময় হইতে প্রায় দুই শত বৎসর বাঙ্গালা দিল্লীর সম্রাটের অধীন ছিল এবং তাঁহাদের প্রেরিত এক এক জন গুবাদার বাঙ্গালা শাসন করিতেন। অনেক সময়ে রাজকুমারেরা বাঙ্গালার গুবাদার হইয়া আসিতেন।

বেণীরায়ের ডাকাইতী নিবারণ মানসিংহের দ্বিতীয় কার্য। বেণীমাধব রায় একজন কুলীন বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ ছিলেন। বোধ হয় সংস্কৃত ভাষাতেও তাঁহার পাণ্ডিত্য ছিল। সেই জন্তই পরে তাঁহার “পণ্ডিত ডাকাইত” নাম হইয়াছিল। তাঁহার এক পত্নী পরম সুন্দরী ছিল। একজন মুসলমান সর্দার সেই সুন্দরী অপহরণ করায়, বেণীরায় সংসার ত্যাগ করিয়া দস্যুত্ব অবলম্বন করিয়াছিলেন। তিনি নানাজাতীয় কতকগুলি হিন্দু চেলা ঘোড়াইয়া একদল ডাকাইত বা সৈন্ত প্রস্তুত করিয়াছিলেন। তিনি চলনবিল মধ্যে একটি দ্বীপে সেই দল লইয়া বাস করিতেন। এই স্থলে তিনি “যবনমর্দিনী” নামে এক কালীমূর্তি স্থাপন করিয়াছিলেন। তিনি নানা দেশ হইতে মুসলমান ধরিয়া আনিয়া সেই কালীর সম্মুখে বলিদান করতঃ তাহাদের দেহ চলনবিলে ফেলিয়া দিতেন। কেবল নিহত যবনগণের মস্তকগুলি তিনি পূজা করিয়া রাখিতেন। তাঁহার বাসদ্বীপকে অত্য়পি “পণ্ডিত ডাকাইতের ভিটা” বলে। মুসলমানেরা ঐ স্থানকে “সয়তানের ভিটা” বলিত। পূর্বে শ্যামা রামা যেরূপ দৌরাভ্যা করিত, মুসলমানদের উপর বেণীরায়ের দৌরাভ্যা তদপেক্ষা বেশী ভিন্ন কম ছিল না। শ্যামা রামা প্রকৃত ডাকাইত ছিল, বেণীরায় তরুণ অর্থলিপ্সু ডাকাইত ছিলেন না। হিন্দুদের

প্রতি তাঁহার বিশেষ অত্যাচার ছিল বলিয়া বোধ হয় না। কোন হিন্দু জমিদার কখন বেণীরায়কে দমনের জন্ত চেষ্টা করেন নাই। দরিদ্র হিন্দুর তিনি কখন কোন অনিষ্ট করেন নাই, বরং অনেক সময়ে তাহাদের উপকার করিতেন। ধনী হিন্দুদের তিনি ধন হরণ করিতেন বটে, কিন্তু অনাবশ্যক প্রাণ হরণ করিতেন না। তিনি কখন গৃহদাহ প্রভৃতি অনর্থক অনিষ্ট করিতেন না। তিনি কোন স্ত্রীলোক বা বালক হরণ করিতেন না। এমন কি, স্ত্রীলোকের ও বালকের গায়ে মূল্যবান অলঙ্কার দেখিয়াও তাহা অপহরণ করিতেন না। তিনি স্পষ্ট বলিতেন যে, “আমি হিন্দু ধনীদিগের নিকট সাহায্য লই মাত্র। কিন্তু সাহায্য নাম করিয়া প্রকাশ্যরূপে লইলে সাহায্যকারীগণ মুদলমান কর্তৃক দণ্ডিত হইবে, এই ভয়ে আমি লুণ্ঠ করিয়া লইয়া থাকি।” বেণীরায়ের আবির্ভাব দেখিয়া, বাড়ীর সম্মুখে, কিছু অর্থ, খাদ্য ও বস্ত্র রাখিয়া দিলে বেণীরায়ের দল আর সেই গৃহস্থের বাড়ীতে প্রবেশ করিত না। তজ্জন্ত হিন্দুরা বেণীরায়ের আগমনে বিশেষ ভীত হইত না। কথিত আছে যে, রাজীব শাহার বাড়ী বিবাহ হইতেছিল, এমন সময়ে বেণীরায় সদলে উপস্থিত হইলেন। রাজীব সকলকে অভয় দিয়া একাকী বেণীরায়ের নিকট গিয়া প্রণাম করিয়া গলবস্ত্র কৃতাজলি হইয়া কহিল, “বাবা ঠাকুর! আপনকার প্রণামী অগ্রেই পৃথক্ করিয়া রাখিয়াছি।” বেণীরায় সেই প্রণামী লইয়া অশীর্ষাদ করিয়া চলিয়া আসিলেন; বিবাহকার্য্যের কোনই বিঘ্ন হইল না। বেণীরায় সাঁতোড়ের সাঁতালদিগের কুটুম্ব ছিলেন। তজ্জন্ত সাঁতোড়ের সাঁতাল ও কায়তগণ বহুসংখ্যক তাঁহার দলে যোগ দিয়াছিল। তন্মধ্যে যুগলকিশোর সাঁতাল এবং কায়স্থ চণ্ডী প্রসাদ রায় সর্ব্বপ্রধান।

মানসিংহ যখন পদ্মার দক্ষিণ পারে যুদ্ধে ব্যাপৃত ছিলেন, সেই সময়ে তাঁহার ভ্রাতা ঠাকুর ভানুসিংহ বেণীরায়ের বিনাশার্থ সসৈন্তে সাঁতোড়ে উপস্থিত হইলেন। সাঁতোড়, ভানুড়িয়া ও নিকটবর্তী অত্যাচার পরগণার জমিদারগণ তলপ মত তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলেন। সমস্ত জমিদারই হিন্দু ছিলেন। তাঁহারা কহিলেন, “বেণীরায়কে সদ্ভাবে বশীভূত করাই সহজ এবং হিতকর। বলপূর্ব্বক বিনাশ করিতে চেষ্টা করিলে বহুলোকের অনিষ্ট হইবে এবং উদ্দেশ্য সহসা সফল হইবে না।” বেণীরায়ের বৃত্তান্ত শুনিয়া ভানুসিংহের ভক্তি হইল। তিনি তাঁহাকে সদ্ভাবে বশ করাই সংকল্প করিলেন। ঠাকুর ভানুসিংহ দূত দ্বারা বেণীরায়কে

জানাইলেন যে, “পাঠান রাজত্বসময়ে মুসলমানেরা বহু অত্যাচার করিয়াছে। আপনিও তদনুরূপ প্রতিফল দিয়াছেন। এখন মোগল সাম্রাজ্য স্থাপিত হইয়াছে। ইহারা হিন্দুদিগের প্রতি সম্পূর্ণ অনুকূল। তীর্থরাজ প্রয়াগে মুকুন্দরাম ব্রহ্মচারী তপস্বী করিতেন। হঠাৎ তাঁহার মনে বিষয়বাসনা উদ্বেক হওয়ারে তিনি আত্ম-মানিতে গঙ্গা-যমুনা-সঙ্গমে কামনা-কুণ্ডে আত্মবিসর্জজন করিয়াছিলেন। তিনিই জন্মান্তরে সম্রাট আকবররূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহার সাম্রাজ্যে মুসলমান-গণ আর হিন্দুর প্রতি অত্যাচার করিতে পারে না। বরং মুসলমান অপেক্ষা এখন হিন্দুদেরই প্রাধাত্য হইতেছে। তাঁহার সহ আপনকার শত্রুতা করা অনুচিত। বিশেষতঃ আপনি স্থপণ্ডিত কুলীন ব্রাহ্মণ। আপনি সহজেই বুঝিতে পারেন যে, একজন মুসলমানের অপরাধে অত্যাচার মুসলমানদিগকে হিংসা করা ধর্মবিরুদ্ধ। আপনি ব্রাহ্মণ গুরু, আমি ক্ষত্রিয়। আমি সহসা আপনকার অনিষ্ট করিতে চাই না। আপনি শান্তি গ্রহণ করিলে, আমি আপনাকে সমুচিত পুরস্কার দিতে সম্মত আছি।” বেণীরায় সন্ধি করিতে সম্মত হইলেন। ভানুসিংহ বেণীরায়কে এক পরগণা জমিদারী রূপে এবং ১২০০/ বিঘা জমি তাঁহার কালীদেবীর দেবত্র রূপে দিতে স্বীকার করিয়া রাজা মানসিংহের দ্বারা সম্রাটের সনন্দ আনাইয়া দিলেন। বেণীরায় তদবধি শান্ত হইয়া ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিলেন। বেণীরায়ের অনুরোধে ভানুসিংহ যুগলকিশোর সাখ্যালকে এবং চণ্ডীপ্রসাদ রায়কেও জমিদারী দিয়াছিলেন আর চণ্ডীরায়কে নবাবী দরবারে পেস্কার নিযুক্ত করিয়াছিলেন।

বেণীরায় নিঃসন্তান মৃত হইলে, তাঁহার প্রধান চেলা যুগলকিশোর সাখ্যাল সেই সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হইলেন। তাঁহার সন্তানেরাই জেলা বগুড়ার সেরপুরের সাখ্যাল নামে অদ্যাপি জমিদারী ভোগ করিতেছেন। যবনমর্দিনী কালী-মূর্ত্তিও সেরপুরে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। পরে ভূমিকম্পে সেই মূর্ত্তি নষ্ট হইয়াছে। বেণীরায়ের দ্বিতীয় শিষ্য চণ্ডীপ্রসাদ রায়ও জমিদারী পাইয়া পাবনা জেলার অন্তর্গত পোতাজিয়া গ্রামে বাস করিয়াছিলেন। তাঁহারই সন্তানেরা পোতাজিয়ার রায়। ইহারাই বারেন্দ্র কায়স্থ মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা পুরাতন জমিদার এবং সম্মানিত। যুগলকিশোর ও চণ্ডীপ্রসাদকে পাঠানেরা “কাল্ জোগ্লা” ও “কাল্ চণ্ডিয়া” বলিত। আর যে সকল কুলীন ব্রাহ্মণ বেণীরায়ের দলে ছিলেন, তাঁহারা এবং তৎসংস্পৃষ্ট কুলীনেরা “বেণীপাঠীর কুলীন” নামে খ্যাত হইয়াছিলেন। তাঁহাদের

সম্ভ্রানেরা অজ্ঞাপি বেণীপাঠীর কুলীন নামেই পরিচিত । পণ্ডিত ডাকাইত ও তাঁহার চেলাদিগের বীরত্ব, চতুরতা, দয়া এবং প্রতিহিংসা-প্রকাশক বহু গল্প এখনও রাজসাহী, পাবনা এবং বগুড়া জেলায় শুনিতে পাওয়া যায় । তাহার সহ তুলনায়ে ইংরেজী “রবিন হুডের কার্য্য কলাপ” তুচ্ছ হইয়া পড়ে । সেই সকল গল্প সংগ্রহ করিলে একখানি বৃহৎ পুস্তক হইতে পারে । এখন বাঙ্গালীরা যেমন ঐক্য-হীন, পূর্বে বোধ হয় তদ্রূপ ছিল না । বেণীরায়ে পত্নী অপহৃত হইলে, বহুলোক তাঁহার দলভুক্ত হইয়া প্রতিহিংসাব্রতী হইয়াছিল ; তাহাদিগকে দমন করা নবাব এবং সম্রাটের পক্ষেও কঠিন কার্য্য ছিল । তখনকার জমিদারগণ কোন বিপদে পড়িলে তাঁহাদের প্রাণাগণ প্রাণপণে সাহায্য করিত । তখন কোন ব্যক্তির বিপদে শুনিবামাত্র তাহার জ্ঞাতি কুটুম্বগণ তাহার সহায়তা জ্ঞাতি বিনা প্রার্থনায় অগ্রসর হইত । বিশেষতঃ ব্রাহ্মণের বিপদে পার্শ্ববর্তী সমস্ত হিন্দুই উদ্ধারার্থ সাহায্য করিত । এখন ইংরেজী শিক্ষার প্রভাবে জাতীয় ঐক্য স্থাপন জ্ঞাতি দীর্ঘ দীর্ঘ বক্তৃতা হয় বটে, কিন্তু কার্য্যতঃ কিছুই হয় না ।

কোচবেহারের মহারাজের সহ সন্ধিস্থাপন রাজা মানসিংহের তৃতীয় কার্য্য । ঠাকুর ভানুসিংহ সঙ্ঘাবে এই কার্য্য সাধন জ্ঞাতি দুইজন বাঙ্গালী ব্রাহ্মণকে কোচবেহারে দূতরূপে পাঠাইয়াছিলেন এবং নিজে দিনাজপুর পর্য্যন্ত সসৈন্তে অগ্রসর হইয়াছিলেন । কিছুদিন পর রাজা মানসিংহও তথায় উপস্থিত হইলেন । দিনাজপুরের নবাব তাঁহাদের রসদ ও অপর আবশ্যকীয় দ্রব্যাদি যোগাইতে ছিলেন । কোচবেহারাধিপতি মহারাজ লক্ষ্মীনারায়ণ সেই বিপ্র দূতদ্বয়ের পরামর্শে রাজা মানসিংহের শরণাগত হইলেন এবং নিজ ভগিনী পদ্মেধরীকে রাজা মানসিংহের সহ বিবাহ দিলেন । মানসিংহ কোচবেহার রাজ্যের সীমা নির্দিষ্ট করিয়া দিলেন এবং বার্ষিক ৮০,০০০ আশী হাজার নারায়ণী টাকা (এই টাকার মূল্য ৮ আনা ছিল) নালবন্দি বা নর্ম দিয়া নিরুপদ্রবে কোচবেহার রাজ্য ভোগ করিতে লক্ষ্মীনারায়ণকে অনুমতি দিলেন । এইরূপে পদ্মার উত্তর পারে দুই কার্য্য বিনা রক্তপাতেই সুসম্পন্ন হইল ।

আকবর শাহের সময়ে যশোহরের জমিদার প্রতাপাদিত্য স্বাধীন হইতে চেষ্টা করিয়া আরাকান হইতে হাবরীদিগকে (পর্তুগীজ) আনিয়া আপনার গোলন্দাজ সৈন্ত মধ্যে নিযুক্ত করত রূপনারায়ণ নদ হইতে নোয়াখালী পর্য্যন্ত সমুদ্র

উপকূলবর্তী সমুদয় স্থান অধিকার করিয়া লন।* সম্রাট অনেকবার সৈন্ত প্রেরণ করেন কিন্তু প্রতিবারেই তাহারা প্রতাপাদিত্য কর্তৃক পরাজিত হয়। অবশেষে সম্রাট জাইগীর মানসিংহকে দ্বিতীয়বার বন্দে প্রেরণ করেন। মানসিংহ যমুনা ও ইচ্ছামতীর সঙ্গমস্থলে প্রতাপাদিত্যকে পরাজয় করেন এবং তাঁহাকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া দিল্লী লইয়া যান। পথিমধ্যে কালীধামে বন্দীকৃত রাজা প্রতাপাদিত্যের মৃত্যু হইয়াছিল। তাঁহার মৃত দেহ দ্বতভাণ্ড ভরিয়া তাহাই লইয়া মানসিংহ জাইগীরের নিকট গিয়া নিজ কার্য্যসমূহের নিকাশ দিয়াছিলেন। মানসিংহ যশোহর হইতে যে শীলাদেবী অশ্বরে লইয়া গিয়াছিলেন, তাহা অত্য়পি অশ্বরেই আছে। দেবীর পুরোহিত চারিজন বৈদিক ব্রাহ্মণ সপরিবারে অশ্বরে বাস করিয়াছিলেন। তাঁহাদের বংশধরগণ এখনও তথায় পুরোহিতরূপে বিদ্যমান আছে।

রাজা মানসিংহ দিনাজপুরের নবাব প্রাণনাথ রায়কে, তাঁহার শাসিত প্রদেশের করদ রাজা স্বীকার করিয়া রাজা উপাধি দিয়াছিলেন। তাঁহার বার্ষিক কর ৬০,০০০ টাকা। ধাৰ্য্য করিয়াছিলেন। কোচবেহারের মহারাজ রাজা প্রাণনাথের সহ পাগড়ী বদল করিয়া বন্ধুত্ব করিয়াছিলেন। মানসিংহের ক্ষত্রিয়া পত্নীর গর্ভসম্মত পুত্র জগৎ সিংহের বংশ বিলুপ্ত হইয়াছে। কোচবেহারের রাজকুমারী পদ্মেশ্বরীর গর্ভে মানসিংহের যে পুত্র হইয়াছিল, তাহার সন্তানেরাই এখন জয়পুবে রাজত্ব করিতেছে।

* স্পেন ও পর্তুগালকে একত্রে হাইবোর্নিয়া বলে। ইংরেজীতে আইবেরিয়ান উপদ্বীপ (Iberian Peninsula) বলে। মুসলমানেরা উহাকে হাত্রিয়া বলিত এবং তাহার অধিবাসী দিগকে হাবরী বলিত।

দশম অধ্যায় ।

বঙ্গদেশের পার্শ্ববর্তী ও মধ্যবর্তী চতুর্বিংশতি রাজ্যের ইতিহাস ।—বঙ্গভাষা, বঙ্গসাহিত্যাদির ইতিহাস ।—মুসলমান রাজত্বে সংবাদপত্র ।

পাঠান রাজত্বের অবসান কালে এবং বঙ্গদেশে মোগল সাম্রাজ্যের অভ্যুত্থান সময়ে বাঙ্গালা দেশের পার্শ্ববর্তী বার জন রাজা এবং অভ্যন্তরে বার জন করদ রাজা বা বারভুঁইয়া ছিলেন । তাঁহাদের সংক্ষিপ্ত বৃত্তান্ত নিম্নে প্রদত্ত হইল ।

১ । মণিপুর—

এই রাজ্য অতি প্রাচীন । ইহার রাজারা চন্দ্রবংশীয় ক্ষত্রিয় ছিলেন । এই বংশীয় শেষ রাজা চিত্রসেনের পুত্র ছিল না । তাঁহার একমাত্র কণ্ঠা চিত্রাঙ্গদাকে মধ্যম পাণ্ডব অর্জুন বিবাহ করিয়াছিলেন । তৎপুত্র বক্র-বাহন মাতামহের উত্তরাধিকারী হইয়াছিলেন । সেই বংশই অত্যাধি বর্তমান আছে । এই রাজারা মগধের বৌদ্ধ সম্রাটদের অধীন ছিলেন এবং বল্লাল সেনের করদ বংশী রাজা ছিলেন । এখন ইংরেজের অধীন হইয়াছেন । এই বংশ কখনই বিশেষ পরাক্রান্ত বা কোন বিষয়ে বিশেষ প্রসিদ্ধ হয় নাই ।

২ । ত্রিপুরা রাজ্য—

ব্রহ্মপুত্র নদের পূর্ব পার হইতে ব্রহ্মদেশের জঙ্গল পর্য্যন্ত এই রাজ্য বিস্তৃত ছিল । এই রাজ্যে চন্দ্রবংশীয়েরা বহুকাল হইতে রাজত্ব করিতেছিলেন । মগধরাজ চন্দ্রগুপ্ত ব্রহ্মপুত্রের পশ্চিম দিকে কাশীধাম পর্য্যন্ত সমস্ত স্থানে ক্ষত্রিয়কুল নষ্ট করিয়াছিলেন, কিন্তু উক্ত নদের পূর্ববর্তী দেশে ক্ষত্ররাজ্য বিদ্যমান ছিল । ত্রিপুরার রাজা পাণ্ডবদের রাজত্ব যজ্ঞে উপস্থিত ছিলেন । এই রাজবংশ সময়ে সময়ে বিলক্ষণ পরাক্রান্ত হইয়াছিল । এই রাজারা বারংবার পাঠান, মোগল, মগ ও আরাকানরাজের সহ যুদ্ধ করিয়াছেন । সময়ে সময়ে তাঁহাদের রাজত্ব আগাম হইতে বঙ্গোপসাগর পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছে । কমলাপুরে (কমিল্লা) এই রাজ্যের রাজধানী ছিল । শাহজাদা সুলজার নবাবী সময়ে কমলাপুর

মোগলেরা দখল করায় আগরতলায় রাজধানী হইয়াছে। প্রায় দেড় শত বৎসর হইল গোপীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় নামক রাজমন্ত্রী বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া সেই রাজবংশ ধ্বংস করতঃ স্বয়ং রাজা হইয়াছিলেন। এখন সেই গোপীপ্রসাদের বংশই রাজা আছেন। গোপীপ্রসাদের বংশীয়েরা কখনও প্রতিভাশালী হন নাই। ইহারা ত্রিপুরা রাজ্যের কিয়দংশ ইংরেজের অধীনে বশী রাজা রূপে ভোগ করেন। আর কতক স্থান জমিদারী স্বত্বে দখল করেন। রাজতালিকা নামক গ্রন্থে এই রাজ্যের ধারাবাহিক ইতিহাস আছে। রাজতরঙ্গিণী নামক কাশ্মীরের ইতিহাস এবং রাজতালিকা নামক ত্রিপুরার ইতিহাস দৃষ্টে জানা যায় যে, ইতিহাস লিখিবার রীতি হিন্দুদের মধ্যে সম্পূর্ণ অজ্ঞাত ছিল না।

৩। শ্রীহট্ট রাজ্য—

অতি প্রাচীন কাল হইতে এই রাজ্যে সূর্য্যবংশীয় ক্ষত্রিয় রাজারা রাজত্ব করিতেছিলেন। এই বংশীয় অতিরথ নামক রাজা বৌদ্ধ ধর্ম গ্রহণ করায় প্রজারা বিদ্রোহী হইয়া পান্থবর্তী রাজাদের সাহায্যে তাঁহাকে তাড়াইয়া দিয়াছিল। তিনি শ্রাম দেশে গিয়া রাজ্য স্থাপন করিয়াছিলেন। তাঁহার বংশধরগণ এখনও শ্রাম দেশে রাজত্ব করিতেছে। প্রজারা অতিরথের কনিষ্ঠ ভ্রাতা সুরথকে রাজা করিয়াছিল। তদ্বংশীয়েরা বহুদিন শ্রীহট্টে রাজত্ব করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহারা সময়ে সময়ে ত্রিপুরার রাজাকে এবং আসামের রাজাকে কর দিতে বাধ্য হইতেন। এই বংশের শেষ রাজা দিগিন্দ্র দেবের কোন সন্তান ছিল না। অদ্বৈত গোস্বামীর বংশজাত দ্বারকানাথ গোস্বামী রাজার গুরু ছিলেন। রাজা অন্তিম কালে নিজ রাজ্য গুরুকে দান করিয়াছিলেন। গোঁসাই রাজা হইয়া অনেকগুলি বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ বাঙ্গালা দেশ হইতে লইয়া গিয়া এই রাজ্যে স্থাপন করিয়াছিলেন। মৈমনসিংহ জেলার যে অংশ ব্রহ্মপুত্রের পূর্ব দিকে আছে, সেই অংশও ছিলেন। সেই সময়ে শাহ জেহান দিল্লীর সম্রাট ছিলেন এবং তৎপুত্র সুজা বাঙ্গালার গুবেরদার ছিলেন। কতিপয় শত্রু ব্রাহ্মণ গিয়া সুজার নিকট শ্রামসুন্দরের

বিরুদ্ধে নালিশ করায় সূজা শ্রীহট্ট রাজ্য জয় করিয়া শুবে বাঙ্গালার সামিল করিয়া-
ছিলেন। সূজা সেই সময়ে ত্রিপুরা রাজ্যের পশ্চিমাংশ—যাহা এখন জেলা কমিল্লার
অন্তর্গত—তাহাও দখল করিয়া বাঙ্গালা দেশের অন্তর্ভুক্ত করিয়াছিলেন। এই
নবাধিকৃত প্রদেশ হইতে বার্ষিক চৌদ্দ লক্ষ টাকা সূজার আয় হইত। শ্যামসুন্দর
রাজ্যদ্রষ্ট হইয়া, ঢাকা জেলার অন্তর্গত উখুলি গ্রামে বাস করিয়াছিলেন।
তৎসংশ্লিষ্ট উখুলির গোসাই নামে পরিচিত। বোধ হয়, ধর্মবিদ্বেষ জনিত অত্যা-
চার মোগল অপেক্ষা গোস্বামীদের অনেক বেশী ছিল।

৪। জয়ন্তীরাজ্য—

এই রাজ্যে খসিয়া নামক অসভ্য অনার্য্য জাতির বসতি ছিল।
এই রাজ্য কখন সভ্য বা পরাক্রান্ত হয় নাই। এই রাজ্য অনেক সময়েই
ত্রিপুরা রাজ্যের অধীন ও করদ ছিল। ইহাতে রীতিমত শাসনপ্রণালী ছিল না।
স্থানে স্থানে যে সকল সামন্ত বা সর্দার ছিল, তাহারা প্রায় স্বাধীন ভাবে
থাকিত। এখন এই রাজ্য ইংরেজের অধীন হইয়া কতক সভ্য হইতেছে।

৫। অচ রাজ্য—

এই রাজ্যে “নাগ” জাতীয় অনার্য্য জাতির বসতি ছিল। অত্থাপি তাহা-
দিগকে “নাগা” বলে। চিরস্থির বস্তুর নাম “নগ” (ন গচ্ছতি ইতি নগ)।
এই শব্দে আকাশ, পর্বত ও বৃক্ষ বুঝায়। আবার সেই নগ সম্বন্ধীয় সমস্ত
পদার্থকেই ‘নাগ’ বলা যায়। নাগ শব্দে স্থির-বায়ু, হস্তী, মহাসর্প এবং
পার্বত্য লোক বুঝায়। সংস্কৃত ভাষায় এমন অনেক শব্দ আছে, যাহা অনেক
বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়। অত্থাচ্চ ভাষাতেও এইরূপ শব্দ অপ্রাপ্য নহে।
সেই সকল শব্দের সাবধানে অর্থ না করিলেই অনর্থক ভ্রম জন্মে। “পৃথিবী
অনন্ত নাগের উপর আছে” এই কথার প্রকৃত অর্থ এই যে, পৃথিবী অসীম
স্থির-বায়ুর উপর আছে; “উলপী নাগকণ্ঠা” এই বাক্যের অর্থ এই যে “উলপী
নাগ বা নাগা উপাধিধারী লোকের কণ্ঠা”। এই সকল স্থলে নাগ শব্দে গর্প
বা হস্তী বলিয়া অর্থ করা অসুচিত। অচ রাজ্য কখন রীতিমত সুশাসিত রাজ্য
ছিল না। এই নাগরাজ্যের কণ্ঠা উলপীকে মধ্যম পাণ্ডব অর্জুন বিবাহ করিয়া-
ছিলেন। নাগেরা স্ত্রীযোগ পাইলেই পাশ্ববর্তী স্থান লুণ্ঠ করিত। আবার পাশ্ববর্তী

রাজারাও সময়ে সময়ে এই রাজ্য লুণ্ঠ করিতেন। এই রাজ্য অনেক সময়েই আসাম ও ত্রিপুরা রাজ্যের অধীন থাকিত। এক্ষণে এই দেশ ইংরেজের অধীন কিন্তু জঙ্গলবাসী নাগাগণ পূর্ববৎ স্বাধীন ও অসভ্য অবস্থাতেই আছে।

৬। আসাম দেশ—

ইহার প্রাচীন নাম প্রাগ্‌জ্যোতিষ বা প্রাগ্‌দেশ। ইহার পশ্চিমাংশের নাম কামরূপ। আহম্ নামক অসভ্য জাতি এই দেশ অধিকার করিয়া তাহাদের জাতীয় উপাধি অনুসারে এই দেশের নাম “আসাম” করিয়াছিল। বোধ হয় খ্রীষ্টীয় একাদশতম শতাব্দীতে এই নাম হইয়াছে। কিন্তু বক্তিয়ায় গিল্‌জীর আসাম আক্রমণের পূর্বাধি এই দেশের নাম আসাম হইয়াছিল। তজ্জন্ত অনুমান হয় যে, বৌদ্ধ রাজত্ব কালেই আসাম নামটি সৃষ্ট হইয়াছিল। মহাভারতে এই দেশে কিরাত জাতির বাস বলিয়া উক্ত আছে। তখন ভগদত্ত এই দেশের রাজা ছিলেন। রাজা দুর্ঘোষনের মহিষী ভানুমতী সেই ভগদত্তের কন্যা। এখন এই দেশে ব্রাহ্মণ, রাজবংশী, কল্‌তা কায়েত, ভূটিয়া, তান্তার, আকা, নাগা ও মগ জাতির বসতি দেখা যায়। বৌদ্ধ দমনের পর রাজবংশীরাই এই দেশের রাজা হইয়াছিল। সময়ে সময়ে সেই রাজবংশী রাজারা বিলক্ষণ পরাক্রান্ত হইয়াছিলেন। তাহাদের রাজত্ব জেলা রঙ্গপুরের পূর্ব হইতে চীনের প্রাচীর পর্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছিল। ব্রহ্মদেশের উত্তর ভাগে ভানো ও প্রোম অঞ্চলে অনেক বড়ুয়া মগ দেখা যায়। তাহারা আসামদেশীয় রাজবংশীর সন্তান। বড়ুয়া শব্দের অর্থ বড় লোক বা সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি। রাজার স্বপুত্র-গোষ্ঠী সকলেই বড়ুয়া গণ্য হইত। রাজার দৌহিত্রগোষ্ঠী ঈশর। রাজার সহিত কুটুম্বিতা-বিহীন উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের উপাধি কারজী বা কার্যী। ব্রাহ্মণ ভিন্ন সকল হিন্দুই রাজবংশী মধ্যে গণ্য। স্ত্রীজাতি এই দেশে সম্প্রতিবিশেষ মধ্যে গণ্য ছিল, সুতরাং তাহাদিগকে পুরুষেরা ইচ্ছামত দান বিক্রয় ও বন্ধক দিতে পারিত। সতীত্ব ধর্ম এখানে সম্পূর্ণ অজ্ঞাত ছিল। ধর্ম কাহারও একচাটিয়া নহে। বিধব্রাদিগকে সনাতন ধর্মে গ্রহণ করিতে শাস্ত্রে বিধান আছে। বৌদ্ধদিগকে সনাতন ধর্মে গ্রহণ করা হইয়াছে, তাহার প্রচুর প্রমাণ পাওয়া যায়। কিন্তু তাহারা সকলেই শূদ্র হইয়াছে।

হিন্দুদের নানা জাতি, নানা শ্রেণী এবং তাহার অসংখ্য শাখা প্রশাখা হওয়াতে এখন কোন বিধর্মীকে কোন শ্রেণীতে গ্রহণ করা হইবে, তাহা নির্বাচন করা যায় না। এই জন্ত বিধর্মীকে হিন্দু ধর্মের গ্রহণ করিবার প্রথা অপ্রচলিত হইয়াছে। চৈতন্যপ্রভুর বৈষ্ণব মতে ব্রাহ্মণেরা “অধিকারী” আর সকল জাতীয় লোকই “বৈষ্ণব”; এই দুইটি মাত্র ভাগ ছিল এবং সেই দুই ভাগের আর কোন শাখা প্রশাখা ছিল না। এজন্ত তিনি কতিপয় মুসলমানকে বৈষ্ণব রূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাহার পর বৈষ্ণবদিগের মধ্যেও জাতিবিচার আরম্ভ হওয়ার বিধর্মীকে বৈষ্ণব করা অসম্ভব হইয়াছে। নানকের শিখ (শিষ্য) ধর্ম্মও ব্রাহ্মণ ও শিষ্য এই দুইটি মাত্র শ্রেণী ছিল। তজ্জন্য নানক অনেক মুসলমানকে শিষ্য করিয়াছিলেন। পরে শিখের মধ্যেও জাতিভেদ আরম্ভ হওয়ার বিধর্মী গ্রহণ করা রহিত হইয়াছে। আসামে ব্রাহ্মণ ও রাজবংশী ভিন্ন হিন্দুর অণু বিভাগ নাই। এজন্ত তথায় বিধর্মীকে হিন্দু করিবার প্রথা বরাবর প্রচলিত আছে। এখানে হিন্দু বলিলেই রাজবংশী বুঝায়। এখানে মুসলমানকে হিন্দু করিবার রীতি এই যে,—ব্রাহ্মণ কিংবা অধিকারীর উপদেশ মত মুসলমান ভক্ত কয়েকবার হরিবোল হরিবোল বলিয়া গোবর-জলে স্নান করে। তাহার পর দাড়ী কামাইয়া ভক্ত শূকরের রক্ত খায় এবং মাটিতে পড়িয়া দেববিগ্রহ প্রণাম করে। তাহার পর আবার হরিবোল বলিতে বলিতে তুলসীজলে স্নান করিয়া ব্রাহ্মণ ও অধিকারীকে প্রণাম করে, দেববিগ্রহ প্রণাম করিয়া নির্মাল্য মস্তকে লয়; অবশেষে দেবতার প্রসাদ ও চরণামৃত সেবন করিলেই বিশুদ্ধ হিন্দু অর্থাৎ রাজবংশী হয়। মুসলমান ভিন্ন অণু জাতির হিন্দু হইতে দাড়ী কামাইতে হয় না, শূকরের রক্ত খাইতে হয় না এবং গোবর-জলেও স্নান করিতে হয় না। তাদৃশ ভক্তেরা তুলসীজলে স্নান করিয়া কয়েক বার হরিবোল বলে। তাহার পর দেবতা, ব্রাহ্মণ ও অধিকারীকে প্রণাম করিয়া প্রসাদ ও চরণামৃত গ্রহণ করিলেই অমনি বিশুদ্ধ হিন্দু গণ্য হয়। আর সেই রাজবংশী লেখা পড়া জানিলেই কায়েত হয়, বড় চাকরী পাইলেই কারজী হয়, রাজার কুটুম্ব হইলেই বড়ুয়া হয়। ব্রাহ্মণের ঔরসে রাজবংশী রমণীর গর্ভজাত সন্তান “অধিকারী” হয়। তাহারা ব্রাহ্মণ হয় না, উপনয়ন ধারণ করে না, কিন্তু নিম্ন শ্রেণীর রাজবংশীয় পৌরোহিত্য করিতে পারে। নূতন কোন লোক ব্রাহ্মণ হইবার কোন

বিধান হিন্দু শাস্ত্রে নাই। সুতরাং তাহা এখানে হয় না এবং কোন স্থানেই কোন কালে হয় নাই।

ভারতবর্ষে এবং আফগানিস্তানে এখন যত মুসলমান আছে, ইহাদের অনান্য চৌদ্দ আনা অংশই হিন্দুসন্তান। তাহারা নানা কারণে বাধ্য হইয়া একবার মুসলমান হইয়াছিল। পুনরায় সনাতন ধর্ম্মে আসিতে না পারিয়া অগত্যা মুসলমান হইয়া রহিয়াছে। তাহাদের দ্বারা হিন্দুদের বহুল অনিষ্ট হইয়াছে এবং হইতেছে। পেশোয়ারের নিকটবাসী গোক্ষুর জাতি তিন শত বৎসর যাবৎ স্বধর্ম্ম রক্ষার্থ মুসলমান সহ যুদ্ধ করিয়াছে। পরে মহম্মদ গোরী তাহাদিগকে মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণে বাধ্য করিয়াছিলেন। তাহারা সেই আক্রোশে পরে গোরীকে হত্যা করিয়াছিল। কিন্তু পুনরায় হিন্দু হইতে না পারিয়া অগত্যা তাহারা মুসলমান হইয়া রহিয়াছে। ইহাদিগকে এখন “কাকুর” বলে। কাকুর শব্দটি গোক্ষুর শব্দেরই অপভ্রংশ। আফগানিস্তান ও বেলুচিস্তান পূর্বে ভারতবর্ষেরই অংশ ছিল। তথায় এখনও অনেক লোক হিন্দু আছে। যাহারা মুসলমান হইয়াছে, তাহাদিগকে পাঠান বলে। তাহারাও হিন্দুসন্তান। চিত্রল* (চৈত্ররথ), বালুথ† (বাল্লীক), কাবুল (কুভা), হিরাবতী (হিরাত), খান্দার (গান্দার), শিবি (সিবি), শাষ (বেলুচিস্তান), গজনী (গজনীর) প্রভৃতি সমস্তই হিন্দুরাজ্য ছিল। আসামের আয় ব্যবস্থা না থাকাতেই আফগানিস্তান, বেলুচিস্তান এবং ভারতবর্ষ মুসলমান-পূর্ণ হইয়াছে এবং পরাধীনতার প্রধান কারণ হইয়াছে। আসামে পুনরায় স্বধর্ম্ম গ্রহণের নিয়ম থাকায় তথায় মুসলমান রাজ্য স্থায়ী হয় নাই। কালাপাহাড় আসাম জয় করিয়াছিলেন, মীরজুমা‡ আসাম জয় করিয়াছিলেন; তাহারা বহু

* চিত্রল প্রদেশ পুরাতন গন্ধর্ব্বদেশ। চিত্ররথ গন্ধর্ব্বের রাজধানী চৈত্ররথ নগরই বর্তমান চিত্রল।

† উত্তর কুরুবর্ষের রাজধানী বাল্লীক নগরই বালুথ বা বালিখ নামে পরিচিত হইতেছে।

‡ মীরজুমা পারস্তের অন্তর্গত ইম্পাহানের নিকটবর্তী একটি পল্লীগ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি প্রথমে একজন রত্নব্যবসায়ী ছিলেন। এই ব্যবসায় উপলক্ষে তিনি গোলকুণ্ডায় উপস্থিত হন এবং রাজার শুভদৃষ্টিতে পতিত হইয়া রাজকার্য্য লাভ করেন। পরে তিনি গোলকুণ্ডা রাজ্যে সর্ব্বপ্রধান সেনাপতি হন। কোন কারণে গোলকুণ্ডাধিপতির অপ্রিয়ভাজন হওয়ায় তিনি আওরঙ্গজেবের শরণাপন্ন হন। ইহার পর মীরজুমা বাদশাহ শাহ জেহানের সাম্রাজ্যকার

লোককে বলপূর্বক মুসলমানও করিয়াছিলেন । কিন্তু তাঁহারা ফিরিবামাত্র আসাম আবার স্বাধীন হইয়াছিল এবং পতিত হিন্দুরা পুনরায় হিন্দু হইয়াছিল । আসাম কিছু দিন কোচবেহারাদিপতির করদ হইয়াছিল । তদ্ভিন্ন বরাবর প্রপন্ন ছিল । অবশেষে ব্রহ্মদেশের রাজা আসাম অধিকার করিলে, আসামরাজ ইংরেজের সাহায্য প্রার্থনা করিয়াছিলেন । ইংরেজেরা মগদিগকে কামরূপ হইতে তাড়াইয়া তাহা নিজ অধিকারভুক্ত করিয়াছেন এবং আসামরাজকে বৃত্তিভোগী করিয়াছেন । আসামের পূর্বভাগ ব্রহ্মরাজ্যেরই অধীন ছিল । এখন তাহাও ইংরেজ-রাজ্যভুক্ত হইয়াছে ।

৭। কোচবেহার—

এখন যাহাকে তিব্বত বলে, ইহার প্রাচীন নাম ভূতবর্ষ বা কিম্পুরুষবর্ষ । তাহার উত্তরে কৈলাস পর্বত, পূর্বে চীন, দক্ষিণে হিমাচল এবং পশ্চিমে গন্ধর্ব্ববর্ষ বা চিত্রল । মানস সরোবর হইতে ইহার মধ্য দিয়া ব্রহ্মপুত্র নদ পূর্ব-মুখে প্রবাহিত হইয়া অবশেষে দক্ষিণমুখ হইয়া ভারতবর্ষে প্রবেশ করিয়াছে । চীন দেশের একাঙ্গুরী ভাষায় বিদেশীয় শব্দ লেখা হ্রস্ব । ভূতবর্ষ চীনের অধীন হইলে চীন ভাষায় নামগুলি বিকৃত হইয়া ভূতবর্ষের নাম ভোট, কৈলাসের নাম কিউন্লন্ এবং ব্রহ্মপুত্র নদের নাম সামপু হইয়াছে । তিব্বতের অধিপতি বা মহাশুরুকে বৌদ্ধেরা দলই লামা অর্থাৎ মহাযোগী বলে । যেমন কাশীর রাজা বলিলে মহাদেবকে বুঝায় আবার রামনগরের রাজাকেও বুঝায়, তেমনি ভূতপতি বলিতে মহাদেব এবং দলই লামা উভয়কেই বুঝায় । সেই ভূতপতি (মহাদেব বা দলই লামা) নিজ রাজ্যের দক্ষিণ প্রান্ত পরিদর্শন করিতে আসিয়া চিক্না পাহাড়ে হরিয়া ন্যাচের দুই পত্নী হীরা ও জিরাকে পরম সুন্দরী দৃষ্টে নিজের সেবাদাসী করিয়াছিলেন । তাহাতে হীরার গর্ভে বিষ্ণু সিংহ এবং জিরার গর্ভে ইশু সিংহ নামক দুই পুত্র হয় । ভূতরাজ সেই দুই পুত্রকে নিজ রাজ্যের দক্ষিণ প্রান্তে রাজত্ব দিয়াছিলেন । কোচবেহারের মহারাজ এবং জলপাইগুড়ীর রায়কত

লাভ করেন এবং তাঁহাকে বহু ধনরত্ন উপঢৌকন প্রদান করেন । কথিত আছে, মীর শাহ জেহানকে পৃথিবীখাত কোহিনুর রত্ন উপহার দেন । শাহ জেহানও প্রীত হইয়া তাঁহাকে উচ্চ রাজকার্যে নিযুক্ত করেন ।

সেই বিষ্ণুসিংহের বংশীয় আর বিজনী ও সিডলীর রাজারা ইন্ডুসিংহের বংশধর, তন্মধ্যে কোচবেহারের মহারাজগণই বিশেষ পরাক্রান্ত এবং প্রসিদ্ধ হইয়াছিলেন।

৮। ভিতরগড়—

চিক্কা পাহাড়ের দক্ষিণে কমটাপুরে নীলধ্বজবংশীয় রাজবংশী জাতীয় রাজাদের রাজত্ব ছিল। তাহার দক্ষিণ-পশ্চিমে ভিতরগড়ে ভবচন্দ্র রাজার বংশধরেরা রাজত্ব করিতেন। ভবচন্দ্র নামক পাগলা রাজা ও তাঁহার মন্ত্রী গবচন্দ্রের গল্প প্রায় সমস্ত বাঙ্গালা দেশেই শুনা যায়। জনপাইগুড়ীর সাড়ে পাঁচ ক্রোশ দক্ষিণ-পশ্চিমে ভিতরগড়ে তাহার বাস ছিল। ভিতরগড় ও বাহিরগড়ের প্রাচীর পরিখা এবং অভ্যন্তরস্থ পুষ্করিণী দৃষ্টে স্পষ্ট জানা যায় যে, ঐ রাজা বিলক্ষণ বিস্মৃত ও বিভবশালী ছিল। এই রাজারাও রাজবংশী ছিলেন।

৯। শিববংশী—

বিষ্ণু সিংহ ও ইন্ডু সিংহ এবং তাঁহাদের উত্তরাধিকারিগণ দেখিলেন, তাঁহাদের পার্শ্ববর্তী সমস্ত রাজা এবং প্রধান লোকেরাই রাজবংশী অর্থাৎ কোচ। সুতরাং তাঁহারা সেই কোচদিগের প্রধান লোক সহ কুটুম্বিতা করিয়া তাহাদের সমাজে মিলিত হইয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহারা আপনাদিগকে শিববংশী বলিয়া পরিচয় দেন এবং রাজবংশী বা কোচ বলিলে অপমান বোধ করেন। অথচ কোচ সহ বিবাহ আদান প্রদানে বা আহাৰ বিহারে কোন অপমান জ্ঞান করেন না। ক্ষত্রিয়দের সহ বিবাহ আদান প্রদানও কোচবেহারের মহারাজাদের দেখা যায়। ইহাদের কোন কোন আচার ব্যবহার ঠিক ক্ষত্রিয়ের সদৃশ আবার আর কতকগুলি ব্যবহার অন্ত্যজ জাতির তুল্য।

১০। কমটাপুর—

এক সময়ে এই রাজ্য বিলক্ষণ প্রবল হইয়াছিল। ভূটান, আসাম, মোরঙ্গ এবং উত্তর বাঙ্গালার কিয়দংশ সময়ে সময়ে কোচবেহারের অধিকৃত হইত। পূর্বে এই সমস্ত স্থান বেহার প্রদেশের অংশ বলিয়া গণ্য ছিল। এই জন্ত বেহারের যে অংশ মুসলমানদের অধিকৃত, তাহার নাম শুবে বেহার বা মোগলান বেহার। আর যে অংশ কোচ রাজার অধিকৃত তাহার নাম কোচবেহার। এই রাজ্যেও আসামের ন্যায় কেবল রাজবংশী ও ব্রাহ্মণ এই দুই জাতি ছিল।

খান, কৈবর্ত, হাড়ী, বেলদার প্রভৃতি জাতীয় লোক স্থানে স্থানে অল্পই দেখা যায়। এখানেও হিন্দু বলিলেই রাজবংশী বুঝায়। কিন্তু এখানে মুসলমান-দিগকে হিন্দু করিয়া লইবার প্রথা ছিল না। নবাব মীরজুম্মা এই দেশ জয় করিয়া কতকগুলি রাজবংশীকে মুসলমান করিয়াছিলেন। তদবধি তাহারা নগ্ন উপাধিধারী মুসলমান হইয়া আছে। কিন্তু তাহারা মুসলমান ধর্মের মর্ম কিছুই জানিত না এবং তাহাদের আচার ব্যবহার সমস্তই রাজবংশীদের স্থায় ছিল। রেল হওয়ার পর এখানকার মুসলমানেরা কিয়ৎ পরিমাণে যাবনিক ব্যবহার গ্রহণ করিতেছে। কামটাপুর ও ভিতরগড় রাজ্য কোচবেহার-রাজ্যভুক্ত হইয়াছে। এই বংশীয় জলপাইগুড়ীর রায়কত এবং সিডলীর চৌধুরীরা এখন ইংরেজ রাজ্যের অধীনে জমিদার হইয়াছেন। কোচবেহার ও বিজনীর মহারাজগণ কতক ভূমি করদ রাজা রূপে আর কতক ভূমি জমিদাররূপে ভোগ করিতেছেন।

১১। জাজপুর—

উড়িষ্যার উত্তরাংশ এবং রাঢ়দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাংশ লইয়া এই রাজ্য সংগঠিত ছিল। এখানকার রাজারা ক্ষত্রিয় ছিলেন, তাঁহারা বল্লালসেনের বণী রাজা ছিলেন। তাঁহারা বাঙ্গালার নবাব ও গোড় বাদশাহের সহ বহু যুদ্ধ করিয়াছিলেন। অবশেষে উড়িষ্যার রাজারা এই রাজ্যের রাজধানী সহ অধিকাংশ দখল করিয়াছিলেন। রাজা সুধীর সিংহ অবশিষ্ট রাজ্য রক্ষার জন্য গোড় বাদশাহের অধীনতা স্বীকার করিয়া বর্দ্ধমানে রাজধানী করিয়াছিলেন। কিন্তু অল্প দিন পরেই বর্দ্ধমানরাজ অত্যন্ত ঋণগ্রস্ত হইয়া সমস্ত রাজ্য বিক্রয় করিতে বাধ্য হন। বর্দ্ধমানের বর্তমান মহারাজের পূর্বপুরুষ লালজী রায় তাহা ক্রয় করিয়াছিলেন। পুরাতন রাজবংশের কোন বংশধর এখন দেখা যায় না। পুরাতন রাজধানী বর্দ্ধমানও এখন জনশূন্য হইয়াছে। এখন যে বর্দ্ধমান নগর আছে, তাহার পূর্ব নাম গোহাট। বর্দ্ধমান রাজ্য লালজী খরিদ করা অবধি গোহাটের নামই বর্দ্ধমান হইছে।

১২। আরাকান—

আরাকানে বাঙ্গালা ভাষা প্রচলিত নাই এবং এখানকার রাজাকে বাঙ্গালী বলা যায় না। তাঁহাদের দ্বারা বাঙ্গালী সমাজের কোন হিতাহিত হয় নাই।

কিন্তু এই রাজ্যের সহ বাঙ্গালা দেশের বিশেষ ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ছিল। নয়াখালি ও চট্টগ্রাম জেলা সময়ে সময়ে আরাকানের অধীন হইয়াছে। এই রাজারা পটুগীজদিগের সহায়তায় অতিশয় প্রবল হইয়া বকরদীপের দক্ষিণ ভাগ পুনঃ পুনঃ লুট করিতেন। তজ্জন্ত অধিবাসীরা পলায়ন করাতে সেই সকল স্থান সুন্দরবন নামক নিবিড় জঙ্গল হইয়াছে। ইহার পর পটুগীজেরা আরাকানে আপনাদের প্রভুত্ব স্থাপনের চেষ্টা করায় আরাকানী মগদিগের সহ তাহাদের বিবাদ হয়। পটুগীজেরা সম্পূর্ণ পরাস্ত হইল। তাহাদের কতক হত, কতক পলায়িত হইল, অবশিষ্টেরা অধীন প্রজাক্রমে চট্টগ্রামে বাস করিয়াছিল। বাদশাজাদা সুজা আরাকানে আশ্রয় লইয়া নিহত হইয়াছিলেন। চট্টগ্রামের প্রভুত্ব লইয়া ত্রিপুরার রাজার সহ আরাকানরাজের বারংবার যুদ্ধ হইয়াছে। নবাব শায়স্তা খাঁ নয়াখালি ও চট্টগ্রাম মোগল সাম্রাজ্যভুক্ত করিয়াছিলেন এবং পটুগীজ ফিরিঙ্গীদিগকে* ঢাকার ফিরিঙ্গীবাজারে অধিবিষ্ট করিয়াছিলেন। আরাকানের রাজারা বৌদ্ধ ছিলেন, কিন্তু জয়কালীর পূজা করিতেন। সেই দেবীর সম্মুখে ব্রাহ্মণ ব্যতীত সকল জাতীয় বন্দীদিগকেই নরবলি দিতেন। হিন্দু, বৌদ্ধ, মুসলমান, খৃষ্টান, কুকি, রাফস, সর্প, ব্যাঘ্র, গো, মহিষ, হস্তী, সিংহ, ভল্লুক, গণ্ডার প্রভৃতি সমস্ত প্রাণীই বলি দিবার রীতি ছিল। দেবীর পুরোহিতদিগকে কুঙ্গী বলিত। অত্যাঁত্ৰ হিন্দু দেব-দেবীরও পূজা হইত। তজ্জন্ত ব্রাহ্মণ পুরোহিত নিযুক্ত ছিল। মগেরা সর্বপ্রকার প্রাণীর মাংসই খাইত। বলিদানকৃত মনুষ্য-মাংসও খাইত। ব্রাহ্মণকর্তা ব্যতীত সকল জাতীয় মনুষ্যের কণ্ঠাই মগেরা বিবাহ করিত। মগরমণীরা সকল জাতির পুরুষকেই পতি বা উপপতিরূপে গ্রহণ করিত এবং তাহাতে উৎপন্ন সন্তান বিশুদ্ধ মগ বলিয়া গণ্য হইত। জারজ সন্তানের মর্যাদা কিছুমাত্র কম হইত না। কখন কখন ব্রাহ্মণ ধরিয়া তাহার সহ রাজকুমারী-দিগের কিংবা সম্ভ্রান্ত মগদিগের কণ্ঠাগণের বিবাহ দিত। তাহাদের সন্তানেরাও মগ বলিয়া গণ্য হইত। ফলতঃ ব্রাহ্মণ ভিন্ন অত্ৰ কাহারও জাতিবিচার ছিল না। পরিশেষে খৃষ্টীয় ১৭৫৩ সালে ব্রহ্মদেশের রাজা আরাকান রাজ্য দখল করিয়া তথাকার রাজবংশ ধ্বংস করিয়াছিলেন। তাহার ৫০ বৎসর পরেই আবার

* ফিরিঙ্গী শব্দে খেত অঙ্গ বিশিষ্ট।

ইংরেজেরা আরাকান দেশ অধিকার করিয়াছেন। তদবধি এই দেশ ইংরেজের অধিকৃত আছে।

* * * *

বার ভূঁইয়া অর্থাৎ বাঙ্গালা দেশের অন্তর্গত বারটা করদ রাজার বিবরণ।

১। ভাছুড়িয়া—তাহার বিস্তারিত বিবরণ লেখা হইয়াছে।

২। সাঁতোড়—ইহার বিবরণ যত দূর প্রাপ্য, তাহাও বিস্তারিত লেখা হইয়াছে।

৩। বর্দ্ধমান—এখানকার বর্ত্তমান রাজবংশ পঞ্চাবী ক্ষেত্রি বা ক্ষত্রিয়। ইহাদের পূর্ব পুরুষ শ্রামল রায়, কতিপয় ক্ষেত্রি ও সারস্বত ব্রাহ্মণ সহ নানা তীর্থ করিয়া অবশেষে উড়িষ্যা জগন্নাথ ক্ষেত্রে গিয়াছিলেন। তাঁহারা প্রত্যাগমনকালে বর্দ্ধমান রাজ্যে বাণিজ্যের সুবিধা দেখিয়া গোহাটের বাজারে দোকান করিয়া-ছিলেন। তাহাতে সঙ্গতি হইলে টাকা লগ্নী করিতে লাগিলেন। শ্রামল রায়ের বংশ ক্রমশঃ অত্যন্ত ধনী হইল। বর্দ্ধমানের মহারাজাও তাঁহাদের নিকট ধনী হইলেন। সেই ক্ষেত্রি মহাজন আবুরায় ও বাবুরায় ও তাঁহাদিগের বংশধর লালজী রায় ক্রমশঃ বর্দ্ধমান রাজ্য ক্রয় করিয়া আপনাই বর্দ্ধমানের মহারাজা হইলেন। প্রাচীন রাজবংশীয়েরা নাগপুরে চলিয়া গেলেন। তদবধি প্রাচীন বর্দ্ধমান জনশূন্য হইল এবং গোহাটের নামই বর্দ্ধমান হইল। বর্দ্ধমানের মহারাজার অধীন চিত্রবরদা * নামক স্থানের সামন্ত শোভা সিংহ নামক একজন ক্ষত্রিয় ১৬৯৫ খৃষ্টাব্দে বিদ্রোহি হইয়া উড়িষ্যার পাঠানদিগের সাহায্যে তৎকালীন রাজা কৃষ্ণরামকে বিনাশ করিয়া বর্দ্ধমান রাজ্য অধিকার করিল। রাজা কৃষ্ণরামের জগৎ রায় নামক পুত্র একাকী পলায়ন করিতে পারিয়াছিল। শোভা-সিংহ কৃষ্ণরামের পরিবারভুক্ত বালক বালিকা ও রমণীদিগকে অবরুদ্ধ করিয়া-ছিল। সে রাজকুমারীকে নিজ ভোগ্য করিতে উৎসুক হইল। পিতৃহা শত্রু শোভা সিংহকে বিনাশ করিতে রাজকুমারীর ইচ্ছা হইল। তিনি সে

* চিতোয়া ও বারদা। চিতোয়া বর্ত্তমান উলুবেড়িয়ার নিকট।

+ রহিম খাঁ পাঠান দিগের দলপতি ছিল। কোন যুদ্ধে তাহার নাসিকার কিয়দংশ কাটা যাওয়াতে লোকে তাহাকে নাক কাটা রহিম খাঁ বলিত।

ভাব গোপন করিয়া শোভা সিংহের দৃষ্ট প্রস্তাবে সম্পূর্ণ সম্মতি দিলেন। পরে স্বযোগ মত শোভাকে হত্যা করিয়া স্বয়ং আত্মহত্যা করিলেন। পাঠানদিগের নায়ক রহিম খাঁ বর্দ্ধমান রাজ্য দখল করিয়া ক্রমে রাজ্য বিস্তার করিতে লাগিল। অল্পকাল পরেই পাঠানেরা পরাজিত হইয়া উড়িষ্যায় পলায়ন করিল। কৃষ্ণরামের পুত্র পুনরায় বর্দ্ধমানে রাজা হইলেন। তিনি আরও বহু জমিদারী ক্রয় করিয়াছিলেন। তাঁহার করদ রাজা বলিয়া সনন্দ পাইয়াছিলেন বটে, কিন্তু মুর্শিদকুলী খাঁ তাঁহাদের মালগুজারী বৃদ্ধি করিয়াছিলেন এবং ক্ষমতা হ্রাস করিয়াছিলেন। তথাপি তখনও তাঁহাদের গড়খাই ছিল, সৈন্ত ছিল এবং বিচারাধিকার ছিল। ইংরেজাধিকারের পর লর্ড কর্ণওয়ালিস বর্দ্ধমানের মহারাজের ও অগ্রাগ্র সমস্ত রাজা মহারাজের রাজস্ব অতিমাত্র বৃদ্ধি করিয়াছিলেন এবং সর্ব-প্রকার ক্ষমতা রহিত করিয়াছেন। তদবধি এখানকার মহারাজও সাধারণ জমিদার হইয়াছেন। তাঁহার রাজাধিরাজ মহারাজ উপাধি আছে বটে, কিন্তু সাধারণ জমিদার অপেক্ষা ক্ষমতা কিছুমাত্র বেশী নাই। এই বংশে এগার পুরুষ বরাবর দত্তকপুত্র দ্বারা বংশরক্ষা হইতেছে। তজ্জন্ত সম্পত্তি ভাগ হয় নাই এবং সম্পত্তি বৃদ্ধি ভিন্ন হ্রাস হয় না।

৪। তাহিরপুর—তাহিরপুরের রাজারা নন্দনাবাসি-গাঁই সিদ্ধশ্রোত্রিয় বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ। মনুসংহিতার সর্বোৎকৃষ্ট টীকাকারক কল্পক ভট্ট এই রাজবংশের পূর্বপুরুষ। এই বংশীয় উদয়নারায়ণ রায় গোড়বাদশাহ গণেশের শ্যালক ছিলেন। তিনিই প্রথম রাজা উপাধি পাইয়াছিলেন। রাজা জীবন রায়, সম্রাট যহ্ননারায়ণের দেওয়ান ছিলেন। রাজা কংশনারায়ণের বৃত্তান্ত পূর্বেই বলা হইয়াছে। শরীকী বিভাগ হওয়ায় এই বংশীয় রাজাদের প্রত্যেক অংশ ক্ষুদ্র হইয়াছে। অনেক শরীকের অংশ বিক্রীত হইয়াছে। কোন কোন শরীকের অংশ দৌহিত্রে পাইয়াছে। মূল রাজবংশের সম্পত্তি অতি অল্পই আছে। এই রাজ্য পূর্বে মুর্শিদাবাদ জেলার অন্তর্গত ছিল, এখন রাজসাহী জেলার অন্তর্গত হইয়াছে।

৫। পুঁঠিয়া—গাড়ে বাদশাহের সেনার রসদ যোগাইবার জন্ত ঠাকুর কমলাকান্ত বাগছি একটি পরগণা চাকরাণ পাইয়াছিলেন। তজ্জন্ত সেই পরগণার

নাম লক্ষরপুর। কমল ঠাকুরের বাড়ী ঐ পরগণা মধ্যে পুঁঠিয়া গ্রামে পূর্বাবধি ছিল। ইনি সাধু বাগছির সন্তান এবং অতি মায়া কুলীন ছিলেন। সম্পত্তি প্রাপ্তির পর তৎসংশ্লিষ্টদের চরিত্রে নানারূপ দোষ জন্মিল। সুরাপান ও লম্পট্য হেতু অনেক কুকার্য্য অনুষ্ঠিত হইল। রাজা রামচন্দ্র রায়, তাঁহার বন্ধু সাতোড়ের ধেনুয়া-রামকৃষ্ণ, মধুরায়, ডাকুরায় ও অরবিন্দ রায় মত্ত অবস্থায় কালী-পূজা উপলক্ষে মহিষের পরিবর্তে গরু বলি দিয়াছিলেন। সেই জন্ত তিরস্কার করায় পুরোহিতকে এবং রাজার জননীকেও হত্যা করিয়াছিল। এই সকল মহাপাপ করা হেতু তাঁহারা পাঁচুড়িয়া অর্থাৎ পঞ্চমহাপাতকী * নামে ঘৃণিত হইয়াছিলেন। মধু, ডাকু, অরবিন্দ সমাজচ্যুত হইয়া দেশত্যাগী হইল, এবং মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করিয়াছিল। রামকৃষ্ণ স্বহস্তে ধেনু বধ করিয়াছিলেন, সেই জন্তই তাঁহার নাম ‘ধেনুয়া’রামকৃষ্ণইয়াছিল। তিনি দেশত্যাগী হইলেন। রাজা রামচন্দ্র ঠাকুর নানারূপ প্রায়শ্চিত্ত করিয়া ব্রাহ্মণসমাজে গৃহীত হইলেন বটে, কিন্তু অতিশয় হেয় থাকিলেন। ইহাকেই লোকে “সাধুর ভরা তল” বলে। এই পুরাতন রাজবংশের বহু শরীক হওয়ায় অনেক শরীকের সম্পত্তি ক্ষুদ্র হইয়াছে, কাহারও বা সম্পত্তি বিক্রীত হইয়াছে। আবার বড় বড় শরীকগণ নূতন সম্পত্তি ক্রয় করিয়া সজ্জতি বর্দ্ধিত করিয়াছেন। পাঁচ-আনীর শরীকের ‘মহারাজ’ এবং চারি-আনীর ‘রাজা’ উপাধি আছে। অপর ক্ষুদ্র অংশীদিগকেও স্থানীয় লোকে রাজা বলে বটে, কিন্তু গবর্ণমেন্টে ঠাকুর উপাধি।

৬। সিন্দূরী—পূর্বে উক্ত হইয়াছে যে, ভীম ওঝা, সম্রাট বল্লাল সেনের পুরোহিত ছিলেন। গোড় নগরের নিকট কালিয়া গ্রামে তাঁহার বসতি ছিল। বল্লালের হডিক সাংস্রব ঘটলে তিনি কালিয়া গ্রাম ত্যাগ করিয়া বর্তমান পাবনা জেলার পূর্বদক্ষিণ অংশে ছাতক নামক গ্রামে বসতি করিয়াছিলেন। তাঁহার সন্তানেরা কালিয়াই গোষ্ঠী নামে খ্যাত। তিনি যখন পূর্ববঙ্গে বাড়ী করিয়াছিলেন, তখন পূর্ববঙ্গে আর কোন শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণ ছিল না। এজন্য তৎসংশ্লিষ্টেরা বাঙ্গাল ওঝা নামে পরিচিত হইতেন। ভীমের পৌত্র অনন্তরাম বাঙ্গাল ওঝা, রাজা লক্ষণ সেনের গুরু ছিলেন। তিনি সিন্দূর ওশাখিনী এই দুই পরগণা নিষ্কর-

* পুঁঠিয়ার রাজারা বলেন যে তাঁহাদের পূর্বপুরুষ উক্ত মহাপাপ করেন নাই। কেবল পাপীদের সহ কুটুম্বিতা করিয়া তাঁহারা পাঁচুড়িয়া হইয়াছেন।

রূপে গুরুদক্ষিণা পাইয়া বহুসংখ্যক বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ এইস্থানে স্থাপন করিয়া-
ছিলেন। তদ্বংশীয়দের তুল্য পুরাতন জমিদার বাদশা দেশে আর দেখা যায়
না। পাঠানরাজ্যারম্ভে ইহারা রায় উপাধি ধারণ করিয়াছিলেন। গোড় বাদ-
শাহদিগের সময়ে বসন্ত রায় আট পরগণার রাজা হইয়াছিলেন। ইহারা কুলীন
ব্রাহ্মণ এবং সমৃদ্ধ রাজা ছিলেন। মুসলমান রাজধানী হইতে বহুদূরবর্তী থাকায়
আপন চত্বরে তাঁহাদের স্বাধীন রাজ্যের স্থায় সর্ববিষয়ে প্রাধান্য ছিল। বসন্ত
রায়ের পুত্র রাজীব রায়, গয়াতীর্থ হইতে প্রত্যাগমনকালে রাঢ়দেশ হইতে
শিবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় নামক একজন রাঢ়ীয় কুলীন ব্রাহ্মণকে তাহার মাতা ও
ভগিনীদ্বয়সহ সঙ্গে করিয়া লইয়া আসিয়াছিলেন। শিবচন্দ্রের দুইটি ভগিনী পরম
সুন্দরী ছিল। রাজা সেই শিবচন্দ্রের “চট্টোপাধ্যায়” উপাধি হলে “মৈত্র”
উপাধি করিলেন। তাঁহার দুই ভগিনীকে স্বয়ং বিবাহ করিলেন। সেই পরিচয়ে
বারেন্দ্র ব্রাহ্মণের ঘরে শিবচন্দ্রের বিবাহ দিলেন এবং তাঁহাকে একটি গ্রাম তালুক
করিয়া দিলেন। তাঁহারই সম্ভানেরা শিবপুরের মৈত্র নামে খ্যাত। শিবচন্দ্র,
বারেন্দ্র ব্রাহ্মণের পরিচয় কিছুই জানিতেন না। তজ্জগৎ ঘটকগণ এবং ভট্টগণ
বিদ্রূপ করিয়া কবিতা বাধিয়াছিল। *

শিবচন্দ্রের বিবাহ সময়ে অনেকে আপত্তি করায় রাজীব রায় কহিলেন,
“কাণ্ডপগোত্র কুলীন ব্রাহ্মণ রাঢ়ী হইলেই চাটুর্ঘ্যো হয়, বারেন্দ্র হইলেই মৈত্র হয়।
শিবচন্দ্রকে যখন বারেন্দ্র করা হইল, তখন ইহার মৈত্র উপাধি হওয়াই উচিত।”
তাঁহার কথায় ফটক দত্ত নামক একটি কায়স্থ কর্মচারী কহিল, “মহারাজের এ
হুকুম সাফ বোধ হয় না।” রাজা ক্রুদ্ধ হইয়া কহিলেন, “আমি সাফ করিতে
পারি না, তুমি ধোবা হইয়া সমস্ত সাফ কর।”† তিনি ফটককে ধরিয়া ধোবার
সহ আহার ব্যবহার করাইয়া ধোবা জাতিতে অবনত করিলেন। তদৃষ্টে ভয়

* ঘটকের কবিতা—“খাটখুট ঠাকুরট গলায় রুদ্রাক্ষমালা, পাই গোত্র কিছু নাই
রাজীব রায়ের শালা।”

ভট্ট কবিতা—“গঙ্গাপারের মৈত্র ঠাকুর গলায় রুদ্রাক্ষমালা, পরিচয় মধ্যে কেবল রাজীব
রায়ের শালা।”

† ভট্ট কবিতা—“জাতির কর্তা রাজীব রায় মুন্সুরের গুণ, তাঁর হুকুম তুচ্ছ করে দত্ত
হইলেন ধোবা।”

পাইয়া আর কেহ কোন আপত্তি করিল না ।

গঙ্গারাম মৈত্র নামক একজন কুলীন ব্রাহ্মণ পরম বৈষ্ণব ছিলেন । তিনি একটি মুসলমান-কন্যাকে বৈষ্ণবী করিয়া নিজের সেবাদাসী করিয়াছিলেন । তাহার ভ্রাতা আবদুলকেও তিনি বৈষ্ণব করিয়া লইয়াছিলেন । তিনি তাহাদের নাম ভূষণা ও রূপদয়াল রাখিয়াছিলেন । তাহারা তাঁহার ঘরেই থাকিত । তিনি তাহাদের স্পৃষ্ট অন্ন গ্রহণ করেন নাই, কিন্তু জল গ্রহণ করিতেন । মুসলমান কাজী এই বৃত্তান্ত জানিয়া রূপদয়ালকে হরিমন্ত ত্যাগ করিতে বলিলেন । রূপদয়াল কহিল, “মহুঘোর ভাষা বিভিন্ন, কিন্তু ঈশ্বর এক । যে আল্লা, সেই হরি ।” কাজী কহিল, “তবে তুমি আল্লা না বলিয়া হরি বল কেন ?” রূপদয়াল কহিল, “আমি পারসী আরবী জানি না ; সমস্ত কথাই যখন বাঙ্গালা ভাষায় বলি, তখন ঈশ্বরের নাম বলিলেও হরি বলাই উচিত । যে ব্যক্তি সমস্ত কথাই পারসী আরবীতে বলে তাহার পক্ষে ঈশ্বরকেও আল্লা বলা কর্তব্য ।” কাজী তর্কে পরাস্ত হইয়া, আবদুলকে হরিমন্ত ত্যাগে জিদ করিলেন । আবদুল সম্মত হইল না দেখিয়া, কাজী তাহার প্রাণদণ্ড করিলেন । ভূষণা ভ্রাতৃশোকে জলে ডুবিয়া মরিল । গঙ্গারাম উদাসীন হইয়া বৃন্দাবন গেলেন ।

আট বৎসর পর গঙ্গারাম দেশে আসিয়া সংসারী হইতে ইচ্ছুক হইলেন । কিন্তু তাঁহাকে কোন ব্রাহ্মণ, সমাজে গ্রহণ করিতে সম্মত হইল না । গঙ্গারাম, রাজীব রায়ের শরণাগত হইলেন । রাজীব রায় বহু ব্রাহ্মণ নিমন্ত্রণ করিয়া আনিলেন এবং সভা করিয়া কহিলেন, “এই গঙ্গারাম মৈত্র, ভূষণা ও রূপদয়ালসহ যেরূপ ব্যবহার করিয়াছে, অদ্বৈতপ্রভু ও নিত্যানন্দ প্রভুও হরিদাসের সহিত ঠিক তদ্রূপ ব্যবহার করিয়াছিলেন । হরিদাস যেরূপ হরিভক্ত ছিল, রূপদয়ালও ঠিক সেইরূপ ছিল । যখন অদ্বৈত ও নিত্যানন্দের সন্তান সুব্রাহ্মণ আছে, তখন গঙ্গারামকে সমাজে গ্রহণ করাই কর্তব্য । আর জন্ম দ্বারাই জাতি হয় । কর্ম্ম দ্বারা কেবল পাপ পুণ্য হয় মাত্র । কর্ম্মজ পাপ প্রায়শ্চিত্ত করিলেই থগুন হয় । গঙ্গারাম প্রায়শ্চিত্ত করিলে আপনারা তাহাকে সমাজে গ্রহণ করুন ।” অধিকাংশ শাক্ত ব্রাহ্মণেরা রাজার অনুরোধ স্বীকার করিল না । তাহারা কহিল,—

“কেন ভাই গঙ্গারাম, আগে কলি হেন কাম,

কেন খালি ভূষণার পানী ?

যরে দিল আবহুলে ভাত, হাড়ীতে না ছোঁয় পাত,
তোর বিসে কিরে কুলে আনি ।”

বৈষ্ণবগণ গঙ্গারামকে প্রায়শ্চিত্তান্তে সমাজে গ্রহণ করিতে সম্মত হইল। গঙ্গারাম প্রায়শ্চিত্ত করিয়া ছাতিয়ান গ্রামনিবাসী কবিভূষণ চৌধুরীর কন্যা বিবাহ করিয়াছিলেন। তাঁহার সহ সংস্রব-বিশিষ্ট কুলীনেরাই “ভূষণ পঠার” কুলীন। উপরি উক্ত তিনটি উদাহরণ দ্বারাই সিন্দুরীর রাজাদের সামাজিক প্রাধান্য স্পষ্ট জানা যায়। কিন্তু নবাব বা বাদশাহের দরবারে তাঁহাদের বিশিষ্ট সম্মান ছিল না। একমাত্র নাথাই ফৌজদার ভিন্ন আর কেহ কোন বাদশাহী পদবী প্রাপ্ত হন নাই।

রাজা দেবীদাস, নামান্তরে ঠাকুর কুশলী, কুলীন ভঙ্গে কাপ হইয়াছিলেন। তিনি দ্বিতীয় কালাপাহাড়ের সমকালবর্তী লোক। তিনি গোড়বাদশাহের ক্রোধ-ভাজন হইয়াছিলেন। কি জন্ত সেই আক্রোশ হইয়াছিল, তদ্বিয়ে নানা প্রকার কল্পিত গল্প আছে, তাহা উদ্ধৃত করা নিষ্প্রয়োজন। বাদশাহ উমরু নামক সেনাপতির অধীনে এক দল সেনা ছাতক আক্রমণ জন্ত পাঠাইয়া ছিলেন এবং তৎপ্রতি আদেশ করিয়াছিলেন যে, “আঠার পুত্র সহ রাজা দেবীদাসের মাথা কাটিয়া আনিও এবং তাহাদের রমণীগণকে দাসীরূপে বিক্রয় করিও ; কিন্তু যদি কেহ মুসলমান হয়, তবে তাহাকে সম্মানে রক্ষা করিও এবং তাহাকে আয়মা দিও।” রাজার জ্যেষ্ঠ পুত্র কার্তিক রায়, তিন দিন নগর রক্ষা করিয়া যুদ্ধে নিহত হইলে, উমরু ছাতক দখল করিলেন। রাজ-পরিবারগণ বিষপানে জীবন শেষ করিল। রাজপুত্রদের মধ্যে ঠাকুর কেশব-নাথ রায় ও ঠাকুর কাশীনাথ রায় মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করিয়া বাঁচিয়াছিলেন। তাঁহাদের সন্তান পাবনা জেলায় আমীনপুরের মিঞা এবং ঢাকা জেলায় এলাচি-পুরের মিঞা। রাজভক্ত ভোলা নাপিত, নিজের তিন পুত্রকে রাজপুত্র বলিয়া বন্দী করিয়া, তিন জন রাজকুমারকে নিজ পুত্র বলিয়া রক্ষা করিয়াছিল। তাঁহাদের নাম ঠাকুর কালিদাস, ঠাকুর চণ্ডীদাস ও ঠাকুর নরোত্তম। বর্তমান সমস্ত কালিয়াই গোষ্ঠীই এই তিন জনের সন্তান। এইজন্ত ইহাদিগকে নাপিত্রী কালিয়াই বলে।

ঠাকুর কালিদাস, মোগলদিগের বাঙ্গালাদেশ আক্রমণ কালে তাহাদের সাহায্য

করিয়া পৈতৃক রাজত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ছাতকে রাণীদের অপমৃত্যু হেতু কালিদাস সেখানে বাস না করিয়া বাগ নামক স্থানে বাস করিয়াছিলেন। তৎসংশয়েরা অত্ৰাপি সেখানে বাস করিতেছে। ছাতক নগর ঘোর জঙ্গল হইয়াছে। কালিদাসের বংশধরগণ এখন বাগের রায় নামেই পরিচিত।

হরুঠাকুর (হরচন্দ্র চক্রবর্তী) রাজসরকারের পূজারী ব্রাহ্মণ ছিল। সে কাশ্যপগোত্রীয় কষ্টশ্রোত্রিয় রাঢ়ী ব্রাহ্মণ ছিল। ঠাকুর কার্তিক রায়ের ছয় নাস বয়স্ক একটি শিশুপুত্র ছিল। রাণীরা বিষপানের পূর্বে হরুঠাকুরকে ডাকিয়া সেই শিশুর প্রতিপালনের ভার তাহার উপর অর্পণ করিয়াছিলেন এবং তজ্জন্ত প্রচুর টাকা এবং অলঙ্কার হরুঠাকুরকে দিয়াছিলেন। হরুঠাকুর সেই শিশুকে নিজ পুত্র বলিয়া রক্ষা করিয়াছিল এবং তাহার নাম ভবানীপ্রসাদ রাখিয়াছিল। হরুঠাকুরের জ্যেষ্ঠপুত্ররূপেই ভবানীপ্রসাদের উপনয়ন হইয়াছিল এবং রাঢ়ী ব্রাহ্মণের কন্যার সহ তাঁহার বিবাহ হইয়াছিল। হরুঠাকুর মৃত্যুকালে ভবানীপ্রসাদের প্রকৃত পরিচয় প্রকাশ করিয়া তাঁহাকে নিজের শ্রাদ্ধাদি করিতে নিবেদন করিল। ভবানী নিজ পরিচয় শুনিয়া অমনি জমিদার হইতে ব্যগ্র হইলেন। তখন টাকা দ্বারা জমিদারী খরিদের রীতি ছিল না। নবাবের চাকরী ও ডাকাতি এই দুইটি মাত্র উপায়ে তৎকালে জমিদার হওয়া যাইত। ভবানীপ্রসাদ পারসী জানিতেন না, সুতরাং প্রথম উপায় তাঁহার সাধ্য ছিল না। এজন্ত তিনি কতকগুলি অনুচর যোটাইয়া ডাকাতি আরম্ভ করিলেন। তিনি চৌদ্দ বৎসর অবিচ্ছিন্ন ডাকাতি করিয়া সমস্ত পরগণা চাঁদপ্রতাপ অধিকার করিয়া “রাজা ভবানীপ্রসাদ রায়” এই উপাধি ধারণ করিলেন।

এই রাজ্যাভিষেক সময়ে ভবানীপ্রসাদ পণ্ডিতগণকে ব্যবস্থা জিজ্ঞাসা করিলেন যে, “তাঁহার পিতার নাম কি বলিতে হইবে এবং তাঁহার গোত্রাদি কি বলিতে হইবে?” তখন পণ্ডিতেরা পাঁতি দিলেন যে, “হরুঠাকুর যদি নিজের অর্থ দ্বারা তোমাকে পালন করিত, তবে তাহাকেই তোমার পিতা বলা যাইত। কিন্তু সে তোমার পৈতৃক ভৃত্য ছিল এবং তোমারই পৈতৃক অর্থ দ্বারা তোমাকে পালন করিয়াছে ও নিজের জীবিকা নির্বাহ করিয়াছে। সুতরাং তাহাকে চাকর ভিন্ন পিতা বলা যায় না। কিন্তু যখন তোমার উপনয়ন বিবাহাদি রাঢ়ী ব্রাহ্মণ ও কাশ্যপগোত্র বলিয়া সেই বিধানে

হইয়াছে, তখন তুমি কাশ্মপগোত্রীয়া রাঢ়ী ব্রাহ্মণরূপেই গণ্য ।” সেই ব্যবস্থা মতেই অভিষেকাদি যজ্ঞ হইল । সেই রাজা ভবানীপ্রসাদের সন্তানগণ জেলা ঢাকার অন্তর্গত জমিদার—রোয়াইলের রায় ও মহাদেবপুরের রায় । ইহারা রাজা ভবানীর বংশ বলিয়া পরিচিত । এই বংশের উপলক্ষেই লোকে “হারারে মারায় কাশ্মপগোত্রি” বলে । প্রকৃত পক্ষে ইহারা বাংশগোত্রীয় বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ ছিলেন । এখন কাশ্মপগোত্রীয়া রাঢ়ী ব্রাহ্মণ হইয়াছেন ।

বারেন্দ্র ঘটকেরা এই বংশের সম্বন্ধে বলেন, “রাজা দেবীদাসের পুত্র ঠাকুর কান্তিক রায়, তৎপুত্র রাজা ভবানীপ্রসাদ রায় রাঢ়ী ।” আবার রাঢ়ীয় কুলজ্ঞেরা রাজা ভবানীপ্রসাদ ও তাঁহার বংশধরগণের কুলমর্যাদা প্রকাশ করেন, কিন্তু ভবানীপ্রসাদের পিতৃকুলের বা মাতামহকুলের কোন বৃত্তান্ত তাঁহাদের পুথিতে নাই । ভট্ট কবিগণ ঠাকুর কুশলীর বংশ সম্বন্ধে গান করেন যে—

“এক ঘর ভাঙ্গিয়া তার হ’লো সাত বাড়ী ।

তিন ঘর বারেন্দ্র তার দুই ঘর রাঢ়ী ॥

দুই ঘর মুসলমান, নষ্ট অশ্ব জন ।

বসন্ত রায়ের বংশ বঙ্গের ভূষণ ॥”

অত্যাচ্ছ রাজবংশের বংশবৃদ্ধি অতি কম । প্রায়শঃ দত্তক পুত্র দ্বারা বংশ-রক্ষা করিতে হইয়াছে । কিন্তু কালিয়াই গোষ্ঠীর বংশ ধারাবাহিকরূপে বৃদ্ধি হইয়াছে । এখনও কালিয়াই গোষ্ঠীর জমিদারী প্রচুর আছে । কিন্তু বহু গোষ্ঠী জন্ম খুব বড় জমিদার কেহই নাই ।

৭ । শুশুং—সোমেশ্বর নামে একটি বাঙ্গালী ব্রাহ্মণ তপস্বী, শুশুং-হুর্গাপুরে এক কালীমূর্তি স্থাপন করিয়া অর্চনা করিতেন । তাঁহার সেই বিগ্রহের নিকট পূজা দিয়া অনেক লোকের কঠিন ব্যারাম আরাম হওয়ায় পার্শ্ববর্তী লোকেরা তাঁহাকে গুরু বলিয়া মানিত । তাঁহার পুত্র সেই সকল শিষ্যদের সাহায্যে পার্শ্ববর্তী স্থান অধিকার করিয়া রাজা হইয়াছিলেন । সেই সময়ে গারো, কুকি, খসিয়া প্রভৃতি অসভ্য জাতির বাঙ্গালাদেশের সীমান্ত প্রদেশে উৎপাত করিত । শুশুঙের রাজার দ্বারা সেই উৎপাত নিবারণ হইতে পারিবে বিবেচনায়, বাঙ্গালার নবাব তাঁহাকে রাজা উপাধি দিয়া তাঁহার রাজত্ব, ক্ষমতা ও সম্মান বর্দ্ধিত করিয়াছিলেন । তদবধি এই বংশের করদ রাজত্ব বহুদিন পর্য্যন্ত চলিতেছিল ।

ইংরেজ কোম্পানির অধিকার সময়ে লর্ড কর্ণওয়ালিস্ ইহাদের জঙ্গলময় রাজ্য রীতিমত জরিপ করিতে পারেন নাই। তজ্জন্ত ইহাদের লভ্য কিংবা ক্ষমতার বিশেষ হানি হয় নাই। প্রায় ৪০ বৎসর হইল ইংরেজ গবর্ণমেন্ট ইহাদের অধিকৃত পর্বত ও জঙ্গল খাদ করিয়া লইয়াছেন এবং হাতী ধরিয়া বিক্রয় করিবার ক্ষমতা রহিত করিয়াছেন। তদবধি ইহাদের মুনাফা অল্প হইয়াছে এবং ইহারা সাধারণ জমিদারের তুল্য হইয়াছেন। সোমেশ্বর প্রথমে কোন শ্রেণীর ব্রাহ্মণ ছিলেন, তাহা ঠিক বলা যায় না। কিন্তু রাজা হওয়া অবধি বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ সহ বিবাহ আদান প্রদানে বারেন্দ্র শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণরূপে গণ্য হইয়াছেন। ধনবানের কুলমর্যাদা সহজেই বৃদ্ধি হয়। ইহারা বহু কুলকার্য্য করিয়া অতি শ্রেষ্ঠ সিদ্ধশ্রোত্রিয় হইয়াছেন। কুলশাস্ত্রে এই বংশ উদয়াচল এবং আটপাঠী কুলীনের নায়ক বলিয়া খ্যাত।

৮। বাহিরবন্দ—পূর্বে বাঙ্গালী ব্রাহ্মণ ও কায়স্থেরা যেমন বুদ্ধিমান, তেমনি বীর্য্যবান্ বলিয়া গণ্য ছিল। কাঁকিনার রাজারা বারেন্দ্র কায়স্থ। তাঁহাদের পূর্বপুরুষ কোচবেহার রাজ্যের প্রধান সেনাপতি ছিলেন। আর ভুবন সিংহ নামক একজন উত্তররাঢ়ী কায়স্থ, আসাম রাজ্যের প্রধান সেনাপতি হইয়াছিল। রাঙ্গামাটিয়া গোঁরীপুর ভুবন সিংহের চাকরান বা করদ রাজত্ব ছিল। * আসাম ও কোচবেহারের সৈন্তগণ বারংবার বাঙ্গালা দেশের উত্তরপূর্ব

* আসামের নিকট উত্তররাঢ়ী কায়স্থ ছিল না। পূর্বে দূরদেশে বিবাহ আদান প্রদান দুঃসাধ্য ছিল। বিশেষতঃ আদামরাজের সহ বাঙ্গালার নবাব ও বাদশাহের বিবাদ ছিল। এই জন্ত ভুবন সিংহের বংশীয়েরা আসামের কলতা-কায়েত সমাজে মিলিয়াছেন। এই বংশ এখন গোঁরীপুরের রাজা। এই বৃত্তান্ত পূর্বে গোঁরীপুর হইতেই সংগৃহীত হইয়াছিল। এক্ষণে তথাকার রাজবংশের অন্তরূপ ইতিহাস রাজবাড়ীতে পাওয়া যায়। তাহা এই যে, সনাতন লাল নামক একজন মিথিলা দেশীয় দরিদ্র কায়স্থ চাকরীর চেষ্টায় আসিয়া রাঙ্গামাটিয়াতে বাস করিয়াছিলেন। এই স্থান আসাম রাজ্য ও মোগল রাজ্যের সীমান্ত স্থান। এই স্থান আসামী ও কোচদের দৌরাত্ম্য হইতে রক্ষার জন্ত সনাতনের বংশীয়েরা দিল্লীর বাদশাহের নিকট বহু জমি ‘আল্‌তাম গাঃ’ রূপ প্রাপ্ত হন এবং আট পরগণা জমিদারী পাইয়াছিলেন। তাঁহারা বড়ুয়া উপাধি ধারণ করিয়াছেন বটে কিন্তু আসামী কায়েত সহ বিবাহ আদান প্রদান করেন নাই। তাঁহারা বরাবর পশ্চিমা কায়েত সহ বিবাহাদি করেন।

মীমাংস প্রদেশ লুঠপাট করিত। তাহাদের দৌরাখ্য নিবারণ জন্ত গোড় বাদশাহ, জগৎ রায় নামক একজন শ্রোত্রিয় বারেন্দ্র ব্রাহ্মণকে বাহিরবন্দ, ভিতর-বন্দ, পাতিলাদহ ও স্বরূপপুর এই চারি পরগণার করদ রাজা নিযুক্ত করিয়া-ছিলেন। আসামী সেনাপতি বিষ্ণুদেব বড়ুয়া বাহিরবন্দ আক্রমণ করিতে আসিলে, জগৎ রায় দুই বিপ্রদূত সহ তামার টাটে পাঁচটি হরীতকী আশীর্বাদী পাঠাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন যে, “আততায়ী নিবারণ উদ্দেশ্যে ভিন্ন ব্রাহ্মণের সহ যুদ্ধ করিতে কোন হিন্দুর অধিকার আছে কি না?” আসামী পণ্ডিতেরা কহিলেন, “গোড় বাদশাহ মুসলমান, এই রাজ্য তাঁহারই অধিকৃত। ব্রাহ্মণ জগৎ রায় তাঁহার চাকর মাত্র; সুতরাং তাহা লুণ্ঠনে দোষ নাই।” বাদ্দানী পণ্ডিতেরা কহিলেন, “জগৎ রায় চাকর নহেন। তিনি বংশানুক্রমে ভোগ দখলের স্বত্বাধিকারী রাজা। গোড়ের মুসলমান বাদশাহ রাজার নিকট নিদিষ্ট রাজস্ব পান মাত্র। লাভ লোক্‌সান জন্ত ফলভাগী রাজা জগৎ রায় ব্রাহ্মণ। সুতরাং এই রাজ্য লুণ্ঠন করিলে ব্রহ্মস্ব হরণ করা হইবে।” আসামী পণ্ডিতেরা বাদ্দানী পণ্ডিত সহ তর্কে পরাস্ত হইলেন। বিষ্ণুদেব সসৈন্তে ফিরিয়া গেলেন। সেই মীমাংসা শুনিয়া কোচবেহারের রাজাও বাহিরবন্দ আক্রমণ করেন নাই।

ইংরেজ রাজ্যারম্ভের পর বাহিরবন্দ রাজ্য ও রাজবংশ বিলুপ্ত হইয়াছে। এই রাজ্যের শেষ মালিক রাণী সত্যবতীর নিকট হইতে বলিহারের রাজা ভিতর-বন্দ পরগণা পাইয়াছেন। বাহিরবন্দ পরগণা কাশীমবাজারের রাজা পাইয়াছেন। পাতিলাদহ কলিকাতার প্রসন্নকুমার ঠাকুরের এবং স্বরূপপুর রাণী রাসমণির জমিদারী ভুক্ত হইয়াছে।

৯। চন্দ্রদ্বীপ—বল্লালের কায়স্থজাতীয়া এক উপপন্নী-জাত পুত্র কালুরায়কে তিনি চন্দ্রদ্বীপে করদ রাজা নিযুক্ত করিয়াছিলেন। পাঠান কর্তৃক বৈষ্ণবরাজপাট নিশ্চল হইলেও কালুরায়ের সন্তানেরা চন্দ্রদ্বীপে রাজত্ব করিতে-ছিল। তাহারা যবন-রাজধানী গোড় নগর হইতে বহুদূরে ছিল। এজন্য তাহারা পাঠানদিগের সম্পূর্ণ অধীন ও আয়ত্ত হয় নাই। তাহারা কখন নবাবকে কিছু কিছু কর দিত, কখন বা দিত না। নিজ চত্বরে তাহারা সম্পূর্ণ স্বাধীন ছিল। কিন্তু কখন নিজ নামে মুদ্রা ছাপিত না। এই রাজবংশীয়েরা অতিশয় বিত্তোৎসাহী ও দাতা ছিলেন। তাঁহারা বহুসংখ্যক পণ্ডিত ব্রাহ্মণ প্রতিপালন

কম্বিতেন। বাকলা চন্দ্রদীপে এখনও বহল ব্রাহ্মণ পণ্ডিত দেখা যায়। চন্দ্রদীপের রাজবংশই তাহার আদি কারণ। কালুরায় ও তৎবংশীয়েরা বঙ্গজ কায়স্থ-শ্রেণীভুক্ত হইয়াছিলেন। কায়স্থ জাতির মধ্যে ইহারাই প্রথম রাজা, এজন্য ইহার কায়স্থ সমাজে বিশেষ মান্য ছিলেন।

চন্দ্রদীপের রাজা দম্বুজদমন রায় নিঃসন্তান গতাস্থ হইলে তাঁহার ভাগিনের (মতান্তরে তাঁহার দৌহিত্র) পরমানন্দ বম্ব উত্তরাধিকারী হইয়া 'রায়' উপাধি গ্রহণ করিয়াছিলেন। পরমানন্দ মুখ্যরাজ কুলীন কায়স্থ-সন্তান এবং তাঁহার মাতামহকুল বাদলা দেশের সম্রাট-বংশজাত। এই জন্য পরমানন্দের বংশীয়েরা সকল কায়স্থের অগ্রগণ্য সমাজপতি ছিল। এই বংশীয় রাজা রামচন্দ্র রায়ের সহ রাজা প্রতাপাদিত্য কন্যার বিবাহ দিয়াছিলেন। এই বংশীয় কতিপয় ব্যক্তি এখন মাধবপাশা গ্রামে বাস করিতেছেন। কিন্তু তাঁহাদের কোন জমিদারী নাই।

১০। যশোহর—বর্তমান জেলা ফরিদপুরের মহকুমা গোয়ালন্দ মধ্যে চন্দনা নামক একটি পদ্মার শাখানদী আছে। তাহার ধারে চন্দনা নামক একটি সমৃদ্ধ গ্রাম ছিল। সেই গ্রামের নাম হইতেই চন্দনা নদীর নামকরণ হইয়াছে। চন্দনার গুহগোষ্ঠী সাঁতোড়ের রাজাদের প্রজা ও কস্মচারী ছিলেন। এই বংশীয় রামচন্দ্র গুহকে সাঁতোড়রাজ গোপালচন্দ্র (চাঁদ গোপাল) খাস বিশ্বাস বা সদর নায়েব নিযুক্ত করিয়া গোঁড়ে পাঠাইয়াছিলেন। তাহাতে রামচন্দ্র গোঁড় বাদশাহের নিকট পরিচিত ও প্রিয়পাত্র হইয়াছিলেন। তৎপুত্র ভবানন্দ মজুমদার। তাঁহার পুত্র রাজা ভীকাম রায়, রায় বিক্রমাদিত্য ও বসন্ত রায় গোঁড়বাদশাহের সরকারে অতি সম্ভ্রান্ত রাজকীয় মর্যাদা লাভ করিয়াছিলেন। ভীকাম রায় তিন পরগণার রাজা হইলেও তাঁহার বাড়ী সাঁতোড়ের জমিদারী মধ্যে চন্দনা গ্রামে ছিল। গোঁড় বাদশাহ সলিমান চন্দনা তালুক ভীকাম রায়কে জমিদারী স্বত্ত্ব দিতে ইচ্ছুক হইয়াছিলেন। কিন্তু ভীকাম রায় প্রতিপালক ব্রাহ্মণ সাঁতোড়ের রাজার ক্ষতি করিয়া নিজ স্বার্থ সিদ্ধি করিতে সম্মত হন নাই। প্রতাপাদিত্য এই বংশজাত। এই গুহবংশ এবং দিনাজপুরের রাজবংশ প্রায় সমকালীন উন্নত হইয়াছিল। বাদলা কায়স্থ মধ্যে গুহবংশ, চন্দ্রদীপের ও দিনাজপুরের রাজবংশ সর্বাধিক বনিয়াদি। তন্মধ্যে

প্রথম দুইটি বিলুপ্ত হইয়াছে। সেই জন্য দিনাজপুরের রাজবংশই কায়স্থ জাতি মধ্যে এক্ষণে সর্বাপেক্ষা সম্ভ্রান্ত । রায় বিক্রমাদিত্য দাউদ খাঁর মন্ত্রী ছিলেন এবং সম্রাট আকবরের সহ যুদ্ধে নিহত হইয়াছিলেন । যখন সমস্ত বাঙ্গালা ও বেহার মোগল-সম্রাটের হস্তগত প্রায় হইল, তখন বিক্রমাদিত্যের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ভীকাম রায়* ও কনিষ্ঠ বসন্ত রায় দণ্ডিত হইবার ভয়ে, স্বস্থান পরিত্যাগ করিয়া সুন্দরবনে আশ্রয় লইয়াছিলেন । তাঁহারা যে স্থানে গিয়া বাস করিয়াছিলেন, সেই স্থানের নাম “যশোহর” হইয়াছিল ।† সেই যশোহরের নাম হইতেই আধুনিক জেলা যশোরের নাম হইয়াছে । সেই পুরাতন যশোহর এখন জঙ্গলাবৃত । বর্তমান যশোর নগরের পূর্বনাম কশ্বা । ভীকাম রায়, বসন্ত রায় এং বিক্রমাদিত্যের শিশু পুত্র প্রতাপাদিত্য কিছুদিন গুপ্তভাবে সেই জঙ্গল-বেষ্টিত যশোহরে বাস করিয়া মোগল রাজ্যের অবস্থা দেখিতে লাগিলেন । যখন তাঁহারা দেখিলেন যে, মোগলেরা কোন অত্যাচার করিল না অথবা বিক্রমাদিত্যের পরিবারবর্গের কোন অনুসন্ধান করিল না, তখন তাঁহারা সাহস পাইয়া আত্ম-প্রকাশ করিলেন । গোড় নগর যখন মহামারীতে বিধ্বস্ত প্রায় হইল এবং শুবেদার মুনিম খাঁ বিনষ্ট হইলেন, ভীকাম রায় সেই গোলযোগের সময়ে নিজ রাজ্য বিস্তার করিতে লাগিলেন । তখন অর্থ দ্বারা জমিদারী ক্রয় করিবার রীতি ছিল না । গুহবংশীয়েরা বাহুবলে তিন চারি পরগণা দখল করিলেন । ভীকাম রায় ও বসন্ত রায় উভয়েই বিদ্বান্ ও বীর পুরুষ ছিলেন । প্রতাপাদিত্য তাঁহাদের অপেক্ষাও সমধিক বীরত্ব প্রকাশ করিতে লাগিলেন । কিন্তু প্রতাপাদিত্যের বিজ্ঞা অতি অল্প ছিল এবং তিনি নিতান্ত মাতাল ও দুর্বৃত্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন । তিনি যুদ্ধকালে যেমন বীর ছিলেন, অল্প সময়ে তেমনি মাতাল ও লম্পট ছিলেন । কিন্তু ভীকাম রায়ের জীবনে তাঁহার দোষ ও গুণ তত বেশী প্রকাশ হয় নাই ।

কমলখোজা নামক একজন প্রহরী প্রতাপের ধূমধাটের প্রাসাদের সিংহদ্বারে থাকিতেন । প্রবাদ আছে, ধূমধাটের নিকটে মাঠের মধ্যে একটা জঙ্গলে রাত্রি দুই

* হিন্দী ভাষায় ভীষ্ম শব্দের অপভ্রংশে ভীষম বলে । বোধ হয় ভীকাম শব্দটি ভীষ্ম শব্দেরই অপভ্রংশ ।

† লোকে ইঁহাদিগকে সাগর ঘাঁপের রাজা বলিত ।

প্রহরের সময়ে আলো হইয়া উঠিত। কমল খোজা তাহা দেখিয়া বহু অনুসন্ধান করিলেন, কিন্তু কোন কারণ নির্ণয় করিতে পারিলেন না। সেই জঙ্গলে রাখাল বালকেরা গন্ধ চরাইত। একদিন তাহারা সেই স্থানে একটা টিপীর উপর ক্রীড়াচ্ছিলে কেহ কালী সাজিল, কেহ পুরোহিত হইয়া পূজা করিল, কেহ পাঁঠা সাজিল, একজন তাহার হাত পা ধরিল, অগ্র বালক বলিদান ছিলে একগাছা হোগলা দিয়া তাহার গলায় আঘাত করিল। হোগলার আঘাতে গলা দ্বিখণ্ড হইয়া গেল, বালকেরা ভয়ে পলায়ন করিল। কমল খোজা এই সংবাদ পাইয়া প্রতাপাদিত্যের নিকট সেই আলো ও এই আশ্চর্য্য মৃত্যুর কথা জ্ঞাপন করিলেন। প্রতাপ সেই মৃতদেহ সিদ্ধকে বদ্ধ করিয়া রাত্রিতে কমল খোজাকে সঙ্গে লইয়া বনমধ্যে প্রবেশ করিলেন। টিপীর নিকট উপস্থিত হইয়াই উভয়ে মুচ্ছিত হইয়া পড়িলেন। দৈবদেশ পাইলেন,—“এই টিপী খনন করিয়া যে মূর্তি পাইবে, তাহাই তোমার ইষ্টদেবতা। আর সেই রাখাল মরে নাই, সে আপনার জননীর নিকট ঘুমাইয়া আছে।”

রাজা সজ্ঞান হইয়াই গৃহে প্রস্থান করিলেন। প্রথমেই সিদ্ধক খুলিয়া দেখিলেন তাহাতে মৃতদেহ নাই। অনুসন্धानে জানিলেন, রাখাল বালক মরে নাই, তাহার জননীর নিকট ঘুমাইতেছিল। পরদিন প্রাতঃকালে প্রতাপাদিত্য জঙ্গলের ভিতরের টিপী খনন করিতে লোক লাগাইলেন। কিঞ্চিৎ খনন করিলেই একটা শিলাময়ী মূর্তির গলদেশ পর্য্যন্ত বাহির হইল। তখন দেবী আকাশবাণী দ্বারা এই প্রত্যাদেশ করিলেন যে, “আর খনন করিও না। এই থানে মন্দির নিৰ্ম্মাণ করিয়া আমার পূজা কর।” রাজাও আদেশানুরূপ কার্য্য করিলেন। এইরূপে তিনি শিলাদেবীর বিগ্রহ আবিষ্কার করেন। তিনি সেই শিলাদেবীর সম্মুখে নরবলি দিতেন।

প্রতাপাদিত্যের যখন মাতাইশ বৎসর বয়স, তখন তাঁহার জ্যেষ্ঠতাত ভীকাম রায়ের নিঃসন্তানাবস্থায় পরলোক হইল। প্রতাপাদিত্য তখন স্বয়ং রাজগদী দাবী করিলেন। বসন্ত রায় কহিলেন, “ভ্রাতা বিজ্ঞমানে ভ্রাতৃপুত্র দায়াদ হয় না, স্ততরাং প্রতাপ আমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার পুত্র হইলেও রাজগদী তাহার প্রাপ্য নহে, আমার প্রাপ্য।” এই উপলক্ষে উভয়ের বনান্তর হইল। কিন্তু প্রকাণ্ড কোন বিবাদ হইল না। তখনও উভয়েই একানে এক বাড়ীতেই

ছিলেন। প্রতাপ একদিবস রাত্রিতে কতিপয় চুষ্ট অনুচর সহ খুড়ার প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিয়া তাঁহাকে সবংশে নিপাত করিলেন। কেবল বসন্ত রায়ের কনিষ্ঠ পুত্র কাঁচুরায়কে প্রতাপাদিত্যের পত্নী রক্ষা করিয়া তাহার মাতুলালয়ে পাঠাইয়াছিলেন।

প্রতাপাদিত্য সমস্ত সম্পত্তির একমাত্র কর্তা হইয়া দিগ্বিজয়ে ব্রতী হইলেন। তিনি পদ্মা, মেঘনা ও সমুদ্র পর্য্যন্ত সমস্ত জমিদারগণকে নিজের অধীন ও করপ্রদ করিয়াছিলেন। পালে পালে হিন্দু ও মুসলমানগণ তাঁহার সহ যোগ দিতে লাগিল। প্রতাপ যদি সচরিত্র হইতেন, তবে বোধ হয় স্বাধীন রাজা হইয়া থাকিতে পারিতেন। কিন্তু তাঁহার চরিত্রদোষে সমস্ত সৎশক্তিত সৎ লোকেরা তাঁহার পক্ষ ত্যাগ করিতে লাগিল। সমস্ত ব্রাহ্মণ ও কায়স্থেরা গুপ্ত-ভাবে তাঁহার বিপক্ষ হইল। এমন কি, তাঁহার নিজের স্ত্রীপুত্রও তাঁহার মঙ্গল কামনা করিতেন না। প্রতাপ অতিশয় দাতা ছিলেন। অর্থলোভে অতি, নীচজাতীয় নীচ প্রকৃতির লোকেরা তাঁহার একান্ত অনুগত ছিল। তাহাদের সাহায্যে তিনি ব্যাঘ্রের ছায় রাজত্ব করিতেন। তিনি “সুন্দর বনের বাঘ” নামেই প্রসিদ্ধ। তিনি অতীব তেজস্বী ছিলেন। তিনি যাহাকে যাহা আদেশ করিতেন, সে তৎক্ষণাৎ তাহাই করিতে বাধ্য হইত। মনে মনে তাঁহার প্রতি লোকের যত কেন অশ্রদ্ধা থাকুক না, কার্য্যতঃ কেহ তাঁহার কোন কথায় প্রতিবাদ করিত না এবং তাঁহার কোন কার্য্যে বাধা দিত না। লোক-পরিচালকের পক্ষে এইটি সর্ব্বপ্রধান গুণ। এই গুণ-বিশিষ্ট লোকের অগ্র সহস্র দোষ থাকিলেও তাহারা যুদ্ধে ও সামাজিক বিবাদে জয়ী হইয়া থাকে। প্রতাপাদিত্যেরও তাহাই হইয়াছিল। প্রতাপ “সার্বভৌম মহারাজ” উপাধি গ্রহণ করিয়া নিজ নামে মুদ্রা ছাপিয়াছিলেন। তিনি ক্রমে তিন দল মোগল সেনা পরাজয় করিয়া আঠার বৎসর কাল স্বাধীন ছিলেন।

প্রতাপের পদাতিক সৈন্তগণ “ঢালী” সৈন্ত নামে অভিহিত হইত। এই ঢালী সৈন্তের সহায়তার জন্য “অযুত তুরঙ্গস্রীতি” এবং “ষোড়শ হলকাহাতি” ছিল। পদাতিক, অশ্বরোহী এবং গোলন্দাজ এই ত্রিতর সংযোগে উত্তম বাহিনী প্রস্তুত হইয়া থাকে। পদাতিককে রক্ষা এবং শত্রুকে আক্রমণ করিবার পক্ষে অশ্বরোহী বিশেষ কার্য্যকর হইয়া থাকে। যুদ্ধের প্রাক্কালে, যুদ্ধের

মধ্য সময়ে অথবা যুদ্ধের অবসান সময়ে অশ্বারোহীর সাহায্যে সম্পূর্ণ জয়লাভ হইয়া থাকে। অপর পক্ষে পরাজয়ের পর প্রত্যাগমনকালে শত্রুসৈন্যের আক্রমণ হইতে সৈন্যগণকে রক্ষা করিবার পক্ষে অশ্বারোহী সৈন্য একমাত্র আশ্রয়স্থল হইয়া থাকে। প্রতাপাদিত্য বঙ্গীয় সৈন্যকে অজেয় করিবার জন্ত উপযুক্ত পরিমাণে অশ্বারোহী সৈন্য নিযুক্ত করিয়াছিলেন। মহারাজের তোপখানা হস্তীর দ্বারা বাহিত হইত। কবিচূড়ামণি ভারতচন্দ্র বলেন, প্রতাপের “ষোড়শ হলকাহাতি” ছিল। ১৫টা হাতিতে একটা হলকা হয়। ১৪০ টা হাতি মহারাজ প্রতাপাদিত্যের তোপখানা এবং যুদ্ধোপযোগী দ্রব্যসম্ভার বহন করিয়া লইয়া যাইত।

সেকালে বঙ্গদেশে অতি সুন্দর সুন্দর সমুদ্রগামী জাহাজ প্রস্তুত হইত। প্রতাপ পটুগীজদিগের সাহায্যে জাহাজ সকল অধিকতর সুন্দররূপে নিৰ্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। এই সকল রণতরী বায়ুর অনুকূলে বা প্রতিকূলে উভয়দিকে অনায়াসে পালভরে গমনাগমন করিত। এই নদ-নদী-বহুল বঙ্গদেশে প্রতাপ এই সকল রণতরী ও সৈন্য লইয়া যখন মোগলদিগকে অকস্মাৎ আক্রমণ করিতেন, তখন তাঁহার গতিরোধ করা তাহাদিগের সাধ্যাতিত হইত।

প্রতাপের সৈন্যগণ তীর, ধনুক, শড়্‌কী, বন্দুক ব্যতীত আরও দুইটা জিনিস ব্যবহার করিত। কুঠার ও কোদাল প্রত্যেক পদাতিকে সঙ্গে লইতে হইত। যুদ্ধযাত্রাকালে এই কুঠার কুঠীর নিৰ্ম্মাণ ও কাষ্ঠ সংগ্রহ প্রভৃতি পক্ষে সহায়তা করিত। কোদাল সাহায্যে আত্মরক্ষা করিয়া যুদ্ধ করিবার জন্ত পরিখা ও গর্তাদি খননে বিশেষ উপযোগী হইত। যুদ্ধের ইতিহাস পাঠে জানা যায় যে, পরাজিত সৈন্য রাত্রির স্বযোগে শিবিরের চতুর্দিকে গড়খাই করিয়া আত্মরক্ষাপূর্বক স্বযোগক্রমে বিজয়ী শত্রুসৈন্যকে আক্রমণ করিয়া জয়লাভ করিয়াছে।

মহারাজ প্রতাপাদিত্য ও তাঁহার সেনানীগণ যথায় জয় দ্রব্য সিদ্ধান্ত করিতেন তথায় তাঁহারা বিপুল পরাক্রমে শত্রুসৈন্য আক্রমণ করিয়া তাহাদিগকে দলিত ও মথিত করিতেন। যখন তাঁহারা দেখিতেন শত্রুসৈন্যের সাহায্যের জন্য নূতন সেনাদল আগমন করিতেছে তখন তাঁহারা শত্রুসৈন্যের মিলন হইবার পূর্বেই তাহাদিগকে আক্রমণ করিয়া যুদ্ধ করিতেন। শত্রুসেনানীগণ পরস্পর মতভেদ জনিত কলহে প্রবৃত্ত হইলে মহারাজ প্রতাপাদিত্য ও

তাহার সেনানীগণ ক্ষণবিলম্ব না করিয়া যুদ্ধক্ষেত্রে অগ্রসর হইতেন অথবা শত্রুসেনানী মারাত্মক ভ্রমে পতিত হইলে তাহাদিগকে ভ্রমশোধনের অবকাশ প্রদান না করিয়া তাঁহারা শত্রুগণকে আক্রমণ করিতেন। তাঁহারা হঠকারিতার সহিত কখন যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতেন না। প্রতাপ প্রথম প্রথম নিজের মৈন্যের অল্পতা জনিত অভাব ক্ষিপ্ৰগতি দ্বারা দূর করিতেন। বাহরচনা দ্বারা গোলন্দাজের এবং স্থান নির্বীচন করিয়া অশ্বারোহীর অভাব মোচন করিতেন। তাঁহার তীক্ষ্ণ দৃষ্টির কাছে শত্রুদের দুর্বলতা ব্যক্ত হইয়া পড়িত। গুপ্তচর নিয়োগ জয়লাভের একটা প্রধান কারণ। মোগলদিগের সময় গুপ্তচর সকল রাজ্যের দূরতর প্রদেশের ক্ষুদ্রগ্রামে অবস্থান করিয়া সমস্ত সংবাদ সম্রাট সমীপে প্রেরণ করিত। প্রতাপেরও গুপ্তচর সকল ছায়ার ন্যায় অনুসরণ করিয়া সমস্ত কথা তাঁহার নিকট প্রেরণ করিত। এই সকল কার্য্য অতি সুশৃঙ্খলার সহিত সাধিত হইত।

প্রতাপ যখন “মহারাজ” উপাধি গ্রহণ করেন, তখন তিনি পুরোহিতকে বলিলেন, “আমি দেশের রাজা, আমি কাহারও দাস নহি। আমার যজ্ঞ-সংকল্পকালে ‘প্রতাপাদিত্য দেবস্ত’ বলিয়া সংকল্প করাইতে হইবে।” কোন ব্রাহ্মণ তাহাতে সম্মত না হওয়ায় প্রতাপ সমস্ত সমাগত ব্রাহ্মণদিগকে স্নানাহার বর্জিত করিয়া দুই দিন আটক রাখিয়াছিলেন। তাঁহার মাতা, পত্নী, জ্ঞাতি, কুটুম্বগণ প্রতিবাদ করায় তিনি তাহাদিগকে বেত্রাঘাত করিয়া তাড়াইয়া দিলেন। তৃতীয় দিন একজন বৈদিক ব্রাহ্মণ, দেবস্ত বা দাসস্ত না বলিয়া “রায়স্ত” বলিয়া প্রতাপের সংকল্প দিতে চাহিল। প্রতাপ তাহাতেই সম্মত হইয়া রুদ্ধ বিপ্রগণকে মুক্তি দিলেন। এই অবধি তিনি বৈদিক ব্রাহ্মণের ভক্ত হইয়াছিলেন। তিনি কোন শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণকে কোন বৃত্তি বা ব্রহ্মত্র দিতেন না।

প্রতাপাদিত্য সদভিপ্রায়ে চন্দ্রদ্বীপের রামচন্দ্র রায়ের সহ কন্যার বিবাহ দেন নাই। তাঁহার ইচ্ছা ছিল যে, বিবাহের রাত্রে বাসরঘরেই জামাতাকে হত্যা করিয়া তাহার রাজ্য আত্মসাৎ করিবেন এবং নিজেই কায়স্থ সমাজের সমাজপতি হইবেন। প্রতাপের পত্নী স্বামীর দুর্ভিসন্ধি জানিতে পারিয়া জামাতাকে রমণীবেশে পলায়নের সুবিধা করিয়া দিয়াছিলেন। প্রতাপ ঘাতুকগণ সহ বাসর ঘরে গিয়া জামাতাকে না দেখিয়া, কন্যার চক্রান্তে জামাতা পলাইয়াছে মনে করিয়া, সেই কন্যাকে হত্যা করিয়াছিলেন।

প্রতাপ নিজসহোদরা ভগিনীর সপত্নী দয়াময়ী দাসীকে পরম সুন্দরী নবযুবতী বিধবা দেখিয়া তাহাকে বলাৎকার করিয়াছিলেন এবং তাহাকে নিকা করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন । পুরোহিত মন্ত্রপড়াইতে অস্বীকার করায়, প্রতাপ ক্রুদ্ধ হইয়া কহিলেন, “তোমরা সংকল্প দিতে বল কায়স্থেরা শূদ্র, কিন্তু বিবাহ দিতে ব্রাহ্মণের ব্যবস্থা কায়স্থে খাটাইতে চাও কেন? বিধবাবিবাহ এবং ভগিনীর সতীনকে বিবাহ করা শূদ্রের পক্ষে নিষিদ্ধ নহে । এই বিবাহ তোমায় অবশ্যই দিতে হইবে, নতুবা তোমাকে কুকুরের কাণ চাটাইব।” প্রতাপ পুরোহিতকে আটক রাখিলেন । তাঁহার জ্ঞাতি কুটুম্ব সকলেই অসন্তুষ্ট হইল, কিন্তু ভয়ে কেহ প্রকাশে প্রতিবাদ করিতে পারিল না । এদিকে দয়াময়ী লোকগঞ্জনা সহ করিতে না পারিয়া আত্ম-হত্যা করিল । কাজেই পুরোহিত মুক্তি পাইলেন । কিন্তু দয়াময়ীকে যাহারা নিন্দা করিয়াছিল, প্রতাপ তাহাদিগকে কঠিন দণ্ড দিয়াছিলেন । এই সকল কার্য দ্বারা প্রতাপাদিত্য সমস্ত সং লোকের বিরাগভাজন হইয়াছিলেন ।

প্রতাপ প্রথমে সকলের প্রিয়পাত্র ছিলেন, পরে নানারূপ অত্যাচার ও কদাচার দ্বারা সমস্ত সজ্জনের অপ্রিয়, স্তত্রাং দেবতারও অপ্রিয় হইয়াছিলেন । কতকগুলি বাগ্দি, চণ্ডাল ও নিম্ন শ্রেণীর মুসলমান তাঁহার একান্ত অনুগত ছিল । প্রতাপ তাহাদের সাহায্যে নিজ বাহুবলে সকলকে বাধ্য রাখিয়াছিলেন ।

এদিকে কাঁচু রায় বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া সম্রাট জাইংগীরের নিকট প্রতাপাদিত্যের বিরুদ্ধে অতিবাদ করিলেন । সম্রাট প্রতাপাদিত্যকে দমন করিবার নিমিত্ত রাজা মানসিংহকে বাঙ্গালায় পাঠাইলেন । মানসিংহ দূত দ্বারা প্রস্তাব করিলেন যে, “প্রতাপ অর্দ্ধরাজ্য কাঁচুরায়কে ছাড়িয়া দেন এবং সম্রাটের অধীনতা স্বীকার করিয়া জমিদার রূপে অর্দ্ধরাজ্য ভোগ করেন।” প্রতাপ সেই প্রস্তাব অগ্রাহ্য করায় যুদ্ধ হইল । প্রবাদ আছে, মানসিংহের সহ যুদ্ধের সময়ে প্রতাপ শঙ্কটে পড়িয়া শিলাদেবীর নিকট স্তব করিয়াছিলেন ; কিন্তু দেবী তাহা শুনিলেন না, রুষ্ট হইয়া মুখ ফিরাইলেন ।*

* শিলাদেবীর মুখ বামদিকে একটু বক্র আছে । ভারতচন্দ্রও লিখিয়াছেন—

“অভয়া যশোরেশ্বরী ।

পাপেতে ফিরিয়া, বসিলা রুখিয়া,
তাহারে অকৃপা করি ।”

প্রতাপাদিত্য অসাধারণ বিক্রমে যুদ্ধ করিয়াও পরাস্ত হইলেন। অমনি সমস্ত সম্রাট লোকেরা কাঁচুরায়ের সহ যোগ দিল। অবশিষ্ট নীচ জাতীয় লোকেরা ছিন্ন ভিন্ন হইয়া পলায়ন করিল। প্রতাপ সুন্দরবন মধ্যে পলায়ন করিলেন। উদয়পুরের রাণা প্রতাপ সিংহের ছায়, বঙ্গের প্রতাপও দীর্ঘকাল যুদ্ধ চালাইয়া অবশেষে নিজরাজ্য উদ্ধার করিতে পরিতেন; কিন্তু রাণাদিগের অনুচরেরা যেরূপ একান্ত রাজভক্ত ছিল, প্রতাপের দুঃচরিত্রতা হেতু তদীয় অনুচরেরা তাঁহার তেমন ভক্ত ছিল না। বরং তাঁহার জ্ঞাতি শত্রুরা তাঁহাকে বন্দী করিয়া দিল। রাজা মানসিংহ প্রতাপকে লৌহ পিঞ্জরে বদ্ধ করিয়া দিল্লী লইয়া যাইতেছিলেন; পথিমধ্যে ৪৯ বৎসর বয়সে প্রতাপাদিত্য বীরলীলা সংবরণ করিলেন।

মানসিংহ প্রতাপাদিত্যের সমগ্র রাজত্ব কাঁচু রায়কে দেন নাই। ভীকাম রায়ের মৃত্যুকালে তাঁহাদের যে জমিদারী ও যে মালগুজারী ছিল, তাহাই কাঁচু রায়কে দিয়াছিলেন। স্বদেশে যাইবার সময়ে মানসিংহ যশোহরের শিলাদেবীকে লইয়া গিয়া অম্বরে প্রতিষ্ঠিত করেন। সেই শিলাদেবী এখনও বিদ্যমান আছে। দেবার সেবার জন্ত মানসিংহ দশঘর পূজারীও লইয়া গিয়াছিলেন। তাঁহারা সকলেই বৈদিক শ্রেণীর ব্রাহ্মণ। এখনও তাঁহাদের বংশধরেরা শিলাদেবীর পূজা করিতেছেন। মানসিংহ শিলাদেবীকে লইয়া আসিলে কাঁচু রায় আর একটা প্রতিমা নির্মাণ করাইয়া যশোহরে প্রতিষ্ঠিত করিলেন। ধুমঘাটের দেবালয়ে আজও সেই প্রতিমা বর্তমান আছে।

যশোহরের যুদ্ধ সময়ে ভবানন্দ মজুমদার নামক একজন রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ রাজা মানসিংহের রসদ যোগাইয়া বাগোয়ান পরগণার জমিদারী পুরস্কার পাইয়াছিলেন। নদীয়ার রাজবংশ তাঁহারই সন্তান। বাঙ্গালাদেশে সংস্কৃত বিদ্যার উন্নতি সাধনে এই রাজবংশ অতি প্রসিদ্ধ।*

১১। দিনাজপুর—রঙ্গপুর জেলায় বর্দ্ধনকুঠার রাজারা অতি পুরাতন জমিদার। ইহারা বারেন্দ্র কায়স্থ। কিন্তু ইহাদের রাজোপাধি মুসলমান বা

* প্রতাপাদিত্য নাটকে ভবানন্দ মজুমদারকে প্রতাপাদিত্যের দেওয়ান এবং বিধাসভাতক বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে, তাহা সম্পূর্ণ মিথ্যা। এরূপ জঘন্য মিথ্যা বর্ণনা দ্বারা নবদ্বীপের প্রসিদ্ধ রাজবংশের কলঙ্ক করা অতীব দুঃখ।

ইংরেজ গবর্ণমেন্ট জানিত নহে। ইহাদের প্রচুর সম্পত্তি বা বিক্রম ছিল না। ইহাদের কোন প্রসিদ্ধ কীর্তি নাই, এজন্য ইহাদিগকে বারভূঁইয়া মধ্যে গণ্য করা হয় না। দেবকীনন্দন ঘোষ নামে একজন উত্তররাঢ়ী কুলীন কায়স্থ, এই বর্দ্ধন-কুঠার রাজার চাকরী করিতেন। তাঁহার পুত্র হরিরাম, নামান্তরে দিনরাজ ঘোষ কল্যাণী নামে একটি যুবতীকে বিবাহ করিয়া গোড়বাদশাহ গণেশনারায়ণ খাঁর প্রিয়পাত্র হইয়াছিলেন। কল্যাণীর উৎপত্তি সম্বন্ধে তিনটি বিভিন্ন বিবরণ পাওয়া যায়।

(১) কল্যাণী এক সন্ন্যাসীর পালিতা কন্যা। তাহার পূর্বপুরুষের কোন বৃত্তান্ত জানা যায় না। সন্ন্যাসীর অনুরোধে সম্রাট্ গণেশ, দিনরাজকে কর্মচারী নিযুক্ত করিয়াছিলেন। দিনরাজ স্বীয় গুণে সম্রাটের প্রিয়পাত্র এবং উন্নত পদস্থ হইয়াছিলেন।

(২) কল্যাণী, সম্রাট্ গণেশ খাঁর দাসীগর্ভজাতা কন্যা। গণেশ তাহাকে হরিরামের সহিত বিবাহ দিয়া, দিনরাজ ঘোষ নাম দিয়া উচ্চ রাজকার্য্যে নিযুক্ত করিয়াছিলেন।

(৩) কল্যাণী বর্দ্ধনকুঠার রাজা আজাবলের কন্যা। তাহাকে বিবাহ করিয়া হরিরাম বর্দ্ধনকুঠার জমিদারীর সাত আনা অংশ পাইয়াছিলেন। তাহার পর গোড়বাদশাহের চাকরী করিয়া উন্নত হন।

কিন্তু ইহা নিশ্চিত যে, কল্যাণীর কল্যাণেই দিনরাজের উন্নতির সোপান হইয়াছিল। তিনি ক্রমে ক্রমে সম্রাট্ যদুনারায়ণ খাঁর পেঙ্কার হইয়াছিলেন। যত্ন মুসলমান ধর্ম্ম অবলম্বন করিলে দিনরাজ কর্ম্ম এস্তাফা দিলেন। যত্ন কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি বিনীতভাবে কহিলেন, “মহারাজ যত দিন ব্রাহ্মণ গুরু ছিলেন, তত দিন আমি হুজুরকে দেবতা জ্ঞানে সেবা করিয়াছি। এখন আপনি স্পর্শ করিলে আমার অঙ্গজল নষ্ট হইবে। সে কথা আমি বলিতে পারিব না। সুতরাং আমার দূরে থাকাই উচিত।” যত্ন সেই কথা শুনিয়া লজ্জিত হইয়া কহিলেন, “তোমার মত বিশ্বস্ত ও সুযোগ্য লোককে আমি ত্যাগ করিতে পারি না। তুমি দূরে থাকিতে চাও, আমি তাহাই করিতেছি। আমি তোমাকে উত্তর বাঙ্গালার নবাব নিযুক্ত করিলাম। তুমি নবাব ও সেনাপতি হইয়া পার্শ্বত্যা জাতির উৎপাত হইতে সেই দিক্ রক্ষা কর।” এই নবাবী প্রাপ্তি

অবধি দিনরাজের ঘোষ উপাধি লুপ্ত হইয়া রায় উপাধি হইল। দিনরাজ যেখানে গিয়া বাস করিয়াছিলেন, তাহারই নাম “দিনরাজপুর” হইয়াছিল। উত্তর বাঙ্গালার লোক শব্দের আত্ম “র”কার উচ্চারণ করে না। এজন্য তাহারা ঐ স্থানকে দিন-আজ-পুৰ বলিত। তাহা হইতেই দিনাজপুর জেলার নাম হইয়াছে। সেই স্থান বর্তমান দিনাজপুর সহর হইতে প্রায় দশ ক্রোশ উত্তরে ছিল।

দিনরাজের পর তৎপুত্র শুকদেব রায় নবাব হইয়াছিলেন। কিন্তু তিনি সর্বদা বিপদগ্রস্ত ছিলেন, তজ্জন্ত সুখী হইতে পারেন নাই। কোচবেহারের মহারাজ অতি প্রবল হইয়া বারংবার দিনাজপুর রাজ্য লুণ্ঠ করিয়াছিলেন। অবশেষে রাজধানী দিনাজপুর লুণ্ঠ করিয়া অগ্নি দ্বারা ভস্মীভূত করিয়াছিলেন। কালাপাহাড়ের ভয়ে শুকদেব জঙ্গল মধ্যে লুকায়িত থাকিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। তাঁহার বৃদ্ধ বয়সে মোগলেরা বাঙ্গালাদেশ অধিকার করিলে, মোগল ও উজ্জ্বক সর্দারেরা দিনাজপুর প্রদেশের দক্ষিণভাগে বহুদূর পর্য্যন্ত আপনাদের জাগীরভুক্ত করিয়া লইয়াছিল। ফলতঃ শুকদেবের অধিকৃত স্থান অল্প ছিল, শত্রু অনেক ছিল, সুতরাং অবস্থা মন্দ ছিল।

তদভাবে তৎপুত্র প্রাণনাথ রায় কোন সনন্দ না লইয়া স্বকৃত নবাব হইলেন। তিনি ভাগ্যবান লোক ছিলেন। তিনি সৈন্ত বৃদ্ধি করিয়া কোচদিগকে পরাজয় করিয়া নিজ এলাকার উত্তর ভাগ পুনরায় অধিকার করিয়াছিলেন। মোগল ও উজ্জ্বক সর্দারগণ বিদ্রোহ অপরাধে জাগীর হইতে বিচ্যুত হইলে, প্রাণনাথ, কতক পরগণা শুকদেবের সনন্দ ক্রমে, কতক বা বলপূর্ব্বক নিজ এলাকাভুক্ত করিয়াছিলেন। জেলা দিনাজপুর সম্পূর্ণ, এবং রঙ্গপুর, বগুড়া, রাজসাহী, মালদহ ও পূর্ণিয়া এই পাঁচ জেলার কতক অংশ তাঁহার শাসনাধীন ছিল। তিনি নবলক্ষের রাজ্য বলিয়া বিখ্যাত অর্থাৎ তাঁহার বার্ষিক মুনাফা নয় লক্ষ টাকা ছিল। যখন সমস্ত জিনিষ শান্তা ছিল, যে সময়ে কোচবেহারের মহারাজের মোট রাজস্ব সাড়ে তিন লক্ষ টাকা ছিল, সেই সময়ে প্রাণনাথ রায়ের নয় লক্ষ টাকা লভ্য থাকায় বোধ হয় তিনিই তখন বাঙ্গালা দেশের মধ্যে সর্বপ্রধান জমিদার ছিলেন।

নবাব প্রাণনাথ রায় যে স্থানে কোচসেনা পরাজয় করিয়াছিলেন, সেই স্থানেই রাজধানী করিয়াছিলেন। সেই স্থানের নাম তিনি “বিজয়নগর”

রাখিয়াছিলেন। কিন্তু দিনাজপুরের নবাবের বসতি জন্ত ঐ স্থানের নামই দিনাজপুর হইয়াছিল। তাহাই বর্তমান দিনাজপুর সহর। পুরাতন দিনাজপুর কান্তনগরের নিকটে ছিল।

কোচদিগের সহ প্রাণনাথের বিবাদ সর্বদা চলিতেছিল। তজ্জন্ত বোধ হয় সৈনিক ব্যয়ও প্রচুর পড়িত। রাজা মানসিংহ সহ কোচবেহারাধিপতির যুদ্ধোত্তম হইলে নবাব প্রাণনাথ রায়, ঠাকুর ভানুসিংহের ও রাজা মানসিংহের সমস্ত রসদ যোগাইয়াছিলেন এবং সৈন্য দ্বারাও সাহায্য করিয়াছিলেন। পরে যখন মহারাজ লক্ষ্মীনারায়ণ সহ মানসিংহের সন্ধি ও কুটুম্বিতা হইল, তখন রাজা মানসিংহ প্রাণনাথকে তাঁহার শাসনাধীন স্থানের করদ রাজা বলিয়া সনন্দ দিলেন এবং কোচবেহারাধিপতির সহ রাজা প্রাণনাথের পাগড়ী বদল করাইয়া উভয়ের বন্ধুতা করাইয়া দিলেন। তদবধি দিনাজপুর ও কোচবেহারের রাজবংশে বরাবর বন্ধুতা চলিয়া আসিতেছে। এই সন্ধি হওয়ার পর রাজা প্রাণনাথের আর কোন প্রবল শত্রু থাকিল না। সুতরাং তিনি দান বিতরণ, জলাশয় খনন ও দেবমন্দির নিৰ্ম্মাণ প্রভৃতি বহু সংকল্পে প্রচুর ব্যয় করিয়াও যথেষ্ট টাকা সংস্থান করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

প্রাণনাথ রায়ই সর্বপ্রথমে ভূমিতে বংশানুক্রমিক স্বত্ববান রাজা বলিয়া সনন্দ পাইয়াছিলেন। তাঁহার পিতা পিতামহ কেবল নবাব অর্থাৎ অস্থায়ী শাসনকর্ত্তা মাত্র ছিলেন। সংস্কৃত ভাষায় দিনাজপুরের ইতিহাসে হরিরাম ঘোষের নবাবী প্রাপ্তি অবধিই তাঁহাকে ও তৎপুত্র শুকদেব রায়কে রাজা বলিয়া লিখিত হইয়াছে। কোন হিন্দু বড় লোক উজির, দেওয়ান, নবাব বা ফৌজদার নিযুক্ত হইলে তাঁহাকে রাজা বলিবার রীতি ছিল। আর বৃহৎ জমিদার—যাঁহার গবর্ণমেন্টে রাজা উপাধি নাই, তাঁহাকেও রাজা বলিবার রীতি ছিল।* বোধ হয় সেই রীতি-ক্রমেই সংস্কৃত ইতিহাসে প্রাণনাথের পূর্ববর্ত্তী নবাবদিগকেও রাজা বলিয়া লেখা

* রাজারা ভূমিতে স্বত্ববান মালিক আর নবাবেরা বেতনভোগী অস্থায়ী চাকর মাত্র। এজন্ত ‘নবাব’ উপাধি হইতে ‘রাজা’ উপাধি বরাবর সমধিক সম্মানিত ছিল। মোগল সম্রাজ্যের শেষ ভাগে নবাবেরা প্রকৃতপক্ষে স্বাধীন হইলেন, কিন্তু তাঁহাদের উপাধি নবাবই থাকিল। তখন অনেক রাজা সেই নবাবদের অধীন থাকায় নবাব উপাধি রাজা উপাধি অপেক্ষা উচ্চতর হইল।

হইয়াছে। কিন্তু তাঁহার বাদশাহী সনন্দ প্রাপ্ত রাজা ছিলেন না। মানসিংহ জাহাঁগীর বাদশাহের নিকট যে কৈফিয়ৎ দিয়াছিলেন, তাহাতে তিনি স্পষ্ট জানাইয়াছেন যে, রাজস্ব বৃদ্ধি ও সুশাসন জন্য দিনাজপুরের নবাবকে সেই প্রদেশের রাজা নির্বাচন করা হইয়াছে। প্রাণনাথের রাজত্ব গঙ্গার ধার হইতে কোচবেহার পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল এবং মালগুজারী একলক্ষ টাকা মাত্র ছিল।

প্রাণনাথ রায়ের পুত্র রাজা রামনাথ রায় অতি ভাগ্যবান লোক ছিলেন। তিনি জঙ্গল মধ্যে প্রচুর টাকা পাইয়া সম্পত্তি আরো বৃদ্ধি করিয়াছিলেন। সম্রাট জাহাঁগীর ও শাহজাহান, মানসিংহ কৃত বন্দোবস্তে কোন আপত্তি করেন নাই। ঔরঙ্গজীব সম্রাট হইয়া রাজা রামনাথকে দিল্লীতে তলপ করিয়াছিলেন এবং তাঁহার রাজত্ব প্রাপ্তির কারণ জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। রাজা কহিলেন, “দিনাজপুর প্রদেশের অবস্থা অতিমন্দ। তাহা হইতে লক্ষ টাকা মালগুজারী কদাচ শুবাদারের নিকট ইর্শাল হইত না। শুবাদার আমাকে স্থায়ী স্বত্ব দিয়া মালগুজারী অতিশয় বেশী করিয়াছেন, তাহা দেওয়া আমার পক্ষে অত্যন্ত কষ্টকর হইয়াছে।” যে সকল কারণে রামনাথের আয় বৃদ্ধি ও ব্যয় কম হইয়াছিল, সম্রাট তাহা জানিতে পারিলেন না। তিনি আমদানী বহিতে দেখিলেন যে, মানসিংহ কৃত বন্দোবস্তের পূর্বে দিনাজপুর প্রদেশ হইতে কখন ত্রিশ হাজার টাকার বেশী ইর্শাল হয় নাই। সুতরাং এই বন্দোবস্তই লাভজনক জানিয়া সম্রাট তাহাই স্থির রাখিলেন এবং সনন্দ ও খেলাত দিয়া রামনাথকে বিদায় করিলেন। রামনাথ দিল্লী যাওয়া কালে পথিমধ্যে বৃন্দাবনে মানস করিয়াছিলেন যে, নিজের রাজত্ব স্থায়ী থাকিলে তিনি বৃন্দাবনের মন্দির অপেক্ষা উত্তম মন্দিরে রাধাকৃষ্ণ বিগ্রহ স্থাপন করিবেন। সেই প্রতিজ্ঞা মত রাজা রামনাথ রায়, মন্দির সমাপ্ত করিয়া বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। এই বাঙ্গালী মন্দির এই রাজবংশের একটি মহাকীর্তি এবং বাঙ্গালী শিল্পের একটি উৎকৃষ্ট নিদর্শন। সন ১৩০৩ সালের ভূমিকম্পে এই মন্দির স্থানে স্থানে ভাঙ্গিয়া গিয়াছে।

দেওয়ান মুর্শিদকুলী খাঁ রাজা রামনাথের মালগুজারী বৃদ্ধি ও ক্ষমতা হ্রাস করিয়াছিলেন। মালগুজারী বাকীর জগু রাজার ভ্রাতা কুমার রাধানাথ রায়কে ধরিয়া মুসলমান ধর্মগ্রহণে বাধ্য করিয়াছিলেন। তিনি মুসলমান হইলে বাকী রাজস্ব মাফ হইল এবং তিনি পূর্ণিয়া জেলার অন্তর্গত সূর্য্যপুর পরগণা জমিদারী

রূপে পাইলেন। কৃষ্ণগঞ্জের মুসলমান রাজারা সেই রাধানাথ রায়ের বংশধর।

রাজা রামনাথের পুত্র বৈষ্ণনাথের সহ নাটোরের প্রথম রাজা রামজীবনের বিবাদ ঘটিয়াছিল। কিন্তু রামজীবনের ভ্রাতা রঘুনন্দন সহ রাজা বৈষ্ণনাথের বন্ধুতা হওয়ায় বিবাদ মীমাংসা হইয়াছিল। রাজা বৈষ্ণনাথের সহ পুনরায় কোচবেষ্ণরের মহারাজার বন্ধুতা হইয়াছিল। বৈষ্ণনাথের রাজত্বকালে নবাব মীরকাশিম, রাজার মালগুজারী বৃদ্ধি করিয়াছিলেন। পরিশেষে লর্ড কর্ণওয়ালিস্ রাজস্ব অত্যন্ত বৃদ্ধি করেন এবং সর্বপ্রকার ক্ষমতা রহিত করেন। তদবধি দিনাজপুরের রাজা সাধারণ জমিদার-শ্রেণীভুক্ত হইয়াছেন।

রাজা বৈষ্ণনাথের পুত্র রাজা রাধাকান্ত নিতান্ত নিরীক্ষ ছিলেন, তজ্জন্ত লোকে তাঁহাকে “গাধাকান্ত” বলিত। তাঁহারই সময়ে একটি পরগণা ভিন্ন সমস্ত জমিদারী নীলাম হইয়াছিল। গাধাকান্ত ঘরে বাহিরে সর্বজন কর্তৃক তিরস্কৃত হইয়া সংসার ত্যাগ করতঃ গঙ্গাবাস করিতে গিয়াছিলেন। তৎপুত্র গোবিন্দনাথ নাবালক থাকায় সুযোগ্য অভিভাবকেরা বিবিধ উপায়ে অধিকাংশ সম্পত্তি পুনরায় উদ্ধার করিয়াছিলেন। তাহাই এ পর্য্যন্ত আছে। তিন ঘর বুনিয়াদি কায়স্থ রাজবংশ মধ্যে চন্দ্রদীপের ও চন্দনার (ষশোহরের) রাজবংশ বিলুপ্ত হইয়াছে। একমাত্র দিনাজপুর রাজবংশই বিদ্যমান আছে, তজ্জন্ত কায়স্থ সমাজে এই রাজবংশের সম্মান সর্বাপেক্ষা অধিক।

১২। রাজসাহী—কেদারেশ্বর মুখটি নামক একজন বংশজ রাঢ়ী ব্রাহ্মণ বৈষ্ণব মতাবলম্বী ছিলেন। তাঁহার পুত্র লালারামগোবিন্দ, গোড় বাদশাহের খাসমুনসী হইয়া রাঢ়দেশে রাজসাহীদিগর নামে চারি পরগণা একত্র করিয়া একচাকলারূপে পাইয়াছিলেন। তাঁহার রাজা উপাধি হইয়াছিল। সাঁওতাল, ধান্ধড় ও চুহাড়দিগের আক্রমণ নিবারণ জন্ত ইহাদের সৈন্ত রাখিতে হইত, এজন্ত ইহাদের বৃহৎ জমিদারীর রাজস্ব অতি কম ছিল। এই রাজবংশ ধনবান্ এবং পরাক্রান্ত ছিল। ইহাদের স্থাপিত কালীমন্দির দৃষ্টে অনুমান হয় যে রাজা হওয়ার পর ইহারা সর্বথা বৈষ্ণব ছিলেন না। কালাপাহাড়ের দৌরাঘাট ইহারা জঙ্গলে পলাইয়াছিলেন। মোগল রাজ্যারম্ভে ইহারা পুনরায় পূর্ব জমিদারী পাইয়াছিলেন। ইহারা আপনাদিগকে রাঢ়ী ব্রাহ্মণ বলিতেন। কিন্তু

রাঢ়ী ব্রাহ্মণেরা তাহা স্বীকার করিতেন না। ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়েরা কখন “লালা” উপাধি ধারণ করিতেন না। এই বংশের লালা উপাধি দ্বারাই স্পষ্ট জানা যায় যে, ইহারা সূত্রাক্ষণ মধ্যে গণ্য ছিলেন না। অথচ ইহারা দরিদ্র রাঢ়ী ব্রাহ্মণের কন্যা ক্রয় করিয়া বিবাহ করিতেন এবং তদুপ রাঢ়ী ব্রাহ্মণের পুত্রসহ নিজ কন্যার বিবাহ দিতেন। এই বংশীয় রাজা উদয়নারায়ণ, মুর্শিদকুলী খাঁর অত্যাচারে রাজ্যচ্যুত হইলে তাহাদের জমিদারী ও রাজা উপাধি নাটোর রাজবংশের প্রতীক্ৰাতা রামজীবন রায় প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ইহাই নাটোর রাজবংশের প্রথম সম্পত্তি জ্ঞাত নাটোরের রাজাদিগকে রাজসাহীর রাজা বলে।

* * * * *

এই বার ভূঁইয়ার সঙ্গে সঙ্গে তিনটি মুসলমান সর্দারের উল্লেখ দেখা যায়; যথা,—(১) ডুমরাই, (২) ভাওয়াল, (৩) আটরা। তাহাদের বিবরণ এই যে,—

(১) ডুমরাই।—নবাব তোগবলবেগ পূর্ববঙ্গ অধিকার করিলে, নাজিরুদ্দীন গিলজীকে পূর্বদক্ষিণ বাঙ্গালার শরীক নিযুক্ত করিয়া ডুমরাই ও নখিলা এই দুই পরগণা জাগীর দিয়াছিলেন। এই বংশীয়েরা বহুকাল যশোর ও ফরিদপুরের কতক অংশে জাগীরদার ও জমিদাররূপে প্রভুত্ব করিয়াছিলেন। অবশেষে ইহাদের সমস্ত সম্পত্তি সীতারাম রায় দখল করিয়াছিলেন।

(২) ভাওয়াল।—বৈদ্য রাজবংশ নিঃশেষ সময়েই ফজলগাজী নামক এক জন মুসলমান সর্দার ভাওয়াল পরগণা জাগীর পাইয়াছিল। এই বংশীয়েরা অতিশয় গৌড়া মুসলমান ছিল এবং প্রায় কেহই লেখা পড়া জানিত না। জয়দেবপুরের রাজবংশের পূর্বপুরুষগণ ইহাদের বংশানুক্রমে দেওয়ান ছিলেন। সূযোগ্য মুসলমান না পাওয়ায় ইহারা অগত্যা হিন্দু কর্মচারী রাখিয়াছিল। মোগল অধিকারে ইহাদের জাগীরে রাজস্ব ধার্য হওয়ায় ইহারা জমিদার হইয়াছিল। মুর্শিদকুলী খাঁর আমলে বাকি রাজস্ব জ্ঞাত ইহাদের জমিদারী নীলাম হওয়ায়, জয়দেবপুরের রাজাদের পূর্বপুরুষ তাহা খরিদ করিয়া “রায়” উপাধি গ্রহণ করেন। এই পরগণায় অধিকাংশ জঙ্গল ছিল। ক্রমে ক্রমে অধিকাংশ জঙ্গল পরিকৃত হইয়া বসতি হওয়ায় এবং কাষ্ঠের মূল্য বৃদ্ধি হওয়ায় এই পরগণার মুনাফা অত্যন্ত বৃদ্ধি হইয়াছে। তজ্জ্ঞাত এখানকার জমিদার ক্রমশঃ রাজা উপাধি পাইয়াছেন। নীলকরদের সহ রীতিমত যুদ্ধ করিয়া এই রাজবংশ

অতিশয় সুখ্যাতি লাভ করিয়াছেন । এই বংশের বদান্ততাও প্রসিদ্ধ ।

(৩) আটিয়া—বর্তমান জেলা মৈমনসিংহ মহকুমা টাঙ্গাইলের অন্তর্গত পরগণা আটিয়া একজন মুসলমান ফকীরের জাগীর ছিল । সেই পরগণার মধ্যে বাথুলির বিশ্বাসগণ সম্ভ্রান্ত তালুকদার ছিলেন । সেই বিশ্বাসদের বাটিতে “কচুয়া” নামে একটি দরিদ্র মুসলমান বালক গোরুর রাখালী করিত । রৌহার ভুবনেশ্বর ভট্টাচার্য্য সেই বিশ্বাসদিগের মিত্র এবং জ্যোতির্বিদ পণ্ডিত ছিলেন । তিনি কচুয়াকে দেখিয়া তাহার স্বলক্ষণ দৃষ্টে বলিলেন যে, “এই বালক রাজা হইবে । যদি বিশ্বাসেরা এখন ইহার উপকার করেন, তবে কচুয়া ও তৎসংশ্লিষ্ট জমিদার দ্বারা বিশ্বাসদের বহু প্রত্যুপকার হইবে ।” বিশ্বাসেরা এই কথা বিশ্বাস করিয়া কচুয়াকে পারসী পড়িতে দিল এবং নিজব্যয়ে তাহাকে এবং তাহার জননীকে পালন করিতে লাগিল । কচুয়া পারসী শিখিলে তাহার নাম “কচে আলি” হইল । কচে আলি আটিয়ার ফকীরের চাকরী পাইল । ফকীরের অন্তিম সময়ে সে এবং তাহার মাতা ফকীরের যথাসাধ্য সেবা শুশ্রূষা করায় ফকীর তাঁহার সমস্ত সম্পত্তি কচে আলি ও তাহার মাতাকে দিয়াছিলেন । কিন্তু বাদশাহী সচিব কচে আলিকে নিজের জাগীর ভোগ করিতে না দিয়া পরগণার উপর মালগুজারী ধাৰ্য্য করিলেন । তদবধি কচে আলি জমিদার হইয়া খাঁ উপাধি ধারণ করিলেন এবং বাথুলির বিশ্বাসদিগকে প্রধান কার্য্যকারক নিযুক্ত করিলেন । মোগল সম্রাট্‌দের অধীনে কচে আলি খাঁর সম্ভ্রানেরা ফৌজদার ও মনসবদার ছিলেন এবং আটিয়া পরগণার সীমা প্রচুর বৃদ্ধি করিয়াছিলেন । মুর্শিদকুলী খাঁর কঠোর মালগুজারী বন্দোবস্তে বাঙ্গালা ও বেহারের প্রায় সমস্ত মুসলমান জমিদারেরই জমিদারী নীলাম হইয়া গিয়াছিল ; কিন্তু বাথুলির বিশ্বাসদের প্রযত্নে আটিয়ার জমিদারের সম্পত্তি রক্ষা পাইয়াছিল । দেলত্‌য়ারের মিত্রেরা সম্ভ্রান্ত সৈয়দ । তাঁহারা আটিয়ার খাঁদিগের দৌহিত্র সূত্রে এই বৃহৎ পরগণার কিয়দংশ পাইয়া জমিদার হইয়াছেন । ইংরেজ রাজত্বে আটিয়া পরগণার কতকাংশ ঢাকার নবাবদিগের অধিকারভুক্ত হইয়াছে । আর অল্প কিছু অংশ ধনবান্ হিন্দুরা খরিদ করিয়াছেন । পঞ্চান্তরে আটিয়ার খাঁ সাহেবেরা অনেক অতিরিক্ত জমিদারী তালুক ইত্যাদি ক্রয় করিয়া সে ক্ষতি-পূরণ করিয়াছেন । হিন্দুদের সহ এই বংশীয়দের যতদূর সম্ভাব আছে এবং

ছিল, অথ কোন মুসলমান বড়মানুষের সহ হিন্দুদের ততদূর হয় নাই। আর দেলছারার মিঞাদের তুলা সম্রাস্ত মুসলমান বাঙ্গালা, বেহার, উড়িষ্যায় আর দেখা যায় না। করটিয়ার মিঞারাই কচে আলি খাঁর পুত্রের বংশধর।

* * * * *

কত দিন হইতে বাঙ্গালা ভাষার সূত্রপাত হইয়াছে, কতদিন হইতে বাঙ্গালা বাঙ্গালীর লিখিত ভাষারূপে গণ্য হইয়াছে, তাহা বলা অসম্ভব। বৈদিক ভাষাই আৰ্য্যজাতির আদি ভাষা ছিল, পরে সংস্কৃত ভাষার প্রচলন হয়। সমাজ-বিপ্লব ধর্ম-বিপ্লব ও রাষ্ট্র-বিপ্লব প্রভৃতি সমস্ত বিপ্লবই ভারতবর্ষের বুকের উপর দিয়া প্রবাহিত হইয়া গিয়াছে। এই সকল বিপ্লবে দেশের আভ্যন্তরীণ অবস্থা যেমন পরিবর্তিত হয়, দেশের ভাষাও সেই সঙ্গে প্রভূত পরিমাণে পরিবর্তিত হইয়া থাকে। সংস্কৃত ভাষা বহুকাল এদেশে প্রভুত্ব বিস্তার করিলেও প্রায় দুই হাজার বৎসর পূর্বে অকস্মাৎ বৌদ্ধ-বিপ্লবে পালী ভাষার উৎপত্তি হইল। এই সময় হইতে সংস্কৃত ভাষা নিম্নতর হইতে আরম্ভ হয়। তৎপর বৌদ্ধধর্মের অবসানে ও সনাতন ধর্মের পুনরুত্থানে পুনরায় সংস্কৃত ভাষার চর্চা আরম্ভ হয়, কিন্তু পূর্বে নবাগত ভাষাটির সাহায্যে দেশে যে প্রাকৃত ভাষার স্তর সৃষ্ট হইয়াছিল, তাহা বিলুপ্ত হইল না। এই প্রাকৃত ও সংস্কৃতের মিশ্রণেই গোড়ীয় ভাষার সৃষ্টি।

খ্রীষ্টচৈতন্য মহাপ্রভুর আবির্ভাবের পর হইতে তৎশিষ্যগণের ভক্তি-প্রবণতায় আধুনিক বঙ্গ-সাহিত্য পরিপুষ্ট লাভ করিতে আরম্ভ করে। তৎপূর্বে এদেশবাসী নরনারী যোগীপাল, মহীপাল, গোপীপাল প্রভৃতির গীত আনন্দের সহিত আলাপ করিত। খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীতে পাল রাজগণের রাজত্বকালে এই গীতের জন্ম হয়। এই সকল গীত ও খনা এবং ডাকের বচন প্রভৃতিই বাঙ্গালা সাহিত্যের প্রথম কালের রচনা বলিয়া প্রত্নতত্ত্ববিদগণের ধারণা যে, ইহা বাঙ্গালা সাহিত্যে আদিম রচনা নহে,—আদিমের নিকটবর্তী মাত্র। ইহারও পূর্বকালে বাঙ্গালা ভাষা রচিত হইয়াছে।

একাল পর্য্যন্ত যে সমুদয় প্রাচীন গ্রন্থ আবিষ্কৃত হইয়াছে তাহা হইতে রামাই পণ্ডিতের ‘শূত্র পুরাণ’, চণ্ডীদাসের ‘চৈতন্যরূপ প্রাপ্তি’, রূপ গোস্বামীর ‘কারিকা’, কৃষ্ণদাস গোস্বামীর ‘রাগময়ীকণা’ এবং সহজিয়া সম্প্রদায়ের কতিপয়

এছে প্রাচীন বাঙ্গালার গদ্য সাহিত্যের আভাস প্রাপ্ত হওয়া যায়। ‘শূন্য পুরাণ’ বৌদ্ধ প্রভাব কালের পদ্মগুণময় গ্রন্থ। ইহার অধিকাংশই পদ্ম, সামান্য অংশ মাত্র গুণ। ইহার পূর্বে কোনও বাঙ্গালী লেখক গুণ লিখিবার প্রয়াস পাইয়াছিলেন কিনা অবগত হওয়া যায় না।

পূর্বোক্ত গ্রন্থসমূহ মুসলমান-শাসন-আমলে রচিত হইলেও, তাহাতে একটিও অসংস্কৃত বা বৈদেশিক শব্দ প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া যায় না। বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের সহজিয়াগণই বাঙ্গালা গল্পের প্রথম স্রষ্টা। খৃষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দী হইতে এই গল্প রচনার নমুনা পাওয়া গিয়াছে। সহজিয়া সম্প্রদায়ের রোপিত বীজ হইতেই বর্তমান কালের বঙ্গভাষার উৎপত্তি।

মুসলমান রাজত্বকালে ভারতবর্ষে সংবাদপত্রের প্রচলন ছিল। অবশ্য, তখন সংবাদপত্র মুদ্রিত হইত না, কিন্তু ইহাতে এখনকার মত অনর্থক সংবাদ না থাকিয়া সমস্ত রাজনৈতিক বিষয়ক সংবাদ হস্তদ্বারা লিখিত হইত এবং তাহা দেশের প্রধান প্রধান রাজকর্মচারীর নিকট প্রেরিত হইত। সমস্ত বিভিন্ন বিভিন্ন প্রদেশের সংবাদ একত্রিত করিয়া সম্রাটের নিকট প্রেরিত হইত, এবং এইরূপ সংবাদ সংগ্রহের জন্ত রাজকীয় স্বতন্ত্র বিভাগ ছিল। “কানুন এ-জং” নামক প্রাচীন পারস্য গ্রন্থে উক্ত আছে যে, পানিপথ যুদ্ধে বাবর শাহ শিবিরে বসিয়া সংবাদপত্র পাঠ করিতে ছিলেন এমন সময়ে হিন্দু রাজারা আসিয়া সন্ধির প্রস্তাব করিয়াছিলেন। আবুল ফজল “আইন-ই-আকবরী” গ্রন্থে উল্লেখ করিয়াছেন যে, সম্রাট আকবরের সময় প্রতি মাসে গবর্ণমেন্ট গেজেটের মত রাজকীয় সমাচার পত্র প্রচলিত ছিল। শাহজাহান আগ্রার মহরম দর্বারে বলিয়াছিলেন, “এলাহাবাদের হিন্দু প্রজাদের মধ্যে বিদ্রোহের লক্ষণ দেখা যাইতেছে ইহা সমাচার পত্রে পাঠ করিয়া বিস্মিত ও বিবাদিত হইলাম।” সম্রাট ঔরংজেব আরাক্কাবাদ নামক স্থানে জীবনলীলা সম্বরণ করেন, তাঁহার পীড়ার সমাচার ও বিবরণ দিল্লীর “পয়গম-এ-হিন্দ” নামক পারস্য সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল।

একাদশ অধ্যায় ।

রাজা মহেন্দ্রনারায়ণ খাঁ।—উপেন্দ্রনারায়ণ খাঁ।—উপেন্দ্রনারায়ণের বিদ্রোহ ও

পরাজয়।—উপেন্দ্রের পণ্ডিতগৃহে অজ্ঞাতবাস ।

মহেন্দ্র নারায়ণ রাজা হইতে, জগৎ নারায়ণের পাটরাণী প্রথমতঃ কোন আপত্তি করেন নাই। তাঁহার বিশ্বাস ছিল যে উপেন্দ্র নাবালক জন্মই মহেন্দ্র রাজ্য শাসন করিতেছে; উপেন্দ্র বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে সেই রাজত্ব পাইবে। তিনি কিছুদিন মধোই জানিতে পারিলেন যে মহেন্দ্র অভিষিক্ত হওয়ার রাজত্ব তাহারই হইয়াছে। সে নিজে যাবজ্জীবন রাজত্ব করিবে তদভাবে তাহারই সম্ভান রাজা হইবে; উপেন্দ্র এবং তাহার সম্ভানেরা কেবল ভবণপোষণ জন্ম যৎকিঞ্চিৎ আয়না পাইবে মাত্র। মহেন্দ্রের সচ্চরিত্রতা হেতু পাটরাণী এতদিন তাঁহাকে খুব ভাল বাসিতেন। এখন মহেন্দ্র কর্তৃক নিজ পুত্র রাজ পদে বঞ্চিত হইল জানিয়া মহেন্দ্রের প্রতি তাঁহার বিদ্বেষ হইল। তিনি বিবেচনা করিলেন, আমি পাটরাণী, সুতরাং রাজপাট আমার নিজ সম্পত্তি, আমার পুত্রই আমার স্বত্ব রাজপদ পাইবার যোগ্য; মহেন্দ্র যে রাজত্ব পৈত্রিক বিবেচনা করিয়া নিজের জ্যেষ্ঠত্ব হেতু রাজত্ব গ্রহণ করিয়াছে তাহা নিতান্ত অগ্ৰার। তাঁহার এই সিদ্ধান্ত বিগুহ্ব কিনা তাহা বুঝিবার জন্ম পাটরাণী নিজ ভ্রাতা দিনমণি সান্যালের মতামত প্রেক্ষী হইলেন। দিনমণি কহিলেন, “কুলশাস্ত্র মতে ‘কুলীনো দেবতা স্বয়ং,’ দিদি! আপনি কুলীন কন্যা আর মহেন্দ্রের মাতা শ্রোত্রিয় কন্যা। আপনকার সহ তুলনায় ছোট রাণী সর্বাংশেই ছোট। সুতরাং আপনকার পুত্র উপেন্দ্র বয়সে ছোট হইলেও শ্রেষ্ঠ আর মহেন্দ্র বয়সে জ্যেষ্ঠ হইলেও নিকৃষ্ট। মহেন্দ্র যে উপেন্দ্রকে উপেক্ষা করিয়া নিজে রাজা হইয়াছে তাহাতে নিতান্ত অগ্ৰার পরিবেদন দোষ হইয়াছে। অতএব মহেন্দ্রকে রাজ্যচ্যুত করিয়া উপেন্দ্রকে রাজা করাই কর্তব্য।” এইরূপে যুক্তি বিভিন্ন হইলেও ভ্রাতা ভগিনীর সিদ্ধান্ত ঠিক একই রূপ হইল। তাঁহারা উদ্দেশ্য সাধনে ব্রতী হইলেন।

মহেন্দ্রের দূরবর্তী জ্ঞাতি প্রচণ্ড খাঁ অতি উগ্রস্বভাব ছিলেন। তিনি একজন সামান্য প্রজার শত্রু ক্ষেত্র নিজ ঘোড়া দ্বারা অপচয় করাতে অপক্ষপাতী রাজা মহেন্দ্র তাঁহার জরিমানা করিয়া প্রজার ক্ষতিপূরণ করিলেন এবং প্রচণ্ডকে ভবিষ্যতে সাবধান হইতে বলিলেন। প্রচণ্ড বিবেচনা করিলেন, আমি রাজার জ্ঞাতি, সুতরাং প্রজার প্রতি অত্যাচার করিতে আমার অবশ্যই স্বত্ব আছে। আমার জরিমানা করিয়া অপমান করা রাজার পক্ষে নিতান্ত অত্যাচার কার্য্য! এরূপ দুষ্ট রাজা থাকিতে আমার মঙ্গল নাই। অতএব তিনি দিনমণির সহকারী হইলেন।

লালা রামচন্দ্র সরকারের পুত্র লালা গোপালচন্দ্র সরকার জমানবিসী কশ্ম করিতেন। তিনি প্রজাদের অর্থ শোষণ করিয়া প্রচুর উপার্জন করিতেন। মহেন্দ্র তাদৃশ অর্থ শোষণের প্রতিবন্ধক হওয়ায় গোপালও তাঁহার বিপক্ষ হইলেন। তাঁহার চারিজনে উপেন্দ্রকে রাজা করিতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। পাটরাণীর হস্তে প্রচুর অর্থ ছিল। দিনমণি এবং প্রচণ্ড উভয়েই বীরপুরুষ ছিলেন এবং গোপাল বুদ্ধিমান ছিলেন। সুতরাং ধনবল, বাহুবল এবং বুদ্ধিবল একত্র হইল, কেবল জনবলের অভাব থাকিল। তাঁহার প্রতাপবাজু পরগণায় গিয়া সেনা সংগ্রহ করতঃ যুদ্ধারম্ভ করিতে গোপনে পরামর্শ করিলেন।

পাটরাণী প্রচুর টাকা ও উপেন্দ্রকে সঙ্গে লইয়া গঙ্গান্নান উপলক্ষে রাজবাড়ী হইতে বাহির হইয়া নৌকা পথে প্রতাপবাজু পরগণায় উপস্থিত হইলেন। দিনমণি, গোপাল এবং প্রচণ্ড খাঁ অত্র উছিলায় সাতগড়া হইতে বাহির হইয়া তাঁহার সহ মিলিত হইলেন। তৎকালে যুদ্ধ ব্যবসায়ী সিপাহী ও লাঠিয়াল সর্বত্রই সুপ্রাপ্য ছিল। রাণীর টাকায় এবং দিনমণি ও গোপালের চেষ্টায় অল্পদিন মধ্যে ৫০০ সিপাহী সংগৃহীত হইল। প্রতাপবাজুর নায়েব পরাজিত ও হত হইল। একমাস মধ্যে সমস্ত প্রতাপবাজু ও কুম্ভস্তী পরগণা রাণীর হস্তগত হইল। সেই থানেই নাবালক উপেন্দ্র নারায়ণ খাঁকে রাজ্যাভিষেক করা হইল। মহেন্দ্র সমাচার পাইয়া সৈন্যে প্রতাপবাজুতে উপস্থিত হইলেন। উভয় পক্ষের মধ্যে প্রকাশ্য যুদ্ধ হইল। মহেন্দ্রের সুশিক্ষিত সেনার সন্মুখে উপেন্দ্রের নূতন দলবল সর্বাংশেই অপকৃষ্ট ছিল। কিন্তু এসিয়া খণ্ডে সেনাপতির যোগ্যতাহুসারেই সৈন্যের ক্ষমতা হ্রাস বৃদ্ধি হয়। দিনমণি

ও প্রচণ্ড খাঁ অতি সাহস পূর্বক যুদ্ধ চালাইতে লাগিলেন। উপেন্দ্র চতুর্দশ বর্ষীয় বালক হইলেও নির্ভীক চিত্তে যুদ্ধ স্থানে উপস্থিত থাকিয়া প্রচণ্ড খাঁর সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত কার্য্য পর্য্যবেক্ষণ করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের বিক্রমে প্রদীপ্ত হইয়া সেই নূতন সেনা মহেন্দ্রের সুশিক্ষিত সেনার সহ সমভাবে যুদ্ধ করিতে লাগিল। এক প্রহর যুদ্ধের পর দিনমণি রণশায়ী হইলেন। অমনি সেনাগণ ভঙ্গ দিয়া পলায়ন আরম্ভ করিল। গোপাল ও প্রচণ্ড খাঁ বহুতর চেষ্টা করিয়াও সম্বরণ করিতে পারিলেন না। তখন আটজন মাত্র অনুচর সহ উপেন্দ্র, গোপাল ও প্রচণ্ড খাঁ দ্রুতগামী নৌকাযোগে পলায়ন করিলেন। তাঁহাদের দলবল হত আহত বা পলায়িত হইয়া সম্পূর্ণ বিদ্রুত হইল। পাটরাণী সহ দিনমণির ও গোপালের পরিবারবর্গ মহেন্দ্রের হাতে পড়িল। মহেন্দ্র কোন উৎপীড়ন করিয়া শাস্ত ভাবে সকলকে বশ করিতে লাগিলেন। একমাস মধ্যে প্রতাপবাজু ও কুসুম্ভী সম্পূর্ণ শাস্ত এবং নিরাপদ হইলে মহেন্দ্র বন্দীগণ সহ সাতগড়ায় আসিলেন। পদ্মানদীর দক্ষিণ পারে একটাকিয়ার রাজত্ব প্রভুত্ব কিছুই ছিল না। গোপাল, প্রচণ্ড ও উপেন্দ্র নৌকাপথে পদ্মা পার হইয়া কতক নির্ভয় হইলেন। তথাপি যদি কেহ অর্থলোভে তাঁহাদিগকে ধরিয়া মহেন্দ্রের হস্তে সমর্পণ করে এই ভয়ে তাঁহারা প্রচ্ছন্ন ভাবেই চলিতে লাগিলেন।

এই সময়ে জাহাঁগীর দিল্লীর সম্রাট ছিলেন। তাঁহার পুত্র শাহজাহান বিদ্রোহী হইয়া বাঙ্গালা ও বেহার অধিকার করিয়া রাজমহলে অবস্থিতি করিতে ছিলেন। উপেন্দ্র অনুচর সহ তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলেন। তাঁহার সুন্দর বীরমূর্ত্তি দেখিয়া শাহজাহানের চিত্ত তৎপ্রতি আকৃষ্ট হইল। শাহজাহান তাঁহার পরিচয় লইলেন। অনেকক্ষণ উভয়ের আলাপ হইল। উপেন্দ্রের কুল মর্যাদা আদব কায়দা (শিষ্টাচার) সাহস বিজ্ঞা বুদ্ধি দৃষ্টে শাহজাহান অতিশয় প্রীত হইলেন। তিনি সভাসদগণকে বলিলেন, “আমার পূর্বপুরুষ বাবর ও আকবর যেমন অবস্থা গতিকে অল্প বয়সেই অভিজ্ঞ বীর হইয়াছিলেন, এই বালকের অবস্থাও ঠিক সেইরূপ দেখিতেছি।” তৎপরে উপেন্দ্রকে কহিলেন, “বাপু হে! তোমার আমার সমান দশা; তুমি যেমন উপেন্দ্রকে কহিলেন, “বাপু হে! তোমার আমার সমান দশা; তুমি যেমন বৈমাত্র ভ্রাতার দোয়াত্বো দেশত্যাগী আমিও সেইরূপ বৈমাত্র ও বৈমাত্র

ভ্রাতার ষড়যন্ত্রে দেশত্যাগী পিতৃদ্রোহী। তোমাকে তোমার পৈত্রিক রাজ্য দেওয়া আমার পক্ষে কঠিন কাজ নয় কিন্তু আমার অবসর নাই। আমার বিমাতা মুরজাহান বেগম বাঙ্গালা দেশে আমার অভ্যুদয় শুনিয়া শাহজাদা পর্বেজ ও সেনাপতি মহাবৎ খাঁর* অধীনে একদল প্রবল সেনা আমার বিরুদ্ধে পাঠাইয়াছেন। আমি সেই নিজ শত্রু নিরাকরণ না করা পর্য্যন্ত তোমার জন্ত কোন চেষ্টা করিতে পারি না। আমি তোমাকে নিজ সন্তানের ছায় স্নেহ করিব। তুমি আমার জ্যেষ্ঠপুত্র দারা শেকোর সহচর হইয়া রাজনীতি বীরনীতি শিক্ষা কর। দেখ বাউক আমার ভাগ্যেই বা কি হয়, আর তোমার ভাগ্যেই বা কি হয়।” “হজুরের অনুগ্রহে একান্ত চরিতার্থ হইলাম” বলিয়া উপেন্দ্র নত ভাবে তিনবার কুর্নিশ করিলেন। প্রতীহারী তাঁহাকে কুমার দারা শেকোর নিকট লইয়া গিয়া পরিচয় করিয়া দিল।

দারা শেকো রাজপুত রাজকুমারীর গর্ভজাত ছিলেন। তিনি বালাবধি অতিশয় হিন্দুপ্রিয় ছিলেন। তিনি মুসলমানধর্ম মানিতেন না এবং মুসলমানদিগকে বিশ্বাস করিতেন না, ভালও বাসিতেন না। তিনি প্রতীহারী প্রমুখাং উপেন্দ্রের পরিচয় এবং শাহজাহানের আদেশ অবগত হইয়া একবারে উপেন্দ্রকে বন্ধু ভাবে গ্রহণ করিলেন। উপেন্দ্র ও গোপাল সর্ক কার্যে দারা শেকোর সাহায্য করিতে লাগিলেন। প্রচণ্ড খাঁ শাহজাহানের নিজ অনুচর হইলেন। অল্পকাল মধ্যেই উপেন্দ্রের সাহস বিক্রম বিত্তা বুদ্ধি শাহজাহানের সমস্ত দলে বিখ্যাত হইল। দারার সঙ্গে সঙ্গে উপেন্দ্র শাহজাহানের অন্তঃপুরেও বাসিতেন। দারার মাতা উপেন্দ্রকে সন্তান নির্বিশেষে স্নেহ করিতে লাগিলেন। উপেন্দ্র তথায় রাজপুত্রের ছায় স্নেহ ও সম্মানে বাস করিতে লাগিলেন।

কিন্তু তাঁহার সেই স্নেহ দীর্ঘকাল স্থায়ী হইল না। কুমার পর্বেজ ও মহাবৎ খাঁ বাদসাহী সেনা সহ অল্পকাল মধ্যেই বক্সের উপস্থিত হইলেন।

* ইংরেজ ঐতিহাসিকগণ মহাবৎ খাঁকে পাঠান বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন, তাহা ভুল। তিনি রাজপুত সন্তান। রাণা প্রতাপ সিংহের ভ্রাতা সাগরজী তাঁহার পিতা। তিনি প্রথমে মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করিয়া পরে অনুতাপে বিবাহ করেন নাই। উড়ু সাহেব কৃত রাজস্থানে এই ভুল নাই।

শাহজাহানও সেনা সহ অগ্রসর হইলেন। শোণ নদের তীরে তুমুল সংগ্রাম হইল। শাহজাহান একান্ত পরাস্ত হইলেন এবং তিন শত মাত্র অনুচর সহ উদ্ধারসে পলায়ন করিয়া নিস্তার পাইলেন। তাঁহার স্ত্রী পুত্র কন্যা সমস্ত পর্বেজের হাতে পড়িয়া দিল্লীতে প্রেরিত হইল। প্রচণ্ড খাঁ শাহজাহানের অনুগামী হইলেন। উপেন্দ্র ও গোপাল মৃত সেনার মধ্যে শব্দাকারে পতিত থাকিয়া বিকৃত শরীরে প্রাণ রক্ষা করিলেন। কিন্তু গোপাল যে জীবিত আছে তাহা উপেন্দ্র জানিলেন না এবং তিনি যে জীবিত আছেন তাহাও গোপাল জানিতে পারিল না।

দিবা অবসান হইল। বাদশাহী সেনা সরিয়া গেল। দিখলয় তমসাস্কর হইল। শৃগাল কুকুর শকুনি গৃধ্রীণগণ মহোল্লাসে মৃত যোদ্ধাদিগের রক্ত মাংসে উদর পূর্ণ করিয়া ভীষণ চীৎকার করিতে লাগিল। উপেন্দ্র স্মরণে বুকিয়া শব্দশয্যা হইতে উঠিয়া শোণ নদের জলে নামিলেন। যুদ্ধশ্রমে অতিশয় পিপাসা হইয়াছিল কিন্তু ভয় প্রযুক্ত তৃষ্ণা সহ্য করিয়া এতক্ষণ মৃতবৎ নিষ্পন্দ ভাবে পতিত ছিলেন। এখন পেট ভরিয়া জলপান করিলেন। শরীর ধৌত করিলেন। মৃত্তিকা দ্বারা ক্ষত স্থানের রক্ত বন্ধ করিলেন। সৈনিক বেশ ত্যাগ করিয়া ধুতী দ্বিখণ্ড করতঃ তাহা দ্বারা কোপিন এবং চাদর করিয়া শরীর আবৃত করিলেন। লুণ্ঠনকারীদের ভয়ে তিনি পূর্বেই সমস্ত অলঙ্কার ত্যাগ করিয়াছিলেন কেবল কোমরে একছড়া সোণার বিছা ছিল, তাহাই এখন উপেন্দ্রের একমাত্র সম্বল থাকিল। উপেন্দ্র ক্ষুধায় অত্যন্ত অস্থির হইলেন, অথচ খাদ্য কোথায় পাইবেন তাহা স্থির করিতে পারিলেন না। শোণ নদে বেশী জল ছিল না, স্রোত মাত্রও ছিল না। তিনি নদ পার হইয়া উত্তর-পূর্ব মুখে গঙ্গাতীরে চলিলেন। অল্প দূরে গিয়া তিনি এক খরবুজার ক্ষেত্র পাইলেন। পেটের জ্বালায় পরস্বাপহরণ জনিত পাপের কথা একবারও মনে উঠিল না। তিনি ছালশুদ্ধ কাঁচা খরবুজা দ্বারা উদর-পূর্তি করিলেন। যে উপেন্দ্রের মুখে ক্ষীর, সর, নবনীতও তুচ্ছ বোধ হইত এখন ক্ষুধার উৎপীড়নে সেই রসনায় কাঁচা খরবুজা অমৃত তুল্য বোধ হইল। রাত্রি প্রায় চারি দণ্ড থাকিতে উপেন্দ্র গঙ্গাতীরে পৌঁছিলেন।

রাত্রি প্রভাত হইলে উপেন্দ্র গঙ্গাজলে প্রাতঃকৃত্য সমাপন করিয়া

ওজরা ঘাটে উপস্থিত হইলেন। পাঠার্থী ব্রাহ্মণবটু বলিয়া পরিচয় দেওয়ার খেয়াপারে পয়সা লাগিল না। এই সময়ে মিথিলা জনকপুরে জগন্নাথ শাস্ত্রী নামে একজন পণ্ডিত প্রসিদ্ধ হইয়াছিলেন। নানা চিন্তাকরিয়া উপেন্দ্র তাঁহার ছাত্র হইতে মনস্থ করিয়া পথ জিজ্ঞাসা করিতে করিতে জনকপুর অভিমুখে চলিলেন। পাঠার্থী বিপ্রবালক বলিয়া পরিচয় দেওয়ার্তে, তিনি যেখানে অতিথি হইলেন সেই খানেই সমাদরে শয়ন ভোজন পাইলেন। তাঁহার সঙ্গে অর্থ, খাদ্য বা শয্যা না থাকা হেতু কোন কষ্ট হইল না। উপেন্দ্র বুঝিলেন ইহাই ব্রহ্মকুলের উচ্চ মর্যাদার ফল। যেমন যাজনিক ব্যবসারে উপার্জন অল্প তেমনই ইহাতে ব্যয়ও অল্প। তিনি যে শাহজাহানের দলে ছিলেন একথা কাহারও মনে উদয় হইল না। তিনি নির্ঝিল্লি অষ্টম দিবসে জনকপুরে জগন্নাথ পণ্ডিতের গৃহে উপস্থিত হইলেন।

পণ্ডিতজী উপেন্দ্রের চেহারাতে রাজলক্ষণ দেখিয়া বুঝিলেন ছাত্রটি সামান্য লোক নহে। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, “বাপু হে, তোমার নাম কি?”

উপেন্দ্র। শ্রীউপেন্দ্র নারায়ণ আচার্য্য।

পণ্ডিত। বাড়ী কোথায়?

উপেন্দ্র। গোড়দেশে সপ্তদুর্গা। (রাজধানীর নামানুসারে বরেন্দ্রভূমিকে গোড়দেশও বলিত)।

পণ্ডিত। কোন গোত্র, কাহার সন্তান?

উপেন্দ্র। কাশ্যপ গোত্র, পণ্ডিতপ্রবর উদয় আচার্য্যের সন্তান।

পণ্ডিত। আমাকে কিরূপে জান্লে?

উপেন্দ্র। আপনার বংশ দিগ্দেশ ব্যাপী, সেই জন্ত আপনকার নিকট পাঠার্থী।

নিজের খ্যাতি গোড়দেশ পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছে শুনিয়া জগন্নাথ অতি দৃষ্টচিন্তে পুনরায় কহিলেন, “তোমার কি পর্য্যন্ত পড়া হইয়াছে?”

উপেন্দ্র। আমি বাঙ্গালা পড়িয়াছি। তাহার পর আমার অভিভাবকেরা আমাকে পারসী পড়িতে দিয়াছিলেন। কিন্তু যাবনিক ভাষা পাঠে আমার ইচ্ছা নাই। সেই জন্ত আপনার ছাত্র সদৃশ নিকট পবিত্র দেবভাষা শিখিতে

আসিয়াছি । সংস্কৃত এ পর্য্যন্ত আমি কিছুই পড়ি নাই এমন কি দেবনাগর বর্ণমালাও ভালরূপ চিনি না ।

পণ্ডিত । তোমার বয়স কি ?

উপেন্দ্র । ষোল বৎসর ।

পণ্ডিত । এত বয়সে ক'থ শিখিতে আরম্ভ করিয়া কত কাল পড়িবে ?

উপেন্দ্র । বাঙ্গালা এবং সংস্কৃত সদৃশ ভাষা, আমি যখন বাঙ্গালা জানি তখন সংস্কৃত পড়া অনেক সহজ হইবে । আপনকার চরণাশীর্ষাদে তিন চারি বৎসর মধ্যে প্রয়োজনীয় সমস্ত বিষয় শিখিতে পারিব ।

পণ্ডিত । তুমি অর্থকরী ভাষা ত্যাগ করিয়া পবিত্র ভাষা শিক্ষার জন্ত এতদূর আসিয়াছ, ইহাতে বোধ হয় তোমার মনোযোগ বেশী হইবে । বা হউক, অল্প বিশ্রাম কর ; কল্যাণবধি তোমার অধ্যাপন আরম্ভ করিব ।

ইংরেজ জাতি বাণিজ্য ব্যবসায়ী । তাঁহাদের সকল কাজই ক্রয় বিক্রয় বাণিজ্য উদ্দেশ্যমূলক । ইংরেজের সকল বিত্তা বিক্রীত হয়, আদালতে বিচার বিক্রীত হয়, বিবাহে প্রেম বিক্রীত হয়, অর্থ লাভ ভিন্ন কোন কাজ নাই । হিন্দু মুসলমানের মধ্যে বিত্তা বিক্রয় ও বিচার বিক্রয় প্রচলিত ছিল না । ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরা ছাত্রদিগকে থাকিবার স্থান দিতেন, আহার দিতেন এবং সম্ভানের ছাত্র প্রতিগালন করিয়া শিক্ষা দিতেন । ছাত্রেরাও অধ্যাপকগণকে পিতৃবৎ ভক্তি করিত এবং তাঁহাদের সাংসারিক কার্যে সাহায্য করিত । ধনী লোকেরা অধ্যাপকদিগের ব্যয় নির্বাহার্থ নিষ্কর জমি দিতেন এবং নানা উপলক্ষে অধ্যাপকদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়া তাঁহাদের বিত্তার পরিচয় লইতেন এবং তাঁহাদিগকে প্রচুর অর্থদান করিতেন । ব্রাহ্মণপণ্ডিতেরা কোনরূপ বিলাসী ছিলেন না । স্মৃতরাং ঐরূপে যে প্রতিগ্রহ পাইতেন তদ্বারাই তাঁহাদের সমস্ত ব্যয় নির্বাহ হইত । ছাত্রেরা বিনামূল্যের কাগী ও বিনামূল্যের কলম দ্বারা বিনামূল্যে তালপত্রে নিজ হস্তে পুস্তক লিখিয়া তাহাই পাঠ করিত, স্মৃতরাং বিত্তাশিক্ষার কোন অর্থব্যয় ছিল না । ছাত্রেরাও জ্ঞান উপার্জন জন্ত সংস্কৃত পড়িত ; চাকরী করিব, অর্থ লাভ করিব বলিয়া বিত্তালয়ে প্রবেশ করিত না । পারসী শিক্ষকদিগকে মুন্সী বলিত । মুন্সীরা কোন আঢ় লোকের বেতন ভোগা হইয়া শিক্ষা দিতেন কিন্তু ছাত্রেরা কোন বেতন দিত না । পারসী পুস্তকও

সচরাচর ক্রয় করিতে হইত। পারসী পাঠক ছাত্রেরা গুরুগৃহে বাসা কিংবা আহার পাইত না। সেই সকল ব্যয়ের ভার তাহাদের অভিভাবকেরা বহন করিত। ফলতঃ পারসী অর্থকরী রাজ ভাষা ছিল। যাহারা তাহা পড়িত তাহারা প্রধানতঃ অর্থ উপার্জন উদ্দেশ্যেই পড়িত। পারসী পড়িতে কিছু অর্থও ব্যয় হইত। কিন্তু ইংরেজী পড়ার ব্যয়ের শতাংশের একাংশও পারসী পড়িতে ব্যয় হইত না।

পর দিন জয়চূর্ণা স্মরণ করিয়া, গুরু পদে প্রণাম করিয়া উপেন্দ্র সংস্কৃত পাঠ্যরস্তু করিলেন। তখন বালকদিগকে মাটিতে আঁচড়া করিয়া বর্ণমালা শিক্ষা দেওয়া হইত। উপেন্দ্র এত বয়সে মাটিতে আঁচড়া না লইয়া কলার পাতে বর্ণশিক্ষা আরম্ভ করিলেন দেখিয়া অগ্রাগ্র ছাত্রেরা উপহাস করিতে লাগিলেন। উপেন্দ্র সোণার বিছা একটু কাটিয়া তাহা বিক্রয় করিয়া তেল তামাকের সংস্থা করিলেন। একটু কাঠের ফলক এবং খড়ীমাটি কিনিয়া তাহাতে বর্ণমালা লিখিতে আরম্ভ করিলেন। উপেন্দ্র অত্যন্ত বুদ্ধিমান ও মেধাবী ছিলেন। তাহার পর একান্ত তদ্রূপ চিত্রে দিবারাত্রি লিখিতে পড়িতে লাগিলেন। এক সপ্তাহে বর্ণমালা, ফলা ও বানান লিখিতে পড়িতে সমর্থ হইলেন। তাহার পরেই কলাপ ব্যাকরণ লিখিতে পড়িতে আরম্ভ করিলেন। হাতে লিখিয়া পুস্তক পড়িতে কিছু কষ্ট হয় বটে কিন্তু তাহাতে মুখস্থ করিবার সাহায্য হয় এবং হাতের লেখা দ্রুত হয়। উপেন্দ্র কোন কষ্টেই কিছু মাত্র কাতর হইতেন না। সুতরাং অল্প কাল মধ্যেই অনেক বেশী পড়িতে পারিলেন। পণ্ডিতদের চতুষ্পাঠিতে কোন শ্রেণী বিভাগ নাই। যে যত দূর ইচ্ছা ততদূর পড়িতে পারে। অত্যান্য ছাত্র দৈনিক যতদূর পড়িতে পারিত উপেন্দ্র তাহার ত্রিগুণ পড়িতেন। অধিকন্তু তিনি নূতন পুরাতন সমানে স্মরণ রাখিতেন। যে সকল ছাত্র তাঁহাকে উপহাস করিয়াছিলেন তিনি একবৎসর মধ্যেই তাঁহাদের অনেককেই অতিক্রম করিলেন, তাহা দেখিয়া সকলেই চমৎকৃত হইল।

ইতিমধ্যে জগন্নাথের একটি পুত্র সফটাপন্ন কাতর হইল। পণ্ডিতজীর কোন সঙ্কিত অর্থ ছিল না, তাঁহার পরিবারবর্গেরও কোন মূল্যবান অলঙ্কার ছিল না। সুতরাং তিনি চিকিৎসার ব্যয় নির্বাহ করিবার কোন সূচপায় করিতে পারিলেন না। তাঁহার ব্রাহ্মণী সেই শোচনীয় অবস্থায় পীড়িত শিশু

কোড়ে লইয়া রোদন করিতে লাগিলেন। উপেন্দ্র আপনার সোণার বিছা খুলিয়া চিকিৎসার ব্যয় নির্বাহার্থ দিলেন। পণ্ডিতজী সেই বহুমূল্য অলঙ্কার বন্ধক দিয়া টাকা আনিয়া সুবৈজ্ঞ দ্বারা চিকিৎসা করাইতে লাগিলেন। একদিন মেঘান্ধকার রাত্রিতে নদী পার হইয়া ছুরবর্তী গ্রাম হইতে ঔষধ আনা আবশ্যক হইল। একে ঝড় বৃষ্টি অন্ধকার তাহাতে পথে বন্য শুকরের ভয়, কেহই ঔষধ আনিবার জন্ত বাইতে স্বাকার করে না দেখিয়া পণ্ডিত মহা সঙ্কটে পড়িলেন। উপেন্দ্র অধ্যাপকের বিপদ দেখিয়া অননি কার্যোদ্ধারে প্রস্তুত হইলেন। পণ্ডিতজী তাদৃশ সঙ্কটে পড়িয়াও বিদেশী অনুরক্ত ছাত্রকে বিপদসম্মুল পথে বাইতে দিতে সক্ষম হইলেন না। তিনি কাদিতে কাদিতে কহিলেন, “আমার পুত্রতো গিয়াছে আবার আর এক ব্রাহ্মণের ছেলেকে আমি এসময়ে নষ্ট করিতে পারি না। বিধাতার যাহা ইচ্ছা তাহাই হইবে। তুমি কেন বাপু! বিদেশে প্রাণ দিবে।” উপেন্দ্র বলিলেন, “আপনার চরণাশীর্ষাদে আমার কোন বিপদ হইবে না, আমি একদণ্ড মধ্যেই নিরাপদে ঔষধ লইয়া আসিব।” পণ্ডিত পত্নীতঁাহাকে উৎসাহ দিয়া ঔষধ আনিতে পাঠাইলেন। পণ্ডিতের কোন শত্রু ভয় ছিল না সুতরাং তিনি কোন তীক্ষ্ণ অস্ত্র রাখিতেন না। উপেন্দ্র একখানি কুঠার হস্তে পরশুরামের ন্যায় একাকী বৈজ্ঞ গৃহে চলিলেন। জগন্নাথ সন্ন্যাসী তঁাহার মঙ্গলার্থ দুর্গানাম জপ করিতে লাগিলেন। ঈশ্বরানুগ্রহে উপেন্দ্রের পথে কোনই বিপদ হইল না। তিনি সাঁতরাইয়া নদী পার হইলেন এবং অতি ত্রস্ত ঔষধ লইয়া ফিরিয়া আসিলেন। পণ্ডিতের পুত্র রক্ষা পাইল এবং অল্পদিন মধ্যে আরোগ্য লাভ করিল। তদবধি পণ্ডিত-জায়া উপেন্দ্রকে অতিমাত্র স্নেহ করিতে লাগিলেন।

জগন্নাথ পূর্বাধি উপেন্দ্রকে ছদ্মবেশী বলিয়া অনুমান করিতে ছিলেন, তঁাহার সেই অনুমান ক্রমেই বুদ্ধি পাইতে লাগিল। উপেন্দ্রের সুন্দর আকৃতি, স্বর্ণবিছা দান, তঁাহার বল বিক্রম সাহস, গুরুভক্তি, অসাধারণ মেধা ও বুদ্ধি দৃষ্টে জগন্নাথ তঁাহাকে দেবতা বলিয়া স্থির করিলেন। তিনি একদিন উপেন্দ্রকে নিভূতে লইয়া গিয়া হাত ধরিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, “বাপুরে! তুমি আমাকে যখন গুরু বলিয়া স্বীকার করিয়াছ তখন আমাকে গোপন করিও না, তুমি কে তাহা যথার্থ প্রকাশ কর।” উপেন্দ্র বলিলেন, “আমি আপনকার নিকট মিথ্যা বলি নাই। আমি যে পরিচয় দিয়াছি তাহা সমস্তই সত্য, কেবল

কিঞ্চিং বৃত্তান্ত গোপন আছে মাত্র। উদয়ণ আচার্য্যের বংশীয় সুবুদ্ধিরাম ভাঙ্ড়ী নবাব সম্ভ্রদীনের নিকট এক প্রকাণ্ড জাগীর পাইয়াছিলেন। সুবুদ্ধিরামের বংশীয়েরা একটাকিয়া রাজা নামে খ্যাত। আমার পিতা একটাকিয়া রাজা ছিলেন। আমার বৈমাত্রভ্রাতা এখন রাজা আছেন। আমি সেই বৈমাত্রের সহ বিবাদে সর্ব্বস্বান্ত হইয়া মনস্থ করিয়াছি যে রাজত্ব প্রভৃত্ত জগৎ চেষ্টায় ক্ষান্ত হইয়া যাজনিক ব্যবসায় দ্বারা শান্তভাবে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিব।” জগন্নাথ কহিলেন, “তোমার ললাটে স্পষ্ট রাজটীকা জাজল্যমান, তুমি অল্পদিন মধ্যেই রাজা হইবে। তোমায় যাজনিক ব্যবসায় করিতে হইবে না, কিন্তু শাস্ত্র পাঠে সকল অবস্থাতেই উপকার হইবে।”

কিঞ্চিদধিক চারি বৎসর অবিশ্রান্ত পাঠে উপেন্দ্রের মোটামুটি পাণ্ডিত্য হইল। তিনি ব্যাকরণ এবং অলঙ্কার শাস্ত্র সমাপ্ত করিলেন। অমরকোষ অভিধান মুখস্থ করিলেন। মনুসংহিতা এবং প্রায়শ্চিত্ত তত্ত্ব সম্পূর্ণ অধ্যয়ন করিলেন। দশকর্ম্ম পদ্ধতি এবং দশোপনিষৎ পড়িলেন। যজুর্বেদও কিছু পাঠ করিলেন। হ্যায় ও দর্শন শাস্ত্রও কিছু কিছু পড়িলেন। অধিকন্তু বাঙ্গালা দেশে যিনি যত কেন পণ্ডিত হউন না, কেহই অনর্গল সংস্কৃত কথাবার্তা বলিতে শিক্ষা করেন না। উপেন্দ্র সংস্কৃতে আলাপ করা অভ্যাস করিলেন। বাঙ্গালা দেশে হ্যায়রত্ন, বিজ্ঞাভূষণ, তর্কবাগীশ প্রভৃতি পাণ্ডিত্য হ্রচক যে সকল উপাধি প্রচলিত আছে জনকপুরে তাহা না থাকায় উপেন্দ্র কেবল “পণ্ডিতজী” উপাধি পাইলেন এবং অধ্যাপক ও সতীর্থগণের নিকট বিদ্যায় লইয়া দেশে চলিলেন।

দ্বাদশ অধ্যায় ।

উপেন্দ্রনারায়ণের গৃহপ্রত্যাগমন ।

উপেন্দ্র দেশে চলিলেন । তাঁহাকে সহজে কেহ চিনিতে না পারে এই উদ্দেশ্যে হিন্দুস্থানী সন্ন্যাসীর বেশ ধরিলেন । সঙ্গে অর্থ সম্বল কিছুই নাই । ভিক্ষা করিতে করিতে গোড় নগরের পথে ধীরে ধীরে বাইতে লাগিলেন । সুপণ্ডিত সন্ন্যাসী বলিয়া সর্বত্রই আদর পাইলেন । উপেন্দ্র একমাসে গোড় নগরে উপস্থিত হইলেন । গোড় আর সে সমৃদ্ধ নগর নাই । মহামারীতে জনশূন্য হইয়াছে । স্থানে স্থানে জঙ্গল হইয়া উঠিয়াছে । কাঁচা বাড়ীগুলি লুপ্ত হইয়া তথায় বিজন অরণ্য হইয়াছে, পুরাতন পাকাবাড়ী ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে । ক্ষুদ্র নির্ম্মিত পাকা বাড়ীর উপরতালায় পেচক ও চর্ম্মচটিকার আবাস, নীচতালায় শজার ও শৃগালের বাসস্থান হইয়াছে । যে স্থানে রাজা, নবাব এবং সম্রাটগণ মহা আড়ম্বরে দরবার করিতেন সেই স্থানে এখন বহু জন্তুর আবাস হইয়াছে । গোড়ের নগরত্ব গিয়াছে কিন্তু জঙ্গলত্ব সম্পূর্ণ হয় নাই । উপেন্দ্র গোড়ের অবস্থা দেখিয়া নিজ অবস্থার সহ তুলনা করিতে লাগিলেন । তিনি চিন্তা করিলেন, ‘এই গোড় অবস্থাই এক সময়ে নৈসর্গিক অরণ্য ছিল, পরে মনুষ্যেরা সেই জঙ্গল কাটিয়া তাহার অধিবাসী বহু জন্তুদিগকে দূরীকৃত করিয়া আপনাদের বাসস্থান করিয়াছিল । আঠার শত বৎসর এখানে সমৃদ্ধ রাজধানী ছিল । আমার পূর্ব পিতামহ গণেশ খাঁ এক সময়ে এখানে প্রবল প্রতাপাধিত সম্রাট ছিলেন । এখন আমি ভিক্ষুক এবং সেই রাজধানী জঙ্গলে পরিণত । জঙ্গল ভাঙ্গিয়া নগর হইয়াছিল আবার নগর ভাঙ্গিয়া বহুজন্তু সমাকীর্ণ জঙ্গল হইয়াছে । আমরাও ধন সম্পত্তিহীন ভট্টাচার্য্য ব্রাহ্মণের বংশধর । মধ্যে আমার কয়েক জন পূর্বপুরুষ বৈষয়িক উন্নতি প্রাপ্ত হইয়া চেষ্টা করিয়াছিলেন । সৌভাগ্য তাঁহাদের সহকারী হইয়াছিল । তাঁহারা রাজা মহারাজা এবং সম্রাট পর্য্যন্ত হইয়াছিলেন । আমার ভাগ্য পরিবর্তনে আমি সেই ব্রাহ্মণ পণ্ডিত হইয়াছি । দোলনা স্বভাবতঃ সোজা ঝুলিতেছে । এক দিকে ধাক্কা দেও সেই দিকে

সরিবে। আবার ফিরিয়া পশ্চাৎগামী হইবে। কিয়ৎকাল এই রূপ এদিক ওদিক ছলিয়া আবার পূর্ববৎ সোজা হইয়া স্থির হইবে। ইহাই জগতের চিরন্তন গতি। সেই নৈসর্গিক গতিতেই আমি ও গোড়নগর মূল অবস্থা প্রাপ্ত হইতেছি।’

গোড় হইতে উপেন্দ্র দক্ষিণবর্তী পথে সাতগড়া চলিলেন। তিনি মনে করিয়াছিলেন যে তাঁহার মাতা ও মাতুলানী বন্দীভাবে আছেন, গোপালের পরিবার দাসত্বে নিযুক্ত হইয়াছে এবং তাঁহার স্বপক্ষীয় সমস্ত লোকের প্রাণদণ্ড হইয়াছে। তজ্জন্ত তিনি স্থির করিলেন, ‘আমি গুপ্তভাবে থাকিয়া গোপালের পরিবার ভুক্ত কোন দাস দাসীর সহ আলাপ করিব। গোপাল যে যুদ্ধে হত হইয়াছে তাহা প্রকাশ করিব না। তাহাদের কাছে বলিব গোপাল পদ্মার দক্ষিণ পারে গুপ্তভাবে আছে। আমি নিজ মাতা, মাতুলানী এবং গোপালের পরিবারবর্গের উদ্ধারার্থ আসিয়াছি। এই আশ্বাসে তাহা-দিগকে বশ করিয়া স্বেযোগ মত আত্মপরিজন ও গোপালের পরিজন লইয়া পলায়ন করিব। নির্বিঘ্নস্থানে গিয়া পরে গোপালের মৃত্যু সংবাদ দিব। গোপাল আমার অতি বিশ্বাসী ভৃত্য ছিল। তাহার পরিবারবর্গকে উদ্ধার করা এবং পালন করা আমার অবশ্য কর্তব্য। যদি আত্মপরিবার পালন করিতে পারি তবে তাহাদিগকেও পালন করিতে পারিব। কিন্তু গোপালের পরিবারবর্গ আমার এখন সপক্ষ হইবে কি বিপক্ষ হইবে তাহা ঠিক বলা যায় না। পাছে তাহারা আমাকে মহেন্দ্রের নিকট ধরিয়া দেয়। আমার ছুবস্থার সময় কাহাকেও বিশ্বাস করিতে পারি না অথচ কাহাকেও বিশ্বাস না করিলে কাজ চলে না। আমাদের কুলপুরোহিত অতি সংলোক। তিনি সামান্য পুরস্কার লোভী নহেন। আমি অগ্রে তাঁহার নিকট যাইব। তাঁহার সহ পরামর্শ করিয়া জননীর বন্দীদশা মোচনের সত্ৰপায় করিব।’ এইরূপ মনস্ত ক রিয়া উপেন্দ্র চলনবিল পার হইয়া ভাটুড়িয়ার প্রান্তদেশে আসিলেন।

উপেন্দ্র ভাটুড়িয়ার যতই তদন্ত করিলেন ততই বুঝিতে পারিলেন যে তাঁহার সমস্ত অনুমানই ভ্রান্তিমূলক। তিনি জানিতে পারিলেন যে মহারাজ মহেন্দ্র নারায়ণ অতি সদাচার ও সুবিচারে রাজ্যশাসন করিতেছেন। তিনি উপেন্দ্রের পক্ষীয় কোন ব্যক্তিকেই কোন কঠিন দণ্ড করেন নাই। উপেন্দ্রের

মাতা মহেন্দ্র কর্তৃক অতীব সম্মানে আছেন। উপেন্দ্রের মাতুলানী সম্মানে নিজ স্বামী গৃহ খাজুড়িয়াতে আছেন। গোপালের পরিবারবর্গেরও কোন অনিষ্ট হয় নাই। প্রায় তিন বৎসর হইল গোপাল সরকার মহেন্দ্রের শরণাগত হওয়ায় রাজা তাঁহাকে ক্ষমা করিয়া পুনরায় জমানবিসী কর্মে বহাল করিয়াছেন। গোপাল সপরিবারে সুখে আছে। উপেন্দ্র সেই সকল কথায় সম্পূর্ণ নির্ভর করিলেন না। কিন্তু তিনি স্বচক্ষে প্রজাগণকে সুখী দেখিলেন এবং স্বকর্ণে আপামর সর্বসাধারণের নিকট সুবশ শুনিলেন। তদ্বারা মহেন্দ্র যে অতি সংলোক তাহা উপেন্দ্র নিশ্চয় বুঝিতে পারিলেন। তখন উপেন্দ্রের মনে অতিশয় আত্মগ্লানি হইল। তিনি চিন্তা করিলেন, ‘বিধাতার অবিচার নাই। অজ্ঞান শিশু যেমন সুন্দর দেখিয়া জলন্ত অগ্নি ধরিতে যায়, তাহার হিতার্থী আত্মীয়গণ তাহাকে নিবারণ করিলে, সে অতীব অসন্তুষ্ট হইয়া রোদন করে, সেই হিতার্থী আত্মীয়গণকে নিজস্বপ্নের প্রতিরোধক শত্রু জ্ঞান করে, অনেক সময়ে নিজ প্রবৃত্তি বিফল দেখিয়া পরম হিতার্থী পরমেশ্বরকে আমরা সেই রূপ শত্রু জ্ঞান করি। আমরা নিগন্ত অজ্ঞ, ঈশ্বর জ্ঞানময়। কিসে আমাদের প্রকৃত হিত হইবে আমরা তাহা বুঝিতে পারি না, কিন্তু ঈশ্বর তাহা জানেন। ঈশ্বর যাহা করেন তাহা সমস্তই উত্তম এবং তাঁহার উদ্দেশ্য মহত্তম। হৃদৈব গতিকে আমরা কষ্টে পড়িয়া যে ঈশ্বরের প্রতি বা ভাগ্যের প্রতি দোষারোপ করি তাহা আমাদের মূর্থতা এবং মহাপাপ। আমার এবং মৎপক্ষীয় সচিবগণের অন্তঃকরণ ভাল ছিল না। হিংসা, দ্বেষ, ক্রোধ, লোভ এবং অহঙ্কার আমাদের হৃদয় অধিকার করিয়াছিল। আমরা জয়ী হইলে মহেন্দ্র সপরিবারে কারারুদ্ধ হইতেন। তৎপক্ষীয় ব্রাহ্মণদের সর্বস্বান্ত হইত এবং অত্র লোকের প্রাণদণ্ড হইত। আমি সেই অল্প বয়সেই অতিশয় কামুক ও স্বেচ্ছাচারী হইয়া উঠিয়াছিলাম। সেই অবস্থায় আমি রাজা হইলে কত জনের ধন, প্রাণ, মান নষ্ট হইত, কত কুলবধূর সতীত্ব নষ্ট হইত তাহা বলা যায় না। লোকে আমার অত্যাচার সহ করিতে না পারিয়া হয়ত আমাকে অপহত্যা করিত কিম্বা অতিমাত্র ইন্দ্রিয় সেবনে নানারূপ রোগগ্রস্ত হইয়া আমার অকাল মৃত্যু ঘটত। ফলতঃ আমি জয়ী হইলে বহুলোকের অনিষ্ট হইত, বংশের কলঙ্ক হইত এবং আমার নিজেরও অনিষ্ট হইত। সেই জন্যই বিধাতা আমাকে পরাজিত এবং

দূরবস্থাপন্ন করিয়া যেমন জগতের উপকার করিয়াছেন তেমনই আমারও উপকার করিয়াছেন। আমি যে পিতৃদ্রোহী শাহজাহানের প্রিয়পাত্র হইয়াছিলাম, তিনি জয়ী হইলেও জগতের অধিকতর অনিষ্ট হইত এবং আমারও অনিষ্ট হইত। আমি তাঁহার অন্তঃপুরে বাইতাম। আমার মন সেই যবন রাজকুমারীদের প্রতি আকৃষ্ট হইতেছিল এবং হাবভাবে আমি বুঝিতেছিলাম যে তাহারাও আমার প্রতি অনু-রাগিনী হইতেছিল। শাহজাহান জয়ী হইলে আমি ধর্ম্মভ্রষ্ট হইয়া যবনী বিবাহে বাধ্য হইতাম নতুবা প্রাণদণ্ড হইত। আমি বাদশাহের জামাতা হইলে বৈষয়িক উন্নতি হইত বটে, ভাড়াড়িয়া এবং আরও অনেক দম্পত্তি লাভ করিতে পারিতাম বটে, কিন্তু তাহাতে জ্ঞাতি কুটুম্ব এবং প্রজাদের প্রচুর অনিষ্ট হইত। আমার পাপ ও কলঙ্কের সীমা থাকিত না। তাঁহার পরাজয়ে আমার যবন সংসর্গ, তাগ হইল। পবিত্র দেবভাষা শিক্ষা হইল। আমি পরিশ্রমী ও কষ্টসহ হইরাছি, আমার কুপ্রবৃত্তি সমস্ত বশীভূত হইয়াছে। আমি অবিলাসী ও মিতব্যয়ী হইরাছি। এখন মহেন্দ্রের স্মৃদৃষ্টান্তে দয়া, ক্ষমা ও সদাচার শিক্ষা হইল। মহেন্দ্র পিতার জ্যেষ্ঠপুত্র এবং রাজ্য পৈতৃক স্মরণে তিনি উচিত মতেই রাজা হইয়াছেন। আমরা তাঁহাকে পদচ্যুত করিতে চেষ্টা করিয়া প্রকৃত রাজ বিদ্রোহী হইয়াছিলাম। তথাপি মহেন্দ্র মৎপক্ষীয় বিদ্রোহ অপরাধীদিগকে ক্ষমা করিয়াছেন। মহেন্দ্র সদাশয়, কুলতিলক এবং রাজত্ব করিবার প্রকৃত যোগ্য ব্যক্তি। এই জন্তই পরম জ্ঞানী পরমদয়াল পরমেশ্বর মহেন্দ্রকে সংগ্রামবিজয়ী এবং রাজা করিয়াছেন। হে ভগবন্! তুমিই একমাত্র সত্য, সার এবং একমাত্র হিতৈষী।’ বলিতে বলিতে উপেন্দ্রের ভক্তি উদ্বেলিত হইল, দরদর অশ্রু পড়িতে লাগিল। অমনি সেই পথিমধ্যেই উপেন্দ্র গলবস্ত্রে ভূতলে পড়িলেন এবং সপ্তাহে প্রাণিপাত করিয়া স্তুতিপাঠ করিতে লাগিলেন।

হিংসাই হিংস্রকদের প্রধান উৎপীড়ক। হিংসাদ্বেষপরতন্ত্র পীরা পরশ্রী কাতর হইয়া সর্বদা যে জর্জরানলে দগ্ধ হয় তাহাই তাহাদের পাপের প্রচুর শাস্তি। উপেন্দ্র মৈথিল পণ্ডিতের শাস্তি সম্ভোষণরী চতুষ্পাঠীতে সংস্কৃত অধ্যয়ন করিয়া সুশিক্ষায় এবং সংসংসর্গে লোভের উৎপীড়ন হইতে মুক্তিলাভ করিয়াছিলেন। কিন্তু মহেন্দ্রের প্রতি হিংসা দ্বেষ তাঁহার মনে প্রজ্বলিত ছিল। তিনি নিজ জননী এবং স্বজনবর্গের দূরবস্থা চিন্তা করিয়া সর্বদা দুঃখচিন্তাসাগরে মগ্ন

থাকিতেন। এক্ষণে মহেন্দ্রের সদাচার ও আত্মীয়গণের কুশল জানিতে পারিয়া তাঁহার সেই দীর্ঘ কালব্যাপী মনঃকষ্ট অপনীত হইল, জ্যোষ্ঠের প্রতি প্রীতিসঞ্চার হইল; মন পরিস্কৃত ও প্রফুল্ল হইল। মস্তক হইতে যেন একটা গুরুভার নামিয়া গেল; শরীর পাতলা হইল। তিনি বিমল আনন্দ অমৃভব করিলেন যেন কোন বহুমূল্য বস্তু লাভ হইল। কিন্তু কি লাভ হইল তখন তাহা বুঝিতে পারিলেন না।

উপেন্দ্র ছদ্মবেশেই সাতগড়ার পশ্চিম দ্বারে উপস্থিত হইলেন। গ্রহরী তাঁহাকে চিনিতে পারিল না। উপেন্দ্র নগর মধ্যে গিয়া পুরোহিত বাড়ী যাইবেন কি গোপালের বাড়ী যাইবেন এই চিন্তায় দোহুলামান হইলেন। কিঞ্চিৎ ইতস্ততঃ করিয়া গোপালের বাড়ী যাওয়াই স্থির করিলেন। উপেন্দ্র কষ্টে পড়িয়া অতীব কষ্টসহ হইয়াছিলেন। গ্রীষ্মকাল, মধ্যাহ্ন সময় সেই প্রথর রৌদ্রে ছত্রহীন চিম্টা কমণ্ডলু হস্তে অক্ষুন্ন ভাবে গোপাল সরকারের বাড়ী অভিমুখে চলিলেন। হিন্দু মুসলমানের কাচারী সর্বত্রই সকাল বেলায় হইত। আহাৰাস্ত্রে পরিশ্রম করা রোগের আকর এবং আয়ুক্ষয় কারক। এজন্ত লোকে পূর্নাহ্নে কাচারীর কার্য শেষ করিয়া মধ্যাহ্নে ঘরে আসিত এবং স্নানাহার করিয়া বিশ্রাম করিত। সেই রীতিক্রমে কাচারীভঙ্গ হওয়ায় গোপাল ক্ষুৎপিপাসায় আকুল ভাবে তাড়া-তাড়ি বাড়ী যাইতেছিলেন। পথে সন্ন্যাসী বেশী উপেন্দ্রের সহ সাক্ষাৎ হইল। উপেন্দ্র গোপালের প্রতি দৃষ্টি করিবামাত্র গোপাল তাঁহাকে চিনিলেন। নিকটে লোক থাকায় গোপাল কোন কথা না বলিয়া ইঙ্গিত করিলেন “আমার বাড়ী চলুন”। উপেন্দ্র মাথা নাড়িয়া সম্মতি প্রকাশ করিলেন। গোপাল পূর্ববৎ ত্রস্ত চলিয়া গেলেন, সন্ন্যাসীও যথাপূর্ব্ব ধীরে ধীরে চির পরিচিত গোপালের বাড়ী অভিমুখে চলিলেন। তাঁহাদের ইঙ্গিত অত্র কেহ লক্ষ্য করিতে পারিল না।

উপেন্দ্র গোপালের বাড়ীর নিকট নিমগাছের নিকট দাঁড়াইলেন। সন্ন্যাসী গৃহ প্রবেশ করিবেন না বলিয়া প্রকাশ করিলেন। গোপাল অভিপ্রায় বুঝিয়া তাঁহাকে বাগান বাড়ীতে স্থান দিলেন। বাঙ্গালী চাকর নিকটে থাকিলে হয়ত তাঁহাকে চিনিয়া ফেলিবে, এজন্ত একটি অন্নবুদ্ধি হিন্দুস্থানীকে সন্ন্যাসীর সেবার জন্ত নিযুক্ত করিলেন। আহাৰাস্ত্রে গোপাল ধন্দ্বালোচনার

উছিলায় সন্ন্যাসীর নিকট আসিলেন। একটি আদেশ করিয়া হিন্দুস্থানী চাকরটিকে স্থানান্তরে পাঠাইলেন। তখন নিভৃত পাইয়া গোপাল প্রণাম করত বিচ্ছেদ কাজের বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করিলেন। উপেন্দ্র সংক্ষেপে আত্মবৃত্ত বর্ণন করিয়া গোপালের অজ্ঞাত কালের ইতিহাস ও বর্তমান অবস্থার প্রশ্ন করিলেন। গোপাল কহিলেন, “আমিও ঠিক ঐরূপ শবমধ্যে লুকাইয়া জীবন রক্ষা করিয়াছিলাম। সন্ধ্যার পর উঠিয়া শোণ নদের জলে শরীর ধোত করিয়া জলপান করিলাম। তাহার পর আপনাকে অবেষণ করিলাম কিন্তু সেই অন্ধকার রাত্রিতে প্রকাণ্ড বিস্তৃত সমরক্ষেত্রে আপনার কোনই অলুসন্ধান করিতে না পারিয়া আপনি বিগ্ৰহমান নাই সিদ্ধান্ত করিলাম। তাহার পর নিজ কর্তব্য চিন্তা করিতে লাগিলাম। ক্ষুধা অত্যন্ত হইয়াছিল কিন্তু সঙ্গে কোন খাদ্য নাই কিহ্মা তাহা ক্রয় করিবার যোগ্য মূল্যও নাই। তবে এখন কি খাই, কোথায় যাই, কি করি? আমি ব্রাহ্মণ নহি যে ভিক্ষুক ভাবেও সন্মান পাইব অথচ নীচ জাতিও নহি যে মুটে মজুরের মত কষ্ট করিয়া দেশে যাইব। তবে সহুপায় কি? যদি বিপদের সময় একটা উপায় উদ্ভাবন না করিতে পারি তবে আমি কিসের কায়েত। এই অপবাদকেই সম্পদের হেতু করিতে হইবে। নানারূপ ফন্দি করিতে বসিলাম। একথানা তলোয়ার লইয়া বাহির হইলাম। আধক্রোশ অন্তর গ্রামে গিয়া আহারার্থ একটা বিলাতী কুছাণ্ড, ধোপা বাড়ী হইতে কিছু সাজিমাটী ও রিটা এবং কামার বাড়ী হইতে একখানা হুঁনকী, কয়লা ও শোলা চুরি করিয়া আনিলাম। এই সকল সামান্য জিনিষ কেহ সাবধানে রাখে না। আত্মরক্ষার জগ্ৰ ঈদৃশ তুচ্ছ পদার্থ চুরিকরা আমি পাপ কার্য্য বলিয়া জ্ঞান করিলাম না। হুঁনকীতে তলোয়ারের ঘা দিয়া কয়লা ধরাইয়া আলো করিলাম। কুছাণ্ডটি কাটিয়া তাহাদ্বারাই ক্ষুধা নিবৃত্তি করিলাম। মৃত সেনার মধ্য হইতে একটি ভাল পোষাক বাছিয়া লইলাম। রিটা ও সাজিমাটী দ্বারা তাহা পরিষ্কার করিলাম। প্রভাতে সেই বাদশাহী সৈনিকের পোষাক, চাপরাশ, কোমরবন্ধ, তলোয়ার লইয়া নিকটবর্তী গ্রামে গেলাম। তথায় দুইজন চাকর রাখিলাম, পালকী ভাড়া করিলাম। নিজের ও সেই চাকরদের কয়েকখান কাপড় পালকীতে পাড়িলাম। পালকী যোগে চাকরদের প্রদর্শন মতে দাননিয়া গ্রামে লালা মাতাদীন নামক এক কারস্থের বাড়ীতে

উপস্থিত হইয়া প্রকাশ করিলাম যে আমি মহাবৎ খাঁর নিযুক্ত বাদশাহী গোয়েন্দা এই স্থানীয় কোন কোন লোক শাহজাহানের দলে ছিল এবং কে কে অর্থদ্বারা, লোকদ্বারা বা রসদদ্বারা তাহার সাহায্য করিয়াছে আমি তাহা নিরূপণ করিব। আমি মাতাদীনোর বাড়ীতে বাসা করিলাম এবং নিজ উদ্দেশ্য সাধন বিধায় তাহার সাহায্য প্রার্থনা করিলাম।

“লালা মাতাদীন পূর্বে সরকারী চাকরী করিত, তখন তাহার অবস্থাও ভাল ছিল। একবে দেনা হইয়া পড়িয়াছিল। সে আমাৎ সঙ্গে নানারূপ আলাপ করিয়া আমি প্রকৃত সরকারী চাকর কি না তাহা পরীক্ষা করিতে লাগিল। আমরা উভয়েই পরস্পরের ভাব বুঝিতে পারিলাম। আমি মাতাদীনকে বলিলাম, তাই! আমিও কায়েত তুমিও কায়েত, যাহাতে উভয়ের লাভ হয় সেই চেষ্টা করাই উচিত, অনৈক্য হইলে উভয়েরই ক্ষতি। মাতাদীন কহিল, আপনি তাই মানিয়েই হয়। যদি ধরচা বাদ লভ্যাংশের অর্ধেক আমাকে দিতে স্বীকার করেন তবে আমি আপনকার চাকররূপে কাজ আরম্ভ করি, উভয়েরই বেশ লাভ হইবে। আমি কহিলাম, অর্ধেক নয়, দশ আনা ছয় আনা। সে বলিল, আপনি ফন্দী বাহির করিয়াছেন, আমি চেষ্টা করিয়া তাহা সকল করিয়া দিব, যা হউক আপনিনয় আনা নিন। আমি সন্মত হইলাম। নয় আনা সাত আনা ভাগ হির হইয়া কাজ আরম্ভ হইল। মাতাদীন আমার নিকট ২৫ বেতনের চাকরীর এক সনন্দ লইল। নিজ ঘর হইতে তাকিয়া, ছলিচা প্রভৃতি দিয়া আমার সরঞ্জাম করিয়া দিল। একজন পাচক ব্রাহ্মণও সংগ্রহ করিয়া দিল।

“লালা মাতাদীনোর সহিত আমার গুপ্ত বন্ধুত্ব হইল। কিন্তু প্রকাশে সে আমাকে মন্নিব বলিয়া মাত্ৰ করিত। সে গ্রামের চৌকিদার ডাকাইয়া আনিয়া এবং তাহার সহ যুক্তি করিয়া বিদ্রোহী দলভুক্ত লোকের তালিকা করিতে লাগিল। শাহজাহানের প্রভুত্ব কালে অধিকাংশ লোকই তাহার সাহায্য করিতে লাগিল। তাহাদের নাম ধাম প্রভৃতি ঠিকানা মাতাদীন ও চৌকিদার জানিত, কতক আমি নিজেও জানিতাম সুতরাং সহজেই বৃহৎ তালিকা প্রস্তুত হইল। আমি স্বকৃত কৃত্রিম গোয়েন্দা, কাহাকেও ধরিতে আমার অধিকার নাই। কেবল ভয় দেখাইয়া টাকা লওয়াই আমাদের উদ্দেশ্য। কাজেই কোন দরিদ্র

লোকে ধরিলাম না। যাহারা খুব বড় লোক, যাহাকে ধরিতে গেলে সন্দেহ দেখাইতে হইবে তাহাকেও ধরিলাম না। কাহারও উপর বেশী অত্যাচার করাও আমার অভিপ্রায় ছিল না। মধ্যস্থ অবস্থার অনেক লোক ধরিলাম। আমাদের চোটপাট দেখিয়া আমার ক্ষমতার সম্বন্ধে কেহ কোন সন্দেহ করিল না। ধৃত ব্যক্তিদের কাছে অল্প পরিমাণ টাকা লইয়া সকলকার প্রতিই অনুগ্রহ করিলাম।” মাতাদীন সকলকেই বলিল, ‘তোমরা আমার প্রতিবাসী আশ্রয় এবং নিতান্ত দয়ার পাত্র। কিন্তু বাদশাহের নিযুক্ত লালা সাহেব বড় কড়া মেজাজের লোক। আমি নিজে কিছু চাই না; তোমরা আমার মারফৎ চূপ করিয়া গোয়েন্দা লালা সাহেবকে কিছু দিলে আমি তাঁহাকে বুঝাইয়া কান্দাকাটি করিয়া তোমাদিগকে রক্ষা করিব।’ এই উপায়ে কোন ব্যক্তির উপর বেশী উৎপীড়ন না করিয়াও অনেকের নিকট অল্প অল্প যাহা আদায় করিলাম তদ্বারা মাতাদীনের দেনা শোধ হইয়া কিঞ্চিৎ সঞ্চিত হইল; আমারও দেশে যাইবার বেশ সম্বল হইল। ব্রাহ্মণ ভিক্ষুকদিগকে কিছু কিছু দান থয়রাতও করিলাম। পরে বাঙ্গালা দেশের বিদ্রোহীদের ঠিকানা করিবার ভাগ করিয়া ধুমধামে দেশে রওনা হইলাম। রাজমহলে আসিয়া পালকী ও পশ্চিমা চাকর বিদায় দিলাম। কয়েকজন বাঙ্গালী চাকর লইয়া নৌকাপথে দেশে রওনা হইলাম। পরিজন উদ্ধার করিয়া পদ্মার দক্ষিণ পারে গিয়া বাস করিব ইহা আমার ইচ্ছা ছিল। কিন্তু দেশে আসিয়া জানিলাম মহারাজ মহেন্দ্রনারায়ণের দয়ায় আমার পরিবার-বর্গ এবং আপনার মাতা মাতুলানো এবং আপনকার পক্ষীয় সমস্ত লোকেই সুখে আছে। তখন আমি মহারাজের শরণাপন্ন হইলাম। তিনি আমাকে ক্ষমা করিয়া পূর্ব চাকরী আবার দিয়াছেন, তিনি আমার নিকট আপনকার বিষয়ে অনুসন্ধান করিয়াছেন। আমি তাহাতে বলিয়াছি যে প্রতাপবাজুর যুদ্ধের পর কুমার উপেন্দ্র নারায়ণের সহ আমার আর সাক্ষাৎ হয় নাই, স্ততরাং তৎপরবর্তী কোন বৃত্তান্ত আমি জানি না।”

সেইদিনই বৈকালে গোপাল পাটরাণীর নিকট উপেন্দ্রের শুভাগমন সমাচার অতি সন্মোদনে দিলেন। পাটরাণী আনন্দে অধীরা হইয়া সাক্ষাৎ করিতে চাহিলেন। গোপাল কহিলেন, “কুমার বাহাদুরও আপনাকে দর্শন করিতে একান্ত উৎসুক। সন্ধ্যার সময় আপনি রঙ্গমহলের পাছের দরজা

খুলিয়া দোতালায় বলিয়া থাকিবেন। সেই স্থান সরদেওয়ালের অতি নিকট। তাহার অল্প দূরেই একটা দোল বেদী আছে। বেদীর ছই দিক বৃক্ষে ঢাকা। আমি কুমার বাহাদুরকে সেই দোল বেদীর উপরে, আনিব, তথায় আপনি স্পষ্ট দেখিতে পাইবেন, কেবল কথাবার্ত্তা হইবে না। কুমারের এখন দাড়ী গোঁপ হইয়াছে, তিনি সন্ন্যাসী বেশে আসিয়াছেন কেহ সহজে তাঁহাকে চিনিতে পারিবেন না। তাঁহার সহিত সাক্ষাতের এই এক মাত্র উপায়, অল্প কোন সজুপায় দেখা যায় না।” পাটরাণী কহিলেন, “রঙ্গমহলে মহেন্দ্রের উপ-পত্নীরা থাকে সেখানে আমার যাওয়া ভাল হয় না। বিশেষতঃ হঠাৎ যদি মহেন্দ্র সেখানে আসে তবে বড়ই লজ্জার বিষয় হইবে। আবার তাহার কারণ অনুসন্ধানও হইবে। বরং উপেন্দ্রের প্রকাশ হওয়াই ভাল। মহেন্দ্র যেরূপ ভাল মানুষ তাহাতে কোন ভয় নাই। সে উপেন্দ্রকে বেশ সুখে রাখিবে।” গোপাল কহিলেন, “না না! সে বড় কঠিন কথা। আমরা আজ চারি দিন হইল খবর পাইয়াছি যে জাহাঁগীর বাদশাহের মৃত্যু হইলে শাহজাহান বাদশাহ হইয়াছেন তিনি তাঁহার পূর্বের পরম শত্রু মহাবৎ খাঁকে ক্ষমা করিয়া পূর্বাশ্রয় দিয়াছেন। শুরজাহান বেগমকেও খুব সম্মান করিয়াছেন* অথচ বৈমাত্র ভাই উচ্চপদ দিয়াছেন। শুরজাহান বৈমাত্র ভাই নারায়ণও তাহাই করিতে পারেন। স্ত্রীলোক, অমাত্য, ভৃত্য ও প্রজাগণকে ক্ষমা করা সহজ কথা। তাহাতে ভবিষ্যতে কোন ভয় নাই বরং তাহাতে পুণ্য ও প্রতিষ্ঠা আছে। কিন্তু বৈমাত্রের ভাই রাজপদের প্রতিদ্বন্দ্বী তাহাকে ক্ষমা করিতে অনেক ভয় অনেক বাধা। ফলতঃ খুব ভাঙ্গরূপে না বুঝিয়া কুমারকে প্রকাশ হইতে দেওয়া হইবে না। আপনি কাহার নিকট কিছু ব্যক্ত করিবেন না। আপনি যদি রঙ্গ-মহলে গিয়া কুমারের সহ দেখা করিতে চান আমি তাহার উপায় করিতে পারি। মহারাজের তিনটা উপপত্নী সর্বদা পরস্পর ঝগড়া করে। আমি পরামর্শ দিয়া সেই বিবাদ মীমাংসার জন্য আপনাকে মধ্যস্থ করাষ্টব। তাহারা অমুরোধ করিয়া পায় ধরিয়া আপনাকে লইয়া যাইবে। আপনি তাহাদের সমস্ত কথা শুনিয়া তাহাদিগকে নীচতালায় নামাইয়া দিয়া বিচার বিবেচনার উচ্চতালায়

* শাহজাহানের সিংহাসনারোহণের পূর্বেই শুরজাহান বন্দিনী হইয়াছিলেন। শাহজাহান তাঁহার ভরণপোষণের জন্য রাজকোষ হইতে বার্ষিক পচিশ লক্ষ টাকা বৃত্তি প্রদান করিতেন।

রঙ্গমহলের ছাদে একাকিনী পাছেব দবজা খুলিয়া বসিবে। কুমার সাহেবের সহ দেখা হইবে। তাহার পর, সেই উপস্থিতির সম্বন্ধে যা হয় একটা লুকুম দিয়া আসিবে। এদিকে নকিব দ্বারা মহারাজকে আমি জানাইব যে, বাইজীদের অমুরোধে পাটরাণী মাতা তাহাদের শিবদ মিটাইতে অত্র বৈকালে রঙ্গমহলে যাইবেন, আপনি সাবধান হইবেন। মহারাজ এ সংবাদ পাইলে আজ বৈকালে বা রাত্রে গেল দিকেও যাইবেন না।” পাটরাণী কহিলেন, “গোপাল! আমি বরাবর তোমাকে বুদ্ধিমান বলিয়া জানি, তুমি এখন যাহা বলিলে তাহা তোমার ঘোষা কথা, খুব ভাল কথা। এখন বাবা, তোমার উপায় তুমিই চেষ্টা কর’রে যাহাতে উপেনকে এতকাল পর একবার দেখিতে পাই তাই কর,” গোপাল ‘যে আশ্রয়’ বলিয়া প্রণাম করত কার্য্য সাধন জন্য প্রস্থান করিল।

মেয়েলী বিবাদের বিচার করা বড়ই কঠিন কার্য্য। কেহই রীতিমত আশ্রয় বুঝান্ত বলে না। মধ্য হইতে দুই চারি কথা বলিয়াই অত্র পক্ষকে গালি দিতে আরম্ভ করে। অমনি প্রতিপক্ষও গালি দেয়। তখন তুমুল বাগ্মন্ত্র হইতে থাকে, তার পর চুলাচুলি মারামারিও হয়। মধ্যস্থ অপ্রস্তুত হইয়া ভয়কে ছাড়াইতে পারিলেই ক্লান্ত হন। পাটরাণী নিজে স্ত্রীলোক, তিনি জানিতেন যে মেয়েলী বিবাদের বিচার করা দেবগণেরও অসাধ্য। তাহা তাঁহারও উদ্দেশ্য ছিল না। তিনি রঙ্গমহলে উপস্থিত হইলেই তিন মাগী ঘোর বাগড়া আরম্ভ করিল। রাণী তাহাদের সেই বিবাদ ফাস্ত কবাব জন্য তিন জনকে তিন দিকে এতদূরে পাঠাইলেন যে একজন অত্রের গালাগালি শুনিতে না পায়। তাহার পর দাসীদের নিকট দুইচারি কথা শুনিয়া লইলেন। পরে দাসীদিগকে বলিলেন, “তোমরা দেবিবে যেন এই তিন বিটা কেহ কাহারো কাছে না যায়, আমি উপর তালায় বসিয়া স্থির চিত্তে বিবেচনা করে যা করা হয় করছি।” রাণী দোতালায় গিয়া সিঁড়ির কপাট বন্দ করিলেন। পাছেব কপাট খুলিয়া দোল বেদীর উপরে উপেক্ষকে সন্ন্যাসী বেশে দেখিতে পাইলেন। বয়োবৃদ্ধি ও ছদ্মবেশে উপেক্ষের বেক্রপ চেহারা হইয়াছিল, গোপালের নিকট না গুলিলে, রাণী তাঁহাকে চিনিতে পারিতেন না। উপেক্ষ জননীকে দেখিয়া প্রণিপাত করিলেন। মহারাণীও বহুকাল পরে পুত্রকে দেখিয়া আনন্দে আশীর্বাদ করিলেন। পরস্পর কথা বলিতে পারিলেন না কিন্তু মনের ভাব মনে অনুভব করিলেন। সন্ধ্যা অতীত হইল।

অন্ধকারে দৃষ্টিরোধ হইল। উপেন্দ্র নামিয়া গোপালের বাগানে চলিলেন।
 রাণী দোতারা হইতে নামিয়া বাইদিককে ডাকাইয়া কহিলেন, “আমি বুঝে
 দেখলাম দোষ তোমাদের কারোই নিজের নয়, তোমরা সূকলে অতি ভাল
 মানুষ, অত্রে ফৌশ দিয়া ঝগড়া লাগায়। আমি বলি, তোমরা সে সব
 কথা শুনে না—যারা ঝগড়া লাগায় তারা তামাসা দ্যাখে, কষ্ট পাও তোমরা;
 তোমরা একরাজার আশ্রয়ে আছ, খাওয়া পরা, অলঙ্কার কিছুই ছুৎ
 নাই, অনর্থক ঝগড়া করে কষ্ট পাও কেন? মহেন্দ্র আমার অতি সুবোধ
 ছেলে, অতি গম্ভীর—সে কারো খোশামোদে টলে না, কারো দ্বিষ্ট কথায়
 ভোলে না। বিধাতা যার ভাগ্যে যা লিখেছেন সে তা পাবে—তার কমও
 হবে না বেশীও হবে না। তবে যদি তিন জন তিন ভগ্নীর মত মিলে মিশে
 থাকে তবেই সুখ। আমার কথা শোনো, ঝগড়া ছেড়ে যাতে আহ্লাদ আমোদে
 সুখে থাকতে পার তাই করো। উত্তর না দেওয়াই ঝগড়ার জিত। যদি কেহ
 থামাথাই ঝগড়া করতে আসে, গালাগালি দেয়, তবে আমার কাছে নালিশ
 করিস, আমি তাকে একবারে ভাঙুড়ী রাজ্যের বাহির করে দিব।” তাঁহার কথায়
 সক্ষেই তুষ্ট হইল। তিনি ফিরিয়া আসিলেন তাঁহার প্রকৃত উদ্দেশ্য কেহই
 বুঝিল না।

রাত্রিতে আবার গোপালের সহ সন্ন্যাসীর ধর্মালোচনা ছলে কথোপকথন
 হইল। উপেন্দ্র কহিলেন, “অগ্রে ধোষ্ঠের মন আমার প্রতি কিরূপ তাহার গুঢ়
 অনুসন্ধান না জানিলে কর্তব্য স্থির করা যায় না।” গোপাল বলিলেন, “আমি
 কলাই তাহা জানিব।”

পরদিন কাচারীতে গোপাল মহেন্দ্রের হিতানুকথা উপস্থত করিলেন। সেই
 উপলক্ষে মহেন্দ্রের মন পরীক্ষার্থে কহিলেন, “বৈমাত্র ভ্রাতা চিরকালই পরম শত্রু।
 সম্রাট শাহজাহান বৈমাত্রদের বিদম্বাদে পিতৃদ্রোহী হইতে বাধ্য হইয়াছিলেন।
 এখন শাহরিয়ারের প্রাণদণ্ড করিয়া নিরাপদ হইয়াছেন। অত্রে কথায়
 কাজ কি, হজুরের বৈমাত্র উপেন্দ্রের কার্য্য স্মরণ করিলেই বৈমাত্র ভ্রাতা যে
 কি ভয়ানক শত্রু তাহা সহজে বোধগম্য হয়।” মহেন্দ্র বলিলেন, “সেটা তোমার
 ভ্রম। যেমন মাটিতে বীজ বুনিলে তদনুরূপ বৃক্ষ ও ফল হয় আবার সেই ফল
 হইতে নূতন বীজ, নূতন বৃক্ষ, নূতন ফল হইয়া ক্রমেই বৃদ্ধি পায় তেমনি

যে ব্যক্তি যেরূপ কাজ করে তদ্বংশে সেই দৃষ্টান্ত মত কার্য্য ক্রমেই বৃদ্ধি হইতে থাকে। ভ্রাতৃদ্রোহ তৈমুর বংশের চিরকলঙ্ক। সে বংশে সহোদর হউক বা বৈমাত্র হউক সকল ভাইই পরম শত্রু। এখন সেই ভ্রাতৃদ্রোহ হইতে ক্রমে পিতৃদ্রোহ উৎপন্ন হইতেছে। যে ঘরে ঝগড়া বিবাদ বরাবর আছে সে ঘরে সতীনে সতীনে, জায়ে ননদে, ভাই বোয়ে সর্ব্বদাই ঝগড়া হয়। তাহা না থাকিলে ঋগুড়ী বা শাড়িপড়নী সহ ঝগড়া হইয়া থাকে। যে ঘরে ঝগড়া নাই তাহাদের সতীনে সতীনেও ঝগড়া বিবাদ হয় না। আমাদের ঘরে কখন ভাই ভাই বিবাদ ছিল না স্মরণ্য হইতেও পারিত না। উপেন্দ্র অতি শিশু ছিল। তাহার মাতুল তাহাকে কুবুদ্ধি দিয়া গৃহ বিবাদের সূত্রপাত করিলেন। ইহা উপেন্দ্রের দোষ নহে। আমি উপেন্দ্রকে শত্রু মনে করি না। আমার কোন সন্তান হইল না, এখন উপেন্দ্র জীবিত থাকিলে তাহাদ্বারাই পিতৃলোকের জলপিণ্ড বহাল থাকিতে পারে। আমি উপেন্দ্রের জন্ত ঘোষণা দিতে চাই। সে আসিলে তাহাকে রাজত্ব দিয়া আমি কাশীবাস করিতে পারি। আমার বয়স বেশী হইয়াছে। এখন বিষয় ত্যাগ করিয়া ঈশ্বর চিন্তাই আমার কর্তব্য। কিন্তু উপেন্দ্র যে জীবিত আছে তাহা আমি আশা করি না। যদি ঘোষণা দিলেও সে না আসে তবে দত্তক পুত্র রাখিয়া বিষয় বাসনা ত্যাগ করিব।” এই বলিয়া মহেন্দ্র অশ্রুপূর্ণ নয়নে দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিলেন।

কাচারী ভঙ্গ হইলে গোপাল বাড়ী আসিয়া উপেন্দ্রের নিকট আনুপূর্ব্বিক সমস্ত কথা বলিলেন এবং মহেন্দ্রের স্নিগ্ধভাব অকৃত্রিম জানিয়া উপেন্দ্রকে প্রকাশ হইতে পরামর্শ দিলেন। কিন্তু উপেন্দ্রের মনে স্বতন্ত্র ভাব উদয় হইল। তিনি কহিলেন, “গোপাল দাদা! তুমি জ্যেষ্ঠের চরিত্র যেরূপ বলিতেছ আমিও তাহাই সত্য বোধ করি। অথথা আমি এখন ছদ্মবেশ ত্যাগ করিয়া তাঁহার শরণ লইতে ইচ্ছা করি না। তাহাতে আমার কাপুরুষতা হয়। যদি আমি কোনরূপ উন্নতি লাভ করিয়া তাহার পর জ্যেষ্ঠের অনুগত হই তবেই আমার পৌরুষ প্রকাশ হয় এবং প্রশংসা হয়। এখন উন্নতির সুবিধাও হইয়াছে। শাহজাহান এখন সম্রাট হইয়াছেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠ এবং প্রিয়তম পুত্র দারাবেগ আমাকে অত্যন্ত ভালবাসিতেন। এখন শাহজাদা দারাবের নিকট উপস্থিত হইলে অবশ্য কোন সম্রাট পদ পাইতে পারিব। তখন জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার অনুগত্য স্বীকার

করিব। অক্ষম ব্যক্তি অনুগত হইলে তাহাকে কেহ বিশেষ বিনীত বা ক্ষমা-পরায়ণ জ্ঞান করে না। আমি যদি ভ্রাতার সহ বিবাদ করিতে সমর্থ হইয়াও তাঁহার অনুগত হই তবেই জ্যেষ্ঠের নিকট আমার আদর হইবে এবং সকল লোকে আমার পূর্ব বিদ্রোহ কেবল শৈশবশুলভ চপলতার এবং কুমন্ত্রীগণের কুপরামর্শের ফল বলিয়া নিশ্চয় করিবে। এখন জানিলাম যে আমাদের পরিবার ও স্বজনগণ সকলেই স্মৃতে আছে সুতরাং আমাদের সে চিন্তা থাকিবে না। “এখন এই মহোন্নতির সুযোগ কদাচ অবহেলা করিব না। আমি অবশ্যই দিল্লী যাইব। তুমিও আমার সঙ্গে চল।”

গোপাল ইতস্ততঃ করিতে লাগিলেন। উপেন্দ্র চক্ষু বিস্তার করিয়া কহিলেন, “তুমি কি এখন আমাকে তুচ্ছ জ্ঞান কর?” গোপাল নম্রভাবে বলিলেন, “না, আপনি প্রভু আমি দাস, আপনার অবাধ্য হই আমার সাধ্য কি? তবে কোন প্রয়োজন মত সংপরামর্শ দেওয়া আমার অবশ্য কর্তব্য। এখানে আপনার জন্ত রাজত্ব প্রস্তুত তবে এখন আর দিল্লী গিয়া উন্নতি আবশ্যক বোধ হয় না। যদি দিল্লী যান তবে আগে রাজা হইয়া পরে যাইবেন। দরিদ্র ভাবে না গিয়া অমীরভাবে যাইলে ভাল হইবে।” উপেন্দ্র অমনি হস্তমুখে কহিলেন, “আমি তো আগেই বলেছি যে আমি দীন হীন অবস্থায় দাদার কাছে গিয়া অনুগ্রহপ্রার্থী হইতে চাহি না। তুমি আমার সঙ্গী হইবে কিনা তাই বল।” গোপাল স্বীকার করিলেন। উপেন্দ্র আবার বলিলেন, “বাদশাহী দরবারে আমার দরিদ্র ভাবে যাওয়া হয় না। পথে দরিদ্র ভাবে যাওয়াই ভাল। পথে বড় মানুষী দেখাইলে কেবল চোর ডাকাতির ভয় হয়। তুমি গয়াশ্রদ্ধ করিবার উচ্ছিয়ায় দাদার নিকট ছুটি লাভ। এক হাজার মাত্র টাকা ঘোটাও। দিল্লীতে গিয়া ভাল বাসা করিয়া, শাহজাদার সঙ্গে দেখা করিব। পাঁচ মোহর নজর দিতে হইবে। একমাস বাসা খরচ করিতে হইবে। বোধ হয় হাজার টাকায় সঙ্কুলান হইতে পারে।” গোপাল “যেআজ্ঞা” বলিয়া বিদায় হইলেন। পাটরাণীর টাকা, অলঙ্কার এবং দ্রব্যজাত বাহা ছিল মহেন্দ্র তাহা আত্মসাৎ করেন নাই সুতরাং গোপাল অতি সহজেই টাকা ঘোটাইলেন, অধিকন্তু পাঁচখান আকবরী মোহর, একটি হীরকাজুরী, একছড়া মুক্তার মালাও আনিলেন। তিনি নিজেও তীর্থযাত্রার ভাণ করিয়া মহেন্দ্রের নিকট ছুটি লইলেন এবং শুভক্ষণ দেখিয়া উভয়ে দিল্লী যাত্রা করিলেন।

ত্রয়োদশ অধ্যায় ।

উপেন্দ্রনারায়ণের দিল্লী যাত্রা ।—মহেন্দ্রের মৃত্যু ।—উপেন্দ্রের গৃহ প্রত্যাগমন ।

—মল্লিক উপাধি ।—চৈতন্য প্রচলন ।—বাণিজ্য ও দেশীয় উন্নতি ।

রাজধর্ম্য এবং ব্যক্তিগত ধর্ম্য প্রচুর বিভিন্ন । ভগবান নহু বিভিন্ন অবস্থার লোকের জন্ত ভিন্ন ভিন্ন কর্তব্য কর্ম্য নির্দেশ করিয়াছেন । জগতে সমস্ত লোকের অবস্থা কখন সমান ছিল না, এখনও নাই এবং ভবিষ্যতেও কখন হইবে না । সুতরাং তাহাদের কর্তব্য কর্ম্যও সমান হইতে পারে না । বেক্রপ কার্য্য করিয়া একজন সর্বত্র প্রশংসনীয় হয় ঠিক সেইরূপ কার্য্যেই অগ্রে নিতান্ত নিন্দনীয় কাপুরুষ মধ্যে গণ্য হয় । অনেকে দৈবগতিক কৃতকার্য্য হইয়াই প্রশংসনীয় ও পূজ্য হইয়াছেন । রোমের সম্রাট অগষ্টস্, দিল্লীর সম্রাট শের শাহ ও শাহজাহান, মহারাষ্ট্রপতি শিবজী যে উপায়ে রাজ্য লাভ করিয়াছিলেন তাহা অতি নিন্দনীয় । যদি তাঁহারা জয়ী না হইতেন কিংবা রাজ্য লাভের অনতিবিলম্বেই দীলাসম্বরণ করিতেন তবে তাঁহারা অতি জঘন্য ঘৃণিত লোক বলিয়া গণ্য হইতেন । কিন্তু তাঁহারা সৌভাগ্যক্রমে যেমন জয়ী হইয়াছিলেন তেমনি দীর্ঘকাল রাজ্য ভোগ করিতে পারিয়াছিলেন । সেই সময়ে তাঁহারা সৌভাগ্যের অতিনাত্র সম্ভবহার দ্বারা সুখ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন । তখন তাঁহাদের পূর্বকৃত কুকর্ম্ম ও সংকর্ম্ম মধ্যে পরিগণিত হইয়াছিল । পক্ষান্তরে দিল্লীর সম্রাট নসিরউদ্দীন অতি সদাশয় তপস্বী ছিলেন । তিনি রাজ্যের একটি পয়সা নিজ ভোগ বিলাসিতার জন্ত ব্যয় করিতেন না । *তিনি অতি সত্যবাদী জিতেন্দ্রিয় এবং দয়ালু ছিলেন । ধ্যান উপাসনা জপতপেই তাঁহার অধিকাংশ সময় ব্যয় হইত । তিনি রাজকার্য্য পর্যালোচনার সময় পাইতেন না । তাঁহার কর্ম্মচারীগণ প্রজার উপর অত্যাচার করিত । ফলতঃ তাঁহার রাজত্বে প্রজাগণের

* নসিরউদ্দীন পুস্তকের অভুলিপি করিয়া, তল্লক আয় দ্বারা নিজের জীবিকা নির্বাহ করিতেন । তাঁহার একমাত্র রাজ্যী ছিল ; তাঁহাকে স্বহস্তে সমুদায় গৃহকার্য্য সম্পন্ন করিতে হইত । একদা রজনকালে তাঁহার অভুলি দন্ধ হওয়ায়, তিনি একটা দাসীর জন্ত স্বামীর নিকট প্রার্থনা করেন । নসিরউদ্দীন তত্বরে বলেন, “আমি রাজ্যের রক্ষক মাত্র, হুতরাং রাজ্য অনর্থক ব্যয় করিতে পারি না ।” তাঁহার রাজত্বে প্রজাদিগের বিশেষ কষ্টের কোন স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায় না ।

বিশেষ সুখ ছিল না। পক্ষান্তরে অগষ্টস্, শের, শাহজাহান রাজধর্ম সম্মত সুশাসন দ্বারা নিজ কুকর্ম ও চরিত্রগত দোষ সম্বন্ধে রাজর্ষি বলিয়া যশোভাজন হইয়াছিলেন। তাঁহাদের রাজত্বে রাজ্যের কৃষি বাণিজ্য, শিল্প সাহিত্যের প্রচুর উন্নতি হইয়াছিল এবং প্রজাগণ সুখী ছিল।

উপেন্দ্র সন্ন্যাসীবেশেই সাতগড়া হইতে বাহির হইলেন। গোপালও গেরুয়া বসন ধারণ করিয়া একটি মাত্র ভৃত্য সহ তীর্থ যাত্রা সাঙ্গে বাহির হইলেন। নগরের এককোশ দূরে পূর্ব নির্দিষ্ট স্থানে উভয়ের সাক্ষাৎ হইল। তাঁহারা গয়া, কাশী, অযোধ্যা, প্রয়াগ, বৃন্দাবন আদি তীর্থ করিয়া দিল্লী গমন স্থির করিলেন। ব্যয় সঙ্কুলন ও বিপদাশঙ্কা লাঘব জন্ম তাঁহারা পদব্রজে দরিদ্র ভাবে চলিলেন। উপেন্দ্র দূরবস্থায় শিক্ষিত হইয়াছিলেন। তিনি প্রচণ্ড রৌদ্রে বিনা ছত্রে অগ্নান বদনে চলিলেন। তাঁহাদের ভৃত্য কালু ভুঁইমালীর মাথায় তলপী থাকায় তাহাকে বোদ্র তত বেশী লাগিল না। সে সেই বোঝা মাথায় করিয়া তীর্থদর্শন কুতূহলে পরমোন্মাদে যাইতে ছিল। গোপাল মহাবিপদে পড়িলেন। শারীরিক পরিশ্রম করা, বহুদূর পদব্রজে চলা, শীত গ্রীষ্ম রোদ বৃষ্টি সহ করা তাঁহার অভ্যাস ছিল না। তাঁহার বয়সও প্রায় পঞ্চাশ বৎসর হইয়াছিল। তিনি দুই কোশ পথ গিয়াই একান্ত শ্রান্ত ক্লান্ত হইয়া পড়িলেন। শরীরে ঘর্ম্মের স্রোত পড়িতে লাগিল, পায়ে বেদনা হইল এবং তৃষ্ণায় কণ্ঠ শুষ্ক হইল। অথচ রাজকুমার উপেন্দ্র যে কষ্ট করিতেছেন তিনি তাহা সহিতে পারেন না, একথা বলিতেও গোপালের লজ্জা বোধ হইল। তিনি অতি কষ্টে আরো এক কোশ গেলেন। উপেন্দ্র ও কালু কিছুদূর আগে গিয়া দেখেন গোপাল পাছে পড়িয়া আছেন। তাঁহারা বৃক্ষ ছায়ায় অপেক্ষা করেন আবার গোপাল নিকটে আদিলেই চলিতে আরম্ভ করেন। তাঁহাদের কতক বিশ্রাম হয়, বিপন্ন গোপালের বিশ্রাম করিবারও সুবিধা হয় না। বহু কষ্টে তিন কোশ গিয়া গোপাল একবারে অবসন্ন হইয়া পড়িলেন এবং জলপান উচ্ছিয়া বৃক্ষতলে বসিয়া পড়িলেন। সঙ্গীদ্বয়ও তাঁহার অনুরোধে বসিল।

অতি পরিশ্রমের পর হঠাৎ জলখাওয়াতে সর্দি গরমী হয়। এজন্ম গোপাল কিছুকাল বিশ্রাম করিতে লাগিলেন। পথশ্রমে তাঁহার বোধ হইল যে তিনি অবশ্যই দশ কোশের কম আদেন নাই। তিনি কালুকে তাঁহার পা টিপিতে

বলিলেন। কালু তামাক সাজিয়া দিয়া পা টিপিতে টিপিতে বলিল, “সরকার মশায়! এইটুকু আসিতেই এত—আপনি কয় বছরে গয়া যাবেন?” গোপাল বিরক্ত ভাবে বলিলেন, “যে দশ বার ক্রোশ এসেছি এই যথেষ্ট—রোজ যদি এত খানি যেতে পারি তবে বিশ দিনে গয়া পৌঁছিব। কেমন কুমার সাহেব! প্রতিদিন দশ ক্রোশ যাওয়া কম পথ নয়।” উপেন্দ্র বলিলেন, “হাঁ, প্রত্যহ দশ ক্রোশ সমানে চলিতে পারিলেই যথেষ্ট, কিন্তু তুমি প্রথম দিনই এইটুকু রাত্তা আসিতে যত কাতর হয়েছ তাতে রোজ যে তুমি পাঁচ ক্রোশ চলতে পারবে তাও আমার ভরসা হয় না।” গোপাল হতাশ্বাস হইয়া বলিলেন, “কুমার সাহেব! তীর্থ আমার মাথায় থাকুক—আমি ফিরে ঘরে যাই, প্রত্যহ এর চেয়ে বেশী চলা আমার সাধ্য নাই। আপনার নব্য বয়স আমি আধ বুড়ো আমাকে বিদায় দিন।” উপেন্দ্র কহিলেন, “দূরবর্তী স্থানে নিজের বিশ্বাসী একজন লোক না থাকিলে ভাল হয় না, তোমাকে ছাড়িতে পারি না, বরং নোকা বা গাড়ীযোগেই চলা যাবে তবু তোমার যেতেই হবে—বুজেছো গোপাল দা, তুমি বই আমার বিশ্বাসী লোক কেহ নাই।” গোপাল গলবন্ধে প্রণাম করিয়া কহিলেন, “আমার বড়দুর হাঁটা অভ্যাস নাই, নতুবা সাধ্যাতক আপনার কার্যে এ দাসের কোন ওজর নাই।”

কালু তখনও উপেন্দ্রকে চিনিতে পারে নাই। উভয়ের কথোপকথন শুনিয়া তাহার মনে সন্দেহ হইল। কালু জিজ্ঞাসা করিল, “সরকার মশায়, এ সন্ন্যাসী বাবাজী কে? তাকে আপনি “কুমার সাহেব” বলেন কেন এবং তাকে এত মাগ্ন করেন কেন?” গোপাল বলিলেন, “চুপ, চুপ, সাধু সন্ন্যাসীদিগকে এই রূপই বলিতে হয় এবং এইরূপ মাগ্নই করিতে হয়। পাছে তোর কথা শুনে রাগ হয় তাইতে বলি আর এরূপ কথা কখন মুখে আনিব না।” কালু অমনি চুপ করিল।

উপেন্দ্রের অনুমতি পাইয়া গোপাল নোকা ভাড়া করিলেন। নৌকায় রাজমহল পর্য্যন্ত গিয়া শেরশাহী সড়ক পাইলেন। তখন তাঁহারা উটের গাড়ী যোগে চলিলেন। গয়া, কাশী, অযোধ্যা, প্রয়াগ, মথুরা, বৃন্দাবন সন্দর্শন ও তীর্থ কার্য সমাধা করিয়া একশত দিনে দিল্লীতে উপস্থিত হইলেন। শাহ-জাহানের স্মৃশাসনে প্রকাশ্য সড়কে দস্যভয় ছিল না, স্মতরাং তাঁহারা পথে কোন বিপদে পড়েন নাই।

উপেন্দ্র দিল্লীতে সুবিধা মত একটি বাসা ভাড়া করিলেন, মোটামুটি সম্ভ্রান্ত লোকের যোগ্য করিয়া সাজ সরঞ্জাম খরিদ করিলেন, সন্ন্যাসী বেশ ত্যাগ করিয়া জামা জোড়া, পাগড়ী, পরিলেন। আলখাল্লার উপর কোমরবন্ধ ও গলায় মুক্তার মালা পরিলেন। তখন কালু চিনিতে পারিয়া গোপালকে কহিল, “সরকার মশায় ! এ সন্ন্যাসী বাবাজী কি আমাদের ছোট সাহেব ?” গোপাল হাসিতে হাসিতে বলিলেন, “এখন চিন্তে পাল্লি—দেখ্ দেখি পোষাকে মানুষের কত চেহারা বদলায়।” কালু বহুদিন পরে উপেন্দ্রকে দেখিয়া আহ্লাদে গদগদ হইয়া প্রণাম করিল।

উপেন্দ্র পালকী ভাড়া করিয়া শাহজাদা দারাশেকোর দরবারে চলিলেন। এক খানা ভাড়াটিয়া একাতে গোপাল তাঁহার সঙ্গে চলিলেন। দারা জানিডেন যে শোণ নদের তীরে তাঁহার রণশায়ী হইয়াছেন ; এখন তাঁহাদিগকে দেখিয়া দারা অতিশয় সমাদরে গ্রহণ করিলেন। দারা এখন বাদশাহের বড় পুত্র, তাঁহার অর্থ ও ক্ষমতা প্রচুর ছিল। তিনি অতি সৎলোক ছিলেন, বিপদ কালের বন্ধুদিগকে পুরস্কার করিতে তাঁহার ইচ্ছাও ছিল। তাঁহার সুপারিসে শাহজাহান উপেন্দ্রকে ৫০০ টাকা বেতনে ফৌজদারী কর্মে নিযুক্ত করিলেন এবং গোপালকে ১০০ টাকা বেতনে উপেন্দ্রের অধীনে মুন্সারিগী কর্ম দিলেন।

উপেন্দ্র হীনাবস্থায় জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার নিকট প্রকাশ হইতে লজ্জা বোধ করিয়াছিলেন। এখন সম্ভ্রান্ত পদস্থ হইয়া মহেন্দ্রকে সমাচার দেওয়া উচিত বোধ করিলেন। তিনি অতি বিনীত ভাবে ডাকযোগে মহেন্দ্রের নিকট পত্র লিখিলেন,—

“আমার কুমন্ত্রীর যখন আমাকে আপনকার বিরোধী হইতে পরামর্শ দিয়া ছিলেন তখন অল্পবুদ্ধি ও অনভিজ্ঞতা হেতু আমি কর্তব্যাকর্তব্য বুঝিতে না পারিয়া বিদ্রোহী হইয়াছিলাম। ধর্মের সুবিচারে আমি পরাস্ত হইয়া পলায়ন করত শাহজাহানের দলে মিলিয়াছিলাম। আমি পিতৃতুল্য জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার বিদ্রোহী ছিলাম, শাহজাহান প্রকৃতই পিতৃদ্রোহী ছিলেন। শোণ নদের তীরে ঘোর যুদ্ধে শাহজাহানের এবং আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত হইল। আমি ক্ষত বিক্ষত হইয়া বহু কষ্টে প্রাণ বাঁচাইয়া গঙ্গাতীরে উপস্থিত হইলাম। তখন আমার মনে অতিশয় অনুশোচনা হইল। রাজ্য, ধন, প্রভুত্ব জগৎ প্রলোভনই যে

আমার কুবুদ্ধি ও পাপের হেতু তাহা তখন আমি প্রথম বুঝিতে পারিলাম। আমার রাজসিক বুদ্ধি অন্তর্হিত হইল। আমি লোভ ত্যাগ করিয়া ব্রহ্মচর্যা গ্রহণে সংকল্প করিয়া জনকপুর নিরাসী মহোপাধ্যায় জগন্নাথ শাস্ত্রীর টোলে সংস্কৃত অধ্যয়ন করিলাম। তখন মনস্থ করিলাম যে ৬গয়াধামে গিয়া পিতৃলোকের পিণ্ডদান করত বরেন্দ্রভূমিতে গিয়া আপনকার পদানত হইয়া পূর্বকৃত পাপ ধোত করিব। তাহার পর যাজনিক ব্যবসায় দ্বারা নিষ্পাপ নির্লোভে জীবিকা নির্বাহ করিব। গয়াধামে গোপাল সরকারের সহ সাক্ষাৎ হইল। তাহার প্রমুখ্যৎ শাহজাহানের সাম্রাজ্য প্রাপ্তি সংবাদ শুনিয়া আবার লোভে পড়িলাম। শাহজাদা দারা আমাকে বড় ভাল বাসিতেন। আমি ও গোপাল তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলে তিনি সুপারিস করিয়া আমাকে দিল্লীতে ফৌজদারী কর্ম দিয়াছেন এবং হাজার সেনার উপর মনসব্দারী দিয়াছেন। গোপাল ১০০ টাকা বেতনে আমার অধিনে মনসারিম হইয়াছে। তাহার ভৃত্য কালু ভূঁইয়ানীও এখানে আছে। খোরাসানে যুদ্ধ যাত্রার জন্য সম্রাট শাহজাদা দারাকে বরণ করিয়াছেন। বোধ হয় তাঁহার সঙ্গে আমারও যাইতে হইবে। জীবন অনিত্য, বিশেষতঃ যুদ্ধার্থীদের জীবনের ক্ষণকালও ভরসা নাই। আমি যদি আপনকার আশীর্বাদে মঙ্গল মত ফিরিয়া আসি তবে শ্রীচরণ দর্শন করিব। নতুবা এই পত্র দ্বারাই এই জন্মের মত বিদায় গ্রহণ করিলাম। আমি লজ্জা ও নির্বেদ বশতঃ এতদিন কোন সমাচার লিখি নাই। আপনি বাৎসল্য গুণে এই নরাদমকে ক্ষমা করিবেন। আমার প্রাণগতিক মঙ্গল জানিবেন। জননী দেবীকে ও অন্যান্য গুরুজনকে আমার মঙ্গল জানাইবেন। গোপাল ও কালুর মঙ্গল সংবাদ তাহাদের বাড়ীতে দিবেন। সতত তথাকার মঙ্গল সংবাদ জানাইয়া চিন্তা দূর করিবেন।”

বাদশাহী আমলে সমস্ত সুহরে এবং পরগণার সদর কশ্বাতে ডাকঘর ছিল। অধ্বারোহী বরকন্দাজগণ এক ডাকঘর হইতে অন্য ডাকঘরে চিঠি পৌঁছাইত। প্রতি ডাকঘরে একজন ডাকমুনসী ও একটি পেয়দা থাকিত। টিকিট ছিল না, রেজেষ্টরী করা ছিল না। সমস্ত চিঠি বেয়ারিং যাইত। সমস্ত সরকারী চিঠি ও রাজা জমিদারদের চিঠি পেয়দা গিয়া বিলি করিত। অন্যান্য চিঠি বিলি হইত না। লোকে ডাকঘরে তত্ত্ব করিয়া মাগুল দিয়া নিজ নামিক চিঠি লইয়া যাইত।

দূরত্ব অনুসারে মাণ্ডল কমবেশী হইত । জমিদারদিগের বাড়ীতে বিলি হওয়ার জন্য বার্ষিক শুদ্ধ দিতেন । সেই শুদ্ধদ্বারা ডাকমুনসার বেতন, পেয়দার বেতন এবং ডাকঘর হইতে জমিদারদের বাড়ী যাইবার রাস্তা মেরামত নির্বাহ হইল । জমিদারদের চিঠির কোন মাণ্ডল লাগিত না । ইহাতে জমিদারদের প্রচুর সুবিধা ও সম্মান হইত । এখনও সেই বাদশাহী নিয়মের অনুসরণে ইংরেজ গবর্ণমেন্ট জমিদারদের নিকট ডাক সেস্ লইয়া থাকেন । কিন্তু এখন তাহাতে জমিদারদের কোন লাভ বা সম্মান নাই । কারণ সর্বসাধারণের ন্যায় তাঁহাদের চিঠিতেও মাণ্ডল লাগে এবং সকল চিঠিই সমানে বিলি হয় । মাণ্ডল বাকি থাকায় তখন কোন চিঠি খোয়া যাইত না স্মতরাং রেজেষ্টরী করার তুল্য ফল হইত । তখন চিঠির ওজন ধরিয়া মাণ্ডল কম বেশী হইত না । কিন্তু তখন অপর লোকের চিঠি পাইতে অনেক বিলম্ব হইত । দিস্তর চিঠি ডাকঘরেই পড়িয়া থাকিত এবং বৎসরান্তে দগ্ধ হইত । কিন্তু সরকারী চিঠি ও জমিদারদের চিঠি পৌছিতে কিছুনাত্র গোণ বা গোলযোগ হইত না ।

মহেন্দ্র বহুকাল পরে উপেন্দ্রের পত্র পাইয়া অতিশয় মনোযোগপূর্বক পাঠ করিলেন । তখন তিনি জানিলেন উপেন্দ্র জীবিত আছে, সে যে তাঁহার বিরোধী হইয়াছিল তাহা কেবল কুপরামর্শ ও বালচাপল্য জনিত, উপেন্দ্র কাপুরুষ নহে, সে নিঃসহায়ে কেবল নিজ চেষ্টায় সংস্কৃত পড়িয়া পণ্ডিত হইয়াছে এবং সম্রাটের প্রিয় হইয়া উন্নত পদ পাইয়াছে, সে এখন তাঁহার অনিষ্ট করিতে সমর্থ হইয়াও অল্পগত হইতেছে স্মতরাং উপেন্দ্র তাঁহার প্রকৃত ভক্ত । এই আলোচনায় তাঁহার হৃদয় আত্মলাভে পরিপূর্ণ হইল । চক্ষে আনন্দাশ্রু পড়িল । তিনি চিঠিখানি বারম্বার পাঠ করিলেন । সমস্ত সভাস্থ লোককে পড়িয়া শুনাইলেন । সমস্ত ঠাকুর বাড়ীতে পূজা ও ভোগ দিতে হুকুম দিলেন । তিনি কাচারী হইতে উঠিয়া নিজে বাড়ীর ভিতর গিয়া উপেন্দ্রের মাতাকে এবং সমস্ত অন্তঃপুরিকাগণকে উপেন্দ্রের পত্র শুনাইলেন । সেই পত্র শুনিয়া সকলেই আত্মলাভিত হইল এবং উভয় ভ্রাতার মাহাত্ম্য কীর্তন করিতে লাগিল । পাটরাণী পুত্রের উন্নতি শুনিয়া পরমানন্দ লাভ করিলেন কিন্তু উপেন্দ্রের সহ যে মধ্যে তাঁহার দেখা হইয়াছিল তাহা প্রকাশ করিলেন না । তিনি মহেন্দ্রকে কহিলেন, “উপেন্দ্র যুদ্ধে যাইবে শুনিয়া আমার মন বড়ই উদ্বিগ্ন হইল ।

তাহাকে বহুদিন দেখি নাই তাহাকে বাড়ী আসিতে লিখিয়া পাঠাও। আর তাহার সুপাত্রী ঠিকানা করিয়া বিবাহ দেও।” মহেন্দ্র কহিলেন, “আপনকার যে আজ্ঞা আমারও সেই ইচ্ছা। উপেন্দ্রের সন্তান হইলেই গোড়বাদশাহের বংশ থাকে।” মহেন্দ্র প্রথমতঃ মনে করিলেন যে তিনি নিজে দিল্লী যাইবেন। পথি মধ্যে গয়া, কানী, প্রয়াগ, অযোধ্যা, নৈনিষারণ্য, মথুরা, বৃন্দাবন দর্শন করিয়া শেষে উপেন্দ্রকে লইয়া আসিবেন, কিন্তু তিনি উপেন্দ্রের পত্রে দেখিলেন যে উপেন্দ্র যুদ্ধোপলক্ষে খোরাসান যাইবে। তাহার সহ যদি সাক্ষাৎ না হয় তবে সমস্ত পরিশ্রম ও ব্যয় অনর্থক হইবে। এজন্ত অগ্রে পত্র লিখিয়া বৃত্তান্ত জানা আবশ্যক বোধ করিলেন।

উপেন্দ্র যে সন্ন্যাসী বেশে সাতগড়ায় আসিয়াছিলেন সে কথা তিনি নিজ চিঠিতে প্রকাশ করেন নাই। পাটরাণীও তদ্বিষয়ক কোন কথা মহেন্দ্রের নিকট বা অত্নের নিকট প্রকাশ করিলেন না। কাজেই মহেন্দ্র তাহা কিছুই জানিতে পারিলেন না। তিনি উপেন্দ্রের পত্রের উত্তরে লিখিলেন যে, “তুমি কেবল মাত্র নিজ চেষ্টায় সংস্কৃত এবং সম্রাট শাহজাহানের প্রিয় পাত্র হইয়া উচ্চপদ লাভ করিয়াছ, ইহাতে আমি আরো আশ্চর্য্যাদিত হইলাম। চাকরী করিবার দুইটি উদ্দেশ্য, তন্মধ্যে প্রথম উদ্দেশ্য অথোপার্জন আর দ্বিতীয় উদ্দেশ্য নিজ কৃতিত্ব প্রদর্শন। তুমি যে পাণ্ডিত্য লাভ করিয়াছ এবং বাদশাহের প্রিয় হইয়া উচ্চপদ লাভ করিয়াছ তাহাতে কৃতিত্ব প্রদর্শন যথেষ্ট হইয়াছে। তোমার অর্থোপার্জনের কোন প্রয়োজন নাই। আমি ক্রমে তিন বিবাহ করিয়াছি কোন সন্তান হয় নাই। আমি এখন বৃদ্ধ হইয়াছি, বৈষয়িক চিন্তাতে আর লিপ্ত থাকিতে ইচ্ছা নাই। আমার ইচ্ছা যে এখন তীর্থবাসী হইয়া জীবনের শেষাংশ ঈশ্বর চিন্তাতে অতিবাহিত করি। আমাদের রাজত্ব বহুপুরুষ যাবৎ চলিতেছে কিন্তু কখন দত্তক পুত্রদ্বারা বংশরক্ষা করিতে হয় নাই। তজ্জন্ত দত্তক রাখিতে আমার ইচ্ছা নাই। তুমি আসিলে আমি রাজত্ব তোমাকে দিয়া তীর্থ যাত্রা করিব। আমাদের পৈত্রিক যে সম্পত্তি আছে তাহাই তোমার সুখ ভোগের জন্ত যথেষ্ট। অতি লোভী হওয়া ব্রাহ্মণের পক্ষে ধর্ম্য বিরুদ্ধ। গুরুতর প্রয়োজন ভিন্ন যুদ্ধব্রতী হওয়াও ব্রাহ্মণের পক্ষে দূষ্য। বিশেষতঃ যুদ্ধের প্রতি মুহূর্ত্তে জীবন সংশয়। তোমার অভাব হইলে গোড়বাদশাহের বংশ লোপ হইবে। অতএব তুমি চাকরী ত্যাগ করিয়া অবিলম্বে দেশে আসিয়া পৈত্রিক রাজত্ব গ্রহণ

কর এবং বিবাহ কর। আর তোমার বিদেশে থাকা অনুচিত। তুমি আমার কনিষ্ঠ ভ্রাতা কিন্তু বয়সে সন্তানের তুল্য। তুমি আমার কথা কদাচ লজ্জণ করিও না। আর গাটরাণী মাতারও তাহাই একান্ত ইচ্ছা। তোমার যুদ্ধ যাত্রার কথা শুনিয়া তিনি নিতান্ত উদ্বিগ্ন হইয়াছেন এবং তোমাকে অবিলম্বে দেশে আসিতে অনুরোধ করিতেছেন। সেই মাতৃআজ্ঞা পালন তোমার সর্ব্বথা কর্তব্য। মাতুল মহাশয় তোমাকে রাজপদ দিবার জন্য ভোমার শৈশব কালে যে বিবাদ উপস্থিত করিয়াছিলেন তজ্জন্ত আমি তোমাকে কিছুমাত্র দোষী জ্ঞান করি নাই। সে সমস্ত অপরাধই মৃত মাতুল দিনমণি সান্যাল মহাশয়ের ছিল, তাহা আমি জানি। তাঁহার পাপের শাস্তি তিনি পাইয়াছেন। অত্ৰ কাহারও কোন অপরাধ নাই তজ্জন্ত আমি অত্ৰ কাহারও দণ্ড করি নাই। সেজন্য তোমার কোন লজ্জা কিংবা ভয় করা অনাবশ্যক স্মরণে ক্ষমা প্রার্থনাও অনাবশ্যক। এখানে সকলের মঙ্গল জানিবে এবং গোপাল সরকার ও কালু ভূঁইয়ামণীর পারিবারিক মঙ্গল তাহাদের জানাইবে। অবিলম্বে তোমাদের মঙ্গল সংবাদ লিখিয়া চিত্তা দূর করিবে। আর প্রচণ্ড খুঁড়া মহাশয়ের যদি কোন সংবাদ জানি তবে তাহাও আমাকে জানাইবে।”

এই চিঠি পাইবার পূর্বেই শাহজাদা দারা যুদ্ধ যাত্রা করিয়াছিলেন। উপেন্দ্র তাঁহার সঙ্গে গিয়াছিলেন। গোপাল দিল্লীতে ছিল। চিঠি দিল্লীতে পৌঁছিলে গোপাল ঠিকানা বদলাইয়া “শাহজাদা দারার লস্কর ছাউনী” বলিয়া ঠিকানা লিখিয়া দিলেন। উপেন্দ্র ছাউনীতে চিঠি পাইয়া তত্বতরে লিখিলেন যে, “আমি শাহজাদা দারার নিজ সেনার অধ্যক্ষরূপে নিযুক্ত হইয়া অতি সম্মানে আছি। এখন ছুটি চাহিলে ছুটি পাইব না বরং শাহজাদা আমাকে ভীকু বিবেচনায় উচ্চপদ হইতে নিম্নতর পদে অবনত করিবেন। এজন্য যুদ্ধের অবসান পর্য্যন্ত আমার অপেক্ষা করিবেন। যদি যুদ্ধ শেষ পর্য্যন্ত জীবিত থাকি তবে গিয়া শ্রীচরণ দর্শন করিব। প্রচণ্ড খুঁড়া রোহিলখণ্ডের গুবোদার হইয়াছেন এইরূপ সংবাদ জানি কিন্তু তাঁহার সহ আমার সাক্ষাৎ হয় নাই। গোপাল ও কালু দিল্লীতে আছে।”

ইহা পূর্বেই বলা হইয়াছে যে তৎকালীন চিঠির মাণ্ডল ওজন অনুযায়ী হইত না, দূরত্ব অনুসারে হইত। বাঙ্গালা দেশ হইতে দিল্লীতে একখানি চিঠি পাঠাইলে তাহার মাণ্ডল কিছু কমবেশি ১০ একটাকা চারি আনা লাগিত। সেইজন্য মহেন্দ্র

একমাত্র উপেক্ষার চিহ্নিতে এত বিভিন্ন ব্যক্তির সমাচার জানিতে চাহিয়াছিলেন। তৎকালে তদ্রূপই রীতি ছিল। কেননা প্রত্যেক ব্যক্তিকে পৃথক চিঠি পাঠাইলে, মাণ্ডল খুব বেশী লাগিত অথচ এক পত্র বৃহৎ হইলেও মাণ্ডল বেশী হইত না।

দারা বাদশ্বর্গ পার হইলেই উজ্জ্বকদের সহ যুদ্ধ আরম্ভ হইল। অম্বরের রাজা জগৎসিংহ বাদশাহী সেনার নায়ক ছিলেন; উপেন্দ্র দারার নিজ সেনার নায়ক ছিলেন। দারা সর্বোপরি কর্তা ছিলেন। তিনি যেমন হিন্দুপ্রিয় ছিলেন তেমনই হিন্দুবাও তাহার একান্ত অনুগত ছিল। উজ্জ্বক, কাল্মক, সেল্জাক, কালশাক প্রভৃতি দুর্দান্ত তান্ত্রিক জাতি বারংবার পরাস্ত হইয়া দারার অধীনতা স্বীকার করিল। কেবল সনরখণ্ড ও বোখার দুর্গ ভিন্ন সমস্ত তুরান ও খোরাসান দারার হস্তগত হইল। দারা স্বয়ং সনরখণ্ড অবরোধ করিলেন এবং বোখার অধিকার জন্ত রাজা জগৎসিংহকে পাঠাইলেন।

উজ্জ্বক সেনাপতি মির্জা আখর বুঝিলেন যে, দিল্লীপতির রাজপুত সেনা সম্মুখ যুদ্ধে অজেয়। সুতরাং তৈমুর বংশের পুরাতন রাজ্য আবার তাহাদের দখল হওয়া অনিবার্য। আখর কোন প্রতিকারের উপায় করিতে না পারিয়া স্বপক্ষীয় অমাত্যগণের পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিলেন। তাহারা সম্মুখ যুদ্ধ ত্যাগ করিয়া ঔৎপাতিক যুদ্ধ করিতে পরামর্শ দিল। মীর খাদিম আলি নামক এক জন সৈয়দ বহুদিন ভারতবর্ষে ছিল। সে কহিল যে, “মহামোগল যে তৈমুর সন্তান এবং এই দেশীয় মুসলমান তাহা জানাইতেই তান্ত্রিক জাতি সহজে দারার অধীনতা স্বীকার করিতেছে। আপনি ঘোষণা করুন যে তৈমুর সন্তান হিন্দুস্থানে গিয়া আধা কাফের হইয়াছে। তাহারা হিন্দুর কন্যা বিবাহ করে। শাহজাহান বাদশাহ নিজে এবং তাঁহার পুত্র দারা উভয়েই হিন্দুদ্বারীর গর্ভজাত। তাহাদের সেনাপতি ও প্রধান প্রধান কার্য্যকারকগণ সকলেই হিন্দু। তুরান মহামোগলের দখল হইলে, তাঁহার হিন্দু কুটুম্বেরা গুবোদার হইবে। তাহাতে প্রকৃতপক্ষে তুরানে হিন্দুদেরই আধিপত্য হইবে। হিন্দুরা অতি নিষ্ঠুর কাফের। তাহারা মুসলমান প্রজা ধরিয়া দেবদেবীর পূজায় বলিদান করিবে। ফলতঃ তাহাতে ভুরাণে মুসলমানদের ধর্ম্ম ও ধন প্রাণ রক্ষা হওয়া কঠিন হইবে। এইরূপ ঘোষণা হইলে প্রজারা মহামোগলের বিরোধী হইয়া উঠিবে। আমি

চেষ্ঠা করিয়া দারার নিজ সেনা মধ্যে মুসলমানদিগকে বিদ্রোহী করিয়া তুলিব । তাহা হইলেই আমাদের মঙ্গল নতুবা আমাদের রক্ষার আর কোন উপায় নাই ।”

মির্জা আখর মন্ত্রীদের পরামর্শ মত বন্দ যুদ্ধ ত্যাগ করিয়া আন্ধন্দীগণকে উৎপাত করিতে লাগিলেন । অত্ৰদিকে খাদিম আলির পরামর্শ মত ঘোষণা করিয়া প্রজাগণকে মোগল সেনার বিরোধী করিয়া তুলিলেন । দারার মুসলমান সেনা কতক বিদ্রোহী হইয়া বিপক্ষে যোগ দিল । যাহাদের হিন্দুস্থানে সম্পত্তি ছিল তাহারা স্পষ্ট বিদ্রোহী হইল না বটে কিন্তু কর্তব্য কার্যে প্রচুর শৈথিল্য করিতে লাগিল । দারা নিজ অম্লরক্ত হিন্দু সেনার বিক্রমে বহু যুদ্ধে জয়ী হইলেন বটে কিন্তু তুরাণ দখল করিতে অসমর্থ হইলেন । তাঁহার সেনা যেখানে যায় অমনি সেখান হইতে সমস্ত প্রজা পলায়ন করে ; তাঁহার সেনা সরিয়া গেলেই তান্ত্রার জাতি সে স্থান আবার অধিকার করিল । দেশে হুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইল । দারা কাবুল হইতে রসদ আনাইলেন । আখর পথিমধ্যে সেই রসদ লুণ্ঠ করিতে চেষ্ঠা করিলেন কিন্তু পারিলেন না । সমস্ত দেশ উৎসন্ন প্রায় হইল । তখন আখর সন্ধির প্রস্তাব করিলেন । দারা দেখিলেন তুরাণ অধিকার করা অসাধ্য । সুতরাং তিনিও সম্মত হইলেন । মির্জা আখর দিল্লীপতির অধীনতা স্বীকার করিয়া বার্ষিক পঞ্চাশ হাজার টাকা নালবন্দি দিতে প্রতিশ্রুত হইলেন ; নগদ দুই লক্ষ টাকা এবং তিন শত উৎকৃষ্ট ঘোড়া উপঢৌকন দিলেন । দারা তাহাই লইয়া মানে মানে ফিরিয়া আসিলেন । আখর নালবন্দির টাকা কখনই দেন নাই এবং মহামোগলগণও তাহা আদায়ের চেষ্ঠা করেন নাই । বাস্তবিক নালবন্দি দিবার চুক্তি কেবল মহামোগলের সম্মান রক্ষার্থেই সন্ধিপত্রে লিখিত হইয়াছিল ; তাহা যে প্রকৃত পক্ষে দেওয়া হইবে না, তাহা উভয় পক্ষই বুঝিয়া ছিলেন ।

দারা প্রত্যাগমন করিয়া পিতার নিকট জগৎসিংহ ও উপেন্দ্র খাঁর প্রশংসা করিলেন এবং মুসলমান কর্মচারীর নিন্দা করিলেন । মুসলমান সহ তাঁহার পূর্বাবধি অসন্তোষ ছিল সেই ভাব আরো বর্দ্ধিত হইল । উপেন্দ্র পাঁচ হাজারী মনসবদার উপাধি পাইলেন এবং মালবের গুবেরদার নিযুক্ত হইলেন । তাঁহার সেই সকল সনন্দ এখনও বিद्यমান আছে ।

উপেন্দ্র দিল্লীতে ফিরিয়া আসিবার সংবাদ পাইবামাত্র মহেন্দ্র তাঁহাকে

বাড়ীতে আসিতে অনুরোধ করিলেন। কিন্তু উপেক্ষা এতবড় উচ্চপদ পাইয়া তাহা কিছু দিন ভোগ না করিয়া বাড়ীতে বাইতে সম্মত হইলেন না। তিনি এক বৎসর কাল মালবের গুবেরদারী করিয়া ছুটি লইলেন এবং নৌকা পথে গোপাল ও কালুকে সঙ্গে লইয়া দেশে রওনা হইলেন। তিনি নৌকায় বাইতে বাইতে পথে যেখানে কোন ডাকঘর পাইতেন সেখান হইতেই জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে চিঠি পাঠাইতেন। অথচ তাঁহার কোন নির্দিষ্ট ঠিকানা না থাকায় তিনি নিজে কাহারও কোন চিঠিপত্র পাইতেন না। দিল্লী আগরা হইতে তাঁহার বাড়ী পর্য্যন্ত সমস্ত রাস্তাতেই নদীর ভাটি। ভাটিয়াল নৌকার গায় স্রুথের যান তখন আর ছিল না, স্রুতরাং উপেক্ষা অতি স্রুথে অতি দ্রুতবেগে অগ্রসর হইলেন। স্বদেশের এবং স্বজনগণের প্রতিমূর্ত্তি তাঁহার মনে উদিত হইল। তিনি তাহাদের সহ কিরূপ আলাপ ও ব্যবহার করিবেন দিবানিশি তাহাই চিন্তা করিতে করিতে সাতগড়ার ঘাটে উপস্থিত হইলেন। সেই দিনই কিছুকাল পূর্বে মহেন্দ্রের মৃত্যু হইয়াছিল। উপেক্ষা বিলের ঘাটে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার জলস্ত চিতা দেখিয়া শোকে রোদন করিলেন। তিনি চিতা সংস্কার ও পূরক পিণ্ডদান প্রভৃতি শেষ কর্তব্য সম্পাদন করিয়া শোকসন্তপ্ত হৃদয়ে সন্ন্যাসী বেশে গৃহে গমন করিলেন।

মহেন্দ্র মৃত্যুর পূর্বে পাটরাণী মাতাকে বলিয়াছিলেন যে, “আমি উপেক্ষার যে শেষ চিঠি পাইয়াছি তদুপে বোধ হয় উপেক্ষা দুই এক দিন মধ্যেই বাড়ীতে পৌঁছিব, কিন্তু আমার সহ সাক্ষাৎ হইল না ইহাতে বড়ই দুঃখ থাকিল। আপনি তাহাকে আমার শেষ উপদেশ জানাইবেন যে, সে যেন আর বিদেশে এবং মোগল দরবারে চাকরী না করে। মোগল রাজবংশে পিতৃদ্রোহ ভ্রাতৃদ্রোহ প্রবল কুপ্রথা। যে সম্রাট হয় সেই নিজ ভ্রাতৃকুল নিশ্চল করে। তাহাদের একজনের পক্ষ হইলে অগ্রজন দ্বারা সর্বনাশ হইতে পারে। এজন্ম বাদশাহী দরবার হইতে দূরে থাকাই উত্তম। আমাদের নিজ সম্পত্তি যাহা আছে তাহাই যথেষ্ট।” তিনি এই বলিয়া মালখানা ও তোবাখানার চাবি পাটরাণীর হাতে দিয়া চিরবিদায় লইয়াছিলেন। উপেক্ষা নির্বিবাদে রাজত্ব লাভ করিলেন।

মহেন্দ্র অতি ধার্মিক এবং কার্যদক্ষ লোক ছিলেন। তৎকালে উপপত্নী রাখা অপকর্ম্ম মধ্যে গণ্য ছিল না। মহেন্দ্রের তিন পত্নী সত্ত্বেও অনেক উপপত্নী ছিল। বহুস্ত্রী সংযোগে উৎপাদিকা শক্তি নষ্ট হয়। তজ্জন্মই বোধ হয়

মহেন্দের সন্তানাদি হয় নাই । স্ত্রীলোকের যেমন বহুপুরুষ সংযোগে অতিকর্ষণ দোষ হয় এবং উৎপাদিকা শক্তি নষ্ট হয়, পুরুষের ঠিক ততদূর না ইউক কতক পরিমাণে সেই দোষ হইয়া থাকে । বিলাসী ধনীদেব যে প্রায়শঃ সন্তান হয় না তাহা এই দোষের প্রমাণ বলিয়া অনুমান হয় ।

মহেন্দের রাজত্ব সময়ে বাঙ্গালা দেশে বহুবিধ দুর্ঘটনা হেতু দেশ প্রায় অরাজক হইয়াছিল । উড়িষ্যার পাঠান কর্তৃক রাঢ় অঞ্চল বারংবার লুণ্ঠিত হয় । মগ ও পটু গিজেরা সন্দীপ দ্বীপে আড্ডা করিয়া পূর্ব-দক্ষিণ বাঙ্গালা লুণ্ঠ করিয়া উৎসন্ন করিয়াছিল । চন্দ্রদ্বীপের রাজাদের রাজ্য বাঙ্গালা দেশের মধ্যে অতীব সমৃদ্ধিশালী ছিল । পটু গিজদিগকে তৎকালে হাব্রী বলিত । সন্দীপস্থিত হাব্রীদের দোরাঙ্কে সেই চন্দ্রদ্বীপের সোণার রাজত্ব ছারখার হইয়াছিল । চন্দ্রদ্বীপের রাজবংশীয়েরা পলায়ন করিয়া মাধবপাশা গ্রামে গিয়া বাস করিয়াছিলেন । তদবধি তাঁহাদের রাজত্ব শেষ হইয়াছে । তদ্বংশীয়েরা এখনও দরিদ্র ভাবে মাধবপাশা গ্রামে বাস করিতেছেন । রাণী দুর্গার দীঘী, রাণী কমলার দীঘী এবং একটি ভগ্ন শিব মন্দির ভিন্ন চন্দ্রদ্বীপের পূর্ব সমৃদ্ধির আর কোন চিহ্ন এখন নাই । কোচবেহারের মহারাজ নরনারায়ণ অতিশয় প্রবল হইয়া উঠিয়াছিলেন । ভোটানের দেবরাজ ও ধর্মরাজ কোচরাজার অধীনতা স্বীকার করিয়া অনুকর দিতেন । আসাম এবং উত্তর বঙ্গ তাঁহার অধীন ও আয়ত্ত হইয়াছিল । পূর্ণিয়া জেলার উত্তর ভাগ, জেলা দিনাজপুর এবং বগুড়া কোচদিগের লুণ্ঠনে শ্রীভ্রষ্ট হইয়াছিল । বাঙ্গালার গুবেদার খানেজাদ খাঁ তাঁহার শাসিত সমস্ত বাঙ্গালা হইতে সম্রাটকে ২২০০০০০ বাইশ লক্ষ টাকার বেশী মাণ্ডলাদি দিতে পারিতেন না । কিন্তু এই সময়ে সাঁতোড় ও ভাড়াড়িয়ার বিশেষ কোন অনিষ্ট হয় নাই ।

মোগল সম্রাটদের মধ্যে জাহাঁঙ্গীরের ছায় কাপুরুষ আর কেহই হয় নাই । জাহাঁঙ্গীর অত্যাচারী বা নিতান্ত নির্কোষ ছিলেন না । কিন্তু তাঁহার আলস্ত ও বিলাসিতা হেতু সাম্রাজ্য বহু দুঃখে পতিত হইয়াছিল । তাঁহার রাজত্বের প্রথমাংশে রাজা মানসিংহ, সেনাপতি মহাবৎ খাঁ এবং বাদশাজাদা শাহজাহানের বিক্রমে সাম্রাজ্য বেশ চলিয়াছিল । কিন্তু সেই সকল বীরের সহ ক্রমে ক্রমে সম্রাটের মনান্তর হওয়াতেই শাসন রজ্জু শিথিল হইল এবং সাম্রাজ্যের রাশি

রাশি অমঙ্গল উপচিত হইয়াছিল।

জাহাঁগীরের আমলে তাঁহার অবৈধ পত্নী নুরজাহান বেগম বুটাদার ঢেলী, এবং কেতকী ফুলেন্দু আতর প্রথম প্রস্তুত করাইয়াছিলেন।

আফগানিস্তানের প্রচলিত পুথ্য ভাষায় ‘মালিক’ শব্দের অপভ্রংশে ‘মল্লিক’ বলে। পাঠান রাজত্বকালে যে সকল রাজপুরুষ জমিদারী বা জাগীর পাইত তাহাদের ‘মল্লিক’ উপাধি হইত। তৎকালে ইহা অতি সম্ভ্রান্ত উপাধি ছিল। পরে কয়েক জন জোলা সঙ্গতিপন্ন হইয়া জাহাঁগীর বাদশাহের নিকট মল্লিক উপাধি প্রার্থনা করিল। যদিও সম্রাট সেই প্রার্থনা গ্রাহ্য করেন নাই তথাপি সেই অবধি মল্লিক উপাধি উপহাসের বাক্য হইল। তজ্জন্ত যতদূর পর্য্যন্ত হিন্দীভাষা প্রচলিত ছিল সেই সমস্ত স্থানের লোকেরা মল্লিক উপাধি ত্যাগ করিল। এই কারণে এখন বাঙ্গালা দেশে, দাক্ষিণাত্যে ও আফগানিস্তানে মল্লিক উপাধি দেখা যায় কিন্তু মধ্যবর্তী স্থানে মল্লিক উপাধি নাই। বাঙ্গালা দেশে অনেক ব্রাহ্মণ এখন মল্লিক উপাধি স্থানে মৌলিক শব্দ লেখেন। তাহা অসঙ্গত কেন না মল্লিক শব্দ সংস্কৃত মূলক নহে। যেমন “মেহতর” এবং “প্রামাণিক” শব্দ অতি সম্ভ্রান্ত উপাধি ছিল। পরে হাড়ীদিগকে মেহতর এবং নাপিতদিগকে পরামাণিক বলিতে বলিতে এখন ঐ দুইটি উপাধি অপমান জনক হইয়াছে সেইরূপ হিন্দুস্থানে মল্লিক শব্দ অপমানকর হইয়া উঠিয়াছে।

এ পর্য্যন্ত আধুলি, সিকি, দুআনি বা পরসা ছিল না। টাকা ভাঙ্গাইলে এক বোঝা কড়ি পাওয়া যাইত। তাহা দ্বারাই ক্রয় বিক্রয় চলিত। নুরজাহান বেগম সেই অমুবিধা দূরীকরণ জন্ত সর্ব প্রথমে তামার পরসা প্রচলিত করেন। সেই তামার পরসায় কিছুই লেখা থাকিত না; তাহাদের আকৃতি এবং ওজনও ঠিক সমান হইত না। সেই তাম্রখণ্ডগুলিকে ঢেপুয়া বা ঢেপুলি বলিত। একটাকা ভাঙ্গাইলে ষোল্ গণ্ডা ঢেপুয়া পাওয়া যাইত। আবার এক ঢেপুয়া ভাঙ্গাইলে বিশ গণ্ডা কড়ী পাওয়া যাইত। টাকা রাজকীয় তত্ত্বাবধানে তৈয়ারী হইত। কিন্তু ঢেপুলি যে কেহ ইচ্ছা মত তৈয়ারী করিতে পারিত।

বাঙ্গালা দেশের টাকা, পাবনা ও শান্তিপুরের তুলার কাপড়, মুর্শিদাবাদ, মালদহ, রাজশাহী ও বগুড়ার রেশমী কাপড় অতি প্রাচীন কাল হইতেই প্রসিদ্ধ ছিল। মোগল রাজ্যারম্ভে তাহার সমাদর আরো বৃদ্ধি হইয়াছিল।

অধিকতর রত্নপুর, জেলার বড়বাড়ীর তৈয়ারী হাড়ের জিনিস এবং শ্রীহট্টের পাট এই সময়ে বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল। বাঙ্গালা দেশ হইতে এই সকল দ্রব্য প্রথমে দিল্লীতে প্রেরিত হইত। তথ্য হইতে কাবুলে, পারস্তে, তুরানে, আরবে এবং অন্যান্য দেশে নীত হইয়া স্বর্ণ মূল্যে বিক্রীত হইত। বাঙ্গালা দেশের পাট, তামাক এবং নারিকেলও দিল্লীতে প্রেরিত হইয়া দিগ্দেশে রপ্তানি হইত। ঢাকাই সোণা, রূপার অলঙ্কার, মুর্শিদাবাদের খাগড়াই কাঁসার জিনিস এবং বাঙ্গালা দেশের গব্য ঘৃত মোগল সম্রাটদের অতি প্রিয় দ্রব্য ছিল।

দ্বায়শাস্ত্রের চর্চায় বাঙ্গালাদেশের ও মিথিলার পণ্ডিতেরা বিশেষ সুখ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন। তজ্জন্ত “হুজ্যতে বাঙ্গালা” অর্থাৎ তর্ক বিতর্কে বাঙ্গালা দেশের পণ্ডিতদিগের সর্বত্র সুখ্যাতি হইয়াছিল। পুরাণ এবং তন্ত্র শাস্ত্রেও বাঙ্গালীর প্রাধান্য হইয়াছিল। পক্ষান্তরে বেদ উপনিষদের চর্চা বাঙ্গালাদেশে লুপ্তপ্রায় হইয়াছিল।

অতি অল্প পরিমাণে লোক লেখা পড়া শিখিত। তাহাদের মধ্যেও বেশী বিজ্ঞা অতি কম লোকে শিখিত। কিন্তু তখনকার লোকে যাহা শিখিত তাহা সমস্তই তাহাদের ভাবী জীবনের প্রয়োজনীয় বিষয়। আধুনিক বিদ্যালয় সমূহে যেমন অপ্রয়োজনীয় বিষয় পড়াইয়া বালকদের মস্তিষ্ক অনর্থক ক্ষয় করা হয় পূর্বে তাদৃশ রীতি একবারেই ছিল না। তজ্জন্ত তখনকার লোক অপেক্ষাকৃত সবল এবং প্রফুল্লচিত্ত ছিল। তখন সর্বদা দস্যভয় থাকায় প্রায় সকল লোকেই নিজ ঘরে অস্ত্র শস্ত্র রাখিত এবং অস্ত্র চালনা কিছু কিছু জানিত। শাহজাহান স্বশাসন বিষয়ে অদ্বিতীয় সম্রাট ছিলেন। মহেন্দ্রের রাজত্বের শেষভাগে শাহজাহান দিল্লীর সম্রাট হইয়া সমস্ত সাম্রাজ্য স্বশাসিত করিয়াছিলেন। প্রকাণ্ড সড়কে দস্যভয় একবারেই ছিল না। সমস্ত বহিঃস্থ ও অন্তঃস্থ শত্রু দমন হওয়ায় প্রজাগণের প্রচুর সমৃদ্ধি হইয়াছিল।

২ চতুর্দশ অধ্যায় ।

রাজা উপেন্দ্রনারায়ণ খাঁ ।

উপেন্দ্র সাতাশ বৎসর বয়সে নির্ঝিন্দাদে রাজগদী প্রাপ্ত হইলেন । তাঁহার বাল্যকালীন উগ্র স্বভাব স্মরণ করিয়া অনেকে তাঁহাকে ভয় করিতে লাগিলেন । যে সকল কর্মচারী প্রতাপবাজুর যুদ্ধকালে তাঁহার বিপক্ষ ছিল তাঁহারা কেহ স্থানান্তর যাইতে চেষ্টা করিলেন অথচ কেহ বা লুক্কায়িত থাকিলেন । উপেন্দ্র তাঁহাদিগকে মিষ্টভাবে আহ্বান করিলেন এবং স্ব স্ব পদে স্থায়ী রাখিলেন । মহেন্দ্রের পত্নীদিগকে তিনি জননীর গ্রাম সম্মান করিতেন এবং তাঁহাদের অনুমতি না লইয়া কোন বৃহদ্ব্যাপারে লিপ্ত হইতেন না । তিনি অল্পকাল মধ্যেই সুবিচার ও সদ্ব্যবহারে মহেন্দ্র অপেক্ষাও সুখ্যাতি লাভ করিলেন । মহেন্দ্র অপেক্ষা উপেন্দ্র বিদ্বান্ হইয়াছিলেন ; আবার নানা অবস্থায় নানা স্থানে গিয়া অল্প বয়সেই অভিজ্ঞ হইয়াছিলেন । বাল্যকালে তাঁহার যেমন অনেক দোষ ছিল তেমনই অনেক গুণও ছিল । নানা অবস্থায় পড়িয়া এবং সুশিক্ষা লাভ করিয়া তাঁহার সেই সকল দোষ তিরোহিত হইয়াছিল এবং সদগুণ সমূহ সমধিক উৎকর্ষ লাভ করিয়াছিল । তিনি বাদশাহের চাকরী করিয়া প্রচুর অর্থ লইয়া দেশে আসিয়াছিলেন । তাঁহার নিকট যে যাহা প্রার্থনা করিত তিনি তন্মধ্যে নির্দোষ প্রার্থনা প্রায় সমস্তই পূরণ করিতেন । ধনবান লোকের সহজেই সুখ্যাতি হয় । উপেন্দ্র যেমন ধনবান তেমনই গুণবান ছিলেন । সুতরাং অল্পকাল মধ্যেই তাঁহার যশোরশি সর্বত্র পরিব্যাপ্ত হইল ।

উপেন্দ্রের দেশে রওনা হইবার সংবাদ পাইয়াই মহেন্দ্র তাঁহার বিবাহের জন্ত সুপাত্রী অনুসন্ধান করিয়া, পরগণা সোণাবাজুর রাজা কাশীশ্বর রায়ের কন্যা সৌদামিনী দেবীর সহ সন্ধুস্ত ধার্য্য করিয়াছিলেন । উপেন্দ্র রাজা হওয়ার পর সেই বিবাহ সম্পন্ন করিলেন । তাঁহার পর নানা স্থান হইতে তাঁহার বিবাহের প্রস্তাব আসিতে লাগিল । তৎকালে সদ্ভতিপন্ন লোকের পক্ষে বহুবিবাহ করা এবং উপপত্নী রাখা সর্বত্র প্রচলিত রীতি ছিল । এখানে

ইহা বলা আবশ্যক যে প্রয়োজন ব্যতীত কোন রীতি উপচিত বা চলিত হয় না। হিন্দু সমাজে পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রীজাতির সংখ্যা চিরকালই বেশী। আবার পুরুষ মধ্যে দরিদ্র এবং কুলমর্যাদায় অপকর্ষ হেতু অনেকে বিবাহ করিতে পারে না। তজ্জন্ত সঙ্গতিপন্ন পুরুষের বহুবিবাহ করা এবং উপপত্নী রাখা হিন্দুসমাজে চিরকাল প্রচলিত, নতুবা বহু রমণীর বিবাহ হইত না এবং প্রতিপালনের সত্বপায় হইত না। উচ্চ শ্রেণীর মধ্যে বিবাহ নিষিদ্ধ হওয়াও ইহার একটি কারণ বটে। ইদানীং যে পাত্রপণ অতিমাত্র বৃদ্ধি হইতেছে, বহু বিবাহ রহিত হওয়াই তাহার প্রধান কারণ। একটি সুপাত্র দেখিলে বহু ব্যক্তি তাহারই সহানুভূতি কথ্য বিবাহ দিতে চাহে। পাত্রপক্ষকে সম্মত করিবার জন্ত কথ্যপক্ষগণ উৎকোচ স্বরূপ জেদাজিদ্দী করিয়া অধিক পণ ডাকিতে থাকে। পাত্রপক্ষ সুযোগ বুঝিয়া দর বৃদ্ধি করিতে থাকেন। কাজেই পাত্রপণ বাড়িয়া যায়। সুপাত্রেরা একাধিক বিবাহ করিলে পাত্রপণ এত বৃদ্ধি হইত না। ষোণীদিগের এক বিবাহ যথেষ্ট বটে, কিন্তু ভোগীদিগের দুই তিন বিবাহ করাই সম্ভব। কেননা পত্নী পঞ্চ মাস গর্ভবতী হইলে তদবধি এক বৎসর কাল সেই পত্নীকে মাতৃবৎ প্রতিপালন করিবে অর্থাৎ অতি যত্নে ও সম্মানে প্রতিপালন করিবে অথচ কামভাবে স্পর্শ করিবে না। ইহা হিন্দু শাস্ত্র ও যুক্তি সম্মত। কিন্তু এক পত্নীক ব্যক্তি সেই নিয়ম রক্ষা করিতে পারে না। তজ্জন্ত সমস্তানগুলি দুর্বল, দীর্ঘা এবং ক্লান্ত হয়। তদ্বারা বংশ ক্রমশঃ মন্দতর হইতে থাকে।

উপেন্দ্রের নানা স্থান হইতে বিবাহ সম্বন্ধ উপস্থিত হইল। অনেকে তজ্জন্ত টাকা ও জমিদারী ঘুষ দিতে স্বীকার করিলেন। উপেন্দ্রের আত্মীয়-গণও অনেকে অনুরোধ করিলেন। কিন্তু তিনি কিছুতেই সম্মত হইলেন না। ক্রমে উপেন্দ্রের বহু বিবাহে অনিচ্ছা সর্বত্র প্রচার হইল। সুতরাং নূতন বিবাহের প্রস্তাব ক্ষান্ত হইল। সৌদামিনী অনুমান করিয়াছিলেন যে তাঁহার যখন ধনবান, গুণবান, রূপবান কুলীন বরে বিবাহ হইয়াছে তখন অবশ্যই বহু সপত্নী হইবে। এখন স্বামীর বহুবিবাহে অনিচ্ছা দেখিয়া পরম পরিতুষ্ট হইলেন এবং যথাসাধ্য স্বামীর সন্তোষ সাধন করিতে লাগিলেন। সৌদামিনী অতি রূপবতী ছিলেন। তাহার উপর তাঁহার একান্ত পতিভক্তি

দেখিয়া উপেন্দ্র যে পরম সুখ অনুভব করিলেন, বহুপত্নীক লোকের ভাগ্যে তদ্রূপ দাম্পত্য সুখ অসম্ভব। কিন্তু তৎকালীন সমাজে উপেন্দ্রের একপত্নীব্রততা প্রশংসিত হয় নাই—বরং উপহাসাস্পদ হইয়াছিল।

তখনকার সমাজে বড় মানুষের উপপত্নী রাখা এবং সময়ে সময়ে বাই, নটী এবং বেশী লইয়া রঙ্গলীলা করা সাধারণ ব্যবহার ছিল। তাহাতে কেহ দোষ জ্ঞান করিত না। অথচ আহার নিদ্রাদি অবশ্য কর্তব্য কর্মও অতিরিক্ত পরিমাণে করিলে দুষণীয় ও নিন্দনীয় হয় সেইরূপ লাম্পট্যও অপরিমিত হইলে নিন্দনীয় হইত। তখন সামাজিক নিয়ম কেহ অতিক্রম করিতে পারিত না। সুতরাং কেহ উপপত্নীর একান্ত বশীভূত হইত না, উপপত্নীর আদেশে বৈধ পত্নীর প্রতি অত্যাচার করিতে পারিত না। পক্ষান্তরে স্বামীর দ্বিতীয় বিবাহ বা উপপত্নী সংযোগ শুনিয়া তাহার ধর্মপত্নীও আত্মহত্যা স্বামীহত্যা বা তাদৃশ অথ কোন ঘোরতর কার্য্য করিত না। রক্ষিতা উপপত্নীরা প্রায়শঃ উপপত্নীর বাড়ীতেই থাকিত; যদি পৃথক বাড়ীতে থাকিত তবু উপপত্নীর বাড়ীতে সর্বদা যাতায়াত করিত। বৈধপত্নী বয়সে ছোট হউক বা বড় হউক উপপত্নীরা বৈধপত্নীকে “দিদি” বলিত এবং মান্য করিত। ব্রাহ্মণের উপপত্নীরা তাঁহার সেবাদাসী নামে পরিচিত হইত। অথ লোকের উপপত্নীদিগকে তাহার উপপত্নী বা জলপাত্র নামে বলা যাইত। কোন ব্যক্তির একাধিক পত্নী এক বাড়ীতে থাকিলে অনেক সময়ে ঝগড়া হইত; একাধিক উপপত্নী থাকিলে তাহাদের পরস্পর সর্বদাই ঝগড়া বিবাদ হইত। কিন্তু বৈধপত্নীর সহ উপপত্নীর ঝগড়া বিবাদ কখন শুনা যায় না। দিল্লীতে এবং মালবে থাকা কালে উপেন্দ্রেরও উপপত্নী ছিল। কিন্তু দেশে আসার পর তাঁহার কোন উপপত্নী ছিল না। তজ্জগৎ অনেকে তাঁহাকে খোজা বলিয়া উপহাস করিত। উপেন্দ্র রাজত্ব পাইয়া মহেন্দ্রের উপদেশ মত তাহাতে তুষ্টি থাকিতে মনস্থ করিলেন। তিনি যথোপযুক্ত নজরাণা সহ দিল্লীতে বাদশাহের নিকট এবং শাহজাদা দারার নিকট পত্র দ্বারা জানাইলেন যে “আমার বৈমাত্র জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার নিঃসন্তানে অভাব হওয়ায় আমি নির্বিবাদে পৈত্রিক সম্পত্তি পাইয়াছি। সেই সম্পত্তির ও পরিবারের তত্ত্বাবধানে আমি সম্পূর্ণ বিব্রত আছি। সুতরাং আমার চাকরী করিবার অবসর নাই। আমার চাকরীর অন্তর্য্য মঞ্জুর করিবেন।

আমার প্রতি ক্ষুদ্রাঙ্গীর যে অনুগ্রহ পূর্বাগত ছিল তাহা স্থির রাখিবেন এবং আমার পৈত্রিক পদে আমাকে বহাল রাখিয়া সনন্দ প্রদান করিবেন।” তিনি বাঙ্গালার গুবেদারকেও কিছু উপঢৌকন পাঠাইয়া অনুগ্রহ প্রার্থনা করিলেন। সম্রাট শাহজাহান তাঁহাকে একটাকিয়ার রাজ্য বলিয়া সনন্দ ও খেলাত পাঠাইয়া দিলেন। দেওয়ান মতোড়রল চাকলে ভাড়াড়িয়ার উপর যে বার্ষিক দশ হাজার টাকা নর্মী ধাৰ্য্য করিয়াছিলেন সম্রাট তাহা মাক দিলেন, এবং তাঁহাকে “পাঁচহাজারী মনসবদার” উপাধি দিয়া সম্মান বৃদ্ধি করিলেন। তখন ঢাকাতে বাঙ্গালার রাজধানী ছিল। বাদশাহী সনন্দ ঢাকাতে গুবেদারের নিকট পৌঁছিলে তিনি তাহা সাতগড়ায় পাঠাইয়া দিলেন এবং বন্ধু ভাবে চিঠি লিখিয়া উপেক্ষকে সম্মানিত ও আপ্যায়িত করিলেন।

উপেক্ষ অতি সবিচারে ও সদাচারে রাজত্ব করিতে লাগিলেন। সম্রাট শাহজাহান রাজ্যশাসন বিষয়ে আদর্শ নৃপতি ছিলেন। তিনি প্রবল প্রতাপে সমস্ত বহিঃস্থ শত্রু দমন করিয়া সম্রাজ্য নিরাপদ করিয়াছিলেন এবং অভ্যন্তরে শান্তি রক্ষার সুবিধান করিয়া দস্যু তস্করাদি দমন করিয়াছিলেন। তাঁহার দ্বিতীয় পুত্র সুজা বাঙ্গালা বেহার ও উড়িষ্যার গুবেদার নিযুক্ত হইয়াছিলেন। তাঁহার সুশাসন ও সদ্ব্যবহারে সমস্ত প্রজা ভৃত্যগণ ধন্যবাদ করিত। উপেক্ষ প্রতিবর্ষে এক একবার তাঁহার সহ সাক্ষাৎ করিতেন। সুজা ঢাকা হইতে রাজধানী রাজমহলে সরাইয়া ছিলেন। [খৃঃ ১৬৩৯]

উপেক্ষের রাজত্বের নবমবর্ষে তাঁহার একটি কন্যা হইল। তাহার নাম সর্কমঙ্গলা রাখা হইল। সেই সময়ে প্রচণ্ড খাঁ দীর্ঘ প্রবাসের পর দেশে আসিলেন। তাহাতে একটি সামাজিক বিপ্লব উপস্থিত হইল। পূর্বে উক্ত হইয়াছে যে প্রচণ্ড খাঁ শাহজাহানের সঙ্গে সঙ্গে পলায়ন করিয়াছিলেন। শাহজাহানের দুরবস্থা কালে প্রচণ্ড প্রাণপণে তাঁহার উপকারার্থ চেষ্টা করিতেন। তজ্জন্ত তিনি তাঁহার অতিমাত্র প্রিয়পাত্র হইয়াছিলেন। শাহজাহান সম্রাট হইলে প্রচণ্ড রোহিলখণ্ডের গুবেদার নিযুক্ত হইয়াছিলেন। সেই স্থানে প্রচণ্ড খাঁ গঙ্গা প্রসাদ তেওয়ারী নামক এক কান্যকুব্জ ব্রাহ্মণের কন্যা পার্বতী দেবীকে বিবাহ করিয়াছিলেন। সেই পত্নীর গর্ভজাত সন্তানাদি লইয়া পত্নী সহ প্রচণ্ড খাঁ সাতগড়ায় উপস্থিত হইলেন। তাঁহাকে সমাজে গ্রহণ করিতে

নানারূপ আপত্তি হইতে লাগিল। সাতগড়ার এবং বরেন্দ্রভূমির পণ্ডিতেরা বিধান দিলেন যে, “কাত্তকুজ ব্রাহ্মণের কন্যা বিবাহ করা ধর্ম বিরুদ্ধ নহে কিন্তু সামাজিক রীতিবিরুদ্ধ এবং বঙ্গালী কুলশাস্ত্র বিরুদ্ধ। প্রচণ্ড খাঁকে সপরিবারে সমাজে গ্রহণ করা যায় না। তিনি অনুনয় করিলে একাকী সমাজে গৃহীত হইতে পারেন।” প্রচণ্ড কাহার নিকট নত হইবার লোক নহেন। স্মতরাং তিনি বরেন্দ্রভূমিতে সমাজে উঠিতে পারিলেন না। তিনি অর্থব্যয়ে নবদ্বীপের পণ্ডিত ও কুলজ্ঞদিগকে বশীভূত করিলেন। তাঁহারা বিধান দিলেন যে, “কাত্তকুজ ব্রাহ্মণের কন্যা বিবাহ করিলে রাঢ়ী ও বরেন্দ্র ব্রাহ্মণদিগের কোন পাতিত্যা বা দোষ হয় না। একরূপ বিবাহ ঘটবার সুযোগ না থাকায় একরূপ বিবাহ হয় না। তজ্জগৎ এই কার্য্য সামাজিক রীতি বিরুদ্ধ বলা যায় না। কান্যকুজে বঙ্গালী কোলীণ্য প্রথা প্রচলিত নাই। স্মতরাং তাহাদের সহ বিবাহ আদান প্রদানে বঙ্গীয় কুল মৰ্গ্যাদার হ্রাস বৃদ্ধি হইতে পারে না।” নবদ্বীপের পণ্ডিতদিগের সিদ্ধান্ত পদ্মার দক্ষিণ পারে যেরূপ মাগু হইত পদ্মার বাম পারে তদ্রূপ মান্য হইত না। প্রচণ্ড পদ্মার দক্ষিণ পারে গিয়া মেহের-পুরে বাড়ী করিলেন। সে দিকে তিনি সৰ্ব্বতোভাবে সমাজে গৃহীত হইলেন। যে সকল কুলীন তাঁহার সহ সমন্বয় করিলেন তাঁহারা “রোহিলা পঠার কুলীন” নামে খ্যাত। এই পঠার কুলীন পদ্মার দক্ষিণ পারেই বেশী; পদ্মার বাম পারে রোহিলা পঠার কুলীন ছিল না; এখন কতক হইয়াছে। প্রচণ্ড খাঁ দারার পক্ষ হওয়ায় শাহজাদা সুজা তাঁহার সমস্ত সম্পত্তি নিঃসাৎ করিয়া-ছিলেন। প্রচণ্ড খাঁ নিজেও ঔরংজীব সহ যুদ্ধে হত হইয়াছিলেন। তাঁহার বংশ এখন নাই। কিন্তু রোহিলা পঠার কুলীন ও শ্রোত্রিয় এখনও বিদ্যমান আছে। বাদশাজাদাদিগের বিবাদে উপেক্ষা কোন পক্ষ না হওয়ায় তাঁহার কোন ক্ষতি বৃদ্ধি হয় নাই। ইহা মহেন্দ্রের অন্তিম উপদেশের সুফল।

উপেক্ষার রাজত্ব একুশ বৎসর অতিক্রম করিল। এই সময় মধ্যে উপেক্ষার জননী এবং মহেন্দ্রের ছই পত্নী গতাস্ব হইলেন। উপেক্ষার এক কন্যা ভিন্ন অশ্রু কোন সন্তান হয় নাই। উপেক্ষা তাহাকে তৎকাল প্রচলিত বাঙ্গালা ভাষা শিখাইয়া-ছিলেন। রাণী সৌদামিনী সেই কন্যাকেই ভাড়াড়ী রাজ্যের উত্তরাধিকারিণী করিতে ইচ্ছুক ছিলেন। উপেক্ষার সেই মতে সম্মতি ছিল। মহেন্দ্রের অবশিষ্ট পত্নী রাণী

পবিত্রা আন্তরিক তরুণ ইচ্ছা করিতেন না অথচ কোন প্রতিবাদও করিতেন না । রাজপুরোহিত বাচস্পতি ঠাকুর এই মতের একান্ত বিরোধী ছিলেন । অত্যাগ্র লোকে স্পষ্ট কোন মতামত প্রকাশ করিত না । সর্বমঙ্গলার বয়স এগার বৎসর উত্তীর্ণ হইল । তাহার বিবাহের জন্ত ঘটক ও পুরোহিত লইয়া পরামর্শ চলিতে লাগিল কিন্তু উপেন্দ্রের মনোমত পাত্র কুত্রাপি যুটিল না । রাণীর ইচ্ছা ঘর-জামাই রাখা হয় । রাজার ইচ্ছা পাত্র সন্নিয়োগ্য লোক হয় যে ভবিষ্যতে ভাড়াড়ী রাজ্য শাসন করিতে পারে । যে পাত্র ঘর-জামাই থাকিতে পারে সে গুণহীন; আর যে গুণবান, সে পাত্র ঘরজামাই থাকিতে সম্মত নয় । কাজেই দীর্ঘকাল বাপী চেষ্টাতেও কোন ফল হইল না । কতবার দেহে যৌবনের প্রথম লক্ষণ আরম্ভ দেখিয়া রাণী পাত্র নিরুপণের চেষ্টা ও পরামর্শের চূড়ান্ত করিতে অগ্ররোধ করিলেন । পরদিন শেষ সিদ্ধান্ত করা ধাৰ্য্য হইল ।

পরদিন প্রত্যুষেই উপেন্দ্র নিজ পুরোহিত রামধন বাচস্পতিকে ও নিজ কুলজ্ঞ যত্নপতি মুকুটমণিকে ডাকাইয়া আনিলেন । নিজেও প্রাতঃকৃত্য সমাপন করিয়া দরবারী পোষাক পরিধান করিয়া বৈঠকখানায় বসিলেন । উপেন্দ্রের বৈঠকখানা ঠিক মোগলের রীতি অনুযায়ী ছিল । কেবল তাঁহার নহে, তৎকালীন সমুদায় আমীর লোকের বৈঠকখানাই ঐ ধরণের ছিল । হিন্দুরীতি ও ইরানী রীতি মিশ্রিত করিয়া বৈঠকখানার সজ্জা করিত । রাজ বাবহার অনুকরণ করা বড় মানুষের একান্ত অভিলাষিত এবং কতক প্রয়োজনীয়ও বটে । তজ্জগৎ সমস্ত হিন্দু মুসলমান বড়মানুষেরা সেই মোগলাই বৈঠকখানা অনুকরণ করিয়াছিল । বিশেষ এই যে, মুসলমানের বৈঠকখানা প্রায়ই পশ্চিমমুখী, কদাচিত দক্ষিণমুখী, কিন্তু হিন্দু বড়মানুষের বৈঠকখানা প্রায়শঃ পূর্বমুখী, কখন বা দক্ষিণমুখী । উপেন্দ্রের বৈঠকখানা দক্ষিণমুখী । দক্ষিণমুখী বৈঠকখানা হিন্দু মুসলমান উভয়েরই থাকিত সুতরাং উপেন্দ্রের বৈঠকখানা দেখিয়া সহজে হিন্দুর কি মুসলমানের তাহা অপরিচিত লোকে টের পাইত না । বৈঠকখানার মধ্যস্থলে পশ্চাতের দেউলে লাগা এক তক্তপোষে গদীর উপর আসন পাতা রাজার নিজ আসন । তাহার পশ্চাতে তাকিয়া, দুই পাশে পাশ বালীস । আসনের সম্মুখে এক হাত-বাগ্ন, দোয়াত, কলমদান ও সহী মোহর । তাহার

দক্ষিণ দিকে এক থানা শতরঞ্চ ও চাদর পাড়া তত্ত্বপোষ, কয়েকটা মোড়া ও জলচৌকী। একথানা জলচৌকীতে কুরসী ছাঁকা, পানদান ও পিকদান। অত্র জলচৌকী, তত্ত্বপোষ ও মোড়াতে সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোকের বসিবার স্থান। রাজার বাম দিকে মেজের উপর চাটাই পাড়া। তাহার উপর শতরঞ্চ ও চাদর পাড়া মুন্সীখানা। তাহাতে আমলারা বসিয়া লেখা পড়া করিত। মুন্সীখানার দক্ষিণদিকে রাজার বামপার্শ্বে গদী চাদর ও তাকিয়া সংযুক্ত একটি আসন দেওয়ানের জন্য থাকিত। সাধারণ লোক বসিবার জন্ত মুন্সীখানার সম্মুখে কয়েকটা শপ থাকিত। ইহাই সদর বৈঠকখানা। মেগাল সম্রাটদের যেমন দরবার আম্ ও দরবার খাম্ নামে দুই বৈঠকখানা ছিল, তৎকালীন আমীরদেরও তদ্রূপ দুই দরবার ছিল। আমীরদের গুপ্ত পরামর্শাদি জন্ত ক্ষুদ্র দরবারকে বালাখানা বলিত। তথায় সর্বসাধারণের গতিবিধি হইত না। তথায় বাদশাহী খাস দরবারের ছায় আমীরদের প্রধান প্রধান কার্য্যকারক এবং নিকট আত্মীয় মাত্র যাইত। বিশেষ কারণে বিশেষ অনুমতি লইয়া অত্র লোক যাইতে পারিত। সদর বৈঠকখানায় রীতিমত পোষাক পরিয়া যাইতে হইত। বালাখানায় কোন পোষাকের বাঁধাবাঁধি ছিল না।

উপেন্দ্রের বালাখানায় সেদিন সকালে সর্বমঙ্গলার বিবাহের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত করিবার জন্ত সভা হইল। সে সভাতে লোকের আধিক্য নাই। উপেন্দ্র স্বয়ং, তাহার শ্যালক রাজা মহেশ্বর রায়, দেওয়ান গোপীনাথ বাগছি, পুরোহিত রামধন বাচম্পতি ঠাকুর, ঘটক যত্নপতি মুকুটমণি এবং গোপাল এই ছয় জন মাত্র সভাসীন। উপেন্দ্র বলিলেন, “আমি চাই যে পাত্রটি দেখতে সুন্দর হয়, চরিত্র ভাল হয়, বিদ্যা বুদ্ধি থাকে, যে ভবিষ্যতে আমার এই রাজত্ব শাসন সংরক্ষণ করতে পারে, আর কোন গুরুতর রোগ না থাকে; আমার এবং মেয়ের বাধ্য হয়ে চলে। ঘর-জামাই হয়ে আমার পুত্রের স্থলাভিষিক্ত হয়ে থাকে এই আমার মতলব। আমার যখন পুত্র নাই, আমার সম্পত্তিই কন্যা ও জামাতাকে দিব, তখন জামাতার নিজ সম্পত্তি দেখিবার প্রয়োজন নাই। আর কুলমর্যাদা দেখিবারও প্রয়োজন নাই।” বাচম্পতি ঠাকুর কহিলেন, “এমন পাত্র পাওয়া যায় নাই এবং যাবে ইহাও সম্ভব নয়। ঘর-জামাই অর্থ অন্নদাস। বারেন্দ্র ব্রাহ্মণের ছেলে সেরূপ ঘর-জামাই হয়ে কদাচ

থাকিতে পারে না। তবে নিতান্ত মূর্থ বোকা হলেও বা কতক সম্ভব। যে ছেলেটি দেখতে সুন্দর, বিদ্যা বুদ্ধি আছে, সে কি কখন ঘরজামাই হয়ে থাকবে? তার বাপ মায়েই বা দিবে কেন এবং সেই বা থাকবে কেন? যদি প্রথমে স্বীকার কবে, তবু শেষে চলে গেলে তুমি রাখতে পারবে না। যদি বল আটক করে রাখব; তাতে কি জামাই তোমার কন্ঠার বাধা হবে? তাহবে না, কন্ঠারও কোন সুখ হবে না। সেই জন্ত বলি, সুপাত্র দেখে কন্যা দান কর বরং কিছু জমিদারী জাগীর দাও। কন্যা মহাসুখে থাকবে; নিজে দত্তক পুত্র রাখ, রাজত্ব তাকে দেও, পূর্বপুরুষের নাম থাকবে। কন্যাকে রাজত্ব দিলে তো তোমার পূর্বপুরুষের নাম থাকবে না।”

উপেন্দ্র কহিলেন, “শাস্ত্রে পুত্রিকা পুত্র রাখা বিধান আছে। ঔরস পুত্র অগ্রগণ্য। একবারে নিঃসম্পর্কীয় পরের ছেলে রাখা অপেক্ষা নিজ কন্যাকে পুত্রিকা রূপে রাখিয়া তৎপুত্রকে পৌত্ররূপে রাখিলে যে সর্বথা ভাল হয় ইহা শাস্ত্র ও যুক্তি দ্বারা প্রামাণ্য। সুতরাং আমি তদ্রূপেই বংশরক্ষা করতে চাই। তাতে দোষ কি?”

উপেন্দ্রের দেওয়ান বাগছি সাহেব তাঁহার মতের পোষকতা করিলেন। এখানে বলা আবশ্যক যে ৬০, ৭০ বৎসর পূর্বে সম্রাট হিন্দুদিগের “বাবু” উপাধি প্রচলিত ছিল না। হিন্দুজমিদার ও উচ্চ রাজকর্মচারী যাহারা রাজা, মহারাজা উপাধির যোগ্য ছিলেন না, তাঁহাদিগকে সম্রাটের ‘সাহেব’ বলা যাইত। সাহেব শব্দ অতি উচ্চ সম্রাটের ছিল। সম্রাট ভিন্ন সমস্ত উচ্চ সম্রাটদিগের নামেই সাহেব উপাধি যোগ হইত।

হিন্দুর মধ্যে কায়স্থ অপেক্ষা নিম্নতর জাতীয় লোক যত কেন সম্মতিপন্ন হউক, তাহাদিগকে সাহেব বলার রীতি ছিল না। কিন্তু কোচবেহারের রাজকুমারদিগকে সাহেব বলা যাইত এবং এখন পর্য্যন্ত বলা হয়। আবার যাজন ব্যবসায়ী ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ যাবনিক সাহেব উপাধি পছন্দ করিতেন না, সেই জন্ত তাঁহাদিগকে সাহেব বলা হইত না। তাঁহাদিগকে ঠাকুর বলাই রীতি ছিল। সমস্ত ব্রাহ্মণকেই ঠাকুর বলা যাইত, কিন্তু রাজা মহারাজা নবাব, গুবেদার, উজির প্রভৃতি বৈষয়িক অত্যাচ পদবীর ব্রাহ্মণেরা “ঠাকুর” উপাধি পছন্দ করিতেন না, তজ্জন্ত তাঁহাদিগকে ঠাকুর বলা হইত

না। “মহাশয়” উপাধিও প্রচলিত ছিল, তাহাও “বাবু” উপাধির প্রতি-
শব্দ নহে। ইহা ভিন্ন পূর্বে বাঙ্গালা দেশে “জী” উপাধিও প্রচলিত ছিল।
এখন বাঙ্গালার এই ক্ষী উপাধি প্রায় অপ্রচলিত। উত্তর পশ্চিমে ও দক্ষিণাত্যে
এখনও জী উপাধি খুব প্রচলিত। কিন্তু তাহাও বাবু উপাধির ঠিক সমান
নহে। সংক্ষেপতঃ বাবু শব্দের ঠিক সমান কোন উপাধি পূর্বে ছিল না।
দেওয়ানজীর পোষকতায় বাচস্পতি ঠাকুর ক্রুদ্ধ হইয়া ঘোরতর আপত্তি
করিলেন। ক্রমে উভয়ের মধ্যে গালাগালি হইতে মারামারির উপক্রম
হইল, বৃদ্ধ গোপাল দৌড়িয়া মধ্যস্থলে দাঁড়াইলেন। উপেন্দ্র, মহেশ্বর
ও মুকুটমণি ধরিয়া উভয়কে কতক শাস্ত করিলেন। বাচস্পতি ঠাকুরকে
স্বান আফিকের জন্ত অনুরোধ করিয়া স্থানান্তরিত করা হইল। পুনরায় পরামর্শ
চলিতে লাগিল। গোপাল এখন বৃদ্ধ। কাজ কর্ম চালাইতে অক্ষম হেতু
চাকরী ত্যাগ করিয়াছিলেন। হিন্দু মুসলমান রাজারা পেনশন দিবেন না
কিন্তু তাঁহাদের চাকরী মৌরসী ছিল। কোন কর্মচারী অতি বৃদ্ধ বা লোকান্তর
হইলে তাহার দায়াদগণ সেই কর্ম পাইত অথবা তাহার যোগ্যতানুসারে কিছু
ছোট বা বড় কর্ম পাইত। সুতরাং পেনশন অপেক্ষাও বেশী উপকার হইত।
গোপাল বার্ষিক্য হেতু কর্মত্যাগ করিবার সময়েই নিজ পুত্র গোবুলকে নিজের
কর্মে সনন্দ লইয়া দিয়াছিলেন। গোপাল এখন চাকরী না করিলেও মধ্যে মধ্যে
রাজবাড়ীতে আসিতেন। গোপাল উপেন্দ্রের পুরুষানুক্রমিক ভৃত্য, তাঁহার
সর্বাবস্থার সঙ্গী এবং অতিমাত্র বিশ্বাসপাত্র ছিলেন। উপেন্দ্র গোপালের সহ
পরামর্শ না করিয়া কোনও গুরুতর কার্য্য করিতেন না। গোপাল বাচস্পতি
মহাশয়ের ও দেওয়ানজীর বিবাদে মর্ম্ম শুনিয়া কহিলেন, “আমার বিবেচনায়
বাচস্পতি ঠাকুরের কথাই বিশুদ্ধ। ঘর-জামাই রাখিতে হইলে ভাল পাত্র
পাওয়া যাইবে না। আর কতাকে রাজস্ব দিলে একটাকিয়া রাজবংশ নাম
লোপ হইবে। পুত্রিকা পুত্র কলিকালে অসিদ্ধ। এই সকল আলোচনা
করিয়া আমার বোধ হয় যে কতাকে কিছু জমিদারী জাগীর দিয়া ভাল পাত্রে
বিবাহ দেন। আর কিছু দিন দেখিয়া, যদি পুত্র না হয় তবে পোষ্যপুত্র গ্রহণ
করেন। কত্যা সম্বন্ধে দত্তক লওয়া চিরকাল প্রচলিত প্রথা। আমার বিবেচনায়
সেই প্রথা অনুসরণ করাই ঠিক।”

উপেন্দ্র সকলের মতামত শুনিয়া রাজা মহেশ্বর রায়কে তাঁহার মত জিজ্ঞাসা করিলেন। মহেশ্বর কিঞ্চিৎ গম্ভীর ভাবে কহিলেন, “যখন ভাল পাত্র ঘরজামাই পাওয়া যায় না তখন সুপাত্র দেখিয়া কন্যার বিবাহ দেও। কন্যা ও জামাতাকে ভরণপোষণ যোগ্য কিছু জমিদারী দেও। তাহা হইলে সর্ব বিষয়ে ভাল পাত্র মিলিবে। তাহার পর জামাতাকে নিজ বাড়ীতে আনিয়া রাজকাৰ্য্য শিক্ষা দেও, ক্রমে ক্রমে কাজের ভার দেও। ইহাতে ঘর-জামাই নাম না করিয়াও জামাই ঘরে রাখিতে পারিবে, আর তাহার চরিত্র এবং যোগ্যতা বোঝা হইবে। তার পর যদি তোমার পুত্র না হয় তবে বিবেচনাপূর্বক কন্যা ও জামাতাকে রাজস্ব দিও অথবা দত্তক রাখিও। এখন দত্তক রাখা ও উচিত নয়। কন্যাকে রাজস্ব দেওয়াও উচিত নয়। কেন না এখনও তোমার পুত্র হওয়া অসম্ভব নহে। আর ঘর-জামাই রাখাতো গাধা পোষা কাজ; আমার মতে নিতান্তই অকর্তব্য।”

রাজা মহেশ্বর চতুরতার সহিত নিজ মত এমন ভাবে প্রকাশ করিলেন যে তাহাতে কাহারই মত খণ্ডন করা হইল না। সুতরাং সকলেই তাঁহার মতে সম্মত হইল। সেই ভাবে শীঘ্র কার্য্য ধাৰ্য্য করিতে সর্ববাদী সম্মতরূপে স্থিরীকৃত হইল।

পুরোহিত আসিয়া উক্ত মতের পোষকতা করিলেন এবং তাঁহার কথায় উপেন্দ্র সম্মতি দিলেন। সুতরাং দেওয়ানজী আর কোন আপত্তি করিতে সাহস করিলেন না। পরদিন পাত্র দেখিতে যাত্রা করা স্থির হইল।

রাণী সৌদামিনী ঘরজামাই রাখাই স্থির সংকল্প করিয়াছিলেন। দেওয়ানজী রাণীর মাসতুতো ভগিনীপতি; তিনি রাণীর মতের পোষকতা করিতেন। খাঁ সাহেবের ইচ্ছাও তাঁহাদের মতানুযায়ী ছিল। সুতরাং তিনি পাত্র দেখিতে যাওয়া অর্থে ঘর-জামাই আনাই স্থির করিয়াছিলেন। যখন দেওয়ানজীর নিকট শুনিলেন যে ঘটক ও পুরোহিতের কথায় তাঁহার স্বামী ও ভ্রাতা সে মত পরিবর্তন করিয়া কুলীন জামাই দেখিতে যাইতেছেন, তখন তিনি নিতান্ত ব্যগ্র ভাবে আপত্তি উত্থাপন করিয়া স্বামীর ও ভ্রাতার মত পরিবর্তন করিতে চেষ্টা হইলেন। দেওয়ানজী তাঁহাকে প্রচুর উৎসাহ দিলেন। মহেন্দ্রের জীবিতা পত্নী রাণী পবিত্রা ও অগ্ৰাণী স্ত্রীজনেরা রাণীর পক্ষ সমর্থন করিতে

কোমর বাঁধিলেন। ফলতঃ যেমন অভিজ্ঞ সেনানীরা এক যুদ্ধে পরাজিত হইয়া অমনি অশ্রুযুদ্ধের আয়োজন করে, দেওয়ানজীও তদ্রূপ বাহির দরবারে পরাস্ত হইয়া ভিতর দরবারে পুনর্যুদ্ধের প্রবলতর আয়োজন করিলেন।

সময়ের পরিবর্তনে বাহির বাড়ীর অবস্থা যেমন পরিবর্তিত হইয়াছিল, বাড়ীর মধ্যের অবস্থা সেরূপ পরিবর্তিত হয় নাই। উপেন্দ্রের বৈঠকখানা মোগলের দরবারের সদৃশ। উপেন্দ্রের উপাধি খাঁ। উপেন্দ্রের দরবারী পোষাক মোগলের তুলা। তিনি যে ব্রাহ্মণ, তা চিনে উঠা ভার। কিন্তু উপেন্দ্রের বাড়ীর মধ্যের ভাব সম্পূর্ণ বিভিন্ন; প্রাচীন আর্য ব্যবহার বাড়ীর মধ্যে প্রায় অক্ষুণ্ণই আছে। উপেন্দ্রের খাঁ উপাধি হইয়াছে কিন্তু তাঁহার পত্নীর উপাধি খাতুন বা খানন হয় নাই, তাঁহার উপাধি “রাণী”। রাণীর পোষাক ধনবতী ব্রাহ্মণীর তায়, মৌগলানীর কোন সাজ তাঁহার নাই। বাড়ীর মধ্যে সমস্ত সাজ, সমস্ত কাজ ধনবান ব্রাহ্মণের বাড়ীর মত। অধিক কি বাড়ীর মধ্যে সে উপেন্দ্রও আর মোগল নহেন। উপেন্দ্র পূজা আত্মিক সমাপন করিয়া আহার করিতে গেলেন। তাঁহার পরিধান গরদের ধুতী, উত্তরীয় গরদের নামাবলী, ললাটে চন্দনের ফোঁটা, কেশ শিখায় আবদ্ধ রক্তজবার ফুল। সবল উজ্জল গৌরবর্ণ শরীর দেখিলে তেজস্পূর্ণ মহর্ষি বলিয়া বোধ হয়। বাড়ীর মধ্যে তাঁহার উপাধি ও রাজা মহারাজ, খা সাহেব নহে। অবস্থা দৃষ্টে বোধ হয় যেন সনাতন ধর্ম যখন ভয়ে অন্তঃপুরে লুকায়িত আছেন।

উপেন্দ্র গরদের ধুতী নামাবলী ছাড়িয়া স্নতী কাপড় পরিলেন; গামছা স্বন্ধে ফেলিয়া আহার করিতে বসিলেন। তখন পাচকের হাতে খাওয়া ব্রাহ্মণের পক্ষে অতীব নিন্দনীয় ছিল। ব্রাহ্মণ রাজা মহারাজ হইলেও তাঁহার পত্নী, ভ্রাতৃবধু, পুত্রবধু, কন্যা, ভগিনী প্রভৃতিরাই তাঁহার জন্য পাক করিত এবং সমস্ত ব্রাহ্মণবর্গের জন্য পাক করিত এবং পরিবেশন করিত। দাস দাসীরাও ঠাকুর ঠাকুরাণীদের প্রসাদ পাইত। অন্যান্য চাকর ও উপরি লোক বেশী হইলে তাহারা সিধা পাইত, পৃথক পাক করিয়া খাইত। কখনও বা তাহাদের জন্য বাহির বাড়ীতে পাচকেরা পাক করিত। অপরিচিত বা ভিন্ন শ্রেণীর ব্রাহ্মণ অতিথি থাকিলে তাঁহার সমুচিত অভ্যর্থনার পর জিজ্ঞাসা হইত “দেবতার আত্মিকের ও সেবার কি বিধান?” যিনি শিব পূজা কি বিষ্ণু পূজা করিবেন

তিনি তাহা প্রকাশ করিলে অমনি মণ্ডপঘরে তাঁহার পূজার আয়োজন হইত। যিনি পূজা করেন না এমন ব্রাহ্মণ খুব কম ছিল। তাদৃশী ব্রাহ্মণেরা সংক্ষেপে বলিতেন “জলে জলে”। আর আহার সম্বন্ধে বাঁহার, গৃহীর ঘরে থাইতে ইচ্ছুক তাঁহার বলিতেন “মা লক্ষ্মীরা যা দেন”। অমনি তাঁহাদের আহারের জন্ত বাড়ীর মধ্যে খবর দেওয়া হইত। বাঁহার ঘরে থাইবেন না তাঁহার সংক্ষেপে বলিতেন “স্বপাক”। তাঁহাদের খাওয়ার এবং পাকের জন্ত বাহির বাড়ীতে আয়োজন করিয়া দেওয়া হইত। বাড়ীর মধ্যে পাচকের সঞ্চার ছিল না। ভিতরে হউক বাহিরে হউক ব্রাহ্মণেরা কদাচ পাচকের হাতে থাইতেন না। গরীব বড় মানুষ সকল ঘরেই মেয়েরা বস্ত্রপূর্ব্বক পাক করিতে শিখিত। ভাল পাক করা তখন সকল স্ত্রীলোকেরই গোরবের কথা ছিল। বিশেষতঃ ব্রাহ্মণের জন্ত পাক করা, পূজার আয়োজন করা তখনকার ঠাকুরাণীরা বড়ই সৌভাগ্যের কথা মনে করিতেন। এখনকার বড় মানুষের বিলাতী ধরণের বৌ কি যেমন পাক করা অপমান বোধ করিয়া কার্পেটের জুতা বুনান সম্মান বোধ করে তখন তাহা ছিল না। তখন “জুতাওয়ালী” অপেক্ষা “অন্নপূর্ণা” উপাধির গৌরব ছিল।

উপেন্দ্র আহারে বসিতেন। রাণী বোদামিনী স্বয়ং স্বামীর পরিবেশন করিতে লাগিলেন। অনতিদূরে একখানা পিড়ীর উপর মহেন্দ্রের বিধবাপত্নী রাণী পবিত্রা দেবী বসিয়া উপেন্দ্রের আহারের তত্ত্বাবধান করিতে লাগিলেন। অন্তঃপুরিকাদের পক্ষে সাংসারিক কথাবার্তার এই একটি প্রধান সময়। রাণী পবিত্রা সেই সুযোগে জিজ্ঞাসা করিলেন, “ছোট ঠাকুর! সর্ব্বা নাকি ঘর-জামাই রাখবে না?” উপেন্দ্র, “আজ্ঞা না।” “কেন?” “ভাল পাত্র ঘর-জামাই পাওয়া যায় না, যার কুল আছে কি গুণ আছে বারেন্দ্র বামুনের সে ছেলে ঘর-জামাই থাকবে না। আমার যে সর্ব্বা তার কি গাধা পাত্র শোভা পায়? রাজা মহেশ্বরের মত নাই, মুকুটমণি মহাশয়ের মত নাই, গোপালদার মত নাই আর বুড়ো বাচস্পতি ঠাকুর তো ঘর-জামাইর কথা শুনেই রাগে গালাগালি দিতে আরম্ভ করেন। আমি ভেবে চিন্তে ও সংকল্প ছেড়ে দামনাশের সাত্তালদের মধ্যে কার্য্য করবো স্থির করেছি। দামনাশের কেশব সাত্তালের ভাতুপুত্র নৃসিংহের সহিত সর্ব্বার বিবাহ দিব। ঘটক মুকুটমণি তাঁহাদের বেশ জানেন।”

পবিত্রা কহিলেন, “জাতি কুটুম্ব তো তাই চায়। দাঙ্গানাশের সাংঘাত
কুলপতির সন্তান এমন কুলীন তো আর নাই। কাজেই পরে বল্বে এই
ঘরেই কার্য্যকরা উচিত। কিন্তু আমরা তা কেমন করে পারি। কুলীন পাত্র
পাঁচটা বিয়ে কর্বে এক জনের বশ হয়ে অত্ৰকে দেখতে পার্বে না। তখন
কি হবে? তুমি যেমন এক বিয়ে করেই তুষ্ট থাক্লে আর বিয়ে কল্লে না,
অত্ৰ কুলীনের ঘরে তো আর তেমন নাই। নেহাৎ দুইটি বিয়ে না করে
আমি এমন কুলীন কখন দেখিও নাই শুনিও নাই। বিশেষ কুলপতির বংশে
তা হ’তেই পারে না। যত কুলীনের মেয়ের পাত্র যোগানই তাদের কাজ।
তাদের এক একজন চারটি পাঁচটি কুলীনের মেয়ে বিয়ে করে। ইহা তাদের
ইচ্ছায় অনিচ্ছায় কর্তেই হয়। কোন কুলীন এসে ধরলে তার মেয়ে বাধ্য
হয়েই বিয়ে করতে হয় নৈলে কুলপতির দে মানই থাকে না। যে কুলীনের পুত্র
আছে, সেই কুলক্ষার জন্য কি কুল মান বৃদ্ধির জন্য কুলপতি বংশে
মেয়ে দেয়। তোমার এক কথা বই অত্ৰ সন্তান নাই, কুলের বাছাবাছিতে
কোন প্রয়োজন নাই। তুমি কেন অত বড় কুলীনের ঘরে যাবে? নিতান্ত
ছোট ঘরে কার্য্য করতে আমার মত নাই। ভাল শ্রোত্রিয় কি কাপ কিম্বা
ছোট কুলীনের মধ্যে দেখতে শুনতে ভাল পাত্র দেখে বিয়ে দেও। সে পাত্র
যদি ঘর জামাই না হয় তবু তাকে কিছু টাকা কড়ি দিয়ে বাধ্য রাখা যাবে।”

উপেক্ষ। আপনি যা এখন বল্লেন তা আগেও বলেছেন, আপনার ছোট জায়ও
অনেক বলেছে। অত্ৰ অনেক লোকেও বলেছে এবং আমি নিজেও অনেক
চিন্তা করেছি। আমরা মহাত্মা উদয়নাচার্য্যের বংশধর নিরাধিন পঠীর প্রধান
কুলীন। কুলপতির বংশের মান আর আমাদের মান প্রায় তুল্য। আমার
কন্যা যদি কোন ছোট ঘরে বিয়ে দেই আমার জাতি কুটুম্বগণ হয়তো আমার
কন্টার হাতে থাকে না। তখন আমাদের মনে কত কষ্ট হবে আর কন্টার মনে
আরো বেশী কষ্ট হবে। আমার কন্টার পক্ষে কুলপতির সন্তান বই অত্ৰ পাত্র
কোন মতেই শোভা পায় না। যারা স্পাত্র তারা চিরকালই বহু বিবাহ
করে তারপরেও কত উপপত্নী রাখে। স্ততরাং সতীন থাকে সেও
ভাল তবু সং বংশে স্পুরুষের হাতেই মেয়ে দেওয়া ভাল। অনেকেই
বল্ছেন আমার এখনও পুত্র হওয়ার কাল যায় নাই। এখন কুল

ডুবায়ে পরে যুদ্ধি পুত্র হয় তখন কত অপদস্থ হ'তে হবে। আর এক কথা বলি, শাহজাহান বাদশাহকে কয়েদ করে, ভাই ভাতিজাকে নষ্ট ক'রে এখন ঔরংজেব বাদশাহ হয়েছে। আমি দারা শেকোর পক্ষীয় লোক ত' সে খুব জানে। আমার ধন প্রাণ রক্ষা হওয়া কঠিন। এ সময় কুল ডুবাতে ভাল হবে না।”

রাণী পবিত্রা উপেন্দ্রকে অত্যন্ত অভিমানী ও উগ্রস্বভাব জানিতেন স্মতরাং তাঁহার সুদীর্ঘ বক্তৃতায় প্রতিবাদ করিতে সাহস করিলেন না। “তৎকালে কুলাভিমান সকলেই খুব বেশী ছিল কুল ভাঙ্গিতে রাণীদেরও তত বেশী ইচ্ছা হইল না। স্মতরাং রাণী পবিত্রা বলিলেন, “আমরা কুল ভঙ্গ করিতে বলি না কেবল চাই যে আমাদের সর্ব্বা কষ্ট না পায়। তাই দেখে তোমার যেখানে ভাল হয় সেই খানে বিয়ে দাও। সে যেন ছুঃখ না পায়।”

উপেন্দ্র তাঁহার কথায় অতিমাত্র তুষ্ট হইয়া বলিলেন, “আপনি মাতৃতুল্য আপনার আজ্ঞা আমার শিরোধার্য্য। সর্ব্বা যাতে সর্ব্ব সুখে থাকে আমি সাধ্যমত তাই চেষ্টা করবো।” তার পর কথার অদৃষ্ট আর দীর্ঘবরের ইচ্ছা।”



পঞ্চদশ অধ্যায় ।

উপেন্দ্রের কন্যা সর্দমঙ্গলার বিবাহ।—নৃসিংহের রাজকাৰ্য্য

শিক্ষা।—নৃসিংহের দ্বিতীয় বিবাহ।

শ্রাবণ মাস বর্ষাকাল। আবার রাজশাহী অঞ্চল অতি নিম্নভূমি, সমস্ত দেশ জল প্লাবিত। নৌকাই যাতায়াতের এক নাত্র যান। প্রত্যেক গ্রামে প্রত্যেক বাড়ীতেই নৌকায় যাওয়া যায়। অত্যাচ্ছন্ন যান অপেক্ষা নৌকায় যাতায়াতে সুখও বেশী। বিশেষতঃ বর্ষাকালে দক্ষিণ ও পূর্ব মুখে জলের স্রোত থাকে। সে দিকে বিনা পরিশ্রমে যাওয়া যায়। আবার উত্তর পশ্চিম মুখে বাতাসের স্রোত। পাল উড়াইয়া বিনা কষ্টে সে দিকে যাওয়া যায়। অত্যাচ্ছন্ন দেশে বর্ষাকালে গমনাগমনের পক্ষে অসুবিধা হয়, পক্ষান্তরে রাজশাহী অঞ্চলে বর্ষাকালই ভ্রমণের উৎকৃষ্টতম সময়। আবার এই সময়ে এ অঞ্চল সর্কাপেক্ষা স্বাস্থ্যকর ছিল। অন্যান্য দেশে বৃষ্টির জল খাল বিল ডোবায় বদ্ধ হয় তাহার মধ্যে লতা পাতা পচিয়া বায়ু দূষিত হয় এই জন্যই অন্যান্য স্থানে বর্ষাকাল অস্বাস্থ্যকর। কিন্তু রাজশাহী অঞ্চলে সমস্ত দেশ জলে ডুবিয়া যাইত; গ্রামের উপর দিয়া, কখন বা বাড়ীর উপর দিয়া স্রোত চলিত। অন্যান্য ঋতুতে সঞ্চিত ময়লা সমুদয় সহ বর্ষাকালের ময়লা ধৌত হইয়া যাইত কোন দুর্গন্ধ থাকিতে পারিত না। সেই জন্য এই অঞ্চল বর্ষাকালে সর্কাপেক্ষা স্বাস্থ্যকর। একটু সঙ্গতিপন্ন লোকমাত্রেরই নিজের নৌকা আছে। ভাড়াটিয়া নৌকাও যথেষ্ট পাওয়া যায়। উপেন্দ্র জলপথে দামনাণ যাইবার আয়োজন করিতে লাগিলেন। দেশ জলে আচ্ছন্ন, আবার জল ধানো আচ্ছন্ন। বরেন্দ্রের ধান্যের বড়ই চমৎকার গুণ। জল যতই বাড়ে ধান্যবৃক্ষগুলিও তেমনি বাড়িতে থাকে। জলে ধান তলায় না বরং যতই বর্ষা বেশী হয় ততই ধান জন্মে। যতদূর

দৃষ্টি চলে অতদূর কেবল ধান্যক্ষেত্র শ্রামল বর্ণে শোভমান । উপেন্দ্র পুরোহিতাদি সঙ্গে লইয়া অপরাহ্নে দামনাশে চলিলেন । তৃতীয় দিনস দামনাশের ঘাটে তাঁহাদের নৌকা লাগিল ।

মুকুটমণির পরিচিত স্থান । তিনি আগে চলিলেন অন্য সকলে তাঁহার প্রদর্শিত পথে পশ্চাতে চলিল । উপেন্দ্র কেশব সাংখ্যালের বাড়ীতে উপস্থিত হইলেন । মিথিলার পণ্ডিতজীর বাড়ীর কথা তাঁহার মনে পড়িল । উপেন্দ্র দেখিলেন মৈথিল পণ্ডিত অপেক্ষা বাঙ্গালী পণ্ডিতের বাড়ী অধিক শান্তিপ্রদ । প্রাচীন মুনি ঋষিদের রীতি চরিত্র বাঙ্গালী পণ্ডিতে যতদূর লক্ষ্য হয় অত্র কুত্রাপি ততদূর হয় না । কেশব সাংখ্যাল একজন প্রধান পণ্ডিত, তাঁহার উপাধি শিরোমণি । বাড়ীতে চতুষ্পাঠী আছে, অনেকগুলি ছাত্রকে নিজব্যয়ে পালন করেন এবং শিক্ষা দেন । মৈথিল পণ্ডিতেরা “গুরু শুশ্রূষা বিহাঃ” এই শ্লোক ধরিয়া ছাত্রদের দ্বারা ভূত্যের কর্ম করাইয়া থাকেন । বাঙ্গালী পণ্ডিতদের সে ব্যবহার নাই । অধ্যাপকের নিজ সন্তানেরা যেরূপ কাজ করে ছাত্রেরাও কেবল সময়ে সময়ে তদ্রূপ কার্য্য করিয়া অধ্যাপকের সাহায্য করে, তদ্ভিন্ন ভূত্যবৎ কোন কাজ ছাত্রদের করিতে হয় না । সাংখ্যালজীর বাড়ীতে পাকা দালান কোঠা নাই । খড়ের চাল মাটির দেউল অনেকগুলি ঘর আছে । তাহাতে তিনটী প্রকোষ্ঠ, এক অঙ্গন হইতে অত্র অঙ্গনে যাইতে মধ্যে পরছত্র । কোন কোন ঘরের মাটির দেউলেই চুণাকাম করা আছে । কোন কোন ঘরে খড়ের চালের নীচে মাটির ছাত দেওয়া আছে ।

বিবাহের কথাবার্তা উপস্থিত করা ঘটকদের একচাটিয়া ছিল । মুকুটমণি দালালের মত কেশব সাংখ্যালের কাছে কাণে কাণে কয়েকটি কথা বলিলেন আবার আসিয়া উপেন্দ্র ও বাচস্পতি ঠাকুর এবং বাগছি মহাশয়ের নিকট নানা কথা বলিলেন । পাত্রপক্ষ কথাপক্ষ পরস্পরকে জানিতেন সুতরাং ঘটকালীর বড় আড়ম্বর করিতে হইল না । কুলপতির বংশীয়েরা বিশেষ অর্থলোভী ছিলেন না পক্ষান্তরে উপেন্দ্র বৈভবশালী রাজা, তাঁহার একমাত্র কন্যার বিবাহে বেশী ব্যয় করিতে কোন আপত্তি ছিল না । সুতরাং বিবাহের আদান প্রদানের কথা গুলিও এক কথাতেই শেষ হইল । মুকুটমণি যাহা বলিলেন ভয় পক্ষই তাহাতে সম্মত হইলেন ।

সোণার বেনে, শুঁড়ীদিগের রীত্যানুসারে দক্ষিণ বাঙ্গালার, এখন যেমন বিবাহের চুক্তি মধ্যে যৌতুক অলঙ্কার ও নগদ টাকা বা কোনরূপ সম্পত্তি দিবার চুক্তি হয়, বরেন্দ্র ভূমিতে সেরূপ চুক্তি অতি অল্প দিন যাবৎ আরম্ভ হইয়াছে। পূর্বে ব্রাহ্মণের মধ্যে তাদৃশ ব্যবহার কোথাও ছিল না। কেবল পণ, ভোজন এবং বারবদারী এই তিনটি পাত্রপক্ষীরে পাইতেন। পণ কুলমর্যাদা বিবেচনা করিয়া কুলজ্ঞেরা নির্দিষ্ট করিতেন। তাহাতে উভয় পক্ষের কোন আপত্তি করিবার যো ছিল না। কথাকর্তা অবস্থানুসারে কখন কখন পাত্রপক্ষের নিকট পণের কিয়দংশ মাপ লইতেন। সম্বন্ধপত্রে কিন্তু ঘটকের নির্দিষ্ট পণই লিখিত হইত। বারবদারী বিবাহ উপলক্ষে পাত্রপক্ষের যাতায়াতের ব্যয়। উভয় পক্ষের বাড়ীর ব্যবধান এক যোজনের অধিক না হইলে কোন বারবদারী দিতে হইত না। অধিক দূর হইলে ব্যবধান এবং উভয় পক্ষের অবস্থা বিবেচনা করিয়া বারবদারী উভয় পক্ষ এবং পাশ্ববর্তী সম্ভ্রান্ত অভিজ্ঞ লোকেরা বিতর্ক করিয়া মীমাংসা করিতেন। ভোজনের টাকা সম্বন্ধের সময় মীমাংসা হইত না। বিবাহের পর দিন যখন বরযাত্রীগণকে ভোজনের জন্ত কথাকর্তা নিমন্ত্রণ করিতেন তখন ভোজনের টাকার তর্ক উপস্থিত হইত। বরযাত্রী মধ্যে যে সকল লোক কথাকর্তা অপেক্ষা কুলমর্যাদায় বড় তাঁহারা কন্যাকর্তার গৃহে ভোজন করার জন্য যে টাকা পাইতেন তাহাই ভোজনমর্যাদা বা ভোজনের টাকা। এই টাকার মীমাংসায় মহা তর্ক বিতর্ক, রাগারাগি মারামারি পর্য্যন্ত হইত। কখন কখন প্রস্তুত অন্ন নষ্ট হইত, ভোজনের টাকার মীমাংসা না হওয়ায় ভোজন হইত না। তৎকালে পাত্রপণ বা বিলাতী ধরণের ডাউরী (dowry) প্রচলিত ছিল না। যৌতুক ও অলঙ্কার কন্যাকর্তা যাহা খুসি তাহাই দিতেন তদ্বিষয়ে কোন চুক্তি হইত না।

মুকুটমণি ১০১ টাকা পণ স্থির করিলেন। কেশব বারবদারী ২৫০ টাকা চাহিলেন। উপেন্দ্র হাস্যমুখে ২৫০০ আড়াই হাজার টাকা দিতে চাহিলেন, স্মৃতরাং তর্ক কিছুই হইল না। তখন বাচস্পতি ঠাকুর পাত্র আনিতে বলিলেন। পাত্র সুসজ্জিত করিয়া আনা হইল।

সুসজ্জিত শব্দের বর্তমান অর্থ ও তৎকালীন অর্থ খুব বিভিন্ন। মুসলমান বাদশাহী আমলেও দরবারী পোষাক ছিল। জমিদার এবং সরকারী কার্যা-

কারকেরা দরবারে বাহিতে জামা জোব্বা ইজার চাপকান পাগড়ী ব্যবহার করিতেন। কিন্তু অন্য সময়ে সূচীকা যুক্ত বস্ত্র বা আলখাল্লা ব্যবহার করিতেন না। সূতরাং নৃসিংহ নিজ অবস্থানুযায়ী তৎকাল প্রচলিত পোষাকে সজ্জিত হইয়া ভাবী শ্বশুরের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। তাঁহার বয়স সত্তর বৎসর, দাড়ী গোঁপের রেখাও উঠে নাই। শরীর সবল ও ঈষৎ স্থূলকায় কিন্তু একটু লম্বা ছন্দ জন্য স্থূল বোধ হয় না। মস্তকায় শিখা, চুলে কোন প্রকার স্ফীতি নাই। বর্ণ একটু ফর্সা, কিট গৌরবর্ণ নহে, সমস্ত শরীর নির্দোষ সুগঠিত। বস্ত্রের মধ্যে লাল চেলীর ধুতী চাদর। কাণে সোণার কুণ্ডল, গলায় সোণার গাঁথা রুদ্রাক্ষ মালা। দক্ষিণ হস্তে সোণার ইষ্টকবচ ও রূপার বলয় ও সোণার অঙ্গুরী। বাম হস্তে সোণার তাগা ও রূপার বলয়। কোমরে রূপার বিছা, পায়ে রূপার খাড়ুয়া ও শিশু কাঠের খঁড়ম। কপালে চুয়া ও চন্দনের ফোঁটা। ইহাই তৎকালীন মধ্যবিত্ত ব্রাহ্মণের বর-বেশ বা উত্তম পোষাক ছিল।

নৃসিংহ সভা প্রবেশ করিয়া খুড়াকে এবং অন্যান্য উপস্থিত গুরুজনকে প্রণাম করিলেন। খুড়ার উপদেশ মত বাচস্পতি ঠাকুরকে এবং মুকুটমণি ঠাকুরকে প্রণাম করিয়া “ব্রাহ্মণেভ্যো নমঃ” বলিয়া সমস্ত ব্রাহ্মণবর্গকে নমস্কার করিয়া বিনীত ভাবে খুড়ার সম্মুখে বসিলেন। উপেন্দ্র, মহেশ্বর, বাচস্পতি, গোপীনাথ বাগছি এবং লাল গোপাল বরের আপাদমস্তক পূজ্জানু-পূজ্জরূপে পর্যবেক্ষণ করিতে লাগিলেন। পাত্র দেখিয়া সকলেই সন্তুষ্ট। পাত্রের বিদ্যা বুদ্ধি পরীক্ষা জ্ঞাত উপেন্দ্র নিজেই প্রশ্ন করিতে লাগিলেন। পরে রাজা মহেশ্বর রায়, রামধন বাচস্পতি, গোপীনাথ বাগছিও নানারূপ প্রশ্ন করিলেন। নৃসিংহ তাহাতে যে উত্তর দিলেন তাহাতে সকলেই তুষ্ট হইলেন। পাত্রী সম্বন্ধে ঘটকের ও বাচস্পতি ঠাকুরের কথায় কেশবের কোন আপত্তি রহিল না। তিনি বিবাহ দিতে সম্মত হইলেন।

ধনবল জনবল উভয় থাকিলে কোন দ্রব্যেরই অভাব হয় না। সন্দেশ বাতাসা মংস্ত্র দধি ঘৃত পান বাত ছস্প্রাপ্য জিনিস নয় সূতরাং কিছুই অভাব হইল না, পরদিনেই কার্য্য ধার্য্য ও সম্বন্ধপত্র হইল। খাঁ সাহেব বিদায় হইয়া সদলে বাড়ী চলিলেন। একটাকিয়া রাজার কন্যা কুলপতির সম্মানে বিবাহ

হইবে তাহাতে মন্দ বলিতে কিছুই নাই সুতরাং কেহই কোন দোষ ধরিতে পারিল না। সকলেই ভাল বলিয়া প্রশংসা করিতে লাগিল। দেওয়ানজীর পূর্বে অমত ছিল কিন্তু পাত্র দেখিয়া তিনিও প্রশংসা করিলেন। তাঁহার ও অত্যান্য সকলের মুখে প্রশংসা শুনিয়া রাণী পবিত্রা, রাণী সৌদামিনী এবং অপর অন্তঃপুরিকাগণও তুষ্ট হইলেন। কিন্তু সর্বমঙ্গলার যে সতিনীর গঞ্জন হইবে রাণীদের মনে সে আশঙ্কা বরং আবো বুদ্ধি হইল।

বারেন্দ্র ব্রাহ্মণের পত্র হইলেই একরূপ বিবাহ হয়। তাহার পর একটা শুভদিন দেখিয়া রীতিমত বিবাহ হইয়া থাকে। উপেন্দ্র বাড়ী আসিয়া কন্যার বিবাহের উত্তোগ করিতে লাগিলেন। শুভ দিনে বিবাহের লগ্নপত্র হইল। উক্ত দিনে বিবাহ মহা ধুমধামে সম্পন্ন হইল। উভয় পক্ষ কুলমর্যাদায় সর্ব প্রধান, জনা ভোজনে বিশেষ কোন গোলযোগ হইল না। খাঁ সাহেব মুক্ত হস্তে প্রচুর দান খয়রাত করিলেন। সর্বমঙ্গলা স্বামীর বাড়ীতে উপস্থিত হইলেন।

এখানে আসিয়া সর্বমঙ্গলা “কন্যা” এবং “বৌ” এই দুই অবস্থার ভিন্নতা অনুভব করিলেন। তখন বৌদের অনেক যত্ননা ভোগ করিতে হইত। কিন্তু প্রথম বিবাহের যাত্রায় সে যত্ননা আরম্ভ হইত না। সর্বমঙ্গলা এপর্যন্ত পৈতৃক রাজপুরী ও তৎপার্বর্ভর্তী ছই চারিটা বাড়ী ব্যতীত কিছুই দেখেন নাই। নৌকায় উঠিয়া দাতগড়া হইতে দামনাশ পর্যন্ত যাইতে পথে নূতন নূতন স্থান দেখিলেন। স্বামীর আলয়ে গিয়া পাকা অট্টালিকাদি না দেখায় তাঁহার মনে কোন কষ্ট বোধ হইল না। বালিকা নূতন নূতন বস্ত্র দেখিয়া এবং নূতন অবস্থা অনুভব করিয়া কৌতুহল তৃপ্তি হেতু সন্তোষ বোধ করিতে লাগিলেন। সর্বমঙ্গলার বিবাহ হওয়া অবধি মাথায় ঘোমটা দেওয়া আরম্ভ হইল। এখন অপেক্ষা তখনকার ঘোমটা অনেক লম্বা ছিল। স্বাধীন ভাবে যাতায়াত একবারে বন্ধ হইল। ছই চারি জন বালক বালিকা ও দাসী ভিন্ন অন্যের সহ কথা বলা বন্ধ হইল। ইশারা করিয়া অধিকাংশ মনের ভাব ব্যক্ত করিতে হইল। তিনি নূতন বৌ তাতে বড় মানুষের মেয়ে আর রামেশ্বরের একমাত্র পুত্রের পত্নী সুতরাং তাঁহার শ্বশুরী তাহাকে প্রচুর আদর করিলেন। পাকস্পর্শ, দ্বিরাগমন এবং অষ্টমঙ্গল হইয়া গেল। সর্বমঙ্গলা পুনরায় পিত্রালয় গেলেন। খাঁ সাহেবের বিশেষ অনুরোধে নৃসিংহও সেই যাত্রায় শ্বশুরালয়ে গেলেন।

